ওরা সেই পুলিশ

নটরাজন

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

অত্যাচারী পুলিশের নিষ্ঠুর আচরণে
যে নিরপরাধ জনগণ জীবন বিসর্জন দিয়েছেন
এবং অশান্ত জনতার নির্মম রোষে
যে বিশ্বস্ত পুলিশ কর্মীরা পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন
তাঁদের সকলের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

॥ এক ॥

রোগমুক্তির আশায় মানুষ যেমন হাসপাতালে যায়, বিপদমুক্তির আশায় তেমনি তারা দেশের শাসনব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়।

হাসপাতালে আউটডোর, ইনডোরে থাকে হরেকরকম 'লজি'র ছড়াছড়ি। ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড। কোথাও হয় বুকের চিকিৎসা, কোথাও বা চিবুকের, কেউ ব্যস্ত চর্মরোগ নিয়ে, কেউ বা রক্তের ধর্ম নিয়ে গবেষণায় মশগুল। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় ডিপার্টমেন্টগুলোর দরজা উন্মুক্ত হয়, আবার বন্ধও হয়ে যায় একটা বিশেষ সময়ে। ব্যতিক্রম কেবল একটা ওয়ার্ড—ইমারজেন্সি। সেখানকার দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত। খোলেও না, বন্ধও হয় না। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রথমদিন থেকে সেই যে ইমারজেন্সির দরজা খুলেছে আজও তেমনি দরজার পাল্লাদুটো হাট করে খোলাই রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হয়নি।

দেশের শাসনব্যবস্থাও অনেকটা ঐরকম। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন দপ্তর। কোথাও সরকারী কাজকর্ম চলে দশটা-পাঁচটার মধ্যে। কোথাও বা সাড়ে দশটা সাড়ে পাঁচটা, কোথাও বা আরও কিছু বেশি। তারপরই তালা পড়ে দপ্তরে দপ্তরে। দমকল ছাড়া কেবল আর একটি মাত্র ডিপার্টমেন্টের দরজা কিন্তু সর্বদাই খোলা। তার নাম থানা।

হাসপাতালের ইমারজেন্সির মত প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে সেই যে এখানকার দরজা খুলেছে, কখনও কোন অবস্থাতেই সেই দরজা বন্ধ হয়নি। যতদিন এর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন বন্ধও হবে না। কে যেন ঠাট্টা করে বলেছিল, সরকারী হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ড, দমকল আর থানাগুলোর দরজার পাল্লা যদি না থাকতো তবে পূর্ত বিভাগের অনেক পয়সা বেঁচে যেত।

খট্ খট্—খট্ খট্—খট্ খট্।

দরজার সামনে ভারী বুটের শব্দ রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটানা বেজে চলেছে। সতর্ক প্রহরীর বুটের শব্দ। মাঝে মাঝে বিরতি—একটু বিশ্রাম। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে প্রহরী কনস্টেবল্ হয়ত বন্দুকের উপরই দেহভার ন্যস্ত করে একটু ঝিমিয়ে নেয়। কাজটা বে-আইনী, কিন্তু তবু করে। না করে উপায় নেই বলেই করে। পুলিশ কনস্টেবল্ হলেও সে মানুষ। রাতের পর রাত ঠায় জেগে থেকে থানার দেউড়ি পাহারা দেওয়া, কিম্বা গভীর রাতে জনমানবশূন্য রাস্তায় ঘুরে ঘুরে টহল দিয়ে ফেরা আর কত ভাল লাগে ! তার ওপর শারীরিক অবস্থাও প্রতিদিন একরকম থাকে না। কাজেই মাঝে মাঝে ঐ বে-আইনী কাজটুকু না করলে চলে না।

যদিও পরিচয়ে কনস্টেবল্, কিন্তু কৃষ্ণের শতনামের মত আরও বহু নাম আছে তাদের। কাজ অনুযায়ী তার নাম। যখন থানার দেউড়িতে দাঁড়িয়ে সেনট্রি ডিউটি করে অর্থাৎ পাহারা দেয় তখন কোথাও তার নাম 'পাহারা', আবার কোথাও বা 'দরজা'। 'দরজা' মানে দরজায়

দাঁড়িয়ে যে ডিউটি করে। আবার সেই কনস্টেবলটিই যখন থানার লক-আপ অর্থাৎ হাজতঘরের আসামীদের দেখা শোনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তাকে ডাকা হয় 'হাজত' বলে। এমনি আরও কত কি!

গভীর রাতে প্রহরীর বুটের শব্দের সঙ্গে তাল রেখে আরও একটা বস্তু বেজে চলে। সেটা হচ্ছে থানার দেয়াল ঘড়ি। ঐ বস্তুটির সঙ্গে প্রহরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুনি এলেও কান দুটো কিন্তু তার সজাগ থাকে ঐ ঘড়ির দিকে। কখন ঢং-শব্দে আওয়াজ হবে। ওই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই সে খুশি হয়ে হাতে তুলে নেবে কাঠের বড় হাতুড়িটা। আর তাই দিয়েই দেয়ালে ঝোলানো পেটা ঘণ্টায় ঘড়ির সংকেতের পুনরাবৃত্তি করে সময় ঘোষণা করবে। এই কাজটিতে তার উৎসাহের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি করার একঘেয়েমির মধ্যে মনটাকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়া। আর দ্বিতীয়ত, ওই সংকেত তার মুক্তিমন্ত্রের ধ্বনি—তার পালা বদলের সময়। ওই ঘণ্টাধ্বনি শুনে আর একজন প্রহরী এসে পালা বদল করবে তার সঙ্গে। আর সে ছুটবে নিজের ব্যারাকের দিকে বিছানায় একটু গড়িয়ে নেবে বলে।

জেলার সদর থানা—কোতোয়ালী। কোতোয়াল শব্দ থেকে কোতোয়ালী শব্দের সৃষ্টি। মুসলমান আমলে রাজধানীর সরকারী শিবিরে থাকত একজন গণ্য মান্য পুলিশ প্রধান। তার আরবী উপাধি ছিল 'শার্তা'। এদেশে তাকে বলা হত কোতোয়াল। সাবেকী সেই কোতোয়াল শব্দটির অস্তিত্ব না থাকলেও কোতোয়ালী শব্দটি এখনও রয়ে গেছে এদেশে।

রাতের কোতোয়ালী থানা। গ্রীষ্মকালের শেষ রাত। বাইরে বন্দুক হাতে প্রহরী। টানা লম্বা বারান্দার অন্য প্রান্তে 'লক আপ' অর্থাৎ হাজতঘর।

শেষ রাতের ঝিরঝির দক্ষিণে হাওয়ায় হাজতঘরে কম্বলের উপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে কয়েকটি হতভাগ্য। অপরাধ করে ধরা পড়েছে তারা পুলিশের হাতে। পরের দিন বেলা দশটায় তাদের চালান দেওয়া হবে আদালতে। অন্তর্বর্তীকালীন এই সময়টা কাটাবে তারা থানার এই অপরিসর হাজতঘরে।

ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে হাজতের মধ্যে একটা লোক কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে। দুঃস্বপ্নই বটে! পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সুখস্বপ্ন দেখতে পারে ক'জন?

একটানা কেঁদেই চলেছে লোকটা। জেগে ওঠে বুটের শব্দ। হাজতঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে বিরক্ত প্রহরী—কেয়া হুয়া! কেয়া হুয়া! চিল্লাতা কি'উ?

কান্না থামে। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ।

থানার দরজা খোলা। ভেতরে অল্প পাওয়ারের আলো। লম্বালম্বি দু'টো টেবিল সাজিয়ে তার ওপর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থেকে ডিউটি করছে নাইট ডিউটি অফিসার। না না, ওটা বেআইনী নয়। হাতের কাজ শেষ করে ধড়াচুড়ো সমেত ঘুমোবার অধিকার আছে নাইট ডিউটি অফিসারের। প্রয়োজনে সেনট্রি কনস্টেবল ডেকে দেবে তাকে। এটাই বিধি। অনেকে বাড়ি থেকে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে আসে। মাথার কাছে থেকে টেলিফোন। টেলিফোন বেজে উঠলেই রিসিভার কানের কাছে তুলে এনে বলে—.....থানা। এটাই নিয়ম। থানা অফিসার "হ্যালো" র বদলে থানার নামটি উচ্চারণ করে আগে। কথোপকথনের সময় সংক্ষিপ্ত হয় এতে।

সাব-ইন্সপেক্টর অমিত রায় কিন্তু নাইট ডিউটির সময় কখনও বিছানা নিয়ে আসে না থানায়। সোজা টেবিলের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমোয়। মাথার বালিশের স্থান অধিকার করে

কয়েকটা মোটা রেজিস্টার। থানায় বিছানা নিয়ে আসার ঝামেলা অনেক। থানার সঙ্গেই যাদের বাসস্থান তাদের পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। অমিত থাকে থানা থেকে অনেকটা দূরে একটা ভাড়া বাড়িতে। সেখান থেকে বিছানা নিয়ে আসা, আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা ঝকমারি ব্যাপার। সাইকেল অবশ্য আছে তার। সাইকেলের ক্যারিয়ারও আছে ! ইচ্ছে করলে ঐ ক্যারিয়ারে বেঁধেই বিছানা নিয়ে আসতে পারে অমিত। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগে নিজের কাছে। পুলিশের উর্দি পরে সাইকেলে বিছানা বেঁধে নিয়ে আসতে লজ্জা করে তার। অবশ্য নিজের হাতে নিজের কাজ করতে কোনদিনই তার লজ্জা নেই। কিন্তু নিজের সম্মান-অস্মানের চাইতেও উর্দির সম্মান-অসম্মান তার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। নিজের উর্দির সম্মান দিতে যে জানে না, অন্যেও তার উর্দির সম্মান দেয় না। কথাটা অবশ্য তার নিজের নয়, বলেছিলেন পুলিশ ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাদের পাসিং আউট প্যারেডের সময়। বেশিদিনের কথা নয়। মাত্র বছর তিনেক আগের ব্যাপার।

পাসিং আউট প্যারেড—অর্থাৎ ট্রেনিং কলেজে একবছর ট্রেনিং নেওয়ার সমাপ্তি দিবসের কুচকাওয়াজ। সেই অনুষ্ঠানেই নতুন সাব-ইন্সপেক্টরদের সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন কথাটা। উপদেশ দিয়েছিলেন তাদের। পরবর্তী কর্মজীবনে সেই কথাটা ভুলে যায়নি সাব-ইন্সপেক্টর অমিত রায়। তাই নিজের পোশাক, বিশেষ করে নিজের উর্দির প্রতি সবিশেষ যত্ন তার। সর্বদা ধোপদুরস্ত পোশাক পরতেই সে অভ্যস্ত।

চেহারাটাও সুন্দর। লম্বা-চওড়া সুপুরুষ আকৃতি। ধবধবে গায়ের রঙ আর ঘনকৃষ্ণ কোঁকড়া একমাথা চুল। ফরসা সুন্দর মুখে নিপুণভাবে কামানো দাড়ি গোঁফের কালচে আভাটুকু যেন তার পৌরুষকে আরও লাবণ্যময় করে তুলেছে। রুক্ষ কঠোরতার পরিবর্তে সারামুখে একটা স্নিগ্ধতার প্রলেপ।

নবীন যুবাপুরুষ অমিত রায়। ট্রেনিং কলেজ থেকে বেরিয়ে দু' বছর অন্য কোথাও শিক্ষানবীশ অর্থাৎ প্রবেশনার ছিল। তারপর চাকরিতে পাকা হয়ে মাস কয়েক আগে এই থানায় বদলী হয়ে এসেছে। বলতে গেলে তার আসল চাকরি জীবনের শুরু এই থানায়। পদাধিকারে সে দ্বিতীয়, মানে সেকেণ্ড অফিসার। অফিসার-ইন্-চার্জের পরেই তার স্থান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট অমিত রায়। কলেজে পড়ার সময় রাজনীতির চর্চা সে কোনদিনই করেনি। করেছিল কেবল শরীরচর্চা। লেখাপড়ায় মেধাবী বলে কোনকালেই নাম ছিল না তার। সাধারণ ছাত্র, মোটামুটি পাশ করে গেছে বরাবর। কলেজের ক্লাশরুমের চাইতে সেখানকার জিমনাসিয়ামের আকর্ষণ বরাবরই বেশি ছিল তার কাছে। রাজনৈতিক নেতাদের বাণীর চাইতে স্বামীজীর বাণী অনেক বেশি মূল্যবান বলে মনে করত সে।

সেই অমিত রায় যখন পুলিশের চাকরিতে ঢুকলো তখন বিস্মিত বন্ধু-বান্ধবেরা চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করেছিল তাকে, সেকি, শেষে পুলিশে চাকরি নিলি?

মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল অমিত, হ্যাঁ, নিলুম। কেন, কি হয়েছে তাতে?

—হবে আবার কী? পুলিশের চাকরি, বড় নোংরা কাজ, ওসব কি তোর ধাতে সইবে?

—সওয়ালেই সইবে। স্বীকার করছি এ চাকরিতে চোর-জোচ্চোর নিয়ে কারবার, কিন্তু তাই বলে নোংরা হতে যাবে কেন?

নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে জবাব দিয়েছিল বন্ধুটি, না, ঠিক নোংরা নয়। তবে কথায় আছে না, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। তাই বলছিলুম, ঐসব চোর-বদমাশ নিয়ে

কারবার করতে করতে তোর নিজের স্বভাবটাও না শেষে....। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গিয়েছিল বন্ধুটি।

হেসে জবাব দিয়েছিল অমিত, বেশ কথা বলেছিস। তাহলে তো পাগলা গারদের ডাক্তাররাও সবাই পাগল হয়ে যেত। ওদেরও তো পাগল নিয়ে কারবার।

বন্ধুটি বেগতিক বুঝে অন্যপথ ধরলে। বললে, ওকথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টের ঐতিহ্য কি বলত? ব্রিটিশ ভারতে চিরটা কাল সাদা চামড়াদের খয়ের-খাঁগিরি করে দেশের লোকের উপর অকথ্য অত্যাচার অযথা উৎপীড়ন করে এসেছে। ঐ স্বভাব ওদের মজ্জায় মজ্জায় এখনও ঢুকে রয়েছে।

জবাবে বলেছিল অমিত, দেখ ভাই, ব্রিটিশ আমলে ওদের অত্যাচারের অবিচারের কাহিনী আমার অজানা নয়। নিজের চোখেও কিছু কিছু দেখেছি। জানিস তো, আমার বাবা, জ্যাঠা, কাকারা ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক। আমি অবশ্য তখন খুবই ছোট। তবুও আমার মনে আছে, মাঝে মাঝে পুলিশ এসে আমাদের বাড়ি চড়াও হয়ে কী অত্যাচারটাই না করত ! বাড়ির মেয়েদের প্রতি পর্যন্ত অশালীন মন্তব্য করতে ছাড়ত না।

—হ্যাঁ, তাই তো বলছি, এমন পরিবারেব ছেলে হয়ে শেষে কিনা তুই দারোগাগিরিতে নাম লেখালি?

—হ্যাঁ, ঠিক সেই কারণেই।

—মানে?

—মানে আর কি? তখন ছোট ছিলাম। মনে মনে রাগ হত ওদের ওপর। কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। এখন বয়স হয়েছে, সেদিনের মনের রাগ এখন যুক্তির ধারে ধারালো করে বুঝতে শিখেছি যে, স্বাধীন দেশে ওদের অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে সমালোচনা কিম্বা টীকা-টিপ্পনী কাটলেই কেবল চলবে না, ওদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সেটা শুধু ওদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যেই নয়, দেশের মঙ্গলের জন্যেই তার প্রয়োজন। তাই দেশের স্বার্থেই তোর আমার মত একালের ছেলেরা যতবেশি এই ডিপার্টমেন্টে ঢুকবে, গোটা ডিপার্টমেন্টেরই দৃষ্টিভঙ্গি ততই পাল্টে যেতে বাধ্য হবে। সেকালের জনগণের ত্রাস পুলিশ বাহিনী স্বাধীন দেশে জনগণের সেবকের ভার গ্রহণ করবে।

বিস্মিত ভঙ্গিতে বন্ধুটি বলে উঠেছিল, তোর আশা তো কম নয়! ব্রিটিশের সবচাইতে বশম্বদ পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি এমনিভাবে একদিন পাল্টে যাবে তেমন আশা রাখিস তুই?

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল অমিত, নিশ্চয়। তা'ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। একদিন ব্রিটিশের অনুচর ছিল বলে রাতারাতি ওদের লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক দিয়ে ডিপার্টমেন্টকে ভরে তুলতে হবে, এটা কোন কাজের কথা নয়। এমনিভাবেই ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে যে, ওরা আর বিদেশী শাসকের অনুচর নয়। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশ ওরা। জনসেবাই ওদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

—তাহলে জনসেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তুই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ঢুকছিস? অমিতের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে তার মুখের পানে একটু কৌতুকমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বন্ধুটি।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল অমিত। তারপর ধীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, তুই তো জানিস, আমার কাছে স্বামীজীর সেবার আদর্শের চাইতে আর কোন বড় আদর্শ নেই। কিন্তু চাকরি-বাকরি না করে ঘুরে ঘুরে কেবল জনসেবা করব তেমন আর্থিক সঙ্গ

তিও আমাদের নেই। কাজেই চাকরি যখন করতেই হবে তখন আমার পক্ষে এমন একটা চাকরি করা ভাল নয়কি, যেখানে জনসাধারণের সেবা করার সুযোগ আমি পাব? আর তুইও নিশ্চয় অস্বীকার করবি না যে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে জনগণের সেবা করবার যে সুযোগ আছে তেমন সুযোগ আর অন্য কোথাও নেই। আমার নিজের বিশ্বাস জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে সমাজের দুই শ্রেণীর ব্যক্তি—ডাক্তার আর পুলিশ। মানুষের বিপদে এরাই হতে পারে তাদের প্রকৃত সহায়।

বন্ধুটি এরপর আর কোন তর্ক করেনি অমিতের সঙ্গে।

* * * *

জেলার সদর থানা হলেও শহর এলাকা ছাড়া একটি বিরাট গ্রাম-এলাকা রয়েছে এই থানার আওতায়। শহর ও গ্রাম উভয় এলাকা থেকেই প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আসে। খুনের মামলা থেকে বাগানের লেবু কিম্বা কলা চুরি পর্যন্ত। শহরের ধনী গৃহস্থের ফুলের বাগান থেকে ফুল চুরির অভিযোগও ধৈর্য ধরে শুনতে হয় অফিসারদের। তাছাড়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারপিটের ঘটনা তো আছেই।

ভোরের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। থানার সামনে বড় ঝাঁকড়া বকুল গাছে শুরু হয়েছে পক্ষীকুলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব উদ্বোধন। থানার ছাতের কড়িবরগায় অবস্থানকারী একদল পায়রা দলবল নিয়ে ছাতের কার্ণিশে বেড়াতে বেড়াতে বক্-বকম্ শব্দে উচ্চকণ্ঠে নিজেদের জবরদখলী স্বত্ব সাড়ম্বরে প্রচার করতে লেগে গেছে। সামনের উন্মুক্ত স্থানে ঘুরে ঘুরে দু'টো গুবরে শালিক গুবরে পোকাব সন্ধানে ব্যস্ত।

ঠিক এমনি সময় থানার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটি লোক সসঙ্কোচে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল ভেতরে। লোকটির হাঁটু পর্যন্ত টান টান করে পরা মলিন ধুতির উপর একটা নীল রঙের মোটা ফতুয়া। কাঁধের ওপর ওই একই রঙের একখানা কাপড়ের টুকরো। ধূলিধূসরিত খালি পা। পথশ্রমে ফতুয়ার পিঠের দিকটা ঘামে ভিজে উঠেছে। মুখে শঙ্কামিশ্রিত উৎকণ্ঠার ছাপ।

বারকয়েক উঁকি মেরেই কিন্তু লোকটি গেটের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। যেন সাহস পাচ্ছে না ভেতরে ঢুকতে।

—আরে কৌন হ্যায়—কৌন হ্যায় তুম? এতক্ষণে সেই লোকটির দিকে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে ওঠে প্রহরী।

এবার সাহস সঞ্চয় করে গুটি গুটি ভেতরে প্রবেশ করে লোকটি। প্রহরীর সামনে এসে আভূমি নত হয়ে নমস্কার করে তাকে। তারপর কাঁচুমাচু মুখের ওপর হাসির রেখা টানতে বৃথা চেষ্টা করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

লোকটিকে দেখেই কিন্তু চিনতে পারে প্রহরী। মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলে ওঠে, সীয়ারাম—সীয়ারাম। কৌন গাঁও?

—জানকীপুর। জবাব দেয় লোকটি।

—খুন, না ডাকাইতি?

—ডাকাতি।

—আচ্ছা ঠায়রো, দারোগাবাবুকো বোলাতে হ্যাঁয়।

প্রহরী দুপা এগিয়ে যেতেই লোকটি উঁকি মেরে থানার ভেতরটা একবার দেখে নেয়। টেবিলের ওপরে ঘুমন্ত অমিতকে দেখেই কিন্তু শঙ্কিত অথচ চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে, না না

সেপাইজ্জী, এখন ডাকবেন না, একে তো সাতসকালে আমাকে দেখেই হয়ত রেগে উঠবেন দারোগাবাবু, তার উপর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে আর—।

লোকটির কথা শেষ হবার আগেই চকচকে দাঁতের পাটি বের করে হেসে কনস্টেবলটি বললে, আরে নেহি নেহি, ডরো মৎ, নয়া দারোগাবাবু, বহুত আচ্ছা আদমী।

লোকটির আশঙ্কা একেবারেই অমূলক বলা চলে না। গ্রামের চৌকিদার সে। সাতসকালে থানায় চৌকিদারের আগমনকে থানার বাবুরা কি চোখে দেখে থাকে তা তার অজানা নয়। থানায় বসে সকালে চৌকিদারের মুখ দেখে কোন দারোগাবাবুরই কোনদিন মনে পড়ে না সেই গানের কলিটি—সকালে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু দিন যাবে মোর ভালো। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো। মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে। ঐসময় তার আগমনের একটি মাত্রই অর্থ—হয় খুন, নয় ডাকাতি, নয় তো ওই জাতীয় আর একটা সাংঘাতিক কিছু।

তাই, শান্তিপ্রিয় নাগরিক নিজের বাড়িতে হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব ঘটতে দেখলে যেমন আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তেমনি থানার বাবুরাও সাতসকালে চৌকিদারের আবির্ভাবে হয়ে ওঠে শঙ্কিত। মনে মনে বলে, সর্বনাশ, এত সকালেই এসে হাজির হয়েছে? কেউ কেউ আবার বেশ বিরক্তও হয়ে ওঠে। আর সেই বিরক্তির ধাক্কা সামলাতে হয় ওই চৌকিদারকেই। কিন্তু যতই অপ্রিয় হোক সরকারি কাজ তাকে করতেই হবে। সুদূর গ্রামের খবরাখবর থানায় পৌছে দিতেই হবে। এটাই তার আসল কাজ।

চৌকিদার। শহর থেকে দূরে গ্রাম বাংলার একমাত্র সরকারি প্রতিনিধি। পুলিশের কাজ করতে হলেও চৌকিদার পুলিশ নয়। থানার পুলিশ আর গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে 'লিঁয়াস' অফিসারের অর্থাৎ সংযোগরক্ষাকারীর কাজ করতে হয় তাকে। পুলিশের মত রাতে গ্রামের পথে একাকী ঘুরে ঘুরে গ্রাম পাহারা দেয় সে। হাতে থাকে সড়কি জাতীয় একটা কিছু অস্ত্র আর একটা কালিঝুলি পড়া হ্যারিকেন লণ্ঠন। গভীর রাতে গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে টানা সুরে থেকে থেকে সে চিৎকার করে ওঠে—খ—ব—র—দা—র! গ্রামবাসীকে সাবধানে থাকতে বলে।

সরকারি উর্দিও পায় এরা। গায়ে একটা নীল রঙের কুর্তা, মাথায় নীল কাপড়ের পাগড়ী আর কোমরে বেল্ট। খালি পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুতির ওপরে ওই সরকারি উর্দি পরে ঘুরে বেড়ায় তারা। চোর-ডাকাত ধরা পড়লে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে থানায় নিয়ে আসার দায়িত্বও তার।

সরকারি কর্মচারী যখন, তখন মাইনেও কিছু আছে। কিন্তু তা যৎসামান্য। অধিকাংশেরই নিজের জমি-জমা আছে কিছু। চাষবাস করে খায়। অনেকটা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের একস্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারের মত।

মাইনে যাই হোক না কেন, আইনে সে সরকারী কর্মচারী। সেই সুবাদে গাঁয়ের লোকের কাছে এখনও কিছু খাতির পায়। সেকালে ব্রিটিশ রাজত্বে খাতির যত্ন যথেষ্টই পেত। লোকে বলত—ওটা হচ্ছে চৌকিদার বাড়ি। গ্রাম্য সমাজে একটা বিশেষ স্থান ছিল তার।

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। কালের আবর্তে গাঁয়ের লোকের কাছে খোদ পুলিশের প্রতিপত্তিই যখন অনেকটা খর্ব হয়ে গেছে তখন চৌকিদার তো কোন্ ছার! কেউ কেউ ভাবে চৌকিদারী কাজটা স্রেফ বেগার খাটার সামিল। তবুও গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে এখনও কিছু খাতির পায় এরা।

অপরিচিত গাঁয়ে মামলা তদন্তে গিয়ে দারোগাবাবুর কিন্তু এখনও ভরসা এই চৌকিদার। বর্ষাকালে গামছা পরে কোমর সমান জল কাদা ভেঙে দারোগাবাবু যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায় তখন তার সাইকেলটি সযত্নে কাঁধে তুলে পার করে দেয় এই চৌকিদার। মামলা তদন্ত করতে করতে দারোগাবাবুর যখন দুপুর গড়িয়ে যায়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় যখন সে অস্থির হয়ে পড়ে তখন চা ও মুড়ির সন্ধানে ছোটে এই চৌকিদার। গাঁয়ের কোন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে দারোগা বাবুর একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করতেও হয় এই চৌকিদারকে। গ্রীষ্মের দুপুরে কড়া মেজাজের দারোগাবাবুর মস্তিষ্ক শীতল করতে গাছে উঠে ডাব পেড়ে আনে এই চৌকিদার। তাছাড়া গাঁয়ের দুষ্ট প্রকৃতির লোকের খবর জোগায় এরা। আসলে, চৌকিদারের দায়ের চাইতে দায়িত্ব অনেক বেশি।

সেন্ট্রি কনস্টেব্‌ল্ অর্থাৎ প্রহরীর ডাকে ধড়মড় করে টেবিলে উঠে বসে থানার মেজবাবু অমিত রায়। গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়েছিল বলে যেন একটু লজ্জিতই হয়। চোখ রগড়ে হাই তুলে চেয়ারে বসতে বসতে সে প্রশ্ন করে, কি হল?

—জন্‌কীপুর গাঁওসে চৌকিদার আয়া, 'হজুর'। কনস্টেবলের মুখে 'হজুর' শব্দটি হজুর হয়ে দাঁড়ায়।

—কেন, কি হল? ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অমিতের।

—ডাকাইতি, হজুর।

—সর্বনাশ, ডাকাতি হয়েছে? কোথায় চৌকিদার? ডাকো—ডাকো তাকে। আভূমি নত হয়ে অমিতকে প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে থাকে চৌকিদার। সেপাইজি ঠিকই বলেছে। নতুন দারোগাবাবু লোক ভাল। ডাকাতির খবর শুনেও মুখে-চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে নি।

—কখন ডাকাতি হল?

—আজ্ঞে, রাত দু'টো আড়াইটের সময়।

—কার বাড়ি?

—আসগর শেখের বাড়ি।

—ক'জন ডাকাত ছিল?

—তা' প্রায় দশ-বারোজন।

—তুমি ঠিক জানো দশ-বারোজন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। খবর পেয়ে আমি যখন ওদের বাড়ি গেলাম তখন ডাকাতরা মালকড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আসগর শেখের পরিবার ফুলবিবি কাঁদতে কাঁদতে বললে দশ-বারোজন এসেছিল।

—মারপিট করেছিল?

—হ্যাঁ, বুড়ো আসগর শেখের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। প্রায় মর-মর অবস্থা।

—বুড়ো এখন কোথায়?

—গাঁয়ের লোকেরা ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

—কোন্ হাসপাতালে?

—আজ্ঞে, পাশের গাঁয়ের হাসপাতালে।

—পাশের গাঁয়ে হাসপাতাল? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অমিত।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু। সেই নয়া সরকারি হাসপাতাল হয়েছে না একটা?

—হাসপাতাল?—ও....হ্যাঁ, হেল্‌থ সেন্টার?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবু, ঐ নামই বটে। আমরা বলি হাসপাতাল। মুখ্যু মানুষ, ইংরিজি নাম মুখে আসে না আমাদের।

একমুহূর্ত চিন্তা করে অমিত আবার প্রশ্ন করে, কি কি নিয়েছে বলতে পারো?

—ফুলবিবির গায়ের সোনার গয়নাগাটি সব নিয়েছে। আর তোরঙ্গ ভেঙে কিছু টাকা-পয়সাও নাকি নিয়ে পালিয়েছে।

—গাঁয়ের লোকেরা ডাকাতদের বাধা দেয়নি?

—কি করে দেবে বাবু? লোকগুলো যে বম্ ফাটিয়েছিল। ভয়ে তারা বাইরেই বেরোয়নি।

একটু সময় চিন্তা করে অমিত। তারপর এজাহারের বইটা টেনে নেয় সামনে। সোজা ব্যাপার তো নয়! ডাকাতি। পুলিশের চোখে সবচাইতে গুরুতর ধরনের অপরাধ এই ডাকাতি। এমন কি সাধারণ নরহত্যার চাইতেও গুরুতর। সাধারণ নরহত্যার প্রতিবিধান করতে পুলিশ সচেষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একে প্রতিরোধ করা চলে না। কে কখন কাকে অতর্কিতে হত্যা করবে তা আগে থাকতে ধারণা করে রাখা যায় না। তাই সাধারণ নরহত্যার ব্যাপারে পুলিশের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। কিন্তু ডাকাতির ক্ষেত্রে তা নয়। সেখানে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুলিশের। প্রতিবিধান তো বটেই, প্রতিরোধ করাটাই সেক্ষেত্রে পুলিশের আসল কাজ। ডাকাতি মানে দেশের আইন-কানুনের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন। সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের আছে এবং সেই অধিকারের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখাটাই পুলিশের কাজ। কিন্তু একদল দুষ্কৃতকারী যখন জোর করে একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিকের বাড়ি প্রবেশ করে মেরে কেটে তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে, তখন পুলিশের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সাধারণের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তাই গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ডাকাতি দমন করতে বদ্ধপরিকর।

ভেবে-চিন্তে এজাহার নিতে একটু বেলা হয়ে যায় অমিতের। এজাহার বইটার পাতায় নিরক্ষর চৌকিদারের বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নিতে নিতে হাঁক দেয় অমিত, পাহারা—পাহারা! কোই সিপাই কো বোলাও। বড়াবাবুকো কোঠিমে খবর ভেজনে হোগা।

খবর পৌঁছায় বড়বাবু অর্থাৎ অফিসার-ইন্-চার্জ ভবদেব ব্যানার্জীর কাছে। তার নির্দেশ মত পিনাকী সরকার যখন পোশাক পরে থানায় এসে হাজির হয়, তখন থানার ঘড়িতে সকাল সাতটা।

ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পিনাকী সরকারের স্থান তৃতীয়। থানার সেজদারোগা সে। ডাকাতি মামলার তদন্তে যাবার জন্যে তাকেই নির্দেশ দিয়েছে বড়বাবু।

পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি বয়স পিনাকীর। মেদবহুল চেহারা। মাথাজোড়া বিরাট টাক। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ থাকলেও দেহের ভঙ্গিমায় কেমন যেন একটা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। নেহাৎ না করলে নয় তাই করতে হচ্ছে, এমনি চাল চলন কথাবার্তা পিনাকীর। নিজের সম্বন্ধেও উঁচু ধারণা তার। সবার ওপরে তার প্রধান গর্ব, সে সৎ। অসৎ পথে অর্থোপার্জনকে সে ঘৃণা করে। আর প্রয়োজন মত সেকথা নিজের মুখে ঘোষণা করতেও সে ছাড়ে না। যারা সুযোগমত দু'চার পয়সা উপরি রোজগার করে তাদের সে একটু কৃপার দৃষ্টিতেই দেখে থাকে।

থানায় ঢুকেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অমিতের পাশে বসে পিনাকী।

তারপর অমিতের দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, বেশ করেছেন মশাই। সকাল হতে না হতেই একখানা ডাকাতি মামলা রুজু করে দিয়ে দিব্বি বসে রয়েছেন।

অমিতের ভ্রূ-যুগল কুঁচকে ওঠে একটু। বয়সে এবং চাকরির দৈর্ঘ্যে পিনাকী তার চাইতে বড় হলেও পদগৌরবে তার নিজের স্থান ভবদেবের পরেই। অমিত থানার মেজবাবু, আর পিনাকী সেজ, এ নিয়ে পিনাকীর মনে যে একটু ক্ষোভ জমা হয়ে আছে তা' মাঝে মধ্যেই তার কথাবার্তায় প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জবাব দেয় অমিত, তা' আমি আর কী করতে পারি? ডাকাতি মামলা এলে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারি না?

—তা' তো বটেই। কিন্তু এই সাতসকালে সমস্ত ঝক্কিটা যে এসে পড়ল আমার ওপর। কোথায় এই ভোরবেলা একটু আরাম করে ঘুমোবো! তা' নয়, এখন কোথাকার কোন গ্রামে গিয়ে উপোস করে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াও!

এমনি সময় চৌকিদার তার ময়লা দাঁতগুলো বের করে সোৎসাহে বলে ওঠে, আজ্ঞে, গাঁয়ে গিয়ে আপনাকে উপোস করে থাকতে হবে কেন, বাবু? আমাদের গাঁয়ের পাঁচু মণ্ডল ধনী লোক। পঞ্চাশ বিঘের ওপর জমিজমা আছে। তার ওখানেই আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা.....।

চৌকিদারের কথা শেষ হবার আগেই তাকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় পিনাকী, চুপ কর হতভাগা। তুই বুঝি এই সাতসকালে ডাকাতির খবর নিয়ে এসেছিস? তারপর আবার মুখ ভেংচে বলতে থাকে, উনি এখন এসেছেন আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে! আরে মুখ্যু, তুই কি আমাকে আর দশটা দারোগার মত পেয়েছিস যে, তু বলে ডাকলেই পাত পেতে খেতে বসে যাবো? আমার নাম পিনাকী সরকার, বুঝলি হাঁদারাম? এক পয়সা ঘুষ খাই নে। খেতেও বসি নে কারুর বাড়ি।

ধমক খেয়ে উৎসাহটুকু উবে যায় চৌকিদারের। গ্রামে মামলার তদন্তে গিয়ে সারাদিন উপোস করে না থেকে গাঁয়ের কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ি একবেলা আতিথ্য গ্রহণের সঙ্গে ঘুষ খাওয়ার কী সম্বন্ধ থাকতে পারে তা ঠিক বুঝতে পারে না সে।

পিনাকী এবার একটু শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে চৌকিদারকে, তোদের জানকীপুর গাঁয়ে যেতে কতটা সময় লাগবে রে?

কাঁচুমাচু মুখে চৌকিদার জবাব দেয়, তা সাইকেলে গেলে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন বাবু।

—তিন ঘণ্টা! প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে পিনাকী। ঘুম থেকে উঠেই এখন তিন ঘণ্টা সাইকেল চালাতে হবে?

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিল অমিত। এবার সে বলে ওঠে, আপনি আর দেরি করছেন কেন, পিনাকীবাবু? যাবেন তো রওনা হয়ে যান।

খানিকক্ষণ অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দেয় পিনাকী, আপনার আর কি মশাই ! আপনি তো বলেই খালাস।

তারপর একটু থেমে আবার বললে, যা' হবার তা' তো হয়েই গেছে। ডাকাতগুলো তো আর সেখানে আমার জন্য বসে নেই যে, গিয়েই তাদের পাকড়াও করবো? একটু আধটু দেরি হলই বা ! তাতে এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে তদন্তের?

—বলছেন কি আপনি? বিস্ময় ঝরে পড়ে অমিতের কণ্ঠে, ডাকাতির স্পটে যেতে দেরি হলে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নেই? ঘটনার ক্লুগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে না?

—আরে রেখে দেন আপনার ক্লু। যা থাকবার তা এমনিতেই থাকবে। মাঝখান থেকে আমি কেন শুধু শুধু দৌড়ে মরি?

কথাটা বললে বটে পিনাকী, কিন্তু থানায় আর বেশিক্ষণ বসে থাকতেও ভরসা পেলো না। মুখে যতই বলুক চাকরি তার অনেক দিনেব, ডাকাতি মামলার গুরুত্ব মোটেই অজানা নয় তার। তাড়াতাড়ি অকুস্থল পরিদর্শন করা তদন্তকারী অফিসারের পক্ষে যে কতটা জরুরী প্রয়োজন সে জ্ঞানও তার আছে।

তাই অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে চৌকিদারের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, তুই ব্যাটা এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমি যাবো সাইকেলে, তুই কি হেঁটে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাস নাকি?

—না বাবু, এই তো যাচ্ছি। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে বাইরের দিকে পা বাড়ায় চৌকিদার।

পিনাকীও আর দেরি করে না। গোমড়া মুখে থানার বারান্দায় এসে নিজের সাইকেলটা টেনে নেয়।

. মুখে অবশ্য মিথ্যে বড়াই করে না পিনাকী। অফিসার হিসাবে সে নিঃসন্দেহে সৎ। তদন্তও জানে ভালোই। কিন্তু কেবল একটিমাত্র দোষে তার সমস্ত গুণ ঢাকা পড়ে যায়। সেটা হচ্ছে তার আলস্য। শুধু আলস্যই বা কেন, মানুষ বিপদে পড়ে যখন পুলিশের দ্বারস্থ হয় তখন তাদের বিপদাপদকে কেউ যদি সহানুভূতির চোখে না দেখে উটকো ঝামেলা বলে গণ্য করে, তাহলে তার পক্ষে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে তদন্ত করা কি সম্ভব? হোক সে সৎ, হোক সে দক্ষ, কিন্তু তখন তার সমস্ত সততা, দক্ষতা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করে তাব উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার মধ্যে তদন্তকারী অফিসার সার্থকতার আনন্দ উপভোগ করে। নিজের সুনাম তো বটেই, সেই সার্থকতার আনন্দ তার মস্ত বড় প্রেরণা। কিন্তু পিনাকী সেক্ষেত্রে কেমন যেন নির্বিকার। সার্থকতার আনন্দও যেমন সে উপভোগ করে না, বিফলতার গ্লানিও তেমন একটা স্পর্শ করতে পারে না তাকে। তাই তার কাজকর্মের মধ্যে নেই তেমন কোন প্রাণের সাড়া, আছে কেবল একটা যান্ত্রিক কাঠিন্য। ক্ষমতানুসারে যতটা সম্ভব করছি, তাতে কিছু ফল হল তো ভালো, না হল তো আমার নিজের কি যায় আসে?—এমনি একটা ভঙ্গি তার।

পিনাকী বেরিয়ে যেতেই ডাইরী বইটা আবার সামনে টেনে নেয় অমিত। এখনও অনেক কাজ তার বাকি। নতুন দিনের ডাইরী পত্তন করতে হবে তাকে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে অমিতের সামনে এসে দাঁড়ায় প্রহরী কনস্টেবল্। খৈনির ভারে ঝুলে পড়া নিচের ঠোঁটটা যথাসাধ্য চেপে বললে, আসামী বাহার যায়গা হজুর।

এই একটা কাজ। সকালবেলা হাজতের আসামীর প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা করতে হয়। কাজটা সম্পন্ন করায় কনস্টেবলেরা, কিন্তু দায়িত্ব ডিউটি অফিসারের। সর্বদা চোখ-কান খোলা রেখে সতর্ক থাকতে হয়, সুযোগ বুঝে পালাতে না পারে তারা।

শহর কলকাতায় হাজতের মধ্যেই একপাশে আসামীর প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা থাকলেও মফঃস্বলের অধিকাংশ থানাতেই আসামীর কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে যেতে হয় বাইরে। সে এক বিচিত্র ব্যবস্থা! ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান বলা চলে। কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ভেজানো দরজার ওপাশে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যস্ত আসামী। আর বাইরে দড়ির অপরপ্রান্ত হাতে দাঁড়িয়ে থাকে কনস্টেবল্। তেমন কোন সাংঘাতিক মামলার আসামী হলে

আর একজন কনস্টেবল্‌ও তীক্ষ্ণ নজর রাখে সেদিকে। কোনক্রমে ভিতর থেকে গলে গিয়ে পেছন দিয়ে পালিয়ে না যায়। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে আসামীর পালিয়ে যাওয়া তার নিজের পক্ষে যতটা গৌরবের, ঠিক ততোধিক অগৌরবের পুলিশের পক্ষে।

কবে কোন্‌কালে নাকি এমনি ঘটনা ঘটেছিল। দড়ির একপ্রান্ত হাতে কনস্টেবল্‌ দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। মিনিট ছাড়িয়ে ঘণ্টাও কেটে যায়, কিন্তু আসামীর বেরিয়ে আসার নামটি পর্যন্ত নেই। বিরক্ত হয়ে তখন কনস্টেবল্‌ তার ভোজপুরী ভাষায় কিছু মধুর বাক্য প্রয়োগ করে ভেতরের লোকটিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাতেও ফল হয় না কিছু। অবশেষে কেমন যেন সন্দেহ হয় তার। লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে কনস্টেবলটি ভেজানো দরজা এক ঝটকায় খুলে ফেলেই 'সীতারাম' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। কোথায় বা আসামী, কোথায় বা কে? দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা রয়েছে গাড়ুর সঙ্গে। ভেতরের ফাঁক গলে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেছে অনেক আগেই।

প্রহরী কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় অমিত, দো সেপাইকো বারিক সে বোলাও।

'বারিক' মানে ব্যারাক—কনস্টেবলদের ব্যারাক। থানা সন্নিহিত ওই ব্যারাকেই তাদের আস্তানা।

লম্বা হলঘরে সারি সারি লোহার খাটিয়া। মাথার কাছে চটের আচ্ছাদনে ঢাকা ছোট ছোট বিছানা। দুই খাটিয়ার মাঝামাঝি স্থানটুকু অধিকার করে থাকে কালো রঙের বাক্স প্যাঁটরা—মোটামুটি এই হল কনস্টেবল্‌ ব্যারাকের চেহারা। ব্যারাকের একপাশে ছোট ছোট পায়রার খোপের মত রান্নাঘর, যাকে প্রবাসী কনস্টেবলরা বলে 'চৌকা'। পুলিশের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও সময় করে এদের অধিকাংশই এই চৌকায় নিজের হাতে রান্না করে খায়। বাঙালী কনস্টেবলদের ধাতে এত কষ্ট সহ্য হয় না। তাই তারা ছোটে সাধারণতঃ হোটেলে কিম্বা ঐ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানের দিকে।

সকাল বিকেল ভিজে গামছা পরে এই চৌকায় খানা পাকাতে পাকাতে কনস্টেবলরা নিজেদের মধ্যে কত রাজা-উজির মারে। সম্ভব, অসম্ভব, সত্যি, মিথ্যে কতরকম খবরের আদান-প্রদান হয় এখানে। তাই থানার বাবুরা ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছে 'চৌকা গেজেটের খবর'। পুলিশ গেজেটে যে খবর থাকে তার চাইতে এই চৌকা গেজেটের খবরের চাকচিক্য অনেক বেশি, বর্ণচ্ছটায় অনেক বেশি উজ্জ্বল।

ব্যারাকের সামনেই কোন একটি গাছের নীচে সযত্নে সাজানো থাকে গোটা কয়েক পাথরের নুড়ি। সকাল-সন্ধ্যা হিন্দুস্থানী ভক্তবৃন্দ ফুল ও জল ঢালে এখানে। কোথাও বা পাথরের নুড়ির বদলে হনুমানজীর মূর্তি। সিঁদুরের প্রলেপে টকটকে লাল তার মুখখানা। গাছের ডালের সঙ্গে সরু কঞ্চিতে বাঁধা লাল রঙের মহাবীরের পতাকা।

সামনের কঞ্চিঘেরা ছোট বাগানে দু' চারটে ফুলগাছের সঙ্গে সহাবস্থান করে কিছু শাকসব্জির গাছ। নিজের বিশ্রামের সময় থেকে কিছু সময় বাঁচিয়ে কোন উৎসাহী কনস্টেবল্‌ হয়ত শীতকালে বেগুন, কপি কিংবা পালংশাকের চাষ করে সেখানে।

ব্যারাকের পাশের ডাস্টবিনের আবর্জনাস্তূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া দাঁতনের সংখ্যাই বেশি। এই একটি নিত্যকর্ম। কনস্টেবলরা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সকালবেলা এই কর্মটি করা চাই। এমনকি সারারাত ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে ব্যারাকে ফিরবার সময় দাঁতনকাঠি জোগাড় করে দাঁত মাজতে মাজতে ফিরবে। প্রবাসী কনস্টেবলরা

সাধারণতঃ সঞ্চয়ী। অতি সাধারণভাবে জীবন কাটায় ওরা। বাজে খরচ সহ্য হয় না ওদের ধাতে। ওদের একমাত্র লক্ষ্য কি করে নিজের মুলুকে আরও দু'বিঘে জমি কিনবে। এ বিষয়ে বাঙালী কনস্টেবলরা যাকে বলে দরাজহস্ত। মাসের বিশ তারিখের মধ্যেই মাইনের টাকা উড়িয়ে দিয়ে ঐ প্রবাসী ভাইদের কাছেই হাত পাতে। শুধু ওরা কেন, প্রয়োজনে থানার বাবুরা পর্যন্ত ধার করে ওদের কাছে। যদিও পুলিশ কানুনে টাকা ধার দেওয়া ও ধার করা দুটোই বারণ।

দিনের ডাইরীপত্তন শেষ হয় অমিতের। তারপর হাঁক দেয় প্রহরী কনস্টেবলকে, পাহারা, সেপাই লোগোকো বোলাও, ডাইরীমে সই করনে হোগা।

একে একে তারা এসে নিজেদের ডিউটি বুঝে নিয়ে ডায়রীতে সই করে। কেউ ইংরেজীতে, কেউ বাংলায়, কেউ বা হিন্দিতে। কনস্টেবলদের মধ্যে পশ্চিমের মুসলমান থাকলে উর্দু সইও দু'একটা চোখে পড়ে—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নির্বিরোধ অবস্থান ঘটে পুলিশের খাতায়।

অমিতের কাজ আপাততঃ শেষ। এবার আর একজন অফিসার এসে থানার চার্জ বুঝে নেবে তার কাছ থেকে। তারপর শুরু হবে তার নিজের কাজ। নিজের কাজ মানে মামলা তদন্তের ডাইরী লেখা, বিভিন্ন এন্‌কোয়ারীর রিপোর্ট লেখা প্রভৃতি। প্রয়োজনে বাইরেও যেতে হতে পারে তাকে। বাড়ি ফিরতে সেই বেলা দু'টো। খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম। আবার চারটা সাড়ে চারটা থেকেই কাজ শুরু। চলবে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত।

না, বিশ্রাম বলতে তেমন কিছু নেই এই চাকরিতে। দিন-রাত কাজ আর কাজ, শুধুই সরকারি কাজ। কর্মযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু খারাপ লাগে না অমিতের। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে সেই আনন্দের স্বাদ এতদিনে পেয়েছে অমিত। সংসারে এ ধরনের লোকদেরই বলে 'কাজ-পাগল'। কাজ ছাড়া যারা আর কিছু জানে না। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রায় প্রতিটি লোককেই এই আখ্যা দেওয়া চলে। তাই এদের মুখে ডিপার্টমেন্টের কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই। খুব বেশি উৎসাহী দু'চারজন ছাড়া এদের মুখে সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধুলো, এমন কি দেশের রাজনীতি নিয়েও তেমন কোন আলোচনা শোনা যায় না।

অমিতের বয়স কম, নতুন চাকরি, খেলাধুলোয় সে চিরদিনই উৎসাহী। তাই কাজের মধ্যে সুযোগ করে নিয়ে মাঝে মাঝে শহরের একটা ক্লাবে গিয়ে হাজির হয়। শীতের সন্ধ্যায় দু'চার গেম ব্যাডমিন্টন খেলে, অথবা ঘন্টাখানেক তাসের আসরে কাটিয়ে ফিরে আসে থানায়।

ডাইরী-বইটা খোলা থাকে সামনে। অমিত বসে থাকে ধূর্জটিবাবুর জন্যে। ধূর্জটী গাঙ্গুলী—থানার চতুর্থ দারোগা। ধূর্জটিবাবুই এসে তার কাছ থেকে বুঝে নেবে চার্জ।

থানা-ডিউটি যেন একটা রিলে রেস। তফাৎ শুধু এই যে, রিলে রেসের শেষ আছে, কিন্তু এর শেষ নেই। এ যেন একটা বৃত্তাকার রিলে রেস। যেদিন থেকে থানার প্রতিষ্ঠা সেই থেকে এই ডিউটি আরম্ভ হয়েছে। একজনের পর একজন, তারপর আর একজন। একমুহূর্তের জন্যেও ফাঁক নেই, বিরতি নেই। এ যেন ঠিক সেই রাবণের চিতা। ছেলেবেলার সেই কথাটা মনে পড়ে অমিতের। কে যেন তাকে বলেছিল, রাবণের চিতা জ্বলছে তো জ্বলছেই। এখনো নেভেনি। কোনদিনই নিভবে না। দু'কানে আঙুল দে, শুনতে পাবি সেই চিতার আগুনের শব্দ। তার কথামত আঙুল দিয়ে দু'কান বন্ধ করেছিল অমিত। সত্যি তাই, আগুনের শব্দই বটে। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনের শব্দ সেদিন স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল অমিত।

।। দুই ।।

বেলা সাড়ে আটটা।

কর্মব্যস্ত সদর থানা। ডিউটি অফিসার এখন ধূর্জটী গাঙ্গুলী। থানায় লোকজন আসছে, যাচ্ছে। নানারকম প্রয়োজন তাদের, নানা ধরনের অভিযোগ।

থানা-হাজতের সামনে বন্দুক হাতে বাঙালী প্রহরী কনস্টেবল্। মধ্যবয়সী একটি আসামী দু'হাতে হাজতঘরের দরজার লোহার শিক ধরে মিনতি করতে থাকে প্রহরীকে, সিপাইজী, দয়া করে এককাপ চা খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

চা-পিয়াসী এই লোকটি অনেকক্ষণ ধরেই অনুরোধ করেছিল তাকে। জবাবে প্রহরী কনস্টেবল্ বলছিল, না, চা খাওয়ার নিয়ম নেই হাজতের মধ্যে। বেলা ন'টা নাগাদ সরকারি খাবার আসবে। খাবার খেয়ে আদালতে চালান হয়ে যাবে তোমরা।

সরকারী খাবার মানে পুরী তরকারী কিম্বা ঐ জাতীয় কোন কিছু। প্রতিটি আসামীর জন্যে নগদ আট আনার সরকারী খাবার বরাদ্দ। এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে এক টাকা।

কিন্তু সেই মধ্যবয়সী আসামীটি প্রহরীর কথায় সন্তুষ্ট নয়। চা-তেষ্টায় সে তখন কাতর হয়ে পড়েছে। অনেকদিনের অভ্যেস, তাই সে অনুরোধ করতে থাকে প্রহরীকে, রাস্তার ওপাশেই তো চায়ের দোকান। দয়া করে দোকানের ছোকরাকে বলে এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করুন সেপাইজী!

এবার প্রহরী কনস্টেবল্ হেঁকে ওঠে, চা খাবে তো পয়সা কোথায়, শুনি?

—-আছে সেপাইজী, পয়সা আছে।

—কোথায় পেলে পয়সা? হাজতে ঢোকার আগে পয়সা-কড়ি তো সব জমা করে নিয়েছেন দারোগাবাবু। আবার পয়সা জোগাড় করলে কোত্থেকে?

লোকটি তার ময়লা দাঁতগুলো বের করে হাসে প্রহরীর দিকে তাকিয়ে। তারপর গায়ের জামার ছিদ্রপথে হাত ঢুকিয়ে একটা আধুলি বের করে বললে, হাজতে তো আজ নতুন ঢুকিনি সেপাইজী। তাই নিজের দরকারে দু'চার পয়সা লুকিয়ে রাখতে হয়।

প্রহরী কনস্টেবল্ এক মিনিট চিন্তা করে। বোধহয় লোকটির চায়ের নেশার পরিমাপ করতে চেষ্টা করে মনে মনে। তারপর হাতছানি দিয়ে রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানের ছোকরাকে ডাকে।

ছেলেটা এলে প্রহরী বলে, এক কাপ চা নিয়ে আয়। আর ওর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যা।

আধুলিটা ছেলেটার হাতে দিয়ে লোকটি বললে, হ্যাঁ, এক কাপ চা, আর সেই সঙ্গে বিড়ি ও একটা দেশলাই।

—মামার বাড়ি পেয়েছ নাকি? গর্জে ওঠে প্রহরী কনস্টেবল্, তা'হলে কিন্তু চা-ও খেতে দেব না।

—থাক—থাক। লোকটা সংশোধন করে নিজের কথা, এক কাপ চা পেলেই চলবে।

এমনি সময় থানায় প্রবেশ করে অফিসার-ইন-চার্জ অর্থাৎ বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জী।

প্রহরী কনস্টেবল্ দাঁড় করানো বন্দুকটাকে ডান হাতে তুলে নিয়ে বুটের খট্ শব্দে এ্যাটেনশন্ হয়ে অভিবাদন করে।

প্রতি-নমস্কার করে সোজা থানার মধ্যে প্রবেশ করে ভবদেব ব্যানার্জী।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। সাধারণ দোহারা গঠন। বয়সের বোঝা দেহকে ভারাক্রান্ত করতে পারে নি এখনও। কাঁচাপাকা হিটলারী গোঁফের নীচে ঠোঁট জোড়ায় সর্বদাই যেন একটু হাসি লেগে রয়েছে। রেগে উঠলেও ঐ হাসিটুকু অদৃশ্য হয় না তার। তাই মুখ দেখে তার মনের ভাব বুঝতে পারা সত্যিই কষ্টকর।

সেকালের গ্রাজুয়েট ভবদেব ব্যানার্জী। অতি বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার। লিখতে-পড়তে বলতে-কইতে অতিশয় পটু। সারা জেলায় নাম আছে। তদন্তের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। ভবদেব ব্যানার্জী যে মামলার তদন্তভার নিজের হাতে নেয় সেই মামলার আসামী কচিৎ অব্যাহতি পায় আদলত থেকে। এমনিই তার সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে ডাইরী লেখার পদ্ধতি। দায়রা আদালতে মোকর্দমা পরিচালনা করার সময় ভবদেব ব্যানার্জীর লেখা ডাইরী পড়ে খোদ পাবলিক প্রসিকিউটাররা পর্যন্ত তার উচ্চ প্রশংসা করে। তারা জানে এ ডাইরীর মধ্যে কোন ফাঁক নেই, ভুলচুক নেই এতটুকু যে পথে আসামী নিষ্কৃতি পেতে পারে।

ব্যবহারেও অতি অমায়িক ভবদেব ব্যানার্জী। পুলিশের চোখ রাঙানি কিম্বা ধমকানি প্রভৃতি দোষ কিম্বা গুণগুলি তার অজ্ঞাত। যদিও কথা বলে আস্তে, কিন্তু প্রতিটি কথা এমন কি প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত যুক্তিপূর্ণ।

এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভবদেব ব্যানার্জীর পদোন্নতি হয়নি। সেই সেকালে দারোগাগিরিতে ঢুকেছিল, আজও সে দারোগা। উন্নতি নেই, আর সেজন্যে কোন আক্ষেপও নেই তার। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত কেউ কখনও তার মুখে তেমন কিছু শোনেনি।

তবে সত্যি কথা বলতে কি, একটা দোষ তার আছে। সুযোগমত উপরি দু'চার পয়সা পকেটে পুরতে মোটেই কার্পণ্য করে না ভবদেব ব্যানার্জী। মামলা নষ্ট করে পয়সা উপার্জন করাকে সে যেমন ঘৃণা করে, তেমনি অতিরিক্ত সততা তার অভিধানে মূর্খতার নামান্তর। এই একটি মাত্র দোষই তার পদোন্নতির পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা তা' কেবল বলতে পারে তার উর্ধ্বতন অফিসাররা।

"বিষকুম্ভ পয়ো মুখম্"-এর মত মনে-মুখে দুই নেই ভবদেব ব্যানার্জীর। মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধা নেই তার। এমনিতে অমায়িক, কিন্তু প্রয়োজনে অতি কঠিন কথাও হেসে অবলীলায় বলে ফেলতে সঙ্কোচ নেই এতটুকু।

থানায় নিজের ঘরে প্রবেশ করে ভবদেব ডেকে পাঠায় ডিউটি অফিসার ধুর্জটি গাঙ্গুলীকে।

ধুর্জটী এসে সামনে দাঁড়ায় ডাইরীটা হাতে নিয়ে। ভবদেব ডাইরীর পাতাগুলোর উপর একবার অতি দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অনেকটা নিজের মনেই বললে, যাক্, পিনাকীবাবু তাহলে ডাকাতি মামলার তদন্তে বেরিয়ে গেছে। আমি ভাবছিলুম অসুস্থতার অজুহাতে হয়ত যেতে চাইবেনা। তার তো আবার একটু বড় ধরনের মামলা দেখলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার অভ্যেস।

মুখে কিছু না বলে ধুর্জটি কেবল মুচকি হাসে।

ডাইরীর পাতায় নিজের থানায় আগমনের সংবাদটা নিয়মানুযায়ী লিখে ডাইরীটা ধুর্জটীকে ফিরিয়ে দিতে দিতে ভবদেব আবার বললে, আর কোন খবর-টবর নেই?

—না, বড়বাবু। তবে—

—তবে কি?

—একজন ভদ্রলোক থানায় এসে ভারি হুজ্জত-হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।

—সেকি! কি চায় ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোকের পিক্‌পকেট হয়েছে। শ'চারেক টাকা নাকি খোয়া গেছে বাসে আসতে আসতে।

—তা' এতে হুজ্জত-হাঙ্গামার কি আছে? একটা চুরির মামলা লিখে নিয়ে ভদ্রলোককে বিদায় দিচ্ছেন না কেন?

—আমি অনেক বলেছি, বড়বাবু। কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই আমার কথা শুনবে না। কেবল বলে, আমাদের দোষেই নাকি তার টাকা চুরি গেছে। আমরা নাকি ইচ্ছে করেই পকেটমারগুলোকে গ্রেপ্তার করি না। তাই তার এমন সর্বনাশ হল। এমনি সব যা-তা কথা।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে ভবদেব বললে, তা' ভদ্রলোক এখন কি চায়?

—সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার ধারণা আমরা তার মামলার কিছুই করতে পারব না।

—হ্যাঁ, আজকাল কিছু লোকের তেমন একটা ধারণা হয়েছে বটে। মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। থানায় যদি আসতেই হয় তো খোদ বড়বাবুর সঙ্গেই দেখা করা চাই। অন্য অফিসারদের কাছে গিয়ে কি লাভ? স্বয়ং পুলিশসাহেব থানায় হাজির থাকলে হয়ত তাঁকে দিয়েই মামলা রুজু করাতে চাইত। তখন হয়ত বড়বাবুও কোন কাজে আসত না। কথাটা বলেই একটু হাসে ভবদেব। তারপর আবার বললে, ভদ্রলোক যখন এতই নাছোড়বান্দা তখন একবার পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।

ধূর্জটী চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র পোশাকে ভদ্রলোকটি প্রবেশ করে বড়বাবুর কক্ষে।

প্যান্ট-সার্ট পরার মত মালকোঁচা মারা ধুতির ভেতরে গুঁজে দিয়েছে সার্টের নিম্নাংশ। তার উপরে চাপিয়েছে একটা সুতির কোট। মাথাব ঠিক মাঝ-বরাবর চুলগুলি দু'পাশে পাট করে আঁচড়ান। মোজাবিহীন পায়ে চকচকে কালো সু, মুখে পান। দেখেই কোন সওদাগরী অফিসের হেডক্লার্ক কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু বলে মনে হয়।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে বড়বাবুর কক্ষে প্রবেশ করে চেয়ারে বসতে বসতে ভদ্রলোক বলতে থাকে, একি ব্যাপার! দিনদুপুরে এমনি কাণ্ড! এটা কি মগের মুল্লুক নাকি?

শান্তকণ্ঠে ভবদেব বললে, এত অস্থির হচ্ছেন কেন আপনি? আগে সবকথা খুলে বলুন, তারপর—

ভবদেবের কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোক তেমনি ভঙ্গিতে বলে ওঠে, বলার আর কি আছে? এই—এই দেখুন ; বলেই ভদ্রলোক তার কোটের বাঁ পাশের পকেটটা দেখায়। পকেটের নীচের দিকটা ব্লেড বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে কাটা।

ভদ্রলোকের অনেক অবান্তর কথার মধ্য দিয়ে ভবদেব এইটুকু মাত্র বুঝতে পারে যে, ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি করে। থাকে এই শহরের পূর্বপ্রান্তে। প্রতিদিন শহরের পশ্চিমপ্রান্তে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে। সাধারণতঃ সে হেঁটেই যাতায়াত করে এই পথটুকু। কিন্তু সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল বলেই বাসে আসছিল স্টেশন পর্যন্ত। পকেটে ছিল একশ'' টাকার চারখানা নোট। স্টেশনে নেমে পকেটে হাত দিয়েই দেখে নোটগুলি উধাও।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ভবদেব বললে, দেখুন, মুশকিল হয়েছে কি জানেন, আপনারা যখন পথে-ঘাটে চলাফেরা করেন তখন এ দেশটাকে রামরাজ্য বলে মনে করেন।

—তার মানে? তেড়ে ওঠে ভদ্রলোক।

—মানে হচ্ছে এই যে অতগুলো টাকা কোটের ভেতরের পকেটে না রেখে বাইরের পকেটে রেখে নিশ্চিন্তে আপনি বাসে উঠলেন। একবার মনেও হল না যে, এদেশে পকেটমারের অভাব নেই।

—আপনি তো বেশ লোক! টাকা গেল আমার, আবার উল্টে আমাকেই দায়ী করছেন?

—না-না, দায়ী করছি না। বলছিলাম, একটু সাবধানে থাকলে হয়ত টাকাগুলো যেত না আপনার।

—বাঃ, বেশ মজার কথা বলছেন তো আপনি! আমার টাকা আমি যেখানে খুশি রাখবো, তাই বলে সেগুলো চুরি হয়ে যাবে? তা'হলে আপনারা আছেন কেন?

হেসে ভবদেব বললে, তাহলে তো পকেটমাররাও বলতে পারে, আমারও যার খুশি তার পকেট মারবো। অবশ্য আমরা আছি ওদের ধরবার জন্যেই। কিন্তু আপনার নোটের নম্বর তো আপনার কাছে লেখা নেই। তাই পকেটমার ধরা পড়লেও ঐ টাকা আপনার বলে প্রমাণ করা শক্ত। তাই সাবধানে চলা-ফেরার কথা বলছিলাম।

ভদ্রলোক এবার কোন জবাব না দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলো। ভবদেব ভদ্রলোকের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার প্রশ্ন করে, বাসে বোধহয় তেমন ভিড় ছিল না। তাই আপনি বসতে পেয়েছিলেন, তাই না?

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের। বললে, বাসে বসতে পেয়েছিলাম কি না সেকথা তো আপনাকে আমি বলিনি। আপনি জানলেন কি করে?

জবাবে ভবদেব বললে, শুধু কি তাই! আমি আরও বলতে পারি যে আপনি বাসের ডানদিকের একটা জানলার পাশে বসেছিলেন।

একটু চিন্তা করে ভদ্রলোক। এতক্ষণে মুখে হাসি ফোটে তার। বললে, ঠিক ধরেছেন, কিন্তু কি করে বললেন বলুন তো?

—আপনার গায়ের ঐ কোটটা দেখে।

—আমার গায়ের কোটে আবার কি আছে?

—দেখুন না, কোটের ডান কাঁধের দিকে কেমন ময়লা লেগেছে। আজই পাটভাঙা কোট পরে বেরিয়েছেন নিশ্চয়!

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে কোটের ডান কাঁধের দিকটা দেখতে থাকে। তারপর একসময় বলে, সাংঘাতিক চোখ তো আপনাদের! ঠেস দিয়ে বসেছিলাম বলেই ময়লা লেগে গেছে।

—হ্যাঁ, ঐ দেখেই তো বললাম।

—কিন্তু আমার এই বসার সঙ্গে টাকা চুরির সম্পর্ক কি? আবার একটু তেতে ওঠে ভদ্রলোক।

ভবদেব বললে, সম্পর্ক নিশ্চয়ই কিছু আছে। আপনি ডানদিকে ঠেস দিয়ে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। আর সেই সুযোগে আপনার বাঁ-পাশের লোকটি আপনার কোটের বাঁদিকের পকেট সাফ করে দিয়েছে।

বিরক্ত হয়ে ওঠে ভদ্রলোক। তীক্ষ্ণকণ্ঠে আপত্তি জানায় সে, আপনি কি সর্বজ্ঞ নাকি? কে বললে, আমি ঝিমুচ্ছিলাম? না, সারাক্ষণ জেগেই ছিলাম আমি।

শান্তকণ্ঠে ভবদেব বললে, আপনার ঐ গায়ের কোটটাই সেকথা বলছে।

ভদ্রলোক মুখে আর কোন প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে ভবদেবের মুখের দিকে।

বলতে থাকে ভবদেব, দেখুন, আপনি পান খেয়েছেন। আপনার ঠোঁটের বাঁদিকের কষ পরিষ্কার, কিন্তু ডানদিকের কষ বেয়ে যে পানের রস গড়িয়ে পড়েছে সে চিহ্ন এখনও স্পষ্ট। তাছাড়া আপনার কোটের ডানদিকের বুকের কাছেও পানের ছোপ। তার মানে, ডানদিকে কাত হয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে আপনি যখন আসছিলেন তখন ঐ ডানদিকের কষ বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়েছিল আপনার কোটের ওপর।

এতক্ষণে যেন ভবদেবের উপর একটু শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে ভদ্রলোকের। তবুও সে মৃদু প্রতিবাদ করে, কিন্তু কই, আমি তো কিছু টের পাইনি—

এবার সশব্দে হেসে ওঠে ভবদেব। বললে, নিজের নাক ডাকার মত বাসে উঠে ঝিমুনির ব্যাপারটাও অনেকে টের পায় না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে ভদ্রলোক। উত্তেজনার পবিবর্তে একটা আক্ষেপের ভাব ছড়িয়ে পড়ে তার সারা মুখে। বললে, ইস্, ঝিমুনিটা না এলে হয়ত টাকাটা এমনিভাবে যেত না!

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

—তা'হলে এখন কি হবে?

—কিছুই হবে না। আপনি ও-ঘরে গিয়ে একটা চুরিব মামলা লিখিয়ে বাড়ি ফিরে যান। আমরা তদন্ত করে দেখি, অবশ্য তদন্তে তেমন কিছু ফল হবে বলে মনে হয় না। পকেটমারদের হাতেনাতে ধরতে না পারলে পরে কিছু করে ওঠা সত্যিই মুশকিল। তবুও আমরা চেষ্টা করে দেখি কতদূর কি করতে পারি।

—হ্যাঁ স্যার, দয়া করে তাই করুন। এতক্ষণে মিনতির সুর ফুটে ওঠে ভদ্রলোকের কণ্ঠে।

ভদ্রলোক উঠে যায় পাশের ঘরে। টেবিলের ওপর স্তূপাকার কাগজপত্রে মন দেয় বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জী।

আধঘণ্টাখানেক পর ধূর্জটী এসে আবার তার কক্ষে প্রবেশ করে হেসে বললে, ভদ্রলোক এতক্ষণে বিদায় নিয়েছে বড়বাবু। তা অমন ছিটগ্রস্ত লোককে আপনি ঠাণ্ডা করলেন কি করে? যাবার সময় খুব সুখ্যাতি করে গেল আপনার।

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসে ভবদেব।

সত্যিই এটা একটা বিশেষ গুণ তার। মনুষ্য-চরিত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকায় মানুষের মনের অবস্থা বুঝে কথা বলে তাকে স্ব-মতে আনতে তার জুড়ি নেই। কিছুক্ষণ আগেই যে ভদ্রলোক পুলিশের অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হয়ে থানায় প্রবেশ করেছিল সে-ই ভবদেবের সঙ্গে কথা বলে নিজের ধারণা খানিকটা পাল্টে নিয়ে শান্ত মেজাজে বাড়ি ফিরে গেল।

বেলা প্রায় দশটা নাগাদ ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে জানকীপুর গ্রামে আসগর শেখের বাড়ির সামনে এসে সাইকেল থেকে নামে দারোগা পিনাকী সরকার। পথশ্রমে ক্লান্ত পিনাকী, সারা মুখে বিরক্তির ছাপ।

পুলিশ দেখে এগিয়ে আসে গ্রামের কিছু লোক। প্রশ্ন করে পিনাকী, আসগর শেখের বাড়ি কোন্‌টা?

—আজ্ঞে ঐটা। আঙুল দিয়ে দেখায় একজন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পিনাকী। লোকটি নিজেই এবার জিজ্ঞেস করে, যাবেন নাকি বাবু ঐ বাড়িতে?

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে পিনাকীর। লোকগুলো কি আহাম্মক! এতদূর সাইকেল চালিয়ে এলাম, এক মুহূর্ত বিশ্রাম পর্যন্ত করতে দেবে না?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে পিনাকী, যাবো না তো কি রথ দেখতে এসেছি তোমাদের গাঁয়ে? তেতে পুড়ে এতদূর এলাম, কোথায় একটা পাখা নিয়ে এসে একটু হাওয়া করবে—তা' নয়, এসেই লেগে যাও কাজে। যত্তসব উজবুক কোথাকার!

যে লোকটি তার যাওয়ার কথা বলেছিল, দারোগাবাবুর মেজাজ দেখে গুটি গুটি সরে পড়ে সে। একটি বৃদ্ধ গোছের লোক এবার বলে ওঠে, সত্যিই তো, দারোগাবাবু এতদূর এলেন, আগে একটু বিশ্রাম তো করবেন। তারপর বৃদ্ধ হাঁক দেয়, ও—সোনামদ্দি, যা—শিগগীর যা, একটা পাখা নিয়ে আয়।

একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পিনাকী সরকার। কথায় কথায় জানতে পারে পাশের গাঁয়ের হেল্‌থ সেণ্টারে বৃদ্ধ আসগর শেখ এখনও বেঁচে আছে। ডাক্তার নাকি বলেছে ভয়ের তেমন কারণ নেই। মনে মনে আশ্বস্ত হয় পিনাকী। যাক্‌, বাঁচা গেল! ডাকাতি মামলার সঙ্গে খুনের ঘটনা জড়িত থাকলে কষ্টের একশেষ হত তার।

আসগর শেখের বাড়ি প্রবেশ করে তদন্ত শুরু করে পিনাকী।

কঞ্চির বেড়ার ওপর মাটির প্রলেপ লাগানো কাঁচা বাড়ি আসগর শেখের। মাথার ওপর খড়ের ছাউনি। সামনে গোবর নিকানো চওড়া বারান্দা। আলকাতরা লাগানো পাকা বাঁশের খুঁটি।

বারান্দায় তখনও শুকিয়ে ওঠা চাপ চাপ রক্ত। একপাশে একখানা রক্তমাখা বাঁশ। ঐ বাঁশের আঘাতেই ফেটেছিল আসগরের মাথা। একধারে পড়ে ছিল একটা সড়কিজাতীয় অস্ত্র—আসগরের নিজের অস্ত্র ওটা। ওটার সাহায্যেই নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল আসগর। কিন্তু পারেনি। তার আগেই ওই বাঁশের আঘাতে ধরাশায়ী হতে হয়েছিল তাকে।

ঘরের মধ্যে ভাঙা তোরঙ্গ। জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছড়ানো। আসগরের স্ত্রী ফুলবিবির দু'চারখানা ভাল শাড়িও পড়ে রয়েছে একপাশে। ডাকাতরা ফেলে রেখে গেছে। ঘরের বাক্স-প্যাঁটরা দেখে মনে হয় ডাকাতগুলো যেন কোন বস্তুর সন্ধানে এসেছিল। কেবলমাত্র তাই নিয়ে পালিয়েছে। অন্য কিছু ছোঁয়নি।

ঘুরে ঘুরে প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করতে থাকে পিনাকী সরকার। ডাকাতের আগমন-নির্গমনের পথও ভালমত পরীক্ষা করে। প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি নেয় নিজের হেপাজতে। তারপর এসে দাঁড়ায় ঘরের পেছনের দিকে যেখানে গাঁয়ের দু'তিনজন স্ত্রীলোকের মধ্যে বসে তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আসগরের স্ত্রী ফুলবিবি।

গাঁয়ের দু'চারজন পুরুষের সঙ্গে পিনাকী দারোগাকে দেখে স্ত্রীলোকেরা মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে দেয়। কান্নার বেগ বেড়ে ওঠে ফুলবিবির। ঘোমটার আড়ালে তার মুখ নজরে পড়ছিল না পিনাকীর। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে গাঁয়ের লোকদের দিকে তাকাতেই একজন একটু হেসে বললে, হ্যাঁ বাবু, ও-ই আসগর শেখর স্ত্রী। দ্বিতীয় পক্ষ।

—কিন্তু আসগরের বয়সে কত? প্রশ্ন করে পিনাকী।

—তা প্রায় ষাটের কাছাকাছি হবে।

একটু আশ্চর্য হয় পিনাকী। দ্বিতীয় পক্ষ হলেও ষাট বছরের বুড়োর আঠারো-উনিশ বছরের স্ত্রী! এ যে তার নাতনীর বয়সী!

পিনাকীর প্রশ্নে প্রথমটায় জবাব দেয় না ফুলবিবি। কেবল কাঁদতেই থাকে।

বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে পিনাকী; বেশ তো, কথার জবাব দিতে না চাও তো দিও না। আমার তাতে কি? না দেবে তো তোমার নিজেরই ক্ষতি।

এবার কান্না থামায় ফুলবিবি।

প্রশ্ন করে পিনাকী, কত রাতে ডাকাত পড়েছিল?

ঘোমটার আড়াল থেকে ধরা গলায় জবাব দেয় ফুলবিবি, প্রায় দু'প্রহর রাত তখন।

—ওরা কি মশাল নিয়ে এসেছিল?

—না, বিজলী বাতি নিয়ে।

পিনাকী বুঝতে পারে ফুলবিবি বিজলী বাতি বলতে টর্চের কথা বলছে।

—কি দিয়ে দরজা ভেঙেছিল বলে মনে হয় তোমার?

—লাথি মেরে।

—তোমরা চেঁচাও নি?

—চেঁচিয়েছিলাম। গাঁয়ের দু'চারজন বোধহয় এসেওছিল। কিন্তু ওরা পটকা ছুঁড়তেই সব পালিয়ে গেল।

—ওরা ক'জন ছিল?

—ঘরে ঢুকেছিল পাঁচজন। তা'ছাড়া বাইরেও অনেকের গলা শুনেছিলাম।

—তারপর?

একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বলতে থাকে ফুলবিবি, ডাকাতগুলো দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেই বড়মিঞাকে জাপটে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে। তারপর ওই বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখলে তাকে। আর দুটো মরদ এসে জোর করে আমার গা থেকে গয়না খুলে নিতে লাগল।

—বাধা দাও নি তুমি?

—ভয়ে কাঁপছিলাম আমি। চেঁচাতেও পারি নি তখন।

—ওরা কি কি নিয়ে গেছে?

—আমার গায়ের গয়না ছাড়া তোরঙ্গের মধ্যে আরও কিছু সোনা-রূপোর গয়না ছিল, সে সব নিয়েছে। গোটাদশেক টাকা ছিল, তাও নিয়েছে।

—তোমার কাপড়-চোপড় কিম্বা থালা বাসন কিছু নেয়নি?

মাথা নাড়ে ফুলবিবি।

পিনাকী বুঝতে পারে ডাকাতগুলোর নজর ছিল কেবল সোনা রূপোর দিকে। অন্য কিছু ছোঁয়নি তারা। কিন্তু একটা ব্যাপারে কেমন যেন একটু আশ্চর্য লাগে তার। আসগরের বাড়ি-ঘরের চেহারা দেখে তাকে গরীব বলেই মনে হয়। বাক্সে দশটি মাত্র টাকা ছিল। সেই আসগরের স্ত্রীর এত সোনা-রূপোর গয়না এলো কি করে?

—ডাকাতগুলো তোমার আর কোন অসম্মান করেনি?

—না। মাথা নাড়ে ফুলবিবি।

—ওদের মধ্যে কাউকে চিনতে পেরেছিলে তুমি?

—না, তবে—কথাটা অসমাপ্ত রেখে থেমে যায় সে।

—তবে কি? আগ্রহ ফুটে ওঠে পিনাকীর কণ্ঠে।

—তবে, বড়মিঞা বোধহয় বাইরে কাউকে চিনতে পেরেছিল।

—ঘরের মধ্যে থেকে কি করে তুমি তা' টের পেলে?

—বাইরে তার গলার স্বর শুনতে পেয়েছিলাম।

—কি বলেছিস সে? আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে পিনাকীর।

—বলেছিল, ইয়া আল্লা, তুই! তারপরেই কে যেন তার মাথায় বাড়ি মারলে। চেঁচিয়ে উঠেছিল বড়মিএগ।

পিনাকীর ধারণা হয় ফুলবিবি যদি সত্যি কথা বলে থাকে তো আসগর নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল কাউকে।

গ্রামের আরও দু'চারজনকে প্রশ্ন করেছিল পিনাকী। তাদের কাছ থেকে ঘটনার বিষয়ে তেমন কিছু জানতে না পারলেও আসগর শেখের পারিবারিক বিষয়ে কিছু দরকারী খবর জোগাড় করেছিল।

আসগরের প্রথম পক্ষের একটি ছেলে আছে। নাম তার সোলেমান। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বছর দু'য়েক আগে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে পাশের সোনাইদহ্ গ্রামে গিয়ে বাস করছে।

—বাপের সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল সোলেমানের? প্রশ্ন করে পিনাকী।

—আজ্ঞে, এই গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঝগড়া আর কি! জবাবে বলেছিল সেই প্রতিবেশী লোকটি।

—তা' গেরস্ত ঘরের ঝগড়াই বটে! মাথা নেড়ে বলেছিল পিনাকী, ষাট বছরের বুড়ো বাপ যদি নাতনীর বয়সী একটা মেয়েকে বিয়ে করে তবে কোন্ ছেলে তা সহ্য করতে পারে?

—না বাবু, না। আপনি যা' অনুমান করেছেন মোটেই তা' নয়। সোলেমান আলাদা হয়ে যাওয়ার পরই আসগর বাধ্য হয়েই বিয়ে করেছিল ফুলবিবিকে। নইলে বুড়ো বয়সে কে তাকে দেখাশোনা করতো?

—ও—তাই বুঝি! ঐ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ায় না পিনাকী।

জানকীপুর গ্রামের আসগর শেখর বাড়ি থেকে সোনাইদহ মাত্র দু'মাইল পথ। ঐ সোনাইদহ হেল্‌থ সেন্টারেই চিকিৎসা হচ্ছিল আসগরের।

চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে পিনাকী যখন যখন সেই হেল্‌থ সেণ্টারে এসে উপস্থিত হ'য় তখন বেলা প্রায় দু'টো।

মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ। সারাদিনে পেটেও তেমন কিছু পড়ে নি পিনাকীর। গ্রামের দু'একজন দারোগাবাবুর খাওয়া-দাওয়ার কথা বলতে এসে ধমক খেয়ে ফিরে গেছে। কড়া মেজাজে বলেছিল পিনাকী, হ্যাঁ, আজ তোমাদের বাড়ি খাই, আর কাল থেকেই চেষ্টা করবে কি করে পিনাকী দারোগার কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা যায়, তাই না?

মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে তারা কিছু বলতে সাহস করে নি পিনাকীকে। 'আতিথেয়তা' শব্দটি এখনও তারা একদম ভুলে যায় নি। একটি বাইরের লোক তাদের গ্রামে এসে সারাদিন উপোস করে থাকবে—এটাকে এখনও তারা অকল্যাণকর বলেই মনে করে। তাই উপযাচক হয়েই তারা পিনাকীর খাওয়ার কথা বলতে এসেছিল। কিন্তু পিনাকীর কথার সুরে তারা আর অনুরোধ করতে সাহস পায়নি।

সোনাইদহ আসার পথে রাস্তায় একটা দোকান থেকে চা মুড়ি কিনে খেয়ে নিয়েছিল পিনাকী। কিন্তু ঐ সামান্য আহারে কি ক্ষুধা মেটে? তাই, একরকম তিরিক্ষি মেজাজ নিয়েই হেল্‌থ সেণ্টারে এসে হাজির হয়েছিল সে।

ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে আসগর শেখের বিছানারর কাছে দাঁড়ায় পিনাকী। জেগেই ছিল আসগর। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। আঘাত তেমন গুরুতর নয়। জোয়ান বয়সে গাঁয়ের লোক এমন আঘাতকে তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ করে না। আসগরের বয়সটা একটু বেশি। তাই খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল।

পুলিশের পোশাক পরা পিনাকীকে দেখে একটা ঢোক গিলে তার মুখের পানে তাকায় আসগর।

প্রশ্ন করে পিনাকী, কেমন আছো?

একটু ম্লান হেসে মাথা কাত করে আসগর।

—কাউকে চিনতে পেরেছিলে?

—না, বাবু।

—কাউকে না?

—আজ্ঞে না।

—সেকি! বিস্মিত পিনাকী বললে, তবে কাকে দেখে তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে?

—কাউকে নয়, বাবু।

—কিন্তু ফুলবিবি যে বললে—

পিনাকীর কথা শেষ হবার আগেই আসগর আবার বললে, ফুলবিবি বোধহয় ভুল শুনেছিল বাবু। কাউকে দেখেই আমি চেঁচাইনি।

একটু সময় চিন্তা করে পিনাকী। ফুলবিবির কথা অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই। কিন্তু আসগর অস্বীকার করছে কেন?

পিনাকী আবার বললে, ওরা তোমাকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল?

—হ্যাঁ, বাবু।

—তারপর।

একটা ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বলতে থাকে আসগর, লোকগুলো যখন লুঠপাটে ব্যস্ত ছিল আমি তখন বাঁধন খুলে ফেলি। দাওয়ার চালের বাঁশের সঙ্গে একটা সড়কি বাঁধা থাকতো বরাবর। সড়কিটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ডাকাতকে মারতে যেতেই—

—কি হল তখন? থামলে কেন? আগ্রহের সুর পিনাকীর কণ্ঠে, বল, কাকে চিনতে পেরেছিলে?

—না-না, বাবু। অস্বাভাবিক জোরে বলে ওঠে আসগর, কাউকে আমি চিনতে পারিনি। ওদের কাউকে আমি চিনি না।

বিরক্ত হয়ে ওঠে পিনাকী। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, তবে তোমার মাথায় কে জখম করলে?

—সেই লোকটাই মারল আমাকে। আমি সড়কি চালাবার আগেই লোকটা আমাকে ঘায়েল করলো।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করে পিনাকী, আচ্ছা আসগর, তোমার ছেলে তো এই সোনাইদহ গ্রামেই থাকে, তাই না?

অকস্মাৎ দারুণ চমকে ওঠে আসগর। প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা করে। তারপরই হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে থাকে, আজ্ঞে না

বাবু—না না। সোলেমান সেখানে ছিল না। সোলেমানকে চিনতে পারিনি আমি। সে আমার ছেলে। ছেলে কি বাপের বাড়িতে কখনও ডাকাতি করতে আসে? আপনি ভুল শুনেছেন বাবু। গাঁয়ের লোকেরা ভুল খবর দিয়েছে আপনাকে।

হতভাগ্য বৃদ্ধ আসগর শেখ। নিজের অজান্তেই সে বলে ফেলল সত্যি কথাটা। সোলেমানকে সেই মুহূর্তে চিনতে না পারলে ঐ সড়কিতেই তাকে বিঁধে ফেলতো সে অনায়াসে। কিন্তু সোলেমানের মুখের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার শক্ত মুঠো আলগা হয়ে গিয়েছিল। লম্বা সড়কিটা খসে পড়েছিল মাটিতে। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিল—ইয়া আল্লা, তুই! কিন্তু সেই মুহূর্তেই সোলেমানের হাতের লাঠি পড়েছিল তার মাথায়। বৃদ্ধ বাপকে রেহাই দেয় নি সে।

আসগর শেখের জবানবন্দি গ্রহণ শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়ায় পিনাকী। তাকে অনুসরণ করে চৌকিদার।

পিনাকী চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে, এখানে সোলেমানের বাড়ি চিনিস তুই?

—হ্যাঁ বাবু, চিনি। যাবেন নাকি?

সহসা জবাব দিতে পারে না পিনাকী। যাবে কি যাবে না, তা' স্থির করতেই কয়েক মিনিট কেটে যায়। নিজের বিবেক বলে, যাওয়াই উচিত। এমন একটা ডাকাতি মামলার যখন একজন আসামীর খোঁজও পাওয়া গেছে তখন তাকে এখনই এ্যারেস্ট করা উচিত। নিয়মও তাই। ওর কাছ থেকেই হয়ত ভবিষ্যতে ওর সাঙ্গপাঙ্গদের খোঁজ মিলবে। বিবেক বললেও কিন্তু তার মন সায় দেয় না। সারাদিন রোদে তেতে-পুড়ে সে পরিশ্রান্ত। ডাকাত ধরার উৎসাহ তার মোটেই নেই। এমন একটা মামলার ফয়সলার ব্যাপারে আর পাঁচজন অফিসার যেখানে উৎসাহিত হয়ে ছুটতো, পিনাকী সেখানে কেমন যেন উদাসীন। কী হবে এত পরিশ্রম করে? গাধার মত এত খেটে লাভ কি? সবাই বাহবা দেব? চাকরিতে উন্নতি হবে? যা হবার তা' হবেই। শুধু শুধু তবে খেটে মরতে যাই কেন?

অবশেষে কিন্তু বিবেকেরই জয় হয়। পিনাকী রওনা হয় সোলেমানের বাড়ি। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে চৌকিদার।

যেতে যেতে ভাবতে থাকে পিনাকী, আশ্চর্য ব্যাপার! ছেলে ডাকাতি করছে বাপের ঘরে। কিন্তু, কারণ কি? রেষারেষি-মনোমালিন্য? শুধুই কি তাই? গাঁয়ের লোকেরা বলেছিল বটে, বাপ ছেলেতে ঝগড়া। অবশ্য সেই ঝগড়ার কারণ তারা খুলে বলেনি। আর নিজেও তখন তা' জানবার জন্যে তেমন একটা উৎসাহ দেখায়নি। পিতা-পুত্রের ঝগড়া এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয় বলেই সে তখন ততটা গুরুত্ব দেয়নি।

পিনাকী এবার জিজ্ঞেস করে চৌকিদারকে, আচ্ছা, তুই বলতে পারিস কি নিয়ে আসগরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল সোলেমানের? তুই তো গাঁয়ের লোক। জানলেও জানতে পারিস।

জবাব দেয় চৌকিদার, হ্যাঁ বাবু, জানি। একটু থেমে ভেবে নিয়ে আবার সে শুরু করে, ঐ আসগর শেখের স্ত্রী, অর্থাৎ সোলেমানের মা মরার সময় কিছু গয়না-গাঁটি রেখে যায়। মরার সময় নাকি বলে গিয়েছিল, সোলেমান বড় হয়ে যখন বিয়ে করবে তখন যেন ওগুলো তার বৌকে দেওয়া হয়। বুড়ো আসগর সযত্নে সেগুলো রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে। সোলেমান একটু ঝগড়াটে প্রকৃতির। তবুও বাপ আসগর ভেবেছিল বিয়ের পর হয়ত ছেলেটা অনেকটা শোধরাবে। কিন্তু হল ঠিক উল্টো। সোলেমানের বৌ জামিলা সোলেমানের চাইতেও

এককষ্ঠি ওপরে। শ্বশুরের যত্ন-আত্তি তো করতই না, উল্টে তাকে দিনরাত গঞ্জনা দিত। বিরক্ত হয়ে আসগর সেই গয়নাগাটি জমিলাকে না দিয়ে রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে। তাই নিয়ে বাপ বেটায় ঝগড়া। অবশেষে একদিন সোলেমান জমিলাকে নিয়ে আলাদা হয়ে উঠে আসে এই গাঁয়ে। তখন বাধ্য গয়ে ফুলবিবিকে বিয়ে করল আসগর।

একটু থামে চৌকিদার। তারপর মুচকি হেসে আবার বললে, বুঝলেন তো বাবু, বুড়োমানুষের সোমত্ত বৌ। তাই আসগর শেখও সব গয়নাগাটি দিয়ে দিলে ফুলবিবিকে।

এতক্ষণে সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হয় পিনাকীর কাছে। এইজনাই ডাকাতেরা কাপড়-চোপড় কিম্বা বাসন-কোসন কিছু নিয়ে যায়নি। ফুলবিবির গায়ের আর তোরঙ্গ হাতড়ে সমস্ত গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়েছে।

বিরক্তিমিশ্রিত সুরে পিনাকী চৌকিদারকে বললে, তোরা সব উজবুক, বুঝলি? তোদের গাঁয়ের লোকগুলোও সব আস্ত উজবুক।

পথ চলতে চলতে চৌকিদার তাকায় পিনাকীর মুখের দিকে। দারোগাবাবুর বিরক্তির কারণ অনুসন্ধান করতে থাকে মনে মনে।

পিনাকী আবার বললে, তোদেব গাঁয়ের লোকদের মধ্যে কেউ ঘুণাক্ষরেও একবার বললে না যে, ঐ গয়নাগাটি নিয়েই বাপ ছেলের মধ্যে ঝগড়া ছিল। ওই বুড়োটা মুখ ফস্কে সোলেমানের কথাটা না বলে ফেললে আমি নিজেও ধারণা করতে পারতাম না যে, ওই লোকটাই তার দলবল নিয়ে গয়নাগাটির জন্যে বাপের ঘরে ডাকাতি করেছে। তাই বলছিলাম, তোরা এক একটি আস্ত উজবুক। বাঘে টেনে নিয়ে গেলেও তোদের সাহায্যে আমাদের আসা উচিত নয়, বুঝলি?

পিনাকীর মুখের দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চৌকিদার আস্তে আস্তে বললে, সোলেমান যে তার বাপের ঘরে ডাকাতি করতে পারে তা' কেউ ধারণাই করতে পারেনি বাবু। তাই তারা—

—চুপ কর! ধমকে ওঠে পিনাকী, সোলেমানের এই কাজে নিশ্চয়ই তোদের গাঁয়ের অনেকেরই সায় ছিল। হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওই দলেই ছিল।

চৌকিদার আর কিছু বলে না।

অনেকটা নিজের মনেই বলতে থাকে পিনাকী, দাঁড়াও, আগে ওই সোলেমান ব্যাটাকে এ্যারেস্ট করি। তারপর মারের চোটে ওর মুখ থেকে দলের প্রত্যেকটি লোকের নাম আদায় করবো।

মুখে কথাটা বললেও পিনাকী দারোগা কিন্তু কোনদিনই মারধোর পছন্দ করে না। তার মতে, আসামীকে মারধোর করার প্রয়োজন কি? এই নিয়ে মাঝে মাঝে থানায় ধুর্জটীর সঙ্গে তর্কও বেধে যেত তার। পিনাকী বলত, আইনে যখন মারধোর করাটা একেবারেই বারণ তখন ও সব ঝঞ্ঝাটে যাওয়া কেন বাপু?

জবাব দিত ধুর্জটী, আপনি নিজেও তো অনেকদিন দারোগাগিরি করলেন, দাদা। বলুন তো, কেবল মিষ্টি কথায় কি ক্রিমিন্যালের মুখ থেকে সবসময় কথা আদায় করা যায়? একটু আধটু না দিলে কি শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে?

উষ্মা প্রকাশ পেত পিনাকীর কথায়। বলত, চিঁড়ে না ভেজে তো না ভিজল তাতে তোমারই বা কি আমারই বা কি!

—সে কি কথা বলছেন দাদা? বিস্মিত কণ্ঠে বলত ধুর্জটি, আপনি কি জানেন না ক্ষেত্রবিশেষে ও জিনিস প্রয়োগ করতেই হয়? এ তো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়ান্স!

নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিত পিনাকী, মামলার কিনারা যদি না হয় তো না হবে। তাতে তোমার আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তারপর মৃদু হেসে বলত, মামলার কিনারা হল না বলে তো আমাদের চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। আর মাইনেও তাই বলে কম পাবো না।

এবার তর্কে পিছিয়ে যেত ধুর্জটী। বলত, তাঁ' যদি বলেন, তবে দাদা এর কোন জবাব নেই। মাইনে নেব, কিন্তু ডাকাতি, খুন, রাহাজানি মামলার কিনারা হবে না—এটা কেমন ধরনের কথা হল দাদা?

—কেমনধারা কথা আবার কি? কেন, তুমি কি জানো না থানায় মারধোর করেছে বলে আসামী আদালতে গিয়ে পুলিশের নামে অভিযোগ করেছে, আর সেই অভিযোগের বিচারও হয়েছে—এমন অনেক ঘটনা ঘটছে আজকাল?

—হ্যাঁ দাদা, তা জানি। কিন্তু ঐ রিস্কটুকু পুলিশকে নিতেই হয়। নইলে যে ক্রিমিন্যালে দেশ ছেয়ে যাবে!

—যাবে তো যাক্, তবুও মারধোর করা বে-আইনী। গোমড়া মুখে পিনাকী বলত।

এমন লোকের সঙ্গে তর্ক করা বাতুলতা মনে করে রণে ভঙ্গ দিত ধুর্জটী।

* * *

এমনিতেই গাঁয়ে পুলিশ আসে কম। তার ওপর খোদ দারোগা, সঙ্গে আবার চৌকিদার! পথচারী দু'একজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায় তাদের দিকে। সঙ্গে দারোগা না থাকলে চৌকিদারকে ডেকে মনের কৌতূহল হয়ত মিটিয়ে নিত তারা।

সোলেমানেরর বাড়ির সামনে এসে তারা দাঁড়ায়। চৌকিদার আঙুল তুলে বাড়িটা দেখিয়ে বললে, এই বাড়ি বাবু।

মাটির দেয়াল। ওপরে টালির ছাউনি। একপাশে ভাঙা গোয়াল-ঘর, বাড়ির সদর ও অন্দরের মধ্যে আড়াআড়ি বাঁশের ওপর সুপারী গাছের শুকনো ডাল ঝুলিয়ে অন্দরের আব্রু রক্ষা করবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। গোটাকয়েক মুরগী ছুটোছুটি করছে উঠোনে। বাড়ির সদরের এক কোণে একটা ছাগল নিজের দড়ির ফাঁদে নিজেই আটকে পড়ে থেকে থেকে চিৎকার করছে। পিনাকী বললে চৌকিদারকে, সোলেমান বাড়ি আছে কিনা খোঁজ নে।

চৌকিদার চলে গেল অন্দরের দিকে।

মিনিট কয়েক পরে সে ঘুরে এসে বললে, না বাবু, সোলেমান বাড়ি নেই। কোথায় যেন গেছে।

—কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করেছিলি?

—হ্যাঁ। ওব স্ত্রী জামিলা বললে সে নাকি জানে না।

দু'চারজন প্রতিবেশী ততক্ষণে এসে জমা হয়েছে সেখানে। কৌতূহল কম নয় তাদের। একজন সাহস করে জিজ্ঞেস করে পিনাকীকে, কী হয়েছে বাবু?

—না না, তেমন কিছু নয়। ব্যাপারটাকে হাল্কা করতে চেষ্টা করে পিনাকী জবাব দেয়, কাল রাতে জানকীপুরে সোলেমানের বাপের বাড়ি ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা ওর বাপকে সাংঘাতিক জখম করেছে। সে এখন তোমাদের হেল্‌থ সেণ্টারে। বুড়ো মানুষ—কখন কি হয় বলা যায় না। তাই খবরটা দিতে এসেছিলাম সোলেমানকে। সেই সঙ্গে দু'চার কথা জিজ্ঞেস করারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সোলেমান নাকি বাড়ি নেই।

—তাই নাকি? প্রতিবেশীটি বললে, কই, আমরা তো কিছুই শুনিনি! আজ দুপুরেও তো দেখা হয়েছিল সোলেমানের সঙ্গে। তখন তো সে কিছু বললে না! বোধ হয় সে নিজেই এখনও জানে না।

—তাই হবে হয়ত। বললে পিনাকী, সোলেমান এখন কোথায় বলতে পার তোমরা কেউ?

কিন্তু কেউ তার খবর বলতে পারলে না।

একটু সময় চিন্তা করে পিনাকী চৌকিদারকে বললে, চল, এবার ফিরি তোদের গাঁয়ে। আমার সাইকেলটা তো আবার সেখানেই রয়েছে।

পিনাকীরর সঙ্গে পা বাড়ায় চৌকিদার। যাবার আগে উপস্থিত প্রতিবেশীদের উদ্দেশ করে পিনাকী বললে, সোলেমানের সাথে দেখা হলে ওর বাপের খবরটা ওকে দিও হে। আর, একবার আমার সঙ্গে থানায় দেখা করতে বলো, বুঝলে?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সকলে।

যেতে যেতে পিনাকী জিজ্ঞেস করে চৌকিদারকে, আমার আসার খবর পেয়ে ব্যাটা পালায় নি তো?

—কি জানি, বাবু! তবে, আপনার চোখে ধূলো দিয়ে কতদিন পালিয়ে থাকবে? খোসামোদের সুরে জবাব দেয় চৌকিদার।

মনে মনে একটু তৃপ্তি বোধ কবে পিনাকী বললে, যা বলেছিস্! ভালয় ভালয় যদি ব্যাটা ধরা না দেয় তো ওর জরু-গরুসুদ্ধ থানায় ধরে নিয়ে যাবো। তখন সুড়সুড় করে নিজেই গিয়ে হাজির হবে থানায়।

—কিন্তু ঐ জরুর কথা বললেন না, বাবু? সোলেমানের ঐ জরুটি নাকি ভারী সাংঘাতিক স্ত্রীলোক। সেবার সেই—

—তুই থাম্! ধমকে ওঠে পিনাকী, সে যা হয় পরে দেখা যাবে। আমি সোজা চলে যাচ্ছি জানকীপুর। তুই এ গাঁয়ের চৌকিদারের বাড়ি গিয়ে তাকে নিয়ে চলে আয় আমার কাছে। গোটাকয়েক কথা বলার আছে তাকে, বুঝলি?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অন্য পথ ধরে চৌকিদার। আর ক্লান্ত পায়ে জানকীপুরের দিকে এগিয়ে চলে পিনাকী দারোগা।

॥ তিন ॥

আমি নিজে পুলিশ নই, যদিও জেলাসদরের এই কোতোয়ালী থানার অফিসারদের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম একটু বেশিই বলতে হবে।

অবশ্য তার কারণও আছে। পেশায় আমি শিক্ষক, এই মফঃস্বলে শহরে, বেসরকারি কলেজে মাস্টারি করি। কিন্তু নেশায় আমি সাংবাদিক। শুধুই নেশা বললে মিথ্যা বলা হবে। আসলে নেশার সাথে সাথে কিছু অর্থাগমও হয় এই বাবদে। হয়ত সেই লোভেই নেশাটা আমার বজায় আছে এখনও। আমার বাবাও এককালে সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার সেই বিশিষ্ট সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান আমাকেই নিয়োগ করেছে তাঁর শূন্য পদে।

সংবাদ সংগ্রহের একটি উত্তম স্থান হচ্ছে থানা। তাই সাংবাদিক হিসেবে সেখানে আমার অবাধ যাতায়াত। দিনের বেলা কলেজে মাস্টারি করি আর সন্ধ্যায় খবরের আশায় ধর্ণা দিই থানায়। সেখানে প্রচুর খাতির পাই। কনস্টেবল্ থেকে শুরু করে স্বয়ং অফিসার-ইন-চার্জ অর্থাৎ বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জী পর্যন্ত আমাকে পছন্দ করে—অন্ততঃ আমার নিজের ধারণা তাই।

ভবদেববাবুর সাথে প্রথম পরিচয়ের দিন সে একটু বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠেছিল, সেকি মশাই, এত অল্প বয়সে আপনি রিপোর্টার হলেন কি করে?

একটু লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলাম, আপনাদের সরকারি চাকরির মত এ লাইনে বয়সের তেমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই, স্যার।

—তাই নাকি? ভাল, ভাল, তা আপনার হোল-টাইমের চাকরি, না পার্টটাইমের?

—পার্ট টাইমের।

—বাকি সময়টা?

—কলেজে মাস্টারি করি।

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠেছিল ভবদেববাবু, আপনি তা'হলে এখানকার কলেজের লেকচারার?

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলাম আমি।

—কি সাবজেক্ট আপনার?

—সাইকোলজি।

—তা' আমরা তো এখানে ক্রিমিন্যাল সাইকোলজি নিয়ে মাথা ঘামাই। ওটাও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে?

—ক্রিমিন্যালকে যদি হিউম্যান বলেন তবে তাও কিছু কিছু জানি বৈকি!

সশব্দে সেদিন হেসে উঠেছিল ভবদেববাবু। আমিও হেসেছিলাম। হাসতে হাসতে সে বলেছিল, ঠিক বলেছেন, হিউম্যান সাইকোলজির মধ্যে ক্রিমিন্যাল সাইকোলজিও পড়ে। যদি অবশ্য, ক্রিমিন্যালকে হিউম্যান বলে গণ্য করা হয়। ঠিক বলেছেন—ভারি চমৎকার কথা বলেছেন আপনি।

সেই থেকে ভবদেববাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। যদিও আমার চাইতে তার বয়স প্রায় দ্বিগুণ, কিন্তু মানুষের পরস্পরের হৃদ্যতা সবসময় বয়সের গণ্ডি মেনে চলে না।

সেক্সপীয়রের মতে নামের নাকি তেমন কোন মূল্য নেই। গোলাপ ফুলকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, গোলাপ গোলাপই থাকবে। কিন্তু এই একটি বিষয়ে আমি কোনদিনই সেই মহান কবির সঙ্গে একমত হতে পারিনি। আমার নামটিকে আমি ভালবাসি। কিন্তু আমার 'তরুণ ঘোষ' নামটি যেদিন থেকে বেমালুম চেপে দিয়ে ভবদেব আমাকে 'সংবাদ প্রভাকর' বলে ডাকতে আরম্ভ করলে, সেদিন মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলেও মুখে প্রতিবাদ করতে পারিনি। কালক্রমে কিন্তু ঐ নামটিই আমার গা-সহা হয়ে গেছে। আমার বয়সের কথা বিবেচনা করে 'আপনি' থেকে তুমি'তে নামতেও বেশিদিন সময় লাগেনি তার।

থানার সেকেণ্ড অফিসার, অর্থাৎ মেজবাবু অমিত রায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা একটু অন্যরকম। যদিও মাত্র অল্প কিছুদিন আগে সে এই থানায় এসেছে, কিন্তু বয়সের ব্যবধানের মত সময়ের ব্যবধানও সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে সবসময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

অমিত আমারই সমবয়সী। ওকে আমার ভারী ভাল লাগে। সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে গল্প করি, আলোচনা করি, তর্কও করি। ভবদেব আমাদের নাম রেখেছে 'কর্সিকান ব্রাদার্স'।

আমাকে থানায় প্রবেশ করতে দেখে হয়ত সে বলে ওঠে, এই যে সংবাদ প্রভাকর এসেছো। কিন্তু তোমার কর্সিকান ব্রাদারটির সঙ্গে তো এখন দেখা হবে না। সে যে তদন্তে বেরিয়েছে।

সেদিন রাত আটটা নাগাদ থানায় ভবদেবের কক্ষে প্রবেশ করতেই সে বললে, সংবাদ প্রভাকর যে! এসো—এসো। তারপর, কি খবর বল?

—খবর তো আপনাদের এখানে, বড়বাবু। জবাব দিই আমি।

—ঠিক বলেছ হে। তুমি যে সাংবাদিক সেটা প্রায়ই ভুলে যাই আমি। তারপর একটু থেমে ভবদেব আবার বললে, কিন্তু ব্রাদার, দেবার মত কোন খবর তো আজ নেই।

—সেকি বড়বাবু, এত বড় বিবাট এলাকার থানা, আর দেবার মত কোন খবর নেই?

—সত্যি ভাই। বিশ্বাস কর, তেমন কোন—

কথা বলতে বলতে মাঝপথে থেমে গিয়ে অকস্মাৎ সে বলে ওঠে আবার, এই দেখ, একেবারেই খেয়াল ছিল না। একটা ডাকাতির খবর আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকসুলভ ক্ষিপ্রতায় প্রশ্ন করি আমি, ডাকাতি? কোথায়, কোন্ গ্রামে? কত টাকা নিয়েছে? কেউ খুন-টুন হয়নি তো? ধরা পড়েছে কেউ?

—আরে বাবা থামো, থামো। একটু দম নিয়ে তারপর আবার প্রশ্নের ঝড় চালাও, নইলে যে দম বন্ধ হয়ে এখনই মারা পড়বে! কথাটা বলেই হেসে ওঠে ভবদেব।

তারপর হাসি থামিয়ে কৃত্রিম গম্ভীরকণ্ঠে আবার বলতে থাকে, তোমরা বাপু এক একটি সাংঘাতিক চীজ। তোমাদের সামনে কি সহসা মুখ খুলতে আছে? যেই না বললাম একটা ডাকাতি হয়েছে, অমনি একেবারে ডাকাতির চৌদ্দ পুরুষের খবর নিতে ঝড়ের বেগে প্রশ্ন শুরু করলে। আরে ভাই ঠিক ঠিক জবাব পেতে হলে ধীরে ধীরে একটি একটি করে প্রশ্ন কর। ভেবে-চিন্তে জবাব দেব।

—সেকি, বড়বাবু? বানিয়ে বানিয়ে আমার প্রশ্নেব জবাব দিতে চান নাকি?

—তা'ছাড়া আর উপায় কি বল? সকালে স্রেফ একটা সাদামাটা ডাকাতির খবর পেয়েছি। বৈচিত্র্যহীন অতি নিরীহ ধরনের ডাকাতি একটা। পিনাকীবাবু সেই সকালে তদন্তে গেছেন, এখনও ফেরেননি। কাজেই ঐ ডাকাতির ডিটেল খবর এখনও জানতে পারিনি। এই অবস্থায় তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হলে বানিয়ে বলা ছাড়া আর কি উপায় আছে আমার?

—কি মুশকিল, আপনাকে বানিয়ে বলতে অনুরোধ করেছি নাকি? আমি জবাব দিই।

—দিলামই বা, ক্ষতি কি? আসল ঘটনাটা যখন সত্যি, তখন না হয় একটু রঙ-চঙ চড়িয়েই খবরটা পরিবেশন করবে, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

—কি যে বলেন, বড়বাবু! আমাদের সাংবাদিকতার শাস্ত্রে ঐ রঙ-চঙ চড়ানোর ব্যাপারটা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আসল খবরের ওপর যে মুহূর্তে রঙ চড়ালাম, অমনি গল্প হয়ে গেল। খবর আর রইল না।

একটু চিন্তার ভান করে ভবদবে বললে, বেশ, তবে তাই হোক। কি জানতে চাও বল।

আমি আবার প্রশ্ন করতে যেতেই ভবদেব আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, একটু দাঁড়াও ভাই, চায়ের কথা বলে নিই আগে।

একজন কনস্টেবলকে চা আনার হুকুম দেয় ভবদেব। থানায় এলে এক কাপ চা আমার নিত্যদিনের পাওনা। ভবদেবের এ ব্যাপারে আরও একটা অভ্যেস—একা একা চা খেতে নাকি ভাল লাগে না তার। তাই থানায় বসে যতবার সে চা খাবে, ততবারই থানার প্রত্যেককে

চা খাওয়াবে। মাঝে মাঝে এমনও হয়, সবাইকে দিয়ে-থুয়েও কেটলীতে চা উদ্বৃত্ত থাকে। চা-দোকানের ছোকরা হয়ত ভবদেবের কাছে এসে বলে, বাকি চা'টা কি ফিরিয়ে নিয়ে যাব, স্যার?

জবাব দেয় ভবদেব, সেকি রে? ফিরিয়ে নিয়ে যাবি কেন? তুই নিজে খেয়ে নে।

—কিন্তু স্যার, তবুও যে আরও দু'কাপের মত বেশি থাকবে!

—ও, তাই নাকি? তা'হলে ডিউটিবাবুর সামনে বাইরের যারা বসে রয়েছে তাদের দিয়ে দে।

ডিউটিবাবু মানে ডিউটি অফিসার।

হয়ত তখন তার সামনে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে একটি লোক তার গরু চুরির এজাহার দিচ্ছে।

চা দোকানের ছোকরা ঢক-ঢক শব্দে কেটলী থেকে মাটির ভাঁড়ে চা ঢেলে তার সামনে এগিয়ে ধরতেই লোকটি প্রথমটায় হয়ত একটু চমকে ওঠে—থানায় এজাহার দিতে এসে আবার চা খাওয়াচ্ছে, ব্যাপার কি?

পরক্ষণেই হয়ত স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে সে বুঝে নেয়, সবাইকে চা খাওয়াচ্ছে সে নিজে। থানায় গরু-চুরির এজাহার দিতে এসেছে। এই চা খাওয়ানোটা তারই সেলামী। তার অনুমতি না নিয়েই বাবুরা চা এনে খাচ্ছে। পয়সাটা দিতে হবে তাকেই। ভদ্রতার খাতিরে তাকেও এক কাপ দেওয়া হয়েছে।

চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে লোকটা একবার চারিদিকে দেখে নেয়। ক'ভাঁড় চা খরচ হল সেই হিসেব করে মনে মনে।

ভাঁড় নিঃশেষ করে লোকটি হয়ত নিজের ছেঁড়া জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে শুষ্ক মুখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে, মোট ক'ভাঁড় চা হল? কত দিতে হবে?

—দূর মশাই, আপনার কাছে পয়সা নেব কেন? চা তো বড়বাবু খাওয়ালেন।

লোকটি বোধহয় তার বাপের জন্মেও শোনে নি থানায় এজাহার দিতে গেলে উল্টে বড় দারোগাই সবাইকে চা খাওয়ায়। তাই সে হা করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পকেট থেকে হাতটা বের করে নিতেও ভুলে যায়।

—হ্যাঁ, তারপর? গরুর গোয়ালে ঢুকে তখন তুমি কি দেখলে? এজাহার লিখতে লিখতে হয়ত প্রশ্ন করে ডিউটি অফিসার।

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে আসে লোকটার। চমকে উঠে ডিউটি অফিসারের দিকে তাকিয়ে সে তার গরুচুরির ঘটনা বিবৃত করতে থাকে। মনে কিন্তু একটা খটকা থেকেই যায়—ভারি তাজ্জব ব্যাপার তো! উল্টে থানারর বাবুরাই চা খাওয়ালো তাকে?

ভবদেবের স্বভাবটাই এমনি। ভাল-মন্দ মিশিয়ে নানাধরনের খবর প্রতিদিন থানা থেকে সংগ্রহ করি আমি। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই এমনি ধরনের হাসি-ঠাট্টার পরে ভবদেব আসল খবর ব্যক্ত করে আমার কাছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমি বলি, সত্যি বড়বাবু, খবরটা বলুন না!

—আরে ভাই, তেমন কোন খবর নয়, অতি সাধারণ ডাকাতি। জানকীপুর গ্রামের আসগর শেখের বাড়ি কাল রাতে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতেরা আসগরকে বেঁধে রেখে তার স্ত্রীর গা ও বাক্সপ্যাঁটরা থেকে গয়না আর সাকুল্যে দশটি টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। লাঠির ঘায়ে আসগরকে জখম করেছে। এই তো ঘটনা। অতি নিরামিষ ধরনের ডাকাতি। খুন হয় নি

কেউ, ডাকাতেরা বন্দুকও ব্যবহার করেনি, কিম্বা গ্রামবাসীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধও হয় নি তাদের। এমন নিরীহ ধরনের ডাকাতির খবর কি তোমার দৈনিকে স্থান পাবে?

উৎসাহে একটু ভাটা পড়ে আমার। নিরুত্তাপ কণ্ঠে আমি জবাব দিই, যা' বলেছেন, বিশেষত্ববর্জিত অতি সাধারণ ডাকাতি। একটু থেমে আমি আবার বলি, জানেন তো, কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা কোন খবরই হয় না, কিন্তু—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ভবদেব নিজেই বাকিটুকু পূরণ করে, কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালেই সেটা হয় একটা জবর খবর, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিই আমি।

—কিন্তু কি আর করবো, ব্রাদার! আজকের মত এই বৈচিত্র্যহীন খবরটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে।

ঠিক এমনি সময় থানায় প্রবেশ করে অমিত। মুখখানা গম্ভীর।

—কি হে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? প্রশ্ন করি আমি।

জবাবে অমিত তেমনি গম্ভীর সুরে বললে, একটি তদন্তে বেরিয়েছিলাম । সেখান থেকে ক্লাব ঘুরে এই এলাম।

ক্লাব বলতে ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব, এই শহরের একটি প্রতিষ্ঠান। রকমারি খেলাধুলোর বন্দোবস্ত সেখানে। অমিত সেই ক্লাবের একজন মেম্বার। নিয়মিত চাঁদা দিলেও কাজের চাপে প্রতিদিন হাজিরা দিতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে যায়। শীতের সন্ধ্যায় ব্যাডমিণ্টন খেলে। আর গ্রীষ্মের বিকেলে টেবল টেনিস, কিম্বা অন্য কোন খেলাধুলোর মাধ্যমে মনটাকে একটু সতেজ করে নিয়ে এসে আবার মন দেয় কাজে।

অমিতের এই হঠাৎ গাম্ভীর্যের কারণ বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি আমি।

অমিত কাগজপত্র নিয়ে তার নিজের টেবিলে গিয়ে বসে। আমি ভাবতে থাকি ওর কথা। হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেল কেন? তবে কি মামলা তদন্তে গিয়ে কোন কিছু ঘটেছে? না কি বাড়ি থেকে কোন খারাপ খবর এসেছে?

হঠাৎ ভবদেব বলে ওঠে, এই যে ব্রাদার, কর্সিকান ব্রাদারকে দেখেই যে নিজের কাজ ভুলে গেলে। তা'হলে ডাকাতির ঘটনা জানবার তেমন আর কোন উৎসাহ নেই তোমার?

অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে উঠি আমি, না বড়বাবু, তা নয়। তবে নিতান্ত সাদামাটা ধরনের একটা ডাকাতি—

—না, তরুণবাবু। সাদামাটা ডাকাতি নয় এটা, বৈচিত্র্যও আছে। বলতে বলতে থানায় প্রবেশ করে পিনাকী সরকার।

উৎকর্ণ হয়ে উঠি আমি। বলি, তাই নাকি? তা ঘটনাটা একটু খুলে বলুন তো!

আঙুলের চাপে রেগুলেটর ঘুরিয়ে সিলিং ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিমায় আমার পাশে বসে পড়ে পিনাকী।

ভবদেবও প্রশ্ন করে, কিছু ক্লু পেলেন নাকি? গ্যাং ট্রেস করতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ, তা পেরেছি বৈকি!

সপ্রশংস দৃষ্টিতে পিনাকীর মুখের দিকে তাকায় ভবদেব। ডাকাতির মামলার তদন্তকারী অফিসারের পক্ষে প্রথম দিনই ডাকাতের গ্যাং ট্রেস করতে পারা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

ভবদেব আবার বললে, কোথাকার গ্যাং? লোকাল, না বাইরের?

—লোকাল গ্যাং, বড়বাবু। আর সেই গ্যাংয়ের পাণ্ডা আসগর শেখেরই ছেলে সোলেমান শেখ।

—সেকি? প্রশ্ন করি আমি, ছেলে নিজেদের বাড়ি ডাকাতি করেছে? সত্যি, আশ্চর্য তো!

—না, ঠিক নিজের বাড়ি নয়। বললে পিনাকী। তারপর ধীরে ধীরে ঘটনাটা বিবৃত করে।

শুনতে শুনতে বিস্মিত হই আমি। সত্যিই ঘটনাটা একটু অদ্ভুত—ছেলে দলবল নিয়ে এসে বাপের ঘরে ডাকাতি করেছে। বাপকে ঘায়েল করে মা'র গা থেকে গয়না খুলে নিয়ে পালিয়েছে। হোক সৎমা, তবু মা তো! এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

পিনাকী আবার বলতে থাকে, পিতা-পুত্রের মধ্যে কিরকম সম্বন্ধ দেখুন। বাপ সড়কি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ঐ সড়কির ঘায়ে সে ছেলেকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতে পারতো। কিন্তু ছেলেকে চিনতে পেরেই হাতের সড়কি খসে পড়ল তার। আর সেই সুযোগে ছেলে ঘায়েল করলো বাপকে।

—আসগর শেখের অবস্থা কেমন? বাঁচবে তো? প্রশ্ন করে ভবদেব।

—হ্যাঁ, বড়বাবু। এবার হয়ত বেঁচে যাবে বুড়োটা।

—সোলেমানের খোঁজ করেছিলেন?

—হ্যাঁ, করেছিলাম, বাড়িতে ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হল।

একমুহূর্ত চিন্তা করে ভবদেব। তারপর আবার বললে, দেখুন পিনাকীবাবু যদিও এই মামলার তদন্তের ভার আপনার ওপর, এর ভাল-মন্দব জন্যে একমাত্র আপনিই দায়ী হবেন, তবুও বলছি ঐ সোলেমানকে গ্রেপ্তার কবে নিয়ে না এসে ভাল কাজ করেননি। হয়ত লোকটা এবার ফেরার হবে।

উষ্মা প্রকাশ পায় পিনাকীর কণ্ঠে। বললে, তা' হলে বলুন কি কবা আমার উচিত ছিল।

—সোলেমানের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল আপনার। আপনিই যখন বলেছেন লোকটা সম্ভবতঃ এখনও কিছু টের পায় নি, তখন একসময় না একসময় সে বাড়ি ফিরতই।

এবার স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পায় পিনাকীর কণ্ঠে। বললে, দেখুন বড়বাবু সারাদিন পরিশ্রম করেছি একরকম উপোসী থেকে। এরপর ঐ সোলেমান ব্যাটার জন্যে ওব বাড়িতে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে আর তেমন উৎসাহ পাইনি। তাই ওখানকার চৌকিদারকে ডেকে ওর খবর নিতে বলে ফিরে এলাম। এখন যদি ব্যাটা ফেরার হয় তো হবে, কি আর করবো!

শান্তকণ্ঠে ভবদেব বললে, কেন, সারাদিন উপোসী রইলেন কেন? গ্রামে কারুর বাড়িতে একমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারলেন না? খেয়ে-দেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনা-চিন্তা করে ঐ সোলেমানের খোঁজ-খবর নিয়ে ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেই ভাল হত।

কণ্ঠস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর প্রকাশ পায় পিনাকীর। বললে, মামলা তদন্তে গিয়ে যারা গাঁয়ের লোকের বাড়িতে জাঁকিয়ে বসে, আমি যে তাদের দলে নই তা' তো আপনি জানেন, বড়বাবু।

খোঁচাটুকু কিন্তু অম্লানবদনে হজম করে ভবদেব। একটু সময় চিন্তা করে মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ, পিনাকীবাবু, স্বীকার করছি আপনার এটা সত্যিই চমৎকার গুণ। তদন্ত করতে গিয়ে কারুর বাড়িতে জলস্পর্শ না করাটা যতখানি ভাল, উপোসী থাকার অজুহাতে বিরক্ত হয়ে ডাকাতি মামলার আসামীকে গ্রেপ্তার করে না নিয়ে আসাটা ঠিক ততখানি খারাপ। এতে সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গেলেও কর্তব্যে দারুণ অবহেলা ঘটে। আজ আপনার বদলে আমি যদি এই তদন্তে যেতাম, তাহলে শুধু হাতে ফিরে না এসে কারুর

বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সোলেমানকে গ্রেপ্তার করে নিয়েই ফিরতাম। প্রয়োজন হলে ঐ ডাকাতি মামলার আসামীর জন্যে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতাম আমি। খেতাম থাকতাম গাঁয়ের কারুর বাড়িতে। এতে হয়ত সততার হানি ঘটত কিছু, কিন্তু কর্তব্য-কর্মের সাফল্য তা' নিশ্চয়ই পূরণ করে দিত।

থানার অফিসারদের নিজেদের মধ্যে এমনি আলোচনায় আমার মত একজন বাইরের লোকের উপস্থিত থাকাটা তেমন বাঞ্ছনীয় নয় বলেই মনে হল আমার। তাই, ওদের কথার মধ্যেই এক সময় উঠে পড়লাম আমি। ঐ ডাকাতি মামলা সম্বন্ধে যা' জানবার সবই আমার নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেছি। কাজেই শুধু শুধু বড়বাবুর ঘরে বসে থেকে ওদের কথাবার্তা শোনার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

অমিত তখনও ঘাড় নীচু করে নিজের কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে ছিল। আমার সাড়া পেয়েই মাথা তুলে তাকায় আমার দিকে। তাকিয়ে দেখি ওর মুখের সেই গাম্ভীর্য তখনও বর্তমান।

—কি হে, বাড়ি ফিরবে নাকি? প্রশ্ন করি আমি।

নিজের হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকায় অমিত। কাগজপত্র গুটিয়ে নিতে নিতে জবাব দেয়, মাত্তর তো ন'টা। তবুও এখনই উঠবো। আজ কেন যেন কাজ করতে ভাল লাগছে না।

—কেন, কি হয়েছে বলেই ফেল না। সেই থেকে লক্ষ্য করছি মুখখানা প্যাঁচার মত করে রয়েছ। কি হয়েছে খুলেই বল না ব্রাদার।

—হ্যাঁ বলব, চল। বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে নিজের টুপিটা টেনে নেয় অমিত। তারপর আমার সঙ্গে যেতে যেতে ডিউটি অফিসার জুনিয়র এ-এস্-আই. সুশান্ত দস্তিদারকে বললে, সুশান্তবাবু আমি বাড়ি চললাম। ডাইরীতে আমাকে 'আউট' দেখিয়ে দেবেন।

রাস্তায় যেতে যেতে অমিত আমাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা তরুণ, বল তো লোকে আমাদের সন্দেহের চোখে দেখে কেন? প্রাণ খুলে কেউ আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না কেন বলতে পার?

এতক্ষণে বুঝতে পারি কোন বিষয়ে মনে মনে আহত হয়েছে অমিত। আর সেই কারণেই মুখখানা তার এমন গম্ভীর।

প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে গিয়ে মৃদু হেসে জবাব দিই, কে বললে মিশতে চায় না? তোমার সঙ্গে কি প্রাণখুলে আমি মিশছি না?

—বাজে কথা রাখো। অধৈর্য কণ্ঠে বললে অমিত, তোমার কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণের কথা বলছি।

—আমি কি অসাধারণ নাকি? তেমনি হেসে আবার জিজ্ঞেস করি।

—আবার বাজে কথা বলছো? প্রায় ধমকে ওঠে অমিত।

বুঝতে পারি, ব্যাপারটাকে হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। তাই হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করি, ব্যাপারটা আগে খুলেই বল না!

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে চলে অমিত। তারপর বললে, ঐ ইয়ং বেঙ্গল ক্লাব। এখানে আসার পর থেকেই আমি ঐ ক্লাবের মেম্বার। মাঝে মাঝে ঐ ক্লাবে যাই। ওখানকার সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশতে চেষ্টা করি। কিন্তু লক্ষ্য করি সবাই আমার সঙ্গে খোলা মনে মিশতে যেন তেমন উৎসাহী নয়। আমি যতই এগিয়ে যাই, ওরা ততই পিছোয়। আমাকে ঘিরে ওদের কেমন যেন একটা সন্দেহ, কেমন এক ধরনের অবিশ্বাস। আমি অনেক চেষ্টা করেছি ওদের মন

থেকে ঐ সন্দেহ দূর করতে। কিন্তু পারি নি। আমার নিজের তরফে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি আছে বলেও আমি মনে করি না। অবশ্য, একমাত্র ত্রুটি হতে পারে এই যে, আমি পুলিশ। মনে হয়, ঐ ক্লাবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপন করাটাকে ওরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছে।

অমিত থামতেই আমি বলি, দেখ ভাই, দোষটা ঠিক ওদের নয়। তোমাদের অতীত কার্যকলাপের ফলে ওরা যদি সহসা তোমাদের বিশ্বাস করে উঠতে না পারে তো ওদের পুরোপুরি দায়ী করা চলে কি?

অকস্মাৎ একটু যেন রেগে ওঠে অমিত। বললে, অতীত—অতীত—অতীত! যেখানেই যাই কেবল এই অতীতের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কে অস্বীকার করছে যে, অতীত আমাদের খারাপ ছিল না? কিন্তু সেই অপরাধে বর্তমান ভবিষ্যৎও আমাদের এমনি হবে কেন? কেন তোমরা বুঝতে পার না, আমরাও এ দেশেরই ছেলে, এই সমাজেই আমরা বাস করি? আমাদের কিছু বাইরে থেকে আমদানী করে নিয়ে আসা হয় নি।

জবাবে আমি বলি, একটু সময় নেবে ভাই। অতীতকে ভুলে গিয়ে চট্ করে হৃদ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তোমাদের দায়িত্বই এ বিষয়ে বেশি। কাজকর্মের মাধ্যমে তোমাদেরই প্রমাণ করতে হবে যে, তোমবা সমাজের সত্যিকারের বন্ধু। পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—এই হচ্ছে তোমাদের মূলমন্ত্র।

শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, সেই আশা নিয়েই তো চাকরি নিয়েছিলাম ভাই। ভেবেছিলাম, লোকের সেবা করব। বিপদে-আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব। কিন্তু—

--কিন্তু কি?

—কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখছি, চেষ্টা করেও যেন সাধারণের মনে ঠাঁই করে নিতে পারছি না। আমরা যেন সেই কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি। জনসাধারণ আর আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধানের প্রাচীর।

সান্ত্বনা দিই অমিতকে। বলি, ধৈর্য ধর ভাই, আন্তরিকতা থাকলে সম্পর্কের পরিবর্তন হবেই। তা' এমন কি ঘটনা ঘটল যাতে করে তুমি আজ হঠাৎ এত চঞ্চল হয়ে উঠলে?

একটু থেমে অমিত বললে, আজ বিকেলে ক্লাবে গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল একটু টেবিল টেনিস খেলবো। টেবল টেনিসের ঘরে তখন কি নিয়ে যেন জোর তর্ক চলছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ থেমে গেল সব। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম আমার এই হঠাৎ আগমনে ওরা ঠিক সন্তুষ্ট হয়নি। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল আমার। তবুও মুখ ফুটে খেলার কথা বলতেই নানারকম অজুহাতে একে একে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সবাই।

আমি লক্ষ্য করেছি অমিতের মনটা বরাবরই একটু বেশি স্পর্শকাতর। বুঝতে পারি এই ঘটনায় সে মনে মনে খুবই আহত হয়েছে। তাই ব্যাপারটাকে হাল্কা করতে গিয়ে আমি বললাম, ওসব ছেলে-ছোকরাদের কথা ছেড়ে দাও। ঐ দুঃখেই তো কোন ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি আমি। দেখ তো কেমন দিব্বি ঘরে বসে বই পড়ে সময় কাটাই।

আমার কথায় অমিত সান্ত্বনা খুঁজে পায় কিনা জানি না। কিন্তু মুখে আর কিছু বলে না।

ইতিমধ্যে আমরা অমিতের বাসার কাছে এসে পড়েছি। অমিত বললে, চল, ভেতরে গিয়ে বসবে।

—না ভাই, আজ থাক। একটু বিশেষ কাজ আছে। আজ বরঞ্চ যাই।

অমিতকে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়ির পথ ধরি আমি। অমিতের কথাই মনে হতে থাকে। সুন্দর, সৎ, কল্পনাপ্রবণ মন অমিতের। জনসেবার মহৎ আদর্শ নিয়েই প্রবেশ করেছে এই

ডিপার্টমেন্টে। মানুষকে ভালবাসতে চায়, মানুষের ভালবাসা পেতে চায়। পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে একটা সুস্থ, সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ভুলতে চায় অতীতের সেই তিক্ততা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে। লেট্ আস ফরগিভ এ্যান্ড ফরগেট—অতীতের সেই অধ্যায় ভুলে গিয়ে এস আমরা স্থাপন করি নতুন সম্পর্ক। তোমাদের সাহায্য করবার জন্যেই তোমরা আমাদের সাহায্য কর। তোমাদের যাতে সুষ্ঠুভাবে সেবা করতে পারি তেমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে তোমরাও এগিয়ে এস আমাদের সাহায্যে। এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত অমিত। কিন্তু বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাত যেন থেকে থেকে তার সেই স্বচ্ছ আদর্শের ওপর কুয়াশার আবরণ টেনে দিচ্ছে। বিচলিত হয়ে ওঠে অমিত, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তার সংবেদনশীল মন। বেচারা অমিত।

* * *

রাত তখন দশটা।

বাইরের লোকজনের তেমন ভিড় নেই থানায়। কর্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে এসেছে অনেকটা।

একখানা জীপগাড়ি এসে ধীরে ধীরে থামে থানাব সামনে। একজন, মাঝবয়েসী পাঞ্জাবী নেমে আসে জীপ থেকে। তার পেছনে নেমে আসে একটি স্ত্রীলোক। পরনে বাঙালী বিধবাব পোশাক। চেহারায় দারিদ্রের সুস্পষ্ট ছাপ।

পদশব্দে ভবদেব কাগজপত্র থেকে মাথা তুলে তাকাতেই হরচাঁদ সিং হাত তুলে নমস্কার করে তাকে। প্রতিনমস্কার করে তাকে সামনের চেয়ারে বসতে বলে ভবদেব জিজ্ঞেস করে, কি খবর হরচাঁদ? কানুর মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাতে পেরেছ?

—হাঁ বাবুজী। ভাঙা বাংলায় জবাব দেয় হরচাঁদ সিং, পনের আনা রাজী করিয়েছি, ঔর এক আনা বাকি।

—উঁহু। এক আনা গররাজি থাকলেও চলবে না, পুরো ষোল আনা রাজী করাতে হবে।

—তাই তো কানুর মাকেও নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

—ও, তাই নাকি? ডাকো, ডাকো তাকে।

বিধবা কানুর মা এসে সঙ্কুচিত হয়ে একটা টুলে বসতেই ভবদেব তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি কানুর মা, হরচাঁদের কথায় তুমি রাজী হয়েছ?

কানুর মা কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে।

ভবদেব আবার বললে, দেখ কানুর মা, হরচাঁদ যা বলছে সে কাজ সম্পূর্ণ বে-আইনী। তবুও কেবল তোমার কথা ভেবেই ঐ ব্যবস্থায় রাজী হয়েছি আমি। এখন তুমি নিজে যদি রাজী না হও তো আমি ঐ বে-আইনী কাজ করব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার মামলা যখন আমার হাতে রয়েছে তখন হরচাঁদের নির্ঘাৎ জেল হয়ে যাবে। কেউ তা রুখতে পারবে না। এখন তুমি বল ওর জেল হলেই কি তুমি খুশি হবে?

এবার কথা বলে কানুর মা। বললে, ওর জেল হলে আমার কি লাভ হবে বাবু? আমার কানুকে কি তা'হলে ফিরে পাবো? যে যাবার সে তো গেছেই, এখন ভাবছি যদি কোনমতে আর তিনটি ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করে তুলতে পারি তবেই—। কথাটা শেষ না করেই আঁচল দিয়ে চোখ মোছে সে।

ঘটনাটা ঘটেছিল মাস দু'য়েক আগে। হরচাঁদ সিংয়ের গাড়ির তলায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছে বারো বছরের ছেলে কানু। শহরের একটা চায়ের দোকানে কাজ করতো সে। বিধবার চারটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে ঐটিই ছিল বড়। এবাড়ি-ওবাড়ি কাজকর্ম করে আর ছেলের উপার্জনে কোনমতে সন্তান ক'টিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল কানুর মা। তা' থেকে প্রথম সন্তানটিই খসে পড়ল এমনিভাবে।

—তা' হলে তুমি রাজী আছো, কানুর মা? প্রশ্ন করে ভবদেব।

—রাজী না হয়ে কি করব বাবু? তবে ও বললে মাত্র এক হাজার টাকা দেবে।

ভ্রূ-যুগল কুঁচকে ওঠে ভবদেবের। হরচাঁদের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, দেখ হরচাঁদ, আমাকে তুমি ভালমতই চেন। আর তুমি এও জান আমি তোমার বিরুদ্ধে যে মামলা সাজিয়ে দেব তা' থেকে তুমি কিছুতেই পরিত্রাণ পেতে পারবে না। শাস্তি তোমার হবেই।

ভবদেবের কথা শেষ হবার আগেই একেবারে হা-হা করে ওঠে হরচাঁদ। বললে, এ কি কথা বলছেন আপনি বাবুজী? তামাম এই জেলায় কে না জানে আপনার হাতে যে পড়বে, তাকে দয়া করে আপনি ছেড়ে না দিলে তার খালাস পাওয়া খুবই শক্ত, বাবুজী। সাজা তার হবেই। আমি কেবল বলছিলাম আপনি যদি দয়া করে ওকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে হাজার টাকায় রাজী করাতে পারেন—

—না, হাজার টাকায় চলবে না। পুরো দু' হাজার টাকা ওকে দিতে হবে। কেমন, এতে তুমি রাজী কানুর মা?

—হ্যাঁ বাবা। মাথা নেড়ে সায় দেয় কানুর মা, দু'হাজার টাকা পেলে আমি বর্ধমানে আমার গাঁয়ে চলে গিয়ে সামান্য কিছু জমিজমা কিনে ছেলে-মেয়ে তিনটির মুখের ভাতের ব্যবস্থা করতে পারবো। প্রতিমাসে তিরিশটা করে টাকা আনতো কানু। সে টাকা তো আজ বন্ধ। বলেই কানুর মা আবার আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

—বেশ, তাই হবে। হরচাঁদ তোমায় পুরো দু'হাজার টাকা দেবে। কি বলছ হরচাঁদ?

ম্লানকণ্ঠে হরচাঁদ বললে, কি আর বলব বাবুজী! আপনি যা বলেছেন তাই হবে।

—তা হলে কবে ওকে টাকা দেবে?

—বলেন তো আজই দিতে পারি। টাকা সঙ্গেই আছে।

ভবদেবের নির্দেশে হরচাঁদ সিং তখনই একশ' টাকার কুড়িখানা নোট গুণে তুলে দেয় কানুর মা'র হাতে।

কানুর মা সন্তর্পণে নোটগুলো ভাঁজ করে আঁচলে বেঁধে কোমরে গুঁজে রাখে।

ভবদেব সাবধান করে দেয় তাকে, টাকাগুলো খুব সাবধানে রেখ, কানু মা। দিনকাল বড় খারাপ। তারপর একজন কনস্টেবল্ ডেকে কানুর মাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে।

কানুর মা চলে যেতেই ভবদেব হরচাঁদকে বললে, ঠিক আছে হরচাঁদ। এবার যেতে পার তুমি। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

হরচাঁদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর পকেট থেকে সন্তর্পণে পাঁচখানা একশ' টাকার নোট বের করে ভবদেবের সামনে রেখে একটু হেসে বললে, আপনার সেলামী বাবুজী।

ভবদেব একবার তাকায় হরচাঁদের মুখের দিকে। মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে তার। মুখে শুধু বললে, ও-আচ্ছা! বলেই নোটগুলো ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেয়।

থানার সঙ্গেই কোয়ার্টার। সাকুল্যে কোয়ার্টারের সংখ্যা পাঁচ। তিনটে সাব-ইন্সপেক্টরের, আর দু'টো এ্যাসিস্‌ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের জন্যে।

অফিসার-ইন-চার্জকে নিয়ে থানায় সাব ইন্সপেক্টরের সংখ্যা চার। পদাধিকার বলে সেকেণ্ড অফিসার হিসাবে অমিত একটি কোয়ার্টার পেতে পারত। কিন্তু যেহেতু সে একা, তাই সে বাইরে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে। বড়বাবু ছাড়া পিনাকী সরকার আর ধুর্জটী গাঙ্গুলী থাকে সাব-ইন্সপেক্টরের কোয়ার্টারে। সিনিয়র এ-এস-আই, শ্রীপতি মিত্র আর জুনিয়র এ-এস-আই, সুশান্ত দস্তিদার যাকে অন্য দুটি কোয়ার্টারে।

থানার কাজ শেষ করে ভবদেব যখন বাড়ি ফেরে তখন রাত একটা।

জেগেই ছিল কমলা। স্বামীর পায়ের শব্দে দরজা খুলে দেয়। ছিপছিপে ফরসা গড়ন কমলার। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেলেও চেহারায় পঁয়তিরিশের বেশি বলে মনে হয় না। শাঁখার সঙ্গে মাত্র দু'গাছা বালা হাতে। কানে পাথর লাগানো ফুল। সরু একগাছা সোনার চেন গলায়। কপালে ও সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুরের চিহ্ন।

বাইরে থেকে লক্ষ্য করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভবদেবের মত কমলাও কথা বলে কম। এমন কি ভবদেবের চাইতেও কম। কিন্তু সবসময় কেমন একটা বিষাদের ছায়া তার মুখে। জীবনে যা' চেয়েছিলাম তা' পেয়েছি কি পাইনি তার হিসাব মেলাতেই যেন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।

কমলাও শিক্ষিতা। সেকালের আই. এ. পাশ। গ্রাজুয়েট ভবদেব দারোগাগিরিতে ঢুকেছে, কাজেই উন্নতি তার অবধারিত। সেই আশাতেই বোধহয় কমলার বাবা তার শিক্ষিতা মেয়েকে ভবদেবের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু দারোগা ভবদেব দারোগাই রয়ে গেল। উন্নতির একটা ধাপেও সে উঠতে পারলে না। সেই দুঃখেই কি কমলার এই বিষণ্ণ মূর্তি?

না, তা' নয়। স্বামীর উন্নতি তার কাম্য হলেও সেটাই তার একমাত্র প্রার্থনার বস্তু ছিল না। সে মনে মনে চেয়েছিল মানুষ ভবদেবের সান্নিধ্য, যে নাকি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে রূপে, রসে, গন্ধে ভরপুর করে তুলবে। যার উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবে প্রতিনিয়ত।

কিন্তু সেখানেই এক মস্তবড় আঘাত পেয়েছিল কমলা। অচিরেই সে বুঝতে পেরেছিল তার প্রতি ভবদেবের যতটা নজর, তার চাইতে বেশি নজর তার চাকরির ওপর। সে আরও বুঝতে পেরেছিল, আর দশজন স্ত্রীলোকের স্বামীর মত স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই তার। সে সরকারী কর্মচারি, কঠিন দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। ইচ্ছে থাকলেও তার স্বামী দু'দণ্ড বসে গল্প করতে পারে না তার সঙ্গে। পরিশ্রান্ত স্বামী দিনের শেষে খেতে বসেও শান্ত মনে খেতে পারে না। সময় সময় মুখের খাবার ফেলে রেখেও কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে হয় তাকে। তখন স্বামীর সেই ফেলে যাওয়া খাবারের দিকে তাকিয়ে চোখের জল বাঁধ মানে না কমলার। মাঝে মাঝে সারারাত বাইরেই থাকতে হয় ভবদেবকে। বাড়ি ফেরার সময় পায় না। নিদ্রাহীন চোখে একা বিছানায় শুয়ে কেবল চোখের জল ফেলতে হয় কমলাকে। সময় নেই অসময় নেই, দিন নেই রাত নেই, কেবল কাজ আর কাজ। নজর নেই সংসারের ওপর। নজর দিতে পারে না ছেলেমেয়েদের ওপর।

প্রথম প্রথম কমলা বলত, এ চাকরি যারা করে তাদের বিয়ে করা উচিত নয়। বিষণ্ণ হাসি হেসে কমলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ভবদেব বলত, কেন, কমলা? তোমার খুব কষ্ট হয়, তাই না?

কখনও বা ভবদেব বলত, আমার জন্যে যদি তুমি বসে থাকো তবে মাসের অর্ধেক দিন তোমার খাওয়াই হবে না, কমল। আমি বাইরে বাইরে ঘুরি। যখন যেখনে যা' জোটে খেয়ে নিই। তুমি শুধু শুধু আমার জন্যে উপোস করে বসে থাক কেন, বল তো? তা'ছাড়া কমলার মনে সর্বদাই কেমন এক আশঙ্কা—বিপদজনক চাকরি, বলা যায় না কিছু। কোথায় কখন ভবদেবের জন্যে কি বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে? সর্বদা ভয়, সব সময় দুশ্চিন্তা।

ছেলে-মেয়ে দু'টি হবার পর তাদের নিয়ে অনেকটা ভুলে থাকতে চেষ্টা করেছিল কমলা। তবুও প্রথম জীবনের সেই না পাওয়ার ব্যথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি কোনদিনই। মনের অতৃপ্ত বাসনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর টেনে দিয়েছিল এক বিষাদক্লিষ্ট গাম্ভীর্য।

কমলা স্বামীর পেছনে এসে ঘরে প্রবেশ করে। ভবদেব কোমরের বেল্ট খুলে, গায়ের জামাটা খুলতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। একমুহূর্ত তাকায় স্ত্রীর মুখের দিকে। তারপর পকেট থেকে সেই নোটগুলো বের করে কমলার হাতে দিয়ে বললে, এগুলো তুলে রাখ।

নোটগুলো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে স্বামীর মুখের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কমলা। দু'চোখ ছলছল করে ওঠে তার।

—ওকি কমল, কি ভাবছ? প্রশ্ন করে ভবদেব।

—না, কিছু না। মনের কথা লুকোতে চেষ্টা করে কমলা।

—না-না, নিশ্চয়ই কিছু ভাবছ তুমি! বল, কি ভাবছ?

একমুহূর্ত স্থির থেকে কমলা বললে, ভাবছি তোমার কথা, ভাবছি আমার কথা, ভাবছি ছেলেমেয়ে দু'টোর কথা। আমাদের পাপেই হয়ত ছেলেটার এই অবস্থা।

—পাপ, কিসের পাপ? বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভবদেবের।

—পাপ নয়? ঘুষ খাওয়া পাপ নয়?

—ও—এই কথা? ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে ভবদেব আবার বললে, পাওয়া টাকা ছেড়ে দেওয়াকে আমি মূর্খতা বলেই মনে করি, কমল। তবে তুমি স্থির জেনো, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে উপরি পয়সা রোজগার আমি করি না।

কমলা মুখে কোন জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসে।

—ওকি, হাসলে যে বড়?

—হাসলাম তোমার পাপকে পুণ্য বলে চালাবার চেষ্টা দেখে। তুমি বিশ্বাস না করলেও আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, এইসব পাপেই আজ অমলের এই অবস্থা।

—কেন, তার আবার কি হল? সে তো দিব্বি কলেজে পড়ছে!

—হ্যাঁ, তুমি তাই জান। রাত একটা বেজে গেছে। এই তো কিছুক্ষণ আগে তোমার ছেলে বাড়ি ফিরল।

—সেকি? অমল এত রাতে বাড়ি ফেরে?

—শুধু কি আজ, প্রায় প্রতিদিনই এমনি রাত করে সে ফেরে। কোথায় যায়, কি করে জানি না। জিজ্ঞেস করলেও জবাব দেয় না। তুমি তো আছো তোমার চাকরি নিয়ে। ওর ওপর নজর দেবে কে? আমি মেয়েছেলে, আমার কথা তো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

—তাই নাকি? ঠিক আছে, কাল সকালে উঠেই ওকে ধমকে দেব।

খেতে বসে ভবদেব কন্যা অমিয়ার খবর নিতেই কমলা বললে, মেয়েটাও না খেয়ে ঘুমিয়েছে।

—কেন, তার আবার কি হল?

—হবে আবার কি? স্কুলে নাকি কোন্ মেয়ে ওকে কি বলেছে। সেই দুঃখেই কান্নাকাটি করে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—স্কুলের মেয়েরা আবার কি বলতে গেল ওকে? খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে ভবদেব।

—মিথ্যে আর কি বলেছে এমন? বলেছে, তোদের তো অনেক টাকা-পয়সা। তোর বাবা থানার বড় দারোগা। ঘুষের টাকাতেই তো তোরা বড়লোক।

সোজা এবং সরল পথে চলতে চলতে অকস্মাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার মুহূর্তে মানুষের মুখের যা' অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি মুখ নিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে ভবদেব। মুখের গ্রাসটা যেন হঠাৎ কণ্ঠনালীতে আটকে গেছে তার।

পরক্ষণেই কিন্তু আসনের ওপর নড়েচড়ে বসে আবার খাওয়ায় মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে ভবদেব। মনকে প্রবোধ দেয়—ময়লা, নোংরা খেতে সব মাছই ওস্তাদ। দোষ কেবল হতভাগ্য বোয়ালমাছের।

সবে ঘুম এসেছে ভবদেবের। এমন সময় বাইরের দরজায় খট্ খট্ শব্দ।

ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কান খাড়া করে থাকে সে। বাইরে কনস্টেবল্ রামলক্ষ্মণ চৌবের কণ্ঠস্বর—বড়বাবু, মার্ডার কেস্ এসেছে, ছোটবাবু ডাকছেন আপনাকে।

ধড়মড় করে খাট থেকে নেমে আসে ভবদেব। সর্বনাশ, মার্ডার কেস্! বেচারা সুশান্ত বোধহয় ঘাবড়ে গেছে। নাইট ডিউটি তো আজ ওরই।

ভবদেবের পরনে লুঙ্গি। সেই অবস্থাতেই একটা হাফসার্ট গায়ে দিয়ে নেয়। কমলাও ততক্ষণে উদ্বিগ্ন মুখে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ তার মুখে। বললে, একটা রাতও কি তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে না?

স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ে দিতে দিতে ভবদেব ম্লান হেসে বললে, দায়িত্বের কাজ, কমল। দুঃখ করে আর কি করবে? চললাম, তেমন অবস্থা দেখলে ফিরে এসে পোশাক পাল্টে আমাকেই হয়ত তদন্তে বেরুতে হবে।

॥ চার ॥

অদ্ভুত নাম গ্রামটির—ডাকাতবিল।

কোনকালে হয়ত সত্যিই একটা বিল ছিল ওখানে। সেকালে কোন ডাকাত হয়ত গাঁয়ের লোকের ওপর দয়াপরবশ হয়ে ওই বিলটি তৈরি করিয়ে দিয়েছিল তাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্যে। হয়ত এইভাবে সারাজীবনের অর্জিত পাপের মধ্যে কিছু পুণ্যও সঞ্চয় করতে চেষ্টা করেছিল। সেই থেকেই বোধহয় ডাকাতবিল নামটির উৎপত্তি।

জেলা শহর থেকে বেশি দূরে নয় গ্রামটি। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে ইটের তৈরি সড়ক শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা শুরু হয়েছে, সেখান থেকে হাঁটাপথে বড়জোর আধঘণ্টার রাস্তা।

এখন কিন্তু কোন বিল চোখে পড়ে না সেখানে। দু'পাশে ধানের ক্ষেত। মাঝখানে প্রশস্ত কাঁচা সড়ক। সেকালে ওই পথে চলত শুধু গরুর গাড়ি। আজকাল কিন্তু সাইকেল রিক্সাও

চলে। তা'ছাড়া সাইকেল তো আছেই। গাঁয়ের চাষী শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাইকেলের প্রচলন খুবই বেশি আজকাল।

কোনরকমে ধার-কর্জ করে একটা সাইকেল কিনতে পারলেই সব মুশকিলের আসান। বিশেষ ভাবে তৈরি পেছনেরর ক্যারিয়ারে পর্বতপ্রমাণ ঝুড়ি-বোঝাই তরি-তরকারি নিয়ে সাত সকালে তারা ছোটে শহরের বাজারে। দুপুরের আগেই খালি ঝুড়ি নিয়ে বিড়ি টানতে টানতে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরে। আবার বিকেলে ফর্সা জামাকাপড় পরে তেড়ি বাগিয়ে ওই সাইকেল চেপেই শহরের সিনেমার সামনে গিয়ে ভিড় করে।

বড় সড়ক থেকে যে ঢালু রাস্তাটা পশ্চিমদিকে চলে গেছে সেটা ধরে কিছুদূর গেলেই দু'পাশে পাটক্ষেত। মানুষ-সমান উঁচু পাটগাছ। ঐ পাটক্ষেতেই পাওয়া গিয়েছিল মহেশ খাস্তগীরের রক্তাক্ত মৃতদেহটা। দু'একটা নয়, তার সারা দেহে পনের-ষোলটা ছোরার আঘাতের চিহ্ন ছিল, যেন কেউ নির্মম আক্রোশে আঘাতের পর আঘাত করে হত্যা করেছে তাকে।

মহেশ খাস্তগীরও জোয়ান পুরুষ। চল্লিশের মধ্যেই বয়স। বেশ হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান চেহারা।

মহেশ যে মুখ বুজে আততায়ীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেনি তার চিহ্ন সর্বত্র ছড়ানো। তার হাতে-পায়ে পাটক্ষেতের নরম জমির কাদা। চার-পাঁচ হাত পরিমিত জমির লম্বা পাটগাছগুলো ভূতলশায়ী। অনেকগুলো পায়ের চিহ্ন সেখানে। মৃত্যুর আগে প্রাণপণে যুঝেছিল মহেশ। হয়ত চিৎকারও করেছিল। কিন্তু কাছে পিঠে লোকালয় না থাকায় তার সেই অন্তিম চিৎকার সম্ভবতঃ কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি।

কিন্তু প্রশ্ন হল, মহেশ একা ঐ পাটক্ষেতে গিয়েছিল কেন? কিসের আকষর্ণ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল লোকালয়শূন্য ঐ পাটক্ষেতে? মহেশ ডাকাতবিল গ্রামের বাসিন্দাও নয়। ডাকাতবিল থেকে আরও দু'ক্রোশ দূরে সাতগাঁ গ্রামের অবস্থাপন্ন চাষী শ্রেণীর লোক ছিল সে। দু'শ বিঘের বেশি তার ধানজমি। গ্রামে পাকা বাড়ি, বাঁধানো ঘাটওয়ালা পুকুর।

স্নান খাওয়া ভুলে পুরো তিনটি দিন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করেছিল জেলার সবচাইতে তুখোড় তদন্তকারী অফিসার ভবদেব ব্যানার্জী স্বয়ং। আর, সেই তদন্তে যে কাহিনী সে উদঘাটিত করেছিল তা' সত্যিই চমকপ্রদ।

মহেশ খাস্তগীরের বাড়ির লোকজনেরাও মহেশের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। প্রতিদিনের মত সেদিনও সকালে মহেশ বাইরে বেরিয়েছিল। কিন্তু কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, তা তারা জানে না। বরাবরই একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ব্যক্তি ঐ মহেশ। হাতে প্রচুর পয়সা, বয়সটাও তেমন বেশি নয়। কাজেই যথেচ্ছাচারের প্রচুর সুযোগ।

কথাটা প্রথম বলেছিল মহেশের গ্রামেরই একটি লোক, পরাণ সামন্ত। ভবদেবকে বলেছিল, স্বভাব-চরিত্তির তেমন ভাল না হলেও মহেশের মনটা কিন্তু খুবই দরাজ ছিল, বাবু। বিপদে পড়ে কেউ তার কাছে হাত পাতলে তাকে কোনদিনই বিমুখ করতো না সে। এই আমার কথাই ধরুন না ! সেবার মেয়ের বিয়ের সময় কিছু টাকা চাইলাম ওর কাছে। বিনে সুদে নগদ দু'টি হাজার টাকা বের করে দিলে। বললে, পরাণকাকা, মানুষের জীবনের সেরা দায় হচ্ছে কন্যাদায়। আপনি যখন পারবেন শোধ করবেন। বলুন তো বাবু, কে দেয় এমন মাগ্‌গী-গণ্ডার বাজারে বিনে সুদে দু'হাজার টাকা? বলেই ধুতির খুঁটে চোখ মুছেছিল পরাণ। তারপর আবার বলেছিল, এমন লোককে কে যে এমনি ভাবে মারলে বুঝতে পারছি না।

—মহেশের চরিত্র বোধহয় তেমন ভাল ছিল না, পরাণ? প্রশ্ন করেছিল ভবদেব।

নিজেকে একটু সংযত করে পরাণ ধরা গলায় জবাব দিয়েছিল, ঐ একটিমাত্র দোষ ছিল ওর। মেয়েছেলের দোষ আর কি। তবে হক কথা বলবো, সে যা করতো, বাইরে বাইরেই করতো। গাঁয়ের বৌ-ঝিদের ওপর কেউ কোনদিন তাকে কু-নজর দিতে দেখে নি, বাবু।

—আচ্ছা পরাণ, গাঁয়ে ওর শত্রু ছিল কেউ?

একটু সময় ভেবে নিয়ে জবাব দিয়েছিল পরাণ, না জেনে নাম করে কাকে আবার এই বিপদে জড়াবো, বাবু? তবে পয়সাওয়ালা লোক যখন তখন শত্রু তো দু'চারজন থাকবেই। জমি-জমা নিয়ে দু'চারজনের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমাও চলছিল তার।

—তারা কে, বলতে পারো পরাণ?

জিভে কামড় দিয়ে পরাণ বলেছিল না, বাবু, না। ঐ কাজটি করতে পারবো না। আপনি বরঞ্চ দয়া করে খোঁজ-খবর নিয়ে নিজে জেনে নিন তাদের নাম। আমাকে বলতে বলবেন না, বাবু। সোজা ব্যাপার তো নয়! খুনের মামলা!

পরাণ সামন্তকে সোজা সরল লোক বলেই মনে হয়েছিল ভবদেবের।

ভবদেব কিন্তু পরে মহেশ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছিল, পরাণ সত্যি কথাই বলেছে। মহেশের স্বভাব-চরিত্র সত্যিই তেমন ভাল ছিল না।

মৃত মহেশের জামার পকেটে যে দু'চারখানা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল, সেই কাগজের সূত্র ধরে শহরের ফৌজদারী আদালতে খবর নিয়ে ভবদেব জানতে পেরেছিল ঐদিন আদালতে উপস্থিত হয়েছিল সে। যে ব্যক্তির সঙ্গে মহেশের মামলা চলছিল তার ওপরই প্রথম সন্দেহ হয়েছিল ভবদেবের। কিন্তু সেই সন্দেহ দানা বাঁধবার আগেই তদন্তের গতি প্রবাহিত হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য পথে। এখানেই ভবদেবের কৃতিত্ব। তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপে সে চালিত হয় যুক্তির সাহয্যে। তার চিন্তাশক্তির পরিপক্কতা গ্রন্থি-সংকুল সমস্যার মধ্যে সমাধানের পথ খোঁজে। আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচেষ্টা যুক্ত হয়ে একদিন সত্য এসে ধরা দেয় আপন মহিমায়।

যে লোকটির সাথে মহেশের দীর্ঘদিন ধরে মোকদ্দমা চলছিল তার নাম তরণী নস্কর। তরণীর সাথে এর আগেও একটি ফৌজদারী মামলা হয়েছিল মহেশের। সেই মামলায় জয়ী হয়েছিল মহেশ। তিন মাসের জেল হয়েছিল তরণীর। বর্তমানের এই মামলাটি দ্বিতীয়।

তদন্তের ব্যাপারে সহজ সরল বস্তুকে চোখ বুজে গ্রাহ্য করার পক্ষপাতী নয় ভবদেব। হোক সেটা সরল, কিন্তু তবুও তাকে যাচাই করে নিতে হবে। নইলে ভুল পদক্ষেপের সম্ভাবনা।

প্রথম মামলায় তরণীর তিন মাস জেল হয়েছিল। কাজেই তরণীর পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় ফৌজদারী মামলাতেও মহেশই জড়িয়েছিল তাকে। তাই, মহেশের ওপর তরণীর আক্রোশ বেড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। তাছাড়া ঐদিনই মামলার তারিখ ছিল এবং মহেশও উপস্থিত হয়েছিল আদালতে।

সবকিছুই মিলিয়ে সোজা পথে তরুণীর ওপর সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ারই কথা। ভবদেবও প্রথমটায় সন্দেহ করেছিল তাকে। কিন্তু সত্যসন্ধানী ভবদেব এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। তরণীর ওপর সন্দেহের কারণগুলো তাকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে যথেষ্ট। অন্য কেউ হলে হয়ত তাকে গ্রেপ্তার করতো। কিন্তু ভবদেব তা করেনি। সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও তলিয়ে দেখে ষোলআনা যাচাই করতে চেয়েছিল সে।

এই যাচাই করতে গিয়েই কিন্তু তরণীর ওপর সন্দেহের গুরুভার বেশ খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল।

আদালতের অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় মামলার কাগজপত্র পরীক্ষা করে তার বুঝতে দেরি হল না যে, এই মামলাটি সম্পূর্ণরূপে তরণীর পক্ষে। মামলার শুনানী শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন কেবল আরগুমেন্ট বাকি।

দু'পক্ষের উকিলের কাছে খোঁজ নিয়েও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল ভবদেব। মহেশের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

এরপরই ভবদেবের চিন্তাধারা প্রবাহিত হল অন্য খাতে। প্রথম মামলার সময় তরণী মহেশের জীবন নাশের কোন চেষ্টা করেনি। সেই মামলায় হেরে গিয়ে তিন মাস জেল খাটার পর বেরিয়ে এসেও সে তেমন কোন চেষ্টা করেনি। তারপর দ্বিতীয় মামলা রুজু হবার পরও তরণী তার জীবন নাশের সংকল্প করেনি। দীর্ঘদিন ধরে মামলার শুনানী চলল। অবশেষে এই শেষ সময় যখন তার জয় অবধারিত, তখন সে হঠাৎ মহেশকে হত্যা করবে, এমন একটা ব্যাপারের সম্ভাবনা কতটুকু? অসম্ভব না হলেও অস্বাভাবিক তো বটেই।

কাজেই, ভবদেব সন্ধান করতে শুরু করলে অন্য সূত্রের। তা'ছাড়া ভবদেবের অজানা ছিল না যে, এদেশে যতগুলি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তার বেশির ভাগের সঙ্গেই সম্বন্ধ থাকে নারীঘটিত বিষয়ের। মহেশের নিজেরও ঐ দোষটি ছিল পুরোমাত্রায়।

প্রথম সূত্রটির সন্ধান দিয়েছিল আদালতের একজন মুহুরী। ভবদেবের প্রশ্নের জবাবে সে বলেছিল, না স্যার আদালতে মহেশের সঙ্গে আর কেউ আসেনি। সে একাই এসেছিল।

—আপনি ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন? প্রশ্ন করেছিল ভবদেব।

—হ্যাঁ, স্যার।

—ওইদিন মহেশের কথাবার্তায় কিছু অস্বাভাবিক লক্ষ্য করেছিলেন আপনি?

—না, স্যার। তেমন কিছু তো দেখিনি। শুনানীর পর সে আমার সঙ্গে ভালভাবেই কথাবার্তা বললে, আমাদের পাওনা টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিলে।

—তারপর সে একাই চলে গেল আদালত ছেড়ে?

একটু সময় চিন্তা করে সেই মুহুরী। তারপর জবাব দিয়েছিল, না স্যার, ওই সময় একজন লোক এসে তার কানে কানে যেন কি বলল। শুনেই মহেশ আমাকে বললে, মুহুরীবাবু, তাড়াতাড়ি আপনার টাকা-পয়সা বুঝে নিন। আমার বিশেষ কাজ আছে। বলেই আমাদের টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে সেই লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

মহুরী সেই লোকটির চেহারারও মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়েছিল।

যাক্, একটি সূত্র তবে পাওয়া গেল। সম্ভবতঃ ওই লোকটিই তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই ডাকাতবিল গ্রামের পাটক্ষেতের মধ্যে। কিন্তু কেন? কি উদ্দেশ্যে? আর, ওই লোকটির পরিচয়ই বা কি?

মানুষে মানুষে রেষারেষি, দলাদলি সবদেশে সবকালেই নিন্দার্হ। কিন্তু এই নিন্দার্হ ব্যাপারটিই চিরকাল পুলিশের খবরের একটি প্রধান উৎস।

সাতগাঁ গ্রামের গ্রামবাসীদের মধ্যেও রেষারেষি দলাদলির অভাব ছিল না। মহেশের বিরুদ্ধ দলের একজন লোকের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল সেই লোকটির আসল পরিচয়।

সে বলেছিল, হ্যাঁ বাবু, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আর্শেদালির কথা বলছেন।

—কে [illegible]র্শেদালি? প্রশ্ন করেছিল ভবদেব।

—পাশের গাঁয়েই থাকে। লোকটা সাংঘাতিক বদ প্রকৃতির মাতাল। গান বাজনা করতে পারে। মহেশের সাথে ওর গলায় গলায় ভাব ছিল।

—কি সূত্রে সেই গলায় গলায় ভাব, বলতে পারো?

লোকটির চোখ'দুটোয় আর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাস জেগে উঠেছিল। একটু ভেবে নিয়ে সে বলেছিল, আজ্ঞে স্যার, ওই মহেশের স্বভাব চরিত্তির তো ভালো ছিল না কোনকালেই। ওই আর্শেদালিও ওই স্বভাবেরই, কাজেই—

লোকটি এই পর্যন্ত বলেই বাকিটুকু মুখে প্রকাশ না করে কেবল একটু হেসে চোখের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল।

আর্শেদালি লোকটি কিন্তু অর্ধ-শিক্ষিত। কথার মধ্যে দু'একটা ইংরেজি শব্দও সে ব্যবহার করত যখন তখন।

ভবদেবের প্রশ্নের জবাবে সে বলেছিল, ঠিক বলেছেন স্যার। মহেশ ছিল আমার অনেক কালের বন্ধু।

—কি সূত্রে তোমাদের বন্ধুত্ব?

একমুহূর্ত দ্বিধা না করে কোনরকম সংকোচের ভাব না দেখিয়ে জবাব দিয়েছিল আর্শেদালি, ওকে যে মেয়েছেলে সাপ্লাই করতুম আমি।

হুঁ! ভবদেব একটু চিন্তা করে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, তার বদলে নিশ্চয়ই টাকা নিতে মহেশের কাছ থেকে?

—হ্যাঁ স্যার, বিনে পয়সায় কি এ কাজ চলে? সোজা উত্তর আর্শেদালির।

—তা'হলে সেদিন আদালতে গিয়ে তুমিই মহেশকে সঙ্গে করে ডাকাতবিলের সেই পাটক্ষেতে নিয়ে গিয়েছিলে? সামান্য কথাতেই আর্শেদালির চরিত্র বুঝে নিয়ে সরাসরি তাকে প্রশ্ন করেছিল ভবদেব।

উত্তরও দিয়েছিল আর্শেদালি সরাসরি, হ্যাঁ, স্যার? বৌটি ওই পাটক্ষেতের মধ্যেই লুকিয়ে থাকবে বলে কথা হয়েছিল।

—বৌ? কার বৌ? বিস্মিত কণ্ঠস্বর ভবদেবের।

—কার বৌ তা' জানি না, স্যার। একটু থেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে আর্শেদালি আবার বলেছিল, শুনুন স্যার, মহেশ ছিল আমার অনেক দিনের বন্ধু। অনেক পয়সা খেয়েছি ওর। তাই যা' ঘটেছিল, সত্যি বলবো আপনার কাছে।

আবার একটু থেমে বিড়িতে একটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল আর্শেদালি, এ লাইনে স্যার পুরানোর চাইতে নতুনের কদর অনেক বেশি। তবে সবসময় তো আর নতুন মেলে না, তাই পুরানোকেই একটু ঘষে-মেজে ঝকঝকে চকচকে করে নতুন বলে চালাতে হয় আমাদের। খদ্দেরের কাছে ধরাও পড়ি, কিন্তু ধরা পড়ি এমন সময় যখন খদ্দের রাগ করে তাদের দূরে ঠেলে দিতে পারে না—তেমন অবসর তখন থাকে না তাদের। ভালো হোক, খারাপ হোক ওতেই মজে যেতে হয় সেই মুহূর্তে।

এইসব ইতিহাস শুনতে তেমন ভাল লাগছিল না ভবদেবের। অধৈর্য কণ্ঠে সে বলেছিল, তুমি মহেশের কথাই বলো।

—হ্যাঁ স্যার, সেই কথাই তো বলবো। বলেই মাড়িসমেত দু'পাটি দাঁত বের করে একটু হেসে আবার আরম্ভ করেছিল আর্শেদালি, ওই মহেশ স্যার—আমার বন্ধু মহেশ, অবিবাহিতের চেয়ে বিবাহিতের উপর ওর বরাবরই একটু বেশি নজর ছিল। জিজ্ঞেস কর[illegible] বলত,

ও তুই বুঝবি না। আমিও যথাসাধ্য বিবাহিত স্ত্রীলোক জোগাড় করে দিতুম ওকে। ওর কাছ থেকে মোটা পয়সাও আদায় করতুম। ঠকিয়েছিও ওকে—হ্যাঁ, স্বীকার করছি, অনেকবার ঠকিয়েছি। বাজার থেকে ধরে এনে গেরস্থ বাড়ির বৌ বলে চালিয়েছি। বলেছি, স্বামী নেয় না অথবা অভাবে এই পথে নেমেছে—এইসব বানিয়ে বানিয়ে বলেছি। আমার কথা বিশ্বাস করেছে ও। দু'দশ টাকা বেশিই দিয়েছে। সেদিনও এমনি এক গেরস্থ বাড়ির বৌয়ের খবর পেলাম। সত্যিই নাকি দারুণ অভাবে পড়েছে। যে লোকটি খবর দিয়েছিল তার সঙ্গে ব্যবস্থাও পাকা করে ফেললাম। গেরস্থ বাড়ির বৌ। তাই তার বাড়ি যাওয়া চলবে না। ঠিক হল ডাকাতবিলের ওই পাটক্ষেতে বৌটি লুকিয়ে বসে থাকবে। আর, এদিকে মহেশ গিয়ে ওখানে হাজির হবে। মহেশের সঙ্গে তখনও কথা হয় নি আমার। কিন্তু আমি জানতাম গেরস্থ বাড়ির বৌয়ের ওপর ওর যেমন লোভ তাতে ওকে আমি ঠিকই রাজি করাতে পারবো। সেইমত সকালে ওর বাড়ি গেলাম খবর দিতে। গিয়ে শুনলাম সে বাড়ি নেই। ভাবতে ভাবতে যখন ওর বাড়ি থেকে ফিরছি, তখন তরণী নস্করের সাথে রাস্তায় দেখা। সে তখন শহরে চলছিল আদালতে হাজিরা দিতে। তরণীর সাথে মহেশের মামলার কথা আমি জানতাম। তাই ভাবলাম আদালতে নিশ্চয়ই দেখা হবে তার সঙ্গে।

আর্শেদালি থামতেই ভবদেব প্রশ্ন করে, তারপর?

—তারপর আর কি, স্যার? আদালতেই দেখা পেলাম তার। খবরটা শুনেই এককথায় রাজি হয়ে গেল। আদালত থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে গেল মহেশ। আমিও সঙ্গে গেলাম। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে বিকেল নাগাদ একটা রিক্সা চেপে আমি আর সে রওনা হলাম ডাকাতবিলের দিকে। আমার পাওনা গণ্ডা আমি আগেই আদায় করে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। গাঁয়ের কাছাকাছি এসে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে হাঁটাপথ ধরলাম আমরা। রাস্তায় লোকজন ছিল না। সেই পাট-ক্ষেতের কাছে এসে দেখতে পেলাম জমির আলের ওপর একজন স্ত্রীলোক বসে আছে। টানা ঘোমটায় মুখ দেখতে পাইনি তার। তবে কাপড় চোপড় দেখে গেরস্থ বাড়ির বৌ বলেই মনে হল। আমরা গিয়ে পৌঁছতেই বৌটি উঠে দাঁড়াল। মহেশ আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বৌটির পেছন পেছন গিয়ে ঢুকলো পাটক্ষেতে। আর আমিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম।

আর্শেদালি থামতেই ভবদেব জিজ্ঞেস করেছিল, এর বেশি আর কিছু জানো না তুমি?

—আজ্ঞে না, স্যার। আল্লা কসম, আর কিছু জানি না আমি।

—যে লোকটি তোমাকে ওই বৌটির খবর দিয়েছিল সে কে?

—আজ্ঞে স্যার, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ আর্শেদালির।

—কি নাম তার?

—আজ্ঞে স্যার, সে এই লাইনের লোক নয়। বৌটির বিপদের কথা শুনে তাকে কেবল সাহায্য করতে চেয়েছিল সে। তা'ছাড়া—

কথার মাঝখানেই কড়া সুরে ভবদেব বললে, বলই না তার নামটা!

—পরাণ সামন্ত। মহেশের প্রতিবেশী।

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল ভবদেবের। ওই পরাণই না সেদিন মহেশের কথা বলতে বলতে কতবার চোখের জল মুছেছিল? পরাণকেই কাকা বলে ডাকতো মহেশ। ওর মেয়ের বিয়েতেই মহেশ বিনা সুদে দু'হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। মহেশের চরিত্র নিয়ে কথা বলতে

বলতে কতই না দুঃখ করেছিল পরাণ। সেই পরাণই কিনা শেষে জেনে-শুনে একটি গৃহস্থবধূর সর্বনাশ করার ব্যবস্থা করেছিল?

ভবদেব আরও বুঝতে পেরেছিল, গৃহস্থবধূ বলে কথিত সেই বৌটি নিশ্চয়ই এই খুনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু কেন? তবে কি তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল? কিন্তু কে করেছিল, পরাণ?

প্রথমটায় পরাণ কিন্তু সবটাই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আর্শেদালির নাম শুনে আর স্বীকার না করে পারেনি। কিন্তু তার মুখ থেকে সেই গৃহস্থ বধূটির পরিচয় কিছুতেই বের করা যায়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল ভবদেব। কঠিন লোক পরাণ। থানায় এনে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও সেই স্ত্রীলোকটির পরিচয় বের করা যায়নি। ভবদেব ইতিমধ্যে খবর নিয়ে জেনেছিল যে, সেই দু'হাজার টাকা তখনও মহেশকে শোধ করেনি পরাণ। নিরুপায় ভবদেব অবশেষে গ্রহণ করেছিল চরম ব্যবস্থা। কুস্তিগীর কনস্টেবল্ রামলক্ষ্মণ চৌবের হেপাজতে মাত্র মিনিট কয়েক ছেড়ে দিয়ে তারপর যখন পরাণকে আবার নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল ভবদেব তখন মুখ দিয়ে কাতর শব্দ বের হচ্ছিল পরাণের।

পরাণ সামন্ত স্বীকার করেছিল সব কথা। সে নিজেই যে গাঁয়ের সুবল শীল ও জীবন বাগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মহেশকে হত্যা করেছিল সেকথাও স্বীকার করেছিল। হত্যার কারণ ঐ দু'হাজার টাকা। টাকার দায় থেকে রেহাই পাবার জন্যেই ঐ পথ বেছে নিয়েছিল পরাণ।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সেই গৃহস্থবধূটির অভিনয়। হ্যাঁ, অভিনয় ছাড়া আর কি? আসলে সত্যিকারে কোন গৃহস্থবধূই সেখানে যায়নি সেদিন। জীবন বাগ নামে সেই ষোল-সতের বছরের ছেলেটাকেই টাকার লোভ দেখিয়ে স্ত্রীলোকের বেশে সেখানে পাঠিয়েছিল পরাণ।

গ্রেপ্তার হবার পর জীবনও স্বীকার করেছিল সব কিছু। পাটক্ষেতের মধ্যেই ধারালো অস্ত্র হাতে লুকিয়ে বসেছিল সুবল শীল আর পরাণ নিজে। উন্মত্ত মহেশ স্ত্রীলোকবেশী জীবন বাগের দিকে হাত বাড়াতেই মুখে একটা শব্দ করে উঠেছিল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে সুবল ও পরাণ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহেশের ওপর।

এমনিভাবেই মহেশ খাস্তগীর নিজের কামনার আগুনের ইন্ধন যোগাতে গিয়ে নিজেই পুড়ে মরলো। পরাণের ব্যবহৃত টোপ মুখে পুরে তার হাতেই নিহত হল নিষ্ঠুরভাবে।

দেশের আইনে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণই মূল্যহীন, আদালত তা' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। পুরো তিনটি দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে সত্য উদঘাটন করতে সমর্থ হলেও ঐ স্বীকারোক্তির সাহায্যে তাদের আদালতে অভিযুক্ত করতে পারে না ভবদেব। এর জন্য চাই আরও সাক্ষ্য প্রমাণ। আর তা' জোগাড় করা আরও দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু দুরূহ বলেই হাল ছেড়ে দিলে চলে না। মার্ডার কেস্—খুনের মামলা। তদন্তের প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে চিন্তা-ভাবনা করে। হিসেব করে প্রতিটি জিনিস লিখতে হবে ডাইরীতে। একচুল এদিক-ওদিক হলেই ভেস্তে যাবে সব। 'বেনিফিট্ অব ডাউট্'-এ খালাস পাবে আসামীরা, ব্যর্থ হয়ে যাবে সমস্ত পরিশ্রম।

মাত্র তিনদিনে যে সত্য প্রকাশিত হল, তা' আদালতে প্রমাণ করবার জন্যে মালমশলা জোগাড় করতে পুরো তিনমাস সময় লেগেছিল ভবদেবের। নিখুঁত তার সাক্ষ্য প্রমাণ

সংগ্রহের পদ্ধতি, নিটোল তার মামলা গড়ে তোলার ক্ষমতা। তাই বলে মিথ্যে কথা কোনদিনই সে লেখে না ডাইরীতে। বিশেষ করে মার্ডার কেসে তো নয়ই—যে মার্ডারের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। ভবদেব ভালমতই জানে, মিথ্যে কখনও আদালতে গিয়ে ধোপে টেঁকে না। তাই একমাত্র সত্যের সাহায্যেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এর অন্যথা হলে মানুষ বিচারকের কাছে হয়ত সে দায়ী হবে না, কিন্তু বিচারকেরও যিনি বিচারক আছেন তাঁর কাছে তাকে দায়ী হতেই হবে। সেখানে অন্ততঃ কোন ভুলচুকের অবকাশ নেই।

সাংবাদিক হিসেবে এই মহেশ হত্যা মামলার সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম আমি। আদালতের বিচারপর্বও সম্পূর্ণ 'কভার' করেছিলাম। রাজসাক্ষী হয়েছিল সেই ষোল-সতের বছরের ছেলে জীবন বাগ। আদালত মুক্তি দিয়েছিল তাকে। কিন্তু পরাণ ও সুবল শীলের যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল। প্রতিদিনের বিচারের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করে উৎসাহী পাঠকদের কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছিলাম আমি।

মামলার রায় যেদিন বেরোয় সেদিন সন্ধ্যায় থানায় এসে বড়বাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলাম, ডাইরেক্ট এভিডেন্স ছাড়া কেবলমাত্র সারকাম্‌স্ট্যানসিয়াল্‌ এভিডেন্সের ওপর নির্ভর করে এরকম একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আসামীদের চরম শাস্তি হয়ে গেল, এটা সত্যিই অভিনব, বড়বাবু।

কোন মন্তব্য না করে ভবদেব কেবল একটু হেসেছিল।

—জানেন বড়বাবু, সংবাদ পরিবেশনের গুণে সংবাদপত্রের আইন আদালতের পাতায় এই মহেশ হত্যা মামলা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছিল।

—ও, আমার মুখে নিজের গুণগান শুনতে চাইছ বুঝি? সংবাদ পরিবেশনের কৃতিত্ব? কথাটা বলেই একটু জোরে হেসে উঠেছিল ভবদেব।

লজ্জিতকণ্ঠে আমি জবাব দিয়েছিলাম, না বড়বাবু। সংবাদ পরিবেশনটা যদি ভালো হয়ে থাকে, তা'হলে সেই সংবাদ সৃষ্টির কৃতিত্ব তো ষোলআনাই আপনার।

আমার দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠেছিল ভবদেব, তুমি ভাই একদিন সত্যিই একজন মস্তবড় সাংবাদিক হয়ে উঠবে। তাই তো তোমাকে সংবাদ প্রভাকর বলে ডাকি।

৷৷ পাঁচ ৷৷

সাদার সঙ্গে ম্যাচ করে কালো রঙ। আর, খাকীর সঙ্গে লাল।

রাজধানী কলকাতার পুলিশ কনস্টেবলের পোশাক সাদা মাথার ক্যাপ কালো। আর, অবশিষ্ট পশ্চিমবাংলার কনস্টেবলের পোশাক খাকী রঙের। মাথার ক্যাপ লাল। সেকালে কনস্টেবলের মাথায় ক্যাপ ছিল না, ছিল পাগড়ী। কিন্তু পাগড়ীর যুগ আর নেই, যদিও 'লালপাগড়ী' বলতে এখনও পুলিশকেই বোঝায়।

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে কনস্টেবলের মাথা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে লাল পাগড়ী। অবশিষ্ট বাংলা পাগড়ী বর্জন করেছিল অনেকদিন আগেই—সেই স্বাধীনতার পরেই। শহর কলকাতা কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে পারে নি পাগড়ীর মায়া। মাত্র সেদিন সেই লালপাগড়ী বিসর্জন দিয়ে আমদানী করেছে কালো ক্যাপ—যার সরকারী নাম ব্যারেট্‌ ক্যাপ।

থানার বাঙালী কনস্টেবল্ অভয়পদ হালদার খাকী পোশাক পরে ব্যারাক থেকে থানার দিকে আসবার পথে লাল রঙের ব্যারেট ক্যাপটা পরে নেয় মাথায়। তারপর এসে দাঁড়ায় মেজবাবু অমিতের সামনে।

—তুমি রেডি হয়ে এসেছো? প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতে নিতে প্রশ্ন করে অমিত।

—হ্যাঁ স্যার।

—তা'হলে চল।

—কোথায় যেতে হবে স্যার?

—মনসাতলা। চুরি কেসের তদন্তে। জবাব দেয় অমিত।

অভয়পদ আবার বললে, আমি বরঞ্চ এগোই স্যার, আপনি তো সাইকেলে যাবেন।

—না, একত্রে হেঁটেই যাবো। সাইকেলটা সারাতে দিয়েছি দোকানে।

মুখখানা কেমন যেন ম্লান হয়ে ওঠে অভয়পদর। আসলে, একটু ধূমপানের ইচ্ছা হয়েছিল তার। ভেবেছিল রাস্তায় একা যেতে যেতে ঐ কাজটা সেরে নেবে। কিন্তু মেজবাবুর সঙ্গে যেতে হলে তা' আর হবার নয়। বয়সে বড় হলেও কনস্টেবল্ হয়ে দারোগার সামনে ধূমপান করা অন্যায়।

অমিতের পিছু পিছু থানা থেকে রাস্তায় নেমে এসে মাথার ক্যাপটা একপাশে একটু কাত করে ঠিক করে নেয় অভয়পদ। ওটা এখন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার। কিছুক্ষণ পর পরই দু'হাত দিয়ে মাথার ক্যাপটা ঠিক করে না নিলে কেমন যেন একটু অস্বস্তি লাগে।

নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা। লালপাগড়ীর স্থলে ক্যাপের আগমন শুধুমাত্র নির্ঝঞ্ঝাটই নয়, অর্থ-সাশ্রয়কারীও বটে।

হ্যাঁ, সেকালে পাগড়ী মাথায় পরতে পয়সাও কিছু খরচ হত বৈকি! অত বড় লম্বা লাল রঙের কাপড়ের ফালিটা তো আর যখন-তখন খুলে ফেলে আবার প্রয়োজনের সময় মাথায় বাঁধা চলতো না। আর সেই সময়ই বা কোথায়? একটা পাগড়ী তৈরি করা মানে আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিটের ধাক্কা। তাই রেডিমেড পোশাকের মত রেডিমেড পাগড়ী তৈরী করে রাখা হত সেকালে। প্রয়োজনের সময় গোটা পাগড়ীটা মাথায় চেপে বসিয়ে দিলেই হল। এই রেডিমেড পাগড়ী তৈরি করা একদিকে যেমন ছিল শ্রমসাধ্য, অন্যদিকে ঠিক তেমনই সাংঘাতিক যন্ত্রণাদায়ক। যে মাথায় ঐ পাগড়ী বাঁধা হবে সেই মাথাটা অন্তত পরের দু'তিন দিন বিষের টুকরো হয়ে থাকবে। সোজা কথায়, লাল কাপড়ের সাহায্যে মাথার সঙ্গে কুস্তি করতে হত। ওই যন্ত্রণার হাত এড়াতে সেকালে কনস্টেবলরা পয়সার বিনিময়ে অন্যের মাথা কিনত। কুস্তি হত সেই কেনা মাথার সঙ্গে। অবশেষে পাগড়ী তৈরি হয়ে গেলে সেটা আল্‌গা খুলে নিয়ে পরত নিজের মাথায়। আর মাথার মালিক মুক্তি পেয়ে ট্যাকে পয়সা গুজে নিজের মাথা নিয়ে সরে পড়ত।

শহরের একটা অঞ্চলের নাম মনসাতলা। ওই মনসাতলার যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর বাড়িতেই আগের দিন রাতে চুরি হয়েছিল। ধড়িবাজ চোর। তক্কে তক্কে ছিল বোধহয়। তাই ঠিক বিয়ের একদিন আগে সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে বিয়ের জন্যে কেনা নতুন থালা-বাসন, গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড় নিয়ে উধাও হয়েছিল।

ভোররাতেই থানায় ঢুকে বুক চাপড়ে হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে উঠেছিল যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। ধার দেনা করে কন্যা সুলতার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কেনাকাটা সব শেষ। আর মাত্র একটি দিন বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই এতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল তার। এখন সে কি করবে? কোথায়

যাবে? ছেলের বাপ যেরকম কৃপণ প্রকৃতির তাতে মুখের কথায় কিম্বা ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে সে যে তার পুত্রকে বিয়ের আসরে এনে হাজির করবে, তেমন সম্ভাবনা একেবারেই নেই বললেই চলে। তবে, এখন উপায়?

সকাল আটটা নাগাদ অমিত থানায় ঢুকতেই ডিউটি অফিসার এ-এস্-আই, শ্রীপতি মিত্র বলেছিল, এই যে মেজবাবু এসে গেছেন। একটা বার্গ্লারী কেস আছে। বলেই ফার্স্ট ইনফরমেশন্ রিপোর্ট বইটা এগিয়ে দিয়েছিল তার সামনে।

বইটার ওপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অমিত বলেছিল, তা'হলে আমিই যাচ্ছি তদন্তে। আপনি বরঞ্চ একজন কনস্টেবলকে ডেকে দিন, শ্রীপতিবাবু।

শ্রীপতিবাবু ডিউটি চার্ট দেখে ডেকে দিয়েছিল কনস্টেবল্ অভয়পদকে।

মনসাতলায় যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর বাড়িটা খুঁজে নিতে মোটেই অসুবিধা হয় না অমিতের। সেকেলে পুরনো বাড়ি—যজ্ঞেশ্বরের পিতামহের আমলের। চুণ-বালি খসে গিয়ে নোনাধরা ইট বেরিয়ে পড়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জীবের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা। অতবড় বাড়িটা তৈরি করবার পয়সা ছিল যজ্ঞেশ্বরের পিতামহের, কিন্তু সারিয়ে নেবার ক্ষমতা ছিল না তার উত্তরপুরুষের। সেকাল একালে প্রভেদ অনেক। সেকালে লোকজন দাস-দাসী, চাকর-বাকরে গম্‌গম্ করত গোটা বাড়িটা। জমিদারীর পয়সায় বজায় ছিল ষোলআনা ঠাঁট। একালে আর সেই জমিদারী নেই। জমিদারী তুলে দেবার সরকারি খেসারতের টাকা বসে বসে খেয়েই প্রায় শেষ করে ফেলেছে যজ্ঞেশ্বর। এখন কেবল থাকার মধ্যে সেই পৈতৃক বাড়িটা। বিষয়-জ্ঞান কোনকালেই টনটনে ছিল না যজ্ঞেশ্বরের। নইলে এই প্রকাণ্ড বাড়িটাই অল্প অল্প সংস্কার করে ভাড়াটে বসিয়ে পাকাপাকি একটা আয়ের ব্যবস্থা করতে পারত অনায়াসে। কিন্তু তা করেনি যজ্ঞেশ্বর।

বিষয়-জ্ঞান না থাকলেও আভিজাত্যের অভিমান ছিল তার অতিরিক্ত প্রখর। সেকালের ডাকসাইটে জমিদার বাড়িতে কিনা ভাড়াটে বসাবে! না, তা' কখনই নয়। ওই একই কারণে চাকরি-বাকরিতেও মন দেয়নি সে কোনদিন। ফলে, ভরা কলসীর জল দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল।

এদিকে মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? এককালে জমিদার ছিল বলে কেউ তো আর শুধু হাতে তার মেয়েকে পার করবে না?

অবশ্য, প্রায় বিনে পয়সায় সুলতার বিয়ে দেওয়া চলত। কিন্তু সেখানেও যজ্ঞেশ্বরের সেই একই আভিজাত্যের অভিমান। ব্রাহ্মণ হলেও সনাতন ভট্টাচার্যের বংশগৌরব বলে কিছু নেই। বংশপরম্পরায় তারা যজমানী করে এসেছে। সনাতন ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষ এককালে এই জমিদার বাড়িতেই যজমানী করেছে। সনাতন অবশ্য হালে গুরুগিরি করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। অনেক ধনী শিষ্য তার। তাই বলে বংশগৌরবহীন সেই সনাতনের ছেলে নিরঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে সুলতার? নিরঞ্জন ছেলেটি অবশ্য খারাপ নয়। দেখতে শুনতে ভালই। কলেজে পড়ে। পুরনো দিনের চেনাজানার সূত্র ধরে প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসত। সেদিন অবশ্য যজ্ঞেশ্বর ধারণাই করতে পারেনি যে, ইতিমধ্যে ঐ নিরঞ্জনই তার কন্যা সুলতার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। ছেলেটার মনে মনে যে এই দুর্বুদ্ধি, তা' সেদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যজ্ঞেশ্বর। তাই যেদিন সনাতনের কাছ থেকেই বিয়ের প্রথম প্রস্তাব এল সেদিন ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তার। এককথায় খারিজ করে দিয়েছিল সেই প্রস্তাব।

কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পেরেছিল, সে ছাড়া বাড়ির প্রায় সকলেই ঐ ছোঁড়াটার দিকে। এমনকি পাত্রীর মা পর্যন্ত নিরঞ্জনকে জামাতারূপে পেতে উন্মুখ। আর পাত্রী সুলতা ঐ ছোঁড়াটাকে মনে মনে পতিত্বেই বরণ করে নিয়ে বসে আছে।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিল যজ্ঞেশ্বর। কি, এত বড় কথা? পূজারী বামুন সনাতন ভট্টাচার্যের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে সুলতার? অসম্ভব!

প্রথমেই প্রচণ্ড বাক্যবাণে যজ্ঞেশ্বর জর্জরিত করে ফেলেছিল নিজের স্ত্রীকে। স্বামীর যুক্তিহীন বাক্যস্রোতের সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে নি সেই মহিলা। অবশেষে যজ্ঞেশ্বর সুলতাকে নিয়ে পড়ল। কেঁদে-কেটে সুলতা দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে তুলল। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর অটল। দক্ষযজ্ঞই হোক, আর রাজসূয় যজ্ঞই হোক যজ্ঞের খোদ মালিক যজ্ঞেশ্বর অবিচল। পত্নীর অনুরোধ, কন্যার চোখের জল টলাতে পারল না তাকে।

বিরক্ত হয়ে স্ত্রী বলেছিল, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?

—হ্যাঁ হবে। মেয়ে যখন হয়েছে তখন তার বিয়ে তো দিতেই হবে। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল যজ্ঞেশ্বর।

—কিন্তু দেবে কি দিয়ে শুনি? এদিকে তো নুন আনতে পান্তা ফুরায়। টাকার জোগাড় করেছ?

—সে চিন্তা তোমায় করতে হবে না। সময় মত সবই যোগাড় হবে।

স্ত্রী আর বেশি কিছু বলেনি। কেবল বলেছিল, আজকালকার ছেলেমেয়ে ওরা, নিজেরা যদি দেখে শুনে বিয়ে করে ক্ষতি কি? এখন কি আর আমাদের দিনকাল আছে যে, কানা হোক, খোঁড়া হোক, বাপ মা যার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে তাকেই চোখ বুজে বরণ করে নিতে হবে?

একটু ঠাট্টার সুরে বলেছিল যজ্ঞেশ্বর, তাই বুঝি শুভদৃষ্টির সময় তুমি চোখ বুজে ছিলে? তা' পরে চোখ মেলে কি দেখলে? নিশ্চয়ই একটা কানা কিম্বা খোঁড়াকে দেখনি!

—আহা, কী কথার ছিরি! দিনে দিনে যেন লজ্জাসরমও ভুলে যাচ্ছো।

এর পর সত্যি সত্যি যজ্ঞেশ্বর সুলতার জন্যে পাত্রের খোঁজ করতে আরম্ভ করল। অবশেষে একটি পাত্রও জুটল। এদিকে মেয়েকেও তীক্ষ্ণ নজরে রাখতে আরম্ভ করল সে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তার চোখ এড়িয়ে নিরঞ্জন মাঝে মাঝেই দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগল সুলতার সঙ্গে।

একদিন নিরঞ্জন হাতে নাতেই ধরা পড়ে গেল যজ্ঞেশ্বরের কাছে। কঠিন সংযমে নিজেকে সংবরণ করে যজ্ঞেশ্বর কেবল শান্তকণ্ঠে বলেছিল নিরঞ্জনকে, দেখ বাবা, তোমার বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি আমি। সুলতার জন্যে অন্য পাত্রের সন্ধান করছি। একটা প্রায় ঠিকই হয়ে গেছে। কাজেই এই সময় তোমার সঙ্গে সুলতার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল।

লজ্জায় একেবারে মরমে মরে গিয়েছিল নিরঞ্জন। কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে সে কেবল বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

নিরঞ্জন চলে যেতেই সুলতার ওপর খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিল যজ্ঞেশ্বর। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল, আর যেন কোনদিন তোকে ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে না দেখি। এই বলে রাখলুম, আজ থেকে তোকে সব সময় দোতলায় থাকতে হবে। নীচে নামতেই পারবি না।

সুলতার টানা টানা চোখ দু'টোয় অশ্রুর বন্যা নেমেছিল সেদিন। ওপরের দাঁতের পাটি দিয়ে নীচের ঠোঁটের একটা কোণ কামড়ে ধরে সে দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

কথাবার্তা একরকম ঠিক। বিয়ের দিনও স্থির হয়ে গেছে। এবার কিন্তু সত্যি সত্যি মুশকিলে পড়ে গেল যজ্ঞেশ্বর। টাকা কোথায়? ছেলের বাপ যে ধরনের কৃপণ প্রকৃতির তাতে হয়ত বিয়ের আসরে বসেই মেয়ের গায়ের গহনার ওজন দেখে নিতে চাইবে।

অগত্যা নিরুপায় যজ্ঞেশ্বরকে বাধ্য হয়েই ধনী জ্ঞাতিদের দ্বারস্থ হতে হল। মনকে প্রবোধ দিয়েছিল, এরা তো তার আত্মীয়। এদের কাছে ধার দেনা করতে লজ্জার কোন কারণ থাকতে পারে না।

কেনাকাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজনও এসে পৌঁছেছিল। বাকি আত্মীয়েরা আসবে বিয়ের দিন সকালে।

বিয়েবাড়ির কাজকর্ম। সেদিন রাতে শুতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল যজ্ঞেশ্বরের। তবুও শেষরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার।

বিছানা ছেড়ে বাইরে এসেই কিন্তু তার চক্ষুস্থির। একি ব্যাপার? বাড়ির সদর দরজা খোলা কেন?

ত্রস্তপায়ে সে ছুটে গিয়েছিল দোতলায় সুলতার ঘরে। ঘরের একপাশে মশারির মধ্যে সুলতা গভীর নিদ্রামগ্ন। দরজা খোলা। আর ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা যাবতীয় জিনিসপত্র উধাও। তা'ছাড়া যে বাক্সটির মধ্যে সোনার গহনাপত্র ছিল সেই বাক্সটিও অদৃশ্য।

সেই মুহূর্তে যজ্ঞেশ্বরের মনে হয়েছিল যেন প্রকাণ্ড ঐ বাড়িটার গোটা ছাদটাই হুড়মুড় শব্দে ভেঙে পড়েছিল তার মাথায়।

তড়িতাহত ব্যক্তির মত শূন্যদৃষ্টিতে কেবল ঘরেরর মধ্যে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল সে। নড়াচড়া কববার ক্ষমতাও যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার। সম্বিৎ ফিরে পেতেই নিজের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

যজ্ঞেশ্বর মুহ্যমান, বাড়ির আত্মীয়-স্বজনেরা বিমূঢ় আর পাড়া-প্রতিবেশীরা বিস্মিত। এমন সর্বনাশও মানুষের হয়। বিয়ের সবকিছু প্রস্তুত। মাঝে মাত্র একটি দিন বাকি। এর মধ্যেই এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল!

দিশেহারা যজ্ঞেশ্বর ছুটছিল পাত্রপক্ষের বাড়ি। শঙ্কার সাথে মনের এক কোণে একটু আশার আলোও লুকিয়ে ছিল। হয়ত পাত্রের বাবা সব কথা শুনে একেবারে নির্দয় নাও হতে পারে। বিপদগ্রস্ত পাত্রীর পিতার অবস্থা বুঝে কোন একটি ব্যবস্থায় রাজি হতে পারে।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিমুখ হতে হল তাকে। পাত্রের এই চশমখোর বাপ প্রথমেই ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। তারপর একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, দেখুন মশাই, আমি এক কথার মানুষ। আপনি কি জোগাড় করেছিলেন, আর আপনার কি চুরি গেছে তা' নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। আপনার সঙ্গে যা' কথাবার্তা হয়েছিল সেইমত ব্যবস্থা না হলে আমি নাচার। আপনার মেয়েকে ঘরে আনতে পারবো না আমি।

অগত্যা যজ্ঞেশ্বর বলল, তা'হলে আপনি বরঞ্চ বিয়ের তারিখটা আরও মাসখানেক পিছিয়ে দিন। দেখি যদি একমাসের মধ্যে কোন একটা ব্যবস্থা করে উঠতে পারি—

একটু বিদ্রূপের হাসি জেগে ওঠে পাত্রের পিতার ঠোঁটের কোণে। বললে, ও, তা'হলে আরও মাসখানেক সময় নেবার জন্যেই আপনার এই চুরির গল্প?

—গল্প? বলেন কি আপনি? আমি মিথ্যে বলছি আপনার কাছে? বিয়ের সবকিছু কেনা-কাটা হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয়-স্বজনেরা পর্যন্ত কেউ কেউ এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু কাল রাতে বাড়িতে চোর ঢুকে—

কথাটা শেষ করতে পারলে না যজ্ঞেশ্বর। তার আগেই ঠোঁট কামড়ে ধরে চোখের জল সংবরণ করতে চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। এর চাইতে অপমান আর কি হতে পারে? সেকালের ডাকসাইটে জমিদারের বংশধর যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী মিথ্যেবাদী! মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে উঠতে না পেরে অবশেষে সে কিনা চুরির গল্প বলতে এসেছে এই লোকটির কাছে! লোকটি তাই মনে করলে তাকে? ছিঃ—ছিঃ, এর চাইতে যে মরে যাওয়াও ঢের ভাল। কন্যাদায়গ্রস্ত বলে এতখানি অপমান সহ্য করতে হবে?

একমুহূর্ত থেমে পাত্রের পিতা বললে, দেখুন মশাই, অনির্দিষ্টের পিছু পিছু ছুটতে আমি রাজি নই। আগামীকাল বিয়ে। আমার তরফেরও সবাইকে খবর দেওয়া শেষ হয়েছে। ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ। এখন এসে আপনি এসব কথা বলছেন। যাই হোক, সময়-টময় আমি দিতে পারব না। কাল যখন বিয়ে হচ্ছেই না, তখন আর সাতদিন পরে যে তারিখটা আছে ঐ তারিখেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি পারেন ভাল, নইলে আমার হাতে আরও একটি ভাল পাত্রী আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ তারিখেই বিয়ের ব্যবস্থা করব। এই আমার শেষ কথা শুনে রাখুন।

শূন্যদৃষ্টি নিয়ে পথে এসে দাঁড়ায় যজ্ঞেশ্বর। অসম্ভব, মাত্র সাতদিনের মধ্যে এত টাকা কে দেবে তাকে? যাদের কাছ থেকে আগেই ধার নিয়েছিল তাদের কাছে গিয়ে আবার হাত পাততে পারবে না কিছুতেই।

স্খলিত পদে যজ্ঞেশ্বর যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন অমিত তার প্রাথমিক তদন্ত প্রায় শেষ করে ফেলেছে।

তাকে দেখেই অমিত বললে, এই যে আসুন, আমার কাজ শেষ হয়েছে। আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করব বলেই অপেক্ষা করছিলুম।

যজ্ঞেশ্বরের মুখখানা থমথমে। প্রত্যাখ্যানের বেদনার সঙ্গে অসহায়তার গ্লানি মিশে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল করে তুলেছিল তাকে। একটু সময় যুবক অমিতের দিকে তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ দু'পা এগিয়ে যায় সে। তারপর তার একখানা হাত চেপে ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, পারবেন, পারবেন দারোগাবাবু, আমার চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করতে পারবেন? মাত্র সাতদিন সময় পেয়েছি। এই সাতদিনের মধ্যে উদ্ধার করে দিতে পারবেন সবকিছু? বলুন দারোগাবাবু, কথার জবাব দিন। শুনতে পাই ইচ্ছে করলে আপনারা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। মিনতি করছি আপনাকে, এই কন্যাদায় থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি চিরদিন—চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবো আপনার কাছে। বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে ওঠে তার। কয়েক ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অমিতের হাতের ওপর।

বিচলিত হয় অমিত। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার এই আকুল আবেদন প্রচণ্ড বেগে নাড়া দেয় তার সংবেদনশীল মনটাকে। চরম বিপদের মুখে একটি মানুষ সাহায্য চাইছে। তার মুখ থেকেই শুনতে চাইছে আশার বাণী। কিন্তু অমিত কি বলবে তাকে? কতটুকু সাহায্য করতে পারবে?

অমিত তদন্তকারী পুলিশ অফিসার। মানুষের বিপদের দিনে তাকে সাহায্য করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে পারে মাত্র। বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে প্রতিটি সূত্র ধরে নিখুঁত তদন্ত করতে পারে

কেবল। কিন্তু সাফল্য যে করায়ত্ব হবেই, তার নিশ্চয়তা কোথায়? অপহৃত ধন সম্পদ উদ্ধার করার গ্যারান্টি কি সে দিতে পারে? চিকিৎসক যেমন মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করে মাত্র, জীবনের গ্যারাণ্টি দিতে পারে না, তেমনি পুলিশও প্রাণপণ চেষ্টার বেশি কিছু করতে পারে না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে থানায় ফিরে আসে অমিত। প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে ফিরছে সে। কিন্তু তেমন কোন আশার আলো ফুটে ওঠেনি তার চোখের সামনে। এমন কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি যার সাহায্যে আরও অগ্রসর হতে পারে। এখন কেবল একমাত্র ভরসা সহরের দাগী ক্রিমিন্যালগুলো। ওদের মধ্যে কেউ যদি এই চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে হয়ত কিছু খোঁজ-খবর মিললেও মিলতে পারে। আর কোন ফরেন্ গ্যাং অর্থাৎ বাইরের কোন অপরাধীর দল যদি এর মধ্যে থেকে থাকে তবে খুবই মুশকিলের ব্যাপার।

থানার ও.সি. ভবদেব ব্যানার্জীর ঘরে ঢুকতেই ভবদেব স্মিত হেসে অমিতকে বললে, বার্গলারী কেসের তদন্ত করে ফিরলে? সূত্র পেলে কিছু?

ভবদেবের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে অমিত জবাব দেয়, না বড়বাবু, কিছুই পাই নি। বলেই যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর বিপদের কথা সবিস্তারে জানায় তাকে।

দু'টি সংবেদনশীল মনের ভাব-ভাবনা অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের মত পরস্পরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। একের কাতরতা অন্যকেও বিষণ্ণ করে তোলে। অমিতের কথা শুনে ভবদেব শান্তকণ্ঠে বললে, সত্যিই, ভারি বিপদ তো ভদ্রলোকের। তা', কোন সূত্র পেলে না তুমি?

—না, বড়বাবু। জবাব দেয় অমিত।

—চোর ঢুকলো কি করে?

—সিঁদ কেটে। শাবল দিয়ে বাড়ির পুরানো ইট খসিয়ে সিঁদ তৈরি করে ঢুকছে।

—সিঁদ কেটেছে কোথায়?

—বাইরের বারান্দায়। একটা জানালার ঠিক নীচেই।

—তাহলে চোর ঐ সিঁদ দিয়ে ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় চলে গিয়েছিল?

—দেখে তো তাই মনে হল, বড়বাবু।

—কিন্তু দোতলায় যে ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি গেছে, সেই ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল না? কে শুয়েছিল সেই ঘরে? কিছু টের পায়নি সে?

—যজ্ঞেশ্বরবাবুর মেয়ে সুলতা শুয়েছিল ঐ ঘরে। তবে সে কিছুই টের পায়নি।

—তা'হলে চোর ঐ ঘরে ঢুকলো কি করে?

একটু থেমে জবাব দেয় অমিত, আমার মনে হয় ওপরে উঠে অন্ধকারের মধ্যে চোর অপেক্ষা করছিল। শেষরাতে সুলতা নাকি একবার বাইরের বাথরুম গিয়েছিল। সেই অবসরে বোধহয় চোর ঘরে ঢুকে লুকিয়ে ছিল। পরে সুলতা ঘুমিয়ে পড়লে জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়ে।

একটু চিন্তা করে ভবদেব। তারপর অনেকটা নিজের মনেই মন্তব্য করে, তা' অবশ্য সম্ভব। তুমি সুলতাকে ভালমত জিজ্ঞেস করেছিলে?

—হ্যাঁ বড়বাবু, কিন্তু সে জবাব দিয়েছিল, বাথরুম থেকে ফিরে এসে সে নাকি সন্দেহজনক কিছু টের পায়নি। নিশ্চিন্ত মনে দরজা বন্ধ করে আবার শুয়েছিল।

—ঐ ঘরের দরজা ভালমত পরীক্ষা করেছিল?

—হ্যাঁ, ভেতর থেকে খিল এঁটে দিলে বাইরে থেকে কিছুতেই খোলা সম্ভব নয়।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ভবদেব। গভীরভাবে চিন্তা করে কিছু। তারপর বললে আবার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিছুই পাওয়া যায়নি?

—না, বড়বাবু।

—তা'হলে তো খুব সতর্ক ক্রিমিন্যাল বলতে হবে। নিজের মনেই মন্তব্য করে ভবদেব। তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করে, সিঁদটা কতবড়?

—মাঝারি আকারের। একটা লোক দিব্বি গলে যেতে পারে ভেতর দিয়ে।

—সিঁদের বাইরে কিম্বা ভেতরেও কোন পায়ের ছাপ ছিল না?

—না বড়বাবু, সিঁদের বাইরের দিকে আর ভেতরের দিকে দুই প্রান্তেই প্রচুর ভাঙা ইটের টুকরো আর ইটের গুঁড়ো জমা করা ছিল। ইটের টুকরোর ওপর পায়ের ছাপ পড়ে নি।

—দুই প্রান্তেই ইটের গুঁড়ো? হঠাৎ বেশ জোরেই উৎসাহিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ভবদেব।

ভবদেবের এই হঠাৎ উৎসাহের কোন কারণ খুঁজে পায় না অমিত। সে শুধু জবাব দেয়, হ্যাঁ, বড়বাবু।

আবার কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে ভবদেব। তারপর আবার প্রশ্ন করে, সিঁদের পাশের জানলাটা কি খোলা ছিল?

—হ্যাঁ।

—জানালায় কি লোহার গরাদ?

—না, সেকেলে বাড়ি। মোটা কাঠের গরাদ।

—বেশ মজবুত জানালা?

—না, পুরনো বাড়ি। এককালে মনে হয় খুবই মজবুত ছিল এখন জলে ভিজে উইয়ে খেয়ে খারাপ হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভবদেব প্রশ্ন করে, সুলতার বিয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছিলে কিছু?

—না বড়বাবু। শুধু এইটুকু জানি, আগামীকাল তার বিয়ে হবার কথা ছিল।

—কোথায়?

—এই শহরেরই দক্ষিণ পাড়ার এক ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে।

—আর কিছু খোঁজ নাও নি?

—না।

একটু থামে ভবদেব। একচিলতে হাসি তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। শান্ত দৃষ্টিতে অমিতের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে আবার বললে, বুঝলে ভাই, থিওরিটিক্যাল আর প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে তফাৎ আছেই। সদ্য পুলিশ ট্রেনিং কলেজ থেকে পাশ করে এসেছো। ক্রিমিনোলজি সাবজেক্টও ভালো করে পড়েছো নিশ্চয়ই। তবুও হাতে-কলমে এখনও অনেক কিছু শেখবার আছে। যাক, এখনই তুমি আবার বেরিয়ে পড়। ঐ মেয়েটির বিয়ে সম্বন্ধে আর তার প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব খবর জোগাড় করে নিয়ে এসো। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেই সঠিক খবর পাবে। আমার মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা গোলমাল আছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ভবদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে অমিত বললে, আমি এখনই যাচ্ছি, বড়বাবু। কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনার মনে সন্দেহ হল কেন।

হেসে ভবদেব বললে, বলবো—বলবো। পরে বলবো। তুমি আগে খবর নিয়ে এসো। তারপর সবকিছু বুঝিয়ে বলবো। তখন দেখবে, একে একে দুইয়ের মত সমস্ত ব্যাপারটাকেই বাঁধা ছকে ফেলা যায়।

ঘণ্টাদু'য়েক পরে হন্তদন্ত হয়ে থানায় প্রবেশ করেই অমিত সোজা গিয়ে ঢোকে ও-সি'র ঘরে।

—কি অমিত, কি খবর? উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর ভবদেবের।

—আশ্চর্য বড়বাবু, সাংঘাতিক আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। বলেই অমিত সনাতন ভট্টাচার্য আর তার ছেলে নিরঞ্জন সম্বন্ধে যাবতীয় খবর গড়গড় করে বলে যায়।

—তাই নাকি? কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের সুর ভবদেবের। বললে, এতক্ষণে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছি।

আর যেন ধৈর্য রাখতে পারে না অমিত। বলে ওঠে, আপনার কি অনুমান ঐ নিরঞ্জন এই চুরির মধ্যে আছে?

—নিশ্চয়। সেই সঙ্গে ঐ মেয়েটিও।

—কিন্তু কি করে অনুমান করলেন?

—অতি সহজে। বলেই একটা সিগারেট ধরায় ভবদেব। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকে, দেখ অমিত, চোর সিঁদ কাটে বাইরে থেকে। মাটির ঘরেই সিঁদ কাটুক কিংবা পাকা বাড়িতেই সিঁদ কাটুক সিঁদের ফোকরের ইট কিংবা মাটি জমা হবে বাইরে, ভেতরে নয়। চোর যদি একবার সিঁদ গলে ভেতরে যেতে পারে তবে সে সেখানে বসে আবার ইট তুলবে কেন? সে তো তখন ঘরের দরজা খুলে দেবে। দলের লোকেরা দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকবে। তাই, সিঁদের দু'প্রান্তেই ইটের টুকরোর কথা শুনেই আমার মনে হয়েছিল ওটা বোধহয় আসল সিঁদ নয়। পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্যেই ওর সৃষ্টি। আসলে চোর ঢুকেছিল অন্য পথে। তারপর তুমি যখন বললে, জানালায় ছিল কাঠের গরাদ, তখন ঐ সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। যেখানে উইয়ে ধরা দু'টো কাঠের গরাদ কেটে চোর অনায়াসেই ভেতরে ঢুকতে পারে, সেখানে এত মেহনত করে ইট সরিয়ে সিঁদ কাটতে যাবে কেন?

প্রশংস দৃষ্টিতে ভবদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অমিত। এতদিন ভবদেব ব্যানার্জী সম্বন্ধে কেবল শুনেই এসেছিল, আজ সত্যি সত্যি তার ঘটনা বিশ্লেষণের অপূর্ব শক্তি সম্বন্ধে হাত-কলমে প্রমাণ পেল। এমন একটি অফিসার সত্যিই ডিপার্টমেন্টের গৌরব।

—তা'হলে চোর ঢুকলো কি করে? জিজ্ঞেস করে অমিত।

—দরজা দিয়ে। জবাব দেয় ভবদেব।

—দরজা খুলে দিয়েছিল সুলতা নিজে?

মাথা নেড়ে সায় দেয় ভবদেব।

—আর, চোর হচ্ছে নিরঞ্জন?

—ঠিক তাই। তবে নিরঞ্জন ভদ্রলোকের ছেলে। সে নিজে যে এসেছিল মনে হয় না। বোধহয় এই শহরেরই কোন দাগী ক্রিমিন্যালকে নিয়োগ করে থাকবে। সেই ব্যাটাও এমন একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল। বোধ হয় বিয়ে বন্ধ করার আর কোন উপায় না থাকায় এই পথ অবলম্বন করেছিল নিরঞ্জন।

—কি ভয়ানক ব্যাপার!

—কিছুই ভয়ানক নয় অমিত, একটু হেসে ভবদেব বলতে থাকে, প্রেমের পথ এমনিতেই একটু কঠিন। নিজের ভালবাসার পাত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার চাইতে এই পথ ধরেই বিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল সেই নিরঞ্জন। তবে ছেলেটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কি বলো?

—এই জন্যে সে এতটা রিস্ক নিয়েছিল?

আবার একটু হাসে ভবদেব। ঠাট্টাচ্ছলে জবাব দেয়, এরা সব এ যুগের নওজোয়ান, নয়া রোমিও। এর চাইতেও কঠিন কাজ করতে এরা প্রস্তুত।

একটু ভেবে নিয়ে অমিত আবার বললে, তা'হলে নিরঞ্জনকে এবার এ্যারেস্ট করতে হয়, বড়বাবু?

—হ্যাঁ, তা হয়। তবে চট্ করে এ্যারেস্ট করো না। তাতে জুলিয়েট অর্থাৎ সুলতা মেয়েটার মনে আঘাত লাগতে পারে। হয়ত মনের দুঃখে আত্মহত্যাই করে বসবে। তার চেয়ে ওকে থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করো। হয়ত এখনও কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করা যেতে পারে।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় নিরঞ্জনকে থানায় নিয়ে আসা হল। ছেলেটি তেমন উগ্রপ্রকৃতির নয়। কিন্তু অমিতের প্রশ্নের জবাবে একটি কথাও স্বীকার করলে না। বললে, হ্যাঁ. সুলতাকে আমি ভালবাসি কিন্তু ওই চুরির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

অমিতের প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মত অবস্থা। যে কিছুই স্বীকার করছে না, তাকে দিয়ে কি করে স্বীকার করানো চলে?

অবশেষে স্বয়ং ভবদেব জেরা আরম্ভ করলে। কিন্তু কঠিন ছেলে নিরঞ্জন। কিছুতেই সে চুরির কথা স্বীকার করলে না। মনুষ্যচরিত্রে অদ্ভুত জ্ঞান ভবদেবের। তাই অন্যপথ ধরলে সে। বললে, দেখ নিরঞ্জন, ভদ্রলোকের ছেলে তুমি। এই শহরে তোমার বাবার প্রচুর সম্মান। তোমাকে আমরা এখনও এ্যারেস্ট করিনি। কিন্তু এখন যদি এ্যারেস্ট করি, তা'হলে তোমার বাবার সম্মান কোথায় থাকবে বলতে পারো? আমি কথা দিচ্ছি, এ্যারেস্ট করবো না তোমাকে। কিছুই হবে না তোমার। যাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছো তার নামটা শুধু বলে দাও। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

নিরঞ্জন কিন্তু তবুও অনমনীয়। তার মুখে কেবল সেই একই কথা, আমি কিছু জানি না।

আবার একটু চিন্তা করে ভবদেব। তারপর নিরঞ্জনেরর দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে বললে, আচ্ছা নিরঞ্জন, একটি সত্যি কথার জবাব দাও তো! সুলতাকে তুমি ভালবাসো, সেও ভালবাসে তোমাকে, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দেয় নিরঞ্জন।

তোমার বাবা শহরের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। তুমিও দেখতে-সুনতে খারাপ নও। পয়সা-কড়িও আছে তোমাদের। যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর পাল্‌টি ঘর তোমরা। তবে কেন যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী মশাই তোমাদের বিয়েতে আপত্তি তুলেছিল?

একটু সময় চুপ করে থেকে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় নিরঞ্জন, পাল্‌টি ঘর হলেও সুলতার বাবা মনে করেন আমাদের নাকি তেমন বংশ গৌরব নেই। তাই তাঁর এত আপত্তি।

—শুধু কি তাই?

—হ্যাঁ, যতদূর শুনেছি, এটাই একমাত্র কারণ।

—তোমাদের বিয়েতে তোমার বাবার মত আছে?

—হ্যাঁ আছে। তিনিই তো প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন। এমনকি সুলতার মাও আমাদের বিয়েতে রাজি ছিলেন।

—তা'হলে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র চক্রবর্তী মশাইয়ের এতে আপত্তি?

—হ্যাঁ, একমাত্র তাঁর।

—আচ্ছা নিরঞ্জন, আমি যদি তাকে বলে-কয়ে রাজি করাতে পারি?

হঠাৎ চমকে ওঠে নিরঞ্জন। বললে, পারবেন—পারবেন আপনি তাঁকে রাজি করাতে? কণ্ঠে আগ্রহের সুর তার।

চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু তোমাকে সেই লোকটির নাম বলতে হবে।

নিরঞ্জন একবার তাকায় ভবদেবের মুখের দিকে। তাকে বিশ্বাস করা চলে কিনা তাই বোধহয় মনে মনে চিন্তা করে। তারপর আবার বললে, আপনি কথা দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি?

আবার একটু চিন্তা করে নিরঞ্জন। মনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় তার মুখে। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে সোজা ভবদেবের দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে বললে, হ্যাঁ, আমিই এই কাজ করিয়েছি গঙ্গা পাল নামে একটা লোককে দিয়ে। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, এছাড়া কিছুতেই বিয়ে বন্ধ করতে পারতাম না আমি।

—গঙ্গা পাল! কে সে? প্রশ্ন করে অমিত।

—সেকি, শোনো নি গঙ্গা পালের নাম? ভট্টাচার্যি পাড়ার সেই দাগী আসামী গঙ্গা পাল? বললে ভবদেব।

—ও—হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে।

সেই রাতেই এ্যারেস্ট হল গঙ্গা পাল। দাগী আসামী। প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। অবশেষে নিরঞ্জনের স্বীকারোক্তির কথা শুনে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়। অবশ্য, পালোয়ান কনস্টেবল্ রামলক্ষ্মণ চৌবের উপস্থিতি তার স্বীকারোক্তিতে অনেকটা সাহায্য করেছিল। অতীতে দু'একবার রামলক্ষ্মণের শক্তির পরীক্ষা হয়েছিল গঙ্গা পালের ওপর।

গঙ্গা পালের খবরের ওপর নির্ভর করে পরের দিন খুব সকালেই হরিহর কর্মকারের বাড়ি ও দোকান খানাতল্লাশি করেছিল অমিত। স্যাকরার কাজ করে হরিহর। সেই সঙ্গে চোরাই সোনার গহনা বেচা-কেনা। যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির চুরি যাওয়া সমস্ত গহনা পাওয়া গেল তার বাড়িতে। অল্প সময়ের মধ্যে সে ওইগুলো গলিয়ে ফেলতে পারেনি। নগদ টাকা কিছুই পাওয়া গেল না। কেবল গঙ্গা পালের বাড়ি থেকে কিছু কাপড়-চোপড় আর নতুন থালা-বাসন উদ্ধার করেছিল অমিত।

ওইদিনই বিকেলে থানায় ডাক পড়েছিলল যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর ও সনাতন ভট্টাচার্যের।

পড়ি কি মরি করে থানায় এসে হাজির হল যজ্ঞেশ্বর সুখবরের আশায়। কিন্তু অমিতের পরিবর্তে খোদ ভবদেব ব্যানার্জীর কথায় দমে গেল কিছুটা।

ভবদেব বললে, না, এখনও চোরাই মাল উদ্ধার করতে পারিনি। তবে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

—সেকি? ম্লান মুখে প্রশ্ন করে যজ্ঞেশ্বর, তবে যে শুনলুম, কোন্ এক স্যাকরার বাড়ি থেকে নাকি সমস্ত গহনা উদ্ধার করেছেন আপনারা?

—না, ভুল শুনছেন আপনি। গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভবদেবের।

ঠিক এই সময় আমি থানায় প্রবেশ করতেই ভবদেব বলে ওঠে, এই যে সংবাদ-প্রভাকর, এসে গেছো!

—হ্যাঁ, বড়বাবু। জবাব দিই আমি। শুনলুম হরিহর স্যাকরার বাড়ি থেকে নাকি কিছু চোরাই গহনা উদ্ধার করেছেন আপনারা?

একটা হালকা ধরনের হাসি হেসে আমার দিকে ইশারা করে ভবদেব বললে, কোথায় পেলে এসব গাঁজাখোরি খবর? তারপর একটু ঠাট্টার সুরের আবার বললে, এই না হলে

সাংবাদিক! কোথায় খবর পেলে, চিলে কান নিয়ে পালালো, আর অমনি ছুটলে চিলের পেছনে! আরে ভাই, সত্যিই যদি উদ্ধার করতে পারতুম তো এই ভদ্রলোকের একটা সত্যিকারের উপকার করা হত। বলেই যজ্ঞেশ্বরকে দেখিয়ে দেয় ভবদেব।

ভবদেবের ইশারায় আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকি আমি। বুঝতে পারি কোন একটা গভীর উদ্দেশ্যে ভবদেব ব্যাপারটা চেপে যেতে চাইছে।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জনের বাবা সনাতন ভট্টাচার্যও এসে হাজির হয়েছে থানায়। তারপর আরম্ভ হয় ভবদেবের বাক্‌চাতুরি।

ওদের কথাবার্তার ধরনে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে চুপ করে বসে থাকি আমি। অমিতও সেখানে উপস্থিত। সেও কিছু না বলে কেবল শুনতে থাকে ওদের আলোচনা।

দেখতে দেখতে বড়বাবুর কক্ষটি একটি প্রজাপতি অফিসে পরিণত হয়।

যজ্ঞেশ্বর প্রথমটায় গররাজি, পরে নিমরাজি, অবশেষে পুরোপুরি রাজি হয়ে যায়। নিরঞ্জনের সঙ্গে সুলতার বিয়েতে সম্মত হয় সে। তবে, একটি সর্ত তার। চোরাই মাল উদ্ধার করে দিতে হবে। কন্যা সুলতাকে কেবলমাত্র শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে বিয়ের আসরে সে আনতে পারবে না কিছুতেই। অপহৃত সোনার গহনা উদ্ধার করে দিতেই হবে।

একবাক্যেই স্বীকৃত হয় ভবদেব। একটু স্মিত হাসি হাসে অমিত। আমিও উপভোগ করতে থাকি ব্যাপারটা।

মিষ্টান্নং ইতরে জনাঃ। পরের তারিখেই নিরঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুলতার। থানার অফিসাররা সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেই সূত্রে আমিও ইতরজনের মধ্যে গণ্য হয়েছিলাম।

যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে খেতে বসে ভবদেব আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিহে সংবাদ-প্রভাকর, বার্গলারি কেসটা কেমন, বলো তো?

জবাব দিয়েছিলাম, অদ্ভুত—চমৎকার! এরকম বার্গলারি কেস যদি প্রতিদিন একটি করে হত তো—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভবদেব কৃত্রিম ধমকের সুরে বলেছিল, চুপ কর, দুর্মুখ কোথাকার! রোজ একটি করে বার্গলারি কেস হোক আর আমার ক্রাইম চার্ট ভারি হয়ে উঠুক, তাই না?

মধুরেণ সমাপয়েৎ হলেও গঙ্গা পাল ও হরিহর কর্মকারের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা মধুময় হয়ে ওঠে নি। তারা কিন্তু যথারীতি আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল।

॥ ছয় ॥

যতই দেখছি ততই বিস্ময় বোধ করছি। থানার বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জীকে যেন আজও ঠিকমত চিনে উঠতে পারছি না।

তদন্তকারী অফিসার হিসেবে তার ক্ষমতা কিম্বা পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত। সারা জেলা জুড়ে তার সুনাম। ব্যবহারেও অত্যন্ত অমায়িক। কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পারি নিজের এলাকা সম্বন্ধে সে শুধু ওয়াকিবহালই নয়, এলাকার জনসাধারণের ওপর সত্যিকারের একটা দরদ আছে তার। সে দরদ মেকি নয়, কিম্বা স্বার্থ-কলুষিতও নয়। সে দরদের পশ্চাতে কাজ করছে

একটা মানবিক প্রেরণা, একটা অসাধারণ কর্তব্যবোধ। জনসেবার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তিই হয়ত সেই প্রেরণার উৎস।

এত গুণের অধিকারী হয়েও কিন্তু তার একটি মাত্র কলঙ্ক। সে অর্থলিপ্সু। না, ঠিক অর্থলিপ্সু বলতে যা' বোঝায়, ভবদেব ব্যানার্জী তা' নয়। উপরি আয়ের জন্যে সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। অর্থের বিনিময়ে অপরাধীর অপরাধ স্খালনে সে কোনদিনই সহায়তা করে না। সেখানে সে কঠিন, কঠোর। এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি নেই সেখানে। কিন্তু তবুও সে বে-আইনী কাজ করে। পুলিশ অফিসার হিসেবে বিচারকের সামনে অপরাধীকে হাজির করাই তার কাজ। কিন্তু সময় সময় বিচারকের দায়িত্বও সে তুলে নেয় নিজের কাঁধে। এটা বে-আইনী। শুধু বে-আইনী নয়, ঘোরতর অপরাধ। জেনে-শুনেই তেমন অপরাধ মাঝে-মধ্যে করে বসে ভবদেব।

সেদিন অর্থের বিনিময়ে হরচাঁদ সিংয়ের অপরাধ স্খালনে সহায়তা করেছিল সে। না, নিজের জন্যে নয়, কানুর মা আর তার ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়েই এই বে-আইনী কাজটা করেছিল ভবদেব। ভেবেছিল, আদালতে গেলে হরচাঁদ সিংয়ের হয়ত জেল হবে। কিন্তু কানুর মা'র তাতে লাভ কি? তার চাইতে তাকে যদি কিছু টাকা-পয়সা পাইয়ে দিতে পারে তবে সেই দুঃস্থ বিধবার সুবিধাই হবে। এই মনোভাব নিয়েই সেদিন সে হরচাঁদ সিংকে বাধ্য করেছিল কানুর মাকে দু'হাজার টাকা দিতে। কৃতকার্যও হয়েছিল। টাকা হাতে পেয়ে মৃত পুত্রের দুঃখ হয়ত খানিকটা ভুলে গিয়েছিল সেই বিধবা। ঠিক সেই মুহূর্তে নিজের কথা চিন্তাই করেনি ভবদেব। কিন্তু কৃতজ্ঞ হরচাঁদ সিং যখন পাঁচখানা একশ' টাকার নোট ভবদেবের হাতে তুলে দিয়েছিল, তখন কিন্তু অম্লান বদনে তা' গ্রহণ করতে মোটেই বাধে নি তার। ভবদেবের বিশ্বাস, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা মূর্খতারই নামান্তর। আইনের বিচারে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই বে-আইনী। আর এটাই ভবদেবের একমাত্র কলঙ্ক।

এই খবরটা কিন্তু চাপা থাকেনি। থানার অনেকেই টের পেয়েছিল ব্যাপারটা। এমন কি বাইরের লোক হয়ে আমিও জানতে পেরেছিলাম।

সেদিন, অমিতের বাসার চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে বসে এই আলোচনাই হচ্ছিল আমাদের।

আমি বললাম, সত্যিই, অদ্ভুত চরিত্রের ব্যক্তি তোমাদের এই বড়বাবু। আজও তাকে ঠিকমত চিনতে পারিনি। এত গুণ ভদ্রলোকের, কিন্তু শুনতে পাই ঐ একটি মাত্র দোষেই নাকি—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মৃদু হেসে অমিত বললে, ওটা ভাই চাঁদের কলঙ্ক।

—সেকি! বিস্ময় প্রকাশ পায় আমার কণ্ঠে, তুমি কি ভবদেববাবুর এমনি কাজ সমর্থন কর নাকি?

আবার একটু হাসে অমিত। তারপর বললে, আমার সমর্থন অসমর্থনে কি আসে যায়?

বুঝতে পারি অমিত আমার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তাই তাকে প্রশ্নের মাধ্যমে চেপে ধরি আমি। বলি, এড়িয়ে গেলে চলবে না, আমার কথার জবাব দাও। তুমি কি সমর্থন কর ভবদেববাবুকে? তার এই নীতিবহির্ভূত অর্থোপার্জনকে কি তুমি ঘৃণা কর না?

একটু সময় চুপ করে থাকে অমিত। তারপর ধীরে ধীরের জবাব দেয়, হ্যাঁ, করি, মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। এবং ঘৃণা করি বলেই বড়বাবু সম্পর্কে এসব কথা যখন কানে আসে তখন দুঃখ পাই। কিন্তু তবুও তাকে আমি শ্রদ্ধা করি একমাত্র তার গুণের জন্যে।

জবাব দিই আমি, অস্বীকার করছি না যে ভবদেববাবুর যথেষ্ট গুণ আছে। কিন্তু তাই বলে তার এই দোষ ঢাকা পড়ে না কিছুতেই।

অমিত আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বললে, দেখ ভাই তরুণ, তোমরা অর্থাৎ জনসাধারণ আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মনে কর। এখানে—

অমিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলি, না, তা' নয়। তোমাদের সবাইকে আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মনে করি না। তবে একটা অংশ যে এই দোষে দোষী, তা' নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পার না তুমি!

—তা' অবশ্য পারি না। তবে ক্ষোভের কথা কি জান, তোমাদের কাছে সব সময়েই মুড়ি-মুড়কির এক দর।

—তার মানে?

—এই বড়বাবুর কথাই ধর না। পয়সার দিকে তার নজর থাকলেও সে নির্বিচারে অর্থোপার্জন করে না। আমি যতদূর জানি, মামলা নষ্ট করে সে কোনদিন পয়সা আয় করে না। সেক্ষেত্রে সে সাংঘাতিক কঠিন। কিন্তু বিচার করার সময় তোমরা তার নামও সাধারণ অসৎ অফিসারের তালিকায় তুলে দাও। আমার দুঃখ সেখানেই।

এবার একটু শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে আমি বলি, অসৎ এর মধ্যে আবার সাধারণ অসাধারণ আছে নাকি? আর থাকলেও জনসাধারণের তা' জানবার সুযোগ কোথায়?

—সুযোগ হয়ত নেই। কিন্তু বিচারের সময় একটু সাবধানে তলিয়ে বিচার করাই কি ভাল নয়? এই তোমারর কথাই ধর না, তুমি বড়বাবুকে ভালমতই জান, তুমিও কি তাকে ঐ দলে ফেলবে? তা' ছাড়া—

—তা' ছাড়া কি? প্রশ্ন করি আমি।

ম্লান হাসি হেসে অমিত জবাব দেয়, আমাদের দেশে একটা কথা আছে না—যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও সহ্য করা চলে। কিন্তু যে দেয় না, তার আদরও অসহ্য লাগে।

—তাই বলে অন্যায়কে সমর্থন করব? প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠি আমি।

—না, অন্যায়কে সমর্থন করতে বলছি না, অন্যায় চিরকালই অন্যায়। এই আমাদের পিনাকীবাবুর কথাই বলছি। পিনাকীবাবুর সততা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার কোন সন্দেহ নেই?

স্বীকার করি আমি। বলি, না, তা' নেই। সত্যিই সে সৎ। কোথাও গিয়ে এক কাপ চা পর্যন্ত খায় না বলেই শুনেছি।

জবাব দেয় অমিত, ঠিকই শুনেছো। একটু উগ্র-সৎ অফিসার পিনাকীবাবু।

হেসে উঠি আমি। বলি, উগ্র-সৎ বস্তুটি কি, ভাই?

অমিতও হেসে জবাব দেয়. অত্যধিক সৎ আর সেই সঙ্গে যার সততার গর্বও আছে. তাকেই আমি বলি উগ্র-সৎ প্রকৃতির।

—হ্যাঁ, সৎ অফিসার বলে তার সত্যিই গর্ব আছে। স্বীকার করি আমি।

—আর, এই পিনাকীবাবু কি ধরনের অফিসার তা বোধহয় তোমার জানতে বাকি নেই?

—না, তা' নয়। অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। কাজের কথা শুনলেই নাকি তার গায়ে কাঁটা দেয়। মুখে সর্বদাই রাজা-উজির মারে, আর কাজের বেলায় ঢু-ঢু।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটাকে একটু ঠেলে সরিয়ে রেখে অমিত বললে, এমন নিষ্কর্মাক ধাড়ী অলস অথচ সৎ অফিসার আর কর্মক্ষম, পারদর্শী, বুদ্ধিমান, কিন্তু পয়সার

দিকে কিছুটা নজর আছে এমনি একজন অফিসার—এই দু'জনের মধ্যে কে বেশি জনগণের কাজে আসতে পারে, বলতে পার?

এতক্ষণে অমিতের সেই দুধাল গরুর লাথির উপমাটা মনে পড়ে আমার। বুঝতে পারি থানার বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জী আর পিনাকী সরকার, এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলছে অমিত।

ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য নয়। যুক্তির সাহায্যে ভেবেচিন্তে কাকে গ্রহণ করে কাকে বর্জন করব তা' বিবেচনা করা সত্যিই সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তর্কে হেরে যেতে রাজি নই আমি। তাই তাড়াতাড়ি জবাব দিই, তোমার সেই দুধাল গরুর লাথির উপমায় আমার আর একটা প্রচলিত কথা মনে পড়ে গেল ভাই—দুষ্ট গরুর চেয়ে কিন্তু শূন্য গোয়ালও ভাল।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে গরু কতটা দুষ্ট এবং তার দুধের পুষ্টি ও মিষ্টত্ব তার দুষ্টুমিকে ছাপিয়ে যেতে পারে কিনা তা'ও বিবেচনা করা দরকার, কি বল?

কথা বলতে বলতে অমিত তার হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই বলে ওঠে, ইস্, দেরি হয়ে গেছে। এক্ষুণি একবার থানায় যেতে হবে।

—কেন, কোন ভারি মামলার তদন্তে বেরোবে নাকি? প্রশ্ন করি আমি।

—না, মামলার তদন্ত নয়। গ্যাম্বলিং রেইডে যেতে হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি হেসে বলি, নাঃ, তোমাদের জ্বালায় জুয়াড়িরা একটু মনের সুখে নিজের পয়সায় জুয়ো খেলতেও পারবে না দেখছি!

পোশাক পরতে পরতে অমিতও মুখ টিপে হেসে বলল, তা' বটে। আমরা কেবল দেশের শান্তিরক্ষকই নই, জনসাধারণের নৈতিক চরিত্ররক্ষকও বটে!

রাস্তায় যেতে যেতে আমি আবার প্রশ্ন করি অমিতকে, একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না ভাই। আমাদের দেশে জুয়ো খেলা বে-আইনী কেন? জুয়ো খেলায় লোকে নৈতিক চরিত্র হারায়, এটাই কি তার কারণ?

হেসে জবাব দেয় অমিত, না, তা' নয়। কথাটা আমি ঠাট্টা করে বলেছি। দেশের লোকের নৈতিক চরিত্র রক্ষার ভার ঠিক আমাদের ওপর নয়। আসলে জুয়োর আড্ডা মানে ক্রিমিন্যালের আড্ডা। জুয়ো খেলা অবাধে চলতে দিলে দেশে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে ওঠে। জুয়োর আড্ডায় হেরে গিয়ে তারা ক্রাইমের মাধ্যমে সেটা পুষিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। সোজা কথায় জুয়োর আড্ডায় যাতায়াতকারীর অপরাধের নেশা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। এই জন্যেই জুয়ো খেলা বে-আইনী। কথা বলতে বলতে থানার কাছে এসে পড়ি আমরা।

আমি আবার প্রশ্ন করি, জুয়ো খেলা যদি বে-আইনী হয়, তবে মদের দোকানে গিয়ে মদ খাওয়া বে-আইনী নয় কেন? মদের আড্ডাও তো বলতে গেলে সাধারণ ক্রিমিন্যালের আড্ডা। জুয়ো আর মদ—এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ তো নেই বললেই চলে।

চলতে চলতে জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসে অমিত।

আমি আবার প্রশ্ন করি, ওকি, হাসলে কেন? আমার কথার জবাব দাও।

অমিত তেমনি মৃদু হেসে বললে, আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আমাদের দেশে মদ খাওয়া বে-আইনী ঘোষণা করার স্বপক্ষে লোকের অভাব নেই। কিন্তু সরকারের পক্ষে তা' ঘোষণা করা সম্ভব নয়। কারণটা অবশ্য আর্থিক। মদের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স বাবদ সরকারের আয় হয়। মদ খাওয়া বে-আইনী ঘোষণা করলে মদের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যাবে। সরকারের আয়ও বন্ধ হবে। অবশেষে একদিন হয়ত দেখা যাবে বে আইনী চোলাই

মদে দেশ ভরে গেছে। কেবল মাঝখান থেকে ট্যাক্স বাবদ সরকারের আয়টাই বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এতবড় আর্থিক ঝুঁকি নিতে সরকার রাজি নয়।

—তা'হলে বলতে চাইছো, দেশের লোকের নৈতিক চরিত্র রক্ষার চাইতে ট্যাক্সের টাকাটাই হল বড়?

—বড়ই তো। সরকার পরিচালনা করতে হলে সরকারের আয়ের পথের দিকেও নজর দিতে হবে বৈকি। আর কেবল আইন তৈরি করে কি লোকের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করা চলে? তা'ছাড়া, মদ খেলেই যে লোকের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়, এ মতের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও নেহাত কম নেই।

—তা'হলে জুয়ো খেলার ওপর আইন এত কঠোর কেন?

—কারণটা অতি সহজ। রাস্তাঘাটে যে জুয়ো খেলা হয় তা' থেকে সরকারের কোনই আয় হয় না। কিন্তু যেখানে আয় হয়, সেখানে জুয়ো নিষিদ্ধ নয়। এই যেমন কলকাতার ঘোড়দৌড় কিম্বা বড় বড় সব লটারী। আসলে ওগুলো জুয়ো ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ও থেকে সরকারের মোটা ট্যাক্স আদায় হয় বলেই ওগুলো বে-আইনী নয়। দেশের সরকার মানে জনসাধারণকেই বোঝায়। সেই জনসাধারণের বৃহত্তর আর্থিক স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে সেইভাবেই আইনের সৃষ্টি, সেখানে নীতির চাইতে প্রয়োজনের কথাটাই সরকারকে বিবেচনা করতে হয় আগে।

একটু ঠাট্টার সুরে আমি বলি, তোমার মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি অমিত!

—কিসের পরিবর্তন?

—নীতির পরিবর্তন আর কি! আগে মনে হত, মদ খাওয়া কিম্বা জুয়ো খেলাকে তুমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে, কিন্তু—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অমিত বললে, এখনও ওগুলোকে ঠিক তেমনি ঘৃণাই করি। কিন্তু আমার মতে আইন তৈরি করে লোকের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করার কোন মানেই হয় না। ওটা মানুষের ভেতরের জিনিস। বাইরের দৃঢ় বন্ধনে ওকে রক্ষা করা একান্তই নিরর্থক। সুযোগ নেই, তাই আমি সৎ—এ ধরনের কথায় আমার শ্রদ্ধা নেই। প্রচুর সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও যে সৎ থাকতে পারে সে-ই খাঁটি। আমার মতে নৈতিক চরিত্রের পরীক্ষার সেটাই প্রশস্ত ক্ষেত্র।

আমি দাঁড়িয়ে পড়তেই অমিত বললে, একি, দাঁড়ালে কেন, থানায় যাবে না?

—না, ভাই। এখন আর থানায় গিয়ে কি হবে? তোমরা তো তোমাদের কাজে বেরিয়ে যাবে। থানায় বসে একা একা আমি কি করব? তা'ছাড়া একটু কাজও আছে। পারি তো সন্ধ্যার পর একবার এদিকে আসতে চেষ্টা করব।

আমি অন্য পথ ধরি, অমিত চলে যায় থানার দিকে।

ইংরেজি 'রেইড্' শব্দটির বাংলা অর্থ হল 'অভিযান'। গ্যাম্বলিং রেইড্ মানে জুয়োর আড্ডায় অভিযান।

পুলিশের কার্যধারার মধ্যে দুটো স্পষ্ট বিভাগ। একটা 'প্রিভেন্শন্' অর্থাৎ প্রতিরোধ। আর অন্যটি 'ডিটেক্শন্' অর্থাৎ প্রতিবিধান। সোজা কথায়, বসন্ত রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আগে থেকেই টিকা নেওয়া, আর বসন্ত রোগ আক্রমণ করলে চিকিৎসার মাধ্যমে

আরোগ্য লাভ করার মত ব্যাপার আর কি। সেই হিসেবে জুয়োর আড্ডায় অভিযান ঐ প্রতিরোধের পর্যায়ে পড়ে। বর্তমান যুগটাই হচ্ছে প্রগতির যুগ। সেকালের সেই ঢিলেঢালা ব্যবস্থা এখন আর নেই। সে যুগে পুলিশের নামেই হৃদকম্প হত অপরাধীর। এ যুগে আর তা' হয় না। এখন ক্ষেত্রবিশেষে সাধাবণ স্তরের ক্রিমিন্যাল্ পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবী করে বসে। আর, সেই দাবীকে মদত জোগাতেও লোকের অভাব হয় না। সেকালে যেমন পুলিশের প্রধান অস্ত্র ছিল 'ইন্টেলিজেন্স' অর্থাৎ খবর সংগ্রহ, একালেও তাই। কিন্তু এই প্রগতির যুগে অপরাধীর তরফেও ইন্টেলিজেন্স কলেক্শানের প্রথা চালু হয়েছে। পুলিশের ইন্টেলিজেন্সের ওপরে ক্রিমিন্যালের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স্। পুলিশ যেমন অপরাধীর গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে তেমনি বর্তমান যুগের অপরাধীরাও পুলিশের প্রচেষ্টা বান্চাল করে দিতে তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলে। পুলিশের গুপ্তচর যেমন অপরাধীর ওপর নজর রাখে, অপরাধীর গুপ্তচরও তেমনি নজর রাখে পুলিশের ওপর। সে যুগের একতরফা পুলিশী ব্যবস্থা আর নেই। এখন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি—বুদ্ধির লড়াই।

আজকাল সহরাঞ্চলের কোন গুপ্ত ঘাঁটিতে যখনই জুয়োরর আড্ডা বসে তখনই জুয়াড়ীদের গুপ্তচর ঘোরাফেরা করে থানার আশেপাশে। গ্যাম্ব্লিং রেইড্ একজনকে দিয়ে হয় না। এজন্যে কনস্টেবল্, অফিসার সমেত একটা বাহিনীর প্রয়োজন। সেই পুলিশ বাহিনী যখন সদলবলে কোথাও রওনা হয় সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ে ওঠে জুয়াড়ীদের গুপ্তচরের। তারা ছায়াব মত অনুসরণ করে তাদের। বেগতিক বুঝলেই খবর চলে যায় আড্ডায়। পুলিশ এসে যখন হাজির হয় তখন সব ফাঁকা।

তাই পুলিশকেও সতর্ক থাকতে হয় আজকাল। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এখন আর গ্যাম্ব্লিং রেইড্ হয় না। এমনকি দল বেঁধেও থানা থেকে বেরোয় না তারা। একে একে গুটি গুটি বেরিয়ে কোথাও গিয়ে একত্র হয়। সেখান থেকেই শুরু হয় আসল অভিযান।

কিন্তু তাতেও কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারা যায়? সাধারণতঃ জুয়োর আড্ডা এমন একটা জায়গায় বসে যেখানে যাবার রাস্তা মাত্র একটিই। আর সেই রাস্তায় ওৎ পেতে বসে থাকে জুয়াড়ীদের চেলাচামুণ্ডারা। পুলিশ দেখলেই তারা দৌড়ে আগেভাগেই গিয়ে খবর দেয় আড্ডায়। চোখের নিমেষে ফাঁকা হয়ে যায় আড্ডা। পড়ে থাকে কেবল দু'একখানা পোড়া মোমবাতি কিম্বা দু'চারখানা তাস।

পুলিশ-ভ্যানে চেপে দলবল নিয়ে থানার মেজবাবু অমিত ও দারোগা ধুর্জটি গাঙ্গুলী এসে যখন বড় রাস্তার মোড়ে নামে তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মত বয়স ধুর্জটির। বেশ লম্বা চওড়া গড়ন। চোখেমুখে স্পষ্ট সাহসের ছাপ। সত্যিই, সাহসী অফিসার ধুর্জটি। হয়ত একটু অতিরিক্ত সাহসী যা প্রায় গোঁয়ার্তুমির পর্যায়ে পড়ে।

'ইন্ফর্মার' অর্থাৎ গুপ্তচরটি আড্ডার খবরাখবর এবং যাওয়ার পথ-ঘাট সম্বন্ধে যাবতীয় খবর পুলিশকে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ইন্ফর্মার বরাবরই আড়ালে থাকে। প্রকাশ হয়ে পড়লেই তার বিপদ। জীবন সংশয়ও হতে পারে।

চারজন কন্স্টেবল আর দু'জন অফিসার শিকারী বেড়ালের মত নিশব্দে বড় রাস্তা থেকে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করে।

অন্ধকার অপরিসর রাস্তাটা সোজা চলে গেছে একটা বস্তির দিকে। ঐ বস্তির মধ্যেই বসেছে জুয়োর আড্ডা।

দু'একজন পথচারী ঐ সরু রাস্তায় হঠাৎ পুলিশ দেখে একটু ভড়কে গিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। মনে হাজারো প্রশ্ন—আবার কি হাঙ্গামা হুজ্জত হল রে বাবা! অসময়ে পুলিশ কেন এখানে?

একপাশে একটা চায়ের দোকান। রাস্তার ওপর একটা লম্বা বেঞ্চিতে বসে দু'তিনজন লোক চা খাচ্ছিল। পুলিশ দেখে ওদের মধ্যে এক ব্যক্তি অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়তে আরম্ভ করে।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে ধূর্জটি, ধর ধর, ওকে ধর। ওকে পালাতে দিও না।

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে লোকটা। আর পিছে পিছে ছুটছে সবাই। একটি ছিপছিপে বাঙালী কনস্টেবল তীরের মত ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির ওপর। মুহূর্তে দু'জনেই ধরাশায়ী।

এবড়ো-খেবড়ো গলিপথে ছুটতে গিয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নেয় অমিত। এইটুকু দৌড়েই হাঁফ ধরেছে তার। গা'টা কেমন যেন ঘিনঘিন করে ওঠে। চারিদিকে ময়লা আবর্জনা, কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

ধূর্জটির কিন্তু প্রচুর উৎসাহ। ছুটতে ছুটতে পেছনে তাকিয়ে সে বললে, আসুন মেজবাবু, দৌড়ে আসুন। ব্যাটারা বোধহয় টের পেয়েছে।

বাঙালী কনস্টেবলটি সেই লোকটাকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে টানতে টানতে নিয়ে যায় চায়ের দোকানের দিকে। ওখানেই তাকে বসিয়ে রাখতে হবে। আর বাকি তিনজন কনস্টেবল নিয়ে ধূর্জটি ও অমিত বস্তি অঞ্চলের নালা ডিঙ্গিয়ে এঁকেবেঁকে এসে হাজির হয় একটা খোলা জায়গায়।

ওখানেই একটা ঘরে জুয়োর আড্ডা। পাঁচ-ছ'জন লোক একটা মাদুরের চারিপাশে গোল হয়ে বসে জুয়ো খেলছিল। একখানা ইটের ওপর জ্বলছিল দু'টো মোমবাতি। মাদুরের একপাশে খুচরো পয়সা আর নোটের স্তূপ—যাকে বলা হয় 'বোর্ডমানি'।

পায়ের শব্দে লোকগুলো চমকে লাফিয়ে ওঠে। তড়িৎগতিতে তারা ঘরের অন্য একটি দরজার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু তার আগেই যমদূতের মত ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ধূর্জটি।

একজন কনস্টেবল্ এপাশ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, সাবধান স্যার, ওদের কাছে ছুরি-ছোরা থাকতে পারে।

কিন্তু সেই সাবধানবাণী উচ্চারিত হবার আগেই দু'তিনজন জুয়াড়ীকে জাপটে ধরে মাটিতে পড়ে যায় ধূর্জটি।

ইতিমধ্যে কে যেন মোমবাতি নিভিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার ঘরে ধস্তাধস্তির শব্দ। অমিতও চেপে ধরেছে একজন জুয়াড়ীকে। উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে তার।

অবশেষে টর্চের আলোয় দেখা গেল মাত্র চারজন জুয়াড়ীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে তারা। বাকি দু'জন পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে। নোট ও খুচরো মিলিয়ে শ' দুয়েকের মত টাকা আর দু'জোড়া তাস পাওয়া গেল সেই আড্ডায়।

আধঘণ্টাখানেক পর নিয়মমাফিক কাজকর্ম শেষ করে জুয়াড়ী চারজনকে নিয়ে পুলিশ বাহিনী যখন বাইরে এসে দাঁড়ায় তখন ধূর্জটির খেয়াল হয় তার বাঁ পায়ের হাঁটুতে দারুণ যন্ত্রণা।

অমিত টর্চের আলো ধূর্জটির হাঁটুর ওপর ফেলেই বলে ওঠে, একি ধূর্জটিবাবু, হাঁটু থেকে যে রক্ত ঝরছে আপনার

খুঁড়িয়ে চলতে চলতে একটু ম্লান হেসে ধূর্জটি অবসন্ন কণ্ঠে জবাব দেয়, ইটের উপর পড়ে গিয়েই থেঁতলে গেছে হাঁটুটা।

—সেকি মশাই, রক্তে যে পায়ের মোজা ভিজে উঠেছে আপনার। আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চলুন।

—না-না, তার দরকার নেই। এমনিই যেতে পারব আমি।

সহানুভূতির সুর ফুটে ওঠে অমিতের কণ্ঠে। বললে, এমনি ভাবে জীবন বিপন্ন করে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার কি প্রয়োজন ছিল?

তেমনি ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয় ধূর্জটি, কি আর হবে, মেজবাবু! আমার আবার জীবন! থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! চোখদুটো অকস্মাৎ ছল ছল করে ওঠে তার।

অমিত আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে চলতে থাকে। ধূর্জটির পারিবারিক জীবন তার অজানা নয়। মাঝে মধ্যেই কেমন যেন একটা হতাশার সুর বেজে ওঠে তার কণ্ঠে। ধূর্জটির সেই মন-নিংড়ানো হাহাকার ধ্বনি শ্রোতাদের মনকেও ব্যথিত করে তোলে।

বরাবরাই একটু ডানপিটে গোছের স্বভাব ধূর্জটি গাঙ্গুলীর। কিন্তু স্ত্রী সরমার স্বভাবটি ছিল ঠিক স্বামীর উল্টো—যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণী একটি। স্বামীর দুর্দান্তপনায় সর্বদাই সে থাকতো শঙ্কিত হয়ে। অনুরোধ করতো, উপরোধ করতো, অবশেষে মাথার দিব্যি দিয়ে ধূর্জটিকে নিজের গা-ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করাতো যাতে সে ইচ্ছে করে আর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়ে।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বিশেষ করে সেই সুন্দর মুখের অধিকারিণী যদি হয় নিজের স্ত্রী।

জয়ী হয়েছিল সরমাও। পুরো না হলেও আংশিক জয়ী তো বটেই। ধূর্জটি নিজের ডানপিটে স্বভাবের মুখে লাগাম বাঁধতে খানিকটা বাধ্য হয়েছিল ওই সরমারই পীড়াপীড়িতে।

কিন্তু সেই সরমা যেদিন প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অকালে সংসার ত্যাগ করে চলে গেল সেদিন ধূর্জটির কাছে সমস্ত জগৎ-সংসারটাই শূন্য বলে মনে হয়েছিল। স্ত্রীকে সত্যিই ভালবাসত সে। সেই অকালমৃত্যু উদভ্রান্ত-বিহ্বল করে তুলেছিল তাকে। আত্মীয়স্বজনরা বলেছিল, ঐ শূন্যস্থান অচিরেই পূর্ণ হবে। চেষ্টাও করেছিল তারা, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেনি। সরমার শূন্যস্থান দ্বিতীয় কোন নারীকে বসাতে রাজি হয় নি ধূর্জটি।

পুলিশের কাজ, রাতদিনের কাজ। সময় অসময় বলে কিছু নেই। রাতে সময়ে সময়ে ঘুমোবারও উপায় নেই নিশ্চিন্ত মনে।

সরমার মৃত্যুর পর দিনকয়েক মাত্র বিছানায় মুখ গুঁজে পড়েছিল ধূর্জটি। তারপরই একদিন ধরাচুড়ো পরে থানায় হাজির হয়ে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

এখন আর পিছুটান নেই। বাধা কিম্বা বন্ধন কিছুই নেই। সরমার স্মৃতি তার কাজের নিষ্ঠাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। যেন কাজের মধ্যেই ডুবে থেকে সে ভুলতে চেয়েছিল প্রিয়তমা স্ত্রীর বিয়োগ-ব্যথা। আর সেই সঙ্গে তার ডানপিটে স্বভাবটিও আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

যে কাজ করতে থানার অন্য অফিসারেরা দু'দশবার চিন্তা-ভাবনা করতো সেই কাজের ভারই নির্দ্বিধায় কাঁধে তুলে নিত ধূর্জটি। কেউ প্রশ্ন করলে একটু ম্লান হেসে সেই একই জবাব দিত—আমার আবার জীবন। থাকলেই বা কি! আর গেলেই বা কি!

আসলে একটা প্রচণ্ড অভিমানের জ্বালা অহরহ দগ্ধ করছিল তার মনটাকে। অভিমান সরমার ওপর, অভিমান বিশ্বসংসারের ওপর, অভিমান নিজের ওপর। এই অভিমানই নিজের

জীবনের ওপরও তাকে করে তুলেছিল উদাসীন। তাই যে কোন বিপজ্জনক কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে প্রস্তুত হয়েই থাকতো। যেন এইভাবেই সে প্রতিশোধ নিতে চাইতো সরমার ওপর।

যা কিছু অসুবিধা ছিল কেবল ঐ মা-মরা টুটুনকে নিয়ে। ছোট্ট মেয়েটিকে দেখাশোনা করতো ধূর্জটির এক বিধবা পিসি। কাজের শেষে ক্লান্ত দেহে ধূর্জটি যখন বাসায় ফিরে আসত, তখন সেই বৃদ্ধা পিসি টুটুনকে তার কোলে দিয়ে বলতো, এই নে তোর মেয়েকে, ওকে আর আমি সামলাতে পারি না।

গভীর স্নেহে মেয়েকে বুকে চেপে ধরতো ধূর্জটি। ছল্-ছল্ করে উঠতো তার চোখ দুটো। সেই মুহূর্তে তার মনে হত, একমাত্র এই মেয়েটার জন্যেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্ততঃ আরও কিছুকাল টিকে থাকতে হবে এই সংসারে। নইলে ওকে দেখবে কে?

দলবল নিয়ে থানায় ফিরে এল অমিত। সঙ্গে আহত ধূর্জটি।

ধূর্জটির আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠল অমিতের। জুয়াড়ীদের জন্যেই ধূর্জটির এই অবস্থা। পুলিশকে বিপাকে ফেলবার জন্যেই ব্যাটারা ইচ্ছে করে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। নইলে, ধূর্জটি হয়ত এমনি আঘাত পেত না।

অমিতের ইচ্ছে করছিল দু'চার ঘা বসিয়ে দিয়ে ওই জুয়াড়ী ব্যাটাদের একটু শিক্ষা দেয়। ঘুচিয়ে দেয় ওদের বজ্জাতি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয় সে। ওদের দোষ দিয়ে লাভ কি? বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা মানুষের সহজাত। ওরাও তাদের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিল মাত্র। ওরা জুয়াড়ী। অন্যায় জেনেও জুয়া খেলার নেশা কাটাতে পারে না ওরা। ঐ নেশার টানেই সারা সপ্তাহের রোজগার বাজি রেখে ওরা জুয়া খেলে। ধরা পড়ে জেলে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আবার জড়ো হয় জুয়ার আড্ডায়। জেলের কথা আর মনে থাকে না তখন।

সমাজের সব চাইতে আদি বৃত্তি বোধহয় গণিকাবৃত্তি, আদি নেশা সম্ভবতঃ মদ্যপান, আর আদি ক্রীড়া বোধকরি দ্যূতক্রীড়া যার একালের নাম জুয়া খেলা। এই তিন বস্তু অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে, আর ভবিষ্যতে টিকে থাকার সম্ভাবনাও প্রচুর। মানব সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে কেবল মাত্র এদের ভোল পাল্টায়। আসল বস্তু কিন্তু ঠিকই থাকে।

থানা ডিউটি মেজবাবু অমিতের।

বরাত ভালই বলতে হবে তার। বেলা বারোটায় এসে ডিউটি নিয়েছে। এখন পর্যন্ত তেমন কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়নি তাকে। ডাইরীর পাতায় দু'একটা ছোটখাট ঘটনার খবরাখবর লিপিবদ্ধ করা ছাড়া বাকি সময়টা চেয়ারে বসে বসেই কাটিয়েছে কেবল।

থানার পেটা ঘণ্টায় ঢং ঢং শব্দে চারটা বাজে। ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই কনস্টেবল্ বৈজু তেওয়ারী অমিতের সামনে এসে দু'পায়ের বুটজুতোর গোড়ালিতে শব্দ করে এ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললে, সেন্‌ট্রি ডিউটি বদল হুয়া, হুজুর।

অমিত মুখ তুলে বৈজুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, নিয়েছে কে?

—সোনাতন। জবাব দেয় বৈজু।

বৈজুর হিন্দী উচ্চারণে সোনাতন মানে সনাতন—কনস্টেবল্ সনাতন চক্রবর্তী।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। বলেই ডাইরীটা সামনে টেনে নেয় অমিত। তারপর একবার কনস্টেবলদের ডিউটি চার্টের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। বৈজুর পরে সনাতনেরই ডিউটি বটে।

থানায় অফিসার বলতে অমিত একা। অন্যরা কেউ নিজের কোয়ার্টারে, আর কেউ বা তদন্তে বেরিয়েছে। বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জীও তার বাড়িতে। বেলা দুটো পর্যন্ত থানায় কাজ করে সে বাড়ি গেছে। দুপুরের খাওয়া বিকেলে শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ আবার এসে বসবে থানায়। বাড়ি ফিরতে সেই গভীর রাত।

ডাইরীর পাতায় সেনট্রি ডিউটি বদলের খবরটা লিখছে অমিত। এইটাই রীতি। প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবরও লিপিবদ্ধ করতে হয় ডাইরীতে।

লেখাটা প্রায় শেষ করে এনেছে অমিত। এখন শুধু নিজের নাম সইটি বাকি। অকস্মাৎ থানার সামনে জেগে ওঠে হৈ চৈ। থানার বারান্দায় জনাকয়েক লোকের পায়ের শব্দ, আর সেই সঙ্গে একটা কুকুরের হিংস্র গর্জন।

অমিত বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দু'জন জোয়ান গোছের লোক একটা বিরাট এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুরকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে বারান্দায়। কুকুরটা কিন্তু উঠতে নারাজ। তার ক্ষুদ্র চোখদুটোয় জেগে উঠেছে ভয়ঙ্কর হিংস্রতা। লক্‌লকে জিভটা প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। তার হাবভাবে মনে হচ্ছে বাগে পেলে ওই লোকদুটোকে অনায়াসেই সে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু বড়ই বে-কায়দায় পড়ে গেছে। তাই আপাততঃ কিছুই করতে পারছে না। লোকদুটো তার গলার দড়ি দু'গাছার দুই প্রান্ত এমনভাবে টেনে ধরে আছে যে, ওদের নাগাল পাওয়া বাস্তবিকই শক্ত।

ওদের পেছনে পেছনে দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে একটি কুলী শ্রেণীর লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসে। লোকটির একটা পা রক্তাক্ত।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে এক মুহূর্ত সময় লাগে অমিতের। কোন বড়লোকের আদুরে কুকুর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কামড়ে দিয়েছে ঐ লোকটাকে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। পায়ে না কামড়ে ঐ বিরাট এ্যাল্‌সেসিয়ান যদি লোকটির কণ্ঠনালী কামড়ে ধরতো তা'হলে এতক্ষণে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত তার।

অনেক কসরৎ ও মেহনতের পর থানার বারান্দায় লোহার রেলিংয়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় কুকুরটাকে। তারপর, যেন যুদ্ধজয় করে ফিরছে, এমনি একটা ভঙ্গিতে লোকদুটো দলবল নিয়ে প্রবেশ করে থানার মধ্যে।

নিজের চেয়ারে বসতে বসতে অমিত কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই একজন অনুযোগের সুরে বলে ওঠে, দেখুন—স্যার, বড়লোকের সোহাগের কুকুরের কাণ্ডটা দেখুন একবার। আমরা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে ওকে হয়ত মেরেই ফেলত।

অমিত এবার লোকটির পায়ের ক্ষত ভাল করে দেখবার সুযোগ পায়। সাধারণ কুকুরের কামড় নয়। লোকটির পায়ের একখাবলা মাংস তুলে নিয়েছে এ্যাল্‌সেসিয়ানটা।

—কার কুকুর? প্রশ্ন করে অমিত।

—দত্ত সাহেবের।

—দত্ত সাহেব! তিনি আবার কে? ভ্রূকুঞ্চিত করে অমিত আবার প্রশ্ন করে।

—সান্যাল পাড়ার অজিতেশ দত্তর কুকুর, স্যার। রিটায়ার্ড এ্যাড্‌ভোকেট অজিতেশ দত্ত। ওই মোড়ের মাথার লাল বাড়িটার মালিক।

—কুকুরটা কি ছাড়া ছিল নাকি?

—হ্যাঁ, স্যার। একজন জবাব দেয়, এই লোকটি আমাদের দোকানের কাছেই থাকে। ও যখন দত্ত সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ কুকুরটা বাড়ির খোলা গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে ওর পায়ে কামড়ে ধরে। হুমড়ি খেয়ে ও পড়ে যায় রাস্তায়। ঠিক তখনই আমরা গিয়ে বাঁচাই ওকে। নইলে যে কি কাণ্ড হত—

—ওদের বাড়ি থেকে কেউ বেরোয়নি?

—না স্যার। কেউ আসে নি, বোধহয় দত্ত সাহেব কিম্বা তার মেয়ে কেউ-ই বাড়ি নেই। নইলে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আসতো। চাকর-বাকরেরা আমাদের ভয়ে বাইরে আসেনি বলেই মনে হল, স্যার।

—হ্যাঁ, ভয়টা অমূলক নয়, কি বলেন? হাতের কাছে পেলে কি ওদের দু'চার ঘা না দিয়ে ছেড়ে দিতেন আপনারা? একটু হেসে বললে অমিত।

লোকটি এবার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

আহত সেই লোকটি ততক্ষণে থানার মেঝেয় বসে পড়েছে। যন্ত্রণার চিহ্ন তার সারা মুখে।

—কি নাম তোমার?

—শিউপূজন। বিকৃত কণ্ঠে জবাব দেয় লোকটি।

—কোথায় থাকো?

—ঐ উধার—

—কি কাজ কর?

—কুলীকা কাম, বাবু।

—দেশ কোথায়?

—ছাপরা জিলা।

আইনের বইটা টেনে নিয়ে একবার উল্টে-পাল্টে দেখে নেয় অমিত। তারপর ফার্স্ট ইনফর্মেশন বইটা টেনে নেয় সামনে। মামলা রুজু করতে হবে কুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে।

লেখাপড়ার কাজ শেষ করে শিউপূজনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে একটু স্থির হয়ে বসে অমিত। করণীয় সবকিছু করা হয়ে গেছে তার। এখন সমস্যা ওই এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুরটাকে নিয়ে। হয় ওটাকে কারুর জিম্মায় দিতে হবে, নইলে পাঠাতে হবে অন্য কোথাও।

থানার বারান্দায় থেকে থেকে গর্জন করতে থাকে কুকুরটা। আর নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে পাহারাদার কনস্টেবল্ সনাতন জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যে নানা ধরনের শব্দ করে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি চাকর শ্রেণীর ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে এসে হাজির হয় থানায়।

মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তর্জন-গর্জন বেড়ে ওঠে কুকুরটার। মেয়েটি সোজা চলে যায় কুকুরটার সামনে। তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললে, কি—কি হয়েছে, জিমি? তোকে বুঝি খুব কষ্ট দিয়েছে ওরা? দাঁড়া—একটু সবুর কর। এক্ষুণি তোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।

মেয়েটি তার পায়ের স্লিপারের শব্দ তুলে অমিতের সামনে এসে তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আমার জিমি এমন কি করেছে যে আপনারা ওকে এখানে বেঁধে রেখে কষ্ট দিচ্ছেন?

অমিত এক নজরে মেয়েটির আপাদমস্তক দেখে নেয়। সাধারণ দোহারা গড়ন। ফরসা গায়ের রঙ। কালো কুচকুচে কোঁকড়া চুলের খোঁপাটি ঘাড়ের দিকে হেলে পড়েছে। মুখখানা মিষ্টি। সেই মিষ্টি মুখে একটা ছেলেমানুষী ভাব। বড় বড় স্বপ্নালু চোখদুটোয় বিরক্তি মিশ্রিত সামান্য ক্রোধের উত্তাপ। পাতলা ঠোঁটজোড়ায় একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমা। আর কণ্ঠস্বরে সুরের ঝঙ্কার।

মেয়েটি অমিতের টেবিলের আরও কাছে সরে আসে। তারপর পেলব হাতদুটি নিজের কোমরের উপর রেখে 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আবার সুরেব ঝঙ্কার তোলে, হা করে তাকিয়ে রইলেন কেন? জবাব দিন। আমার জিমিকে এমনি ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

মেয়েটির কথার ধরনে বিস্মিত না হয়ে পারে না অমিত। আশ্চর্য সাহস, কোন মেয়ে থানায় ঢুকে যে এমনিভাবে কোন অফিসারের কাছে কৈফিয়ত তলব করতে পারে, তা' ছিল তার ধারণারও অতীত। আবার হাসিও পায় ওর ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখে। কৈফিয়ত তলবের ভাষাটাও যেন কেমন—হা করে তাকিয়ে রইলেন কেন? যেন হা করে ওর রূপ-সুধা পানে মত্ত হয়ে পড়েছে অমিত।

বাস্তবিকই তাই। মনের অগোচরে পাপ নেই। নিজের অজ্ঞাতসারেই এতক্ষণ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল অমিত। কি দেখছিল তা' হয়ত সে নিজেই জানে না। বোধহয় দেখছিল মেয়েটির রূপ-লাবণ্য, সম্ভবত উপভোগ করছিল তার সাহস ও ছেলেমানুষীপনা যা' কিনা অন্য যে কোন ব্যক্তির বেলায় প্রায় বেয়াদপির পর্যায়ে গিয়ে পৌছত।

মেয়েটির কথায় স্বাভাবিক ভাবেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে অমিত। ছি—ছি, মেয়েটি কি ভাবছে তাকে!

মেয়েটির মুখের ওপর থেকে এক মুহূর্ত দৃষ্টি সরিয়ে নেয় অমিত। তারপর আবার তার দিকে তাকিয়ে হাল্কা সুরে জবাব দেয়, যা' বলেছেন, আপনার জিমিকে এমনিভাবে বেঁধে রেখে শাস্তি দেওয়া উচিত হয় নি আমার। যে শাস্তি জিমির মালিকের প্রাপ্য সেই শাস্তি জিমিকে দিয়ে সত্যিই অন্যায় করে ফেলেছি আমি।

—কি বললেন? তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ মেয়েটির।

মেয়েটির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে অমিত বললে, আপনি জানেন আপনার ওই জিমি আজ কি করেছে?

—কি আর এমন করেছে? কাউকে তাড়া করেছিল হয়ত।

—না, শুধু তাড়াই করেনি, তাড়া করে গিয়ে একজন লোকের পা থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে।

—সেকি! বিস্মিত কণ্ঠস্বর মেয়েটির।

—হ্যাঁ, ঠিকই তাই। লোকজন এসে না পড়লে হয়ত লোকটিকে মেরেই ফেলত।

মেয়েটি আর কিছু না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তেজনা কমে গিয়ে একটু শান্ত হয়ে উঠেছে সে ততক্ষণে। মুখের সেই বিরক্তি মিশ্রিত ক্রোধের স্থলে জেগে উঠেছে একটা বিষাদের ছায়া, একটু বেদনার আভাস।

—লোকটি কে, কোথায় থাকে? মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে মেয়েটি।

অমিত সেই আহত লোকটির নাম ঠিকানা বলে দিয়ে আবার বললে, তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মেয়েটি আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। যেন ভাবতে থাকে কিছু।

এবার প্রশ্ন করে অমিত, আপনার নামটি জানতে পারি কি?

—স্মৃতিকণা দত্ত।

—আপনার বাবার নাম?

—শ্রীঅজিতেশ দত্ত।

—কি করেন তিনি?

—এ্যাডভোকেট ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

অমিত আবার প্রশ্ন করে, আপনাদের জিমিকে ছেড়ে রেখেছিলেন কেন?

প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় স্মৃতিকণার কণ্ঠে। বললে, না—না, ওকে কখনও ছেড়ে রাখা হয় না। আজ বিকেলে বাবা ও আমি কেউই বাড়ি ছিলাম না। বাড়ির চাকর-বাকরদের গাফিলতিতেই জিমি ছাড়া পেয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। তবে—

—তবে কি?

—তবে, জিমি তো কখনও কাউকে কামড়ায় নি। খুবই শান্ত প্রকৃতির।

—হ্যাঁ, শান্ত তো বটেই। ওর আজকের কাণ্ডকারখানাই তার প্রমাণ। শ্লেষাত্মক সুরে কথাটা বলে অমিত।

—তার মানে? আপনি বলতে চাইছেন জিমির সম্পর্কে আপনাকে আমি বাড়িয়ে বলছি? শান্ত কণ্ঠস্বর আবার একটু তেজী হয়ে ওঠে স্মৃতিকণার।

স্মৃতিকণার স্বভাবের এই বিশেষত্বটুকু কেমন যেন আকৃষ্ট করে অমিতকে। এই নরম, এই গরম। তাতে আবার মিশে রয়েছে ছেলেমানুষী সুলভ সংকোচহীনতা।

—না, তা' বলছি না। একটু যেন পিছিয়ে যায় অমিত। বললে, আমি কেবল আজকের ঘটনার কথাই বলছি। বলেই এজাহারের বইটার পাতা উল্টে গোটা এজাহারটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললে, তা'হলে ঐ জিমির মালিক হচ্ছেন আপনার বাবা শ্রীঅজিতেশ দত্ত, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে স্মৃতিকণা বললে, হ্যাঁ। বাবা জিমিকে সেই ছোট্ট অবস্থায় কিনে এনেছিলেন সত্যি, তবে ওকে মানুষ করেছি আমি।

—সেকি! কুকুরকে মানুষ করেছেন? এ আবার কি কথা হল? কথাটা বলেই হেসে ওঠে অমিত।

স্মৃতিকণাও হাসে। ঠোঁটের ফাঁকে জেগে ওঠে মুক্তোর মত দাঁতের সারি। কণ্ঠস্বরে সুরের ঝঙ্কার। বললে, ওই হল। মানুষ করা মানে বড় করে তোলা আর কি!

সংযত হয় অমিত। হাসি থামিয়েই কিন্তু গম্ভীর হয়ে ওঠে। এটা কোন পার্ক কিম্বা কারুর বাড়ি নয়। এটা থানা—জেলার কোতোয়ালী থানা। এখানে দিবারাত্র যে নাটকের অভিনয় চলে তাতে হাসির চাইতে কান্নারই প্রাধান্য। এখানকার বাতাস কমেডির স্পর্শে হাল্কা নয়, ট্র্যাজেডির ভারে ভারাক্রান্ত। এখানকার মাটি শতসহস্র অপরাধীর চোখের জলে নোনা হয়ে রয়েছে। এর প্রতিটি বালুকণায় মিশে রয়েছে তাদের দীর্ঘনিশ্বাস।

গম্ভীর কণ্ঠে অমিত বললে, দেখুন, ব্যাপারটাকে আপনি যতটা হাল্কা মনে করছেন আসলে কিন্তু ঠিক ততটা নয়। মামলা একটা রুজু হয়েছে। আপনাদের ওই জিমির মালিক যখন আপনার বাবা তখন তাঁর বিরুদ্ধেই মামলা হবে। তদন্তে প্রমাণ হলে আদালতেও দাঁড়াতে হবে তাঁকে।

—বলছেন কি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর স্মৃতিকণার। এই সামান্য ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াবে?

—হ্যাঁ, তা' গড়াবে বৈকি! এটা একটা কগ্‌নিজিবল্ অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য মামলা। প্রয়োজনে আপনার বাবা গ্রেপ্তারও হতে পারেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার বাবা নিজেই তো এ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন। তাঁকেই না হয় জিজ্ঞেস করবেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিকণা। চিন্তা করে কিছু। তারপর একসময় বললে, সে যা' হবার পরে হবে। এখন আপাতত আমার জিমিকে ছেড়ে দিন।

—না, তা' হয় না। ওকে এখন ছেড়ে দেওয়া চলে না।

—সেকি? ওকে তা'হলে কোথায় রাখবেন? উষ্মা প্রকাশ পায় স্মৃতিকণার কণ্ঠে। মুখখানা অকস্মাৎ থমথমে হয়ে ওঠে।

—মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এখানকার সরকারি ভেটেরিনারি হাসপাতালে থাকতে হবে আপনার জিমিকে। প্রয়োজনে তাকে আদালতেও উপস্থিত করা হবে।

—তার মানে, আমার জিমির কয়েদ হবে! আপনাদের হাতে পাড়লে দেখেছি জন্তুরও রেহাই নেই!

একটু ম্লান হাসে অমিত। বললে, না, তা' নেই।

আবার একটু সময় চিন্তা করে স্মৃতিকণা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অমিত কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। সে ভাবছিলল, সরকারি ভেটেরিনারি হাসপাতালে কুকুরটাকে রাখার ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। তার চাইতে মালিকের জিম্মায় রেখে দেওয়া অনেক ভাল। মালিককে লিখিত অঙ্গীকার করতে হবে যে, তলব মত সে কুকুরটিকে আদালতে হাজির করবে।

অমিত সেই কথাই বলতে যাচ্ছিল স্মৃতিকণাকে। কিন্তু তার আগেই স্মৃতিকণা বলে ওঠে, বেশ, কত টাকা চাই আপনার, বলুন? কত টাকা পেলে জিমিকে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন? শুনেছি, পয়সা পেলে নাকি কোন কাজই আপনাদের কাছে বে-আইনী নয়।

সহসা অমিতের মনের দরজায় এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে স্মৃতিকণার কথায়। স্মৃতিকণা টাকার লোভ দেখাচ্ছে তাকে! ঘুস—ঘুসের লোভ! ঐ সহজ সরল মেয়েটিও নগদ মূল্যের পরিবর্তে তাকে দিয়ে বে-আইনী কাজ করিয়ে নিতে চাইছে! মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে অমিতের। ছি-ছি, পয়সার পরিবর্তে নিজের কাজ হাসিল করার কি লজ্জাকর প্রচেষ্টা! ঘুস খাওয়া যেমন অপরাধ, ঘুস দেওয়াও ততোধিক অপরাধ। দাতা ও গ্রহীতা সমান অপরাধে অপরাধী। কেউ কারুর চাইতে ছোট কিংবা বড় নয়। একহাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি ওদের একজনকে দিয়ে দুর্নীতিও অনুষ্ঠিত হয় না। চাই দু'জনকেই। একজন দেবে, আর একজন নেবে। তবে, কেউ দেয় বলেই কেউ নেয় অথবা কেউ নেয় বলেই কেউ দেয় এ তর্ক একান্তই হাস্যকর, অনেকটা সেই গাছ আগে না বীজ আগে'র মতই বৃথা।

মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে স্মৃতিকণার ওপর। কী নীচতা মেয়েটার! কী ক্লেদাক্ত মন! ওর মিষ্টি হাসির তলায় কাজ গুছিয়ে নেবার কি বিশ্রী ফন্দি!

কিন্তু ওরই বা দোষ কি! যুগের হাওয়াই এই। স্মৃতিকণাও এ যুগেরই মেয়ে। যে যুগে মানুষেরই তৈরি আইনের প্রতি মানুষের আনুগত্যের অভাব, যে যুগে কালোবাজার থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাঁচ কিলো চাল নিয়ে এসে ছেলে বাপের কাছে কৃতিত্ব দাবী করে আর বাপ ছেলের পিঠ চাপড়ে বাহবা দেয়, সেই যুগে স্মৃতিকণার মত মেয়ে তার

আদরের জিমিকে ছাড়িয়ে নিতে পুলিশকে পয়সার লোভ দেখাবে, তাতে আর এমন দোষ কি?

অমিতের একটু আগের সেই বিদ্রোহী মনটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়। রাগ করে কি হবে? অভিমান করেও বা হবে কি? এরাই এই দেশের মানুষ। এদের মধ্যেই তাকে থাকতে হবে। এদের নিয়েই চলতে হবে তাকে। সেবা করতে হবে এদেরই। মহাপুরুষের বাণী মনে পড়ে তার—পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে নয়।

শান্তকণ্ঠে অমিত বললে, আপনি একটু ভুল করছেন, স্মৃতিকণা দেবী। ব্যতিক্রমও আছে কিছু কিছু।

একটু থেমে অমিত আবার বললে, আপনার জিমিকে আপনারই জিম্মায় দিয়ে দিচ্ছি। কাগজপত্রে সই করে ওকে বাড়ি নিয়ে যান। একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না আপনাকে। তবে, তলব মত ওকে আদালতে হাজির করবেন।

এতক্ষণে, কেমন যেন একটু লজ্জার ভাব জেগে ওঠে স্মৃতিকণার মুখে। ফরসা গালে ছড়িয়ে পড়ে লাল রঙের হালকা আভা। মাথা নীচু করে মৃদু কণ্ঠে সে জবাব দেয়, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

সঙ্গের চাকরটির সাহায্যে জিমিকে নিয়ে স্মৃতিকণা যখন থানা ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় তখন তাদের গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অমিত—থানার মেজদারোগা অমিত রায়। সেই মুহূর্তে তার মনে ছিল না কোন বিদ্বেষ, ছিল না কোন দুঃখ কিম্বা অভিমান। একটা অনাস্বাদিত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার অন্তরের অন্তস্থল।

॥ সাত ॥

থানার সিনিয়র এ. এস্. আই. শ্রীপতি মিত্র।

সরকারি কাগজপত্রে বয়স এখনও তিপ্পান্ন। রিটায়ার করতে আর মাত্র দু'বছর বাকি। কিন্তু আসলে তিপ্পান্ন ছাড়িয়ে গেছে বছর তিনের আগেই। পুরো পঁয়তিরিশ বছর চাকরি হয়েছে। সেই সেকালে ব্রিটিশ যুগে চাকরিতে ঢুকেছিল। কনস্টেবলের চাকরি। অতি সামান্য মাইনে। কিন্তু সেই সামান্যই অসামান্য হয়ে উঠতো উপরি আয়ের কল্যাণে। তা'ছাড়া সে যুগে তাদের প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। একমাত্র ওপরওয়ালা সাহেব-সুবোদের সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই নির্বিঘ্নে চাক্‌রি করা যেত। জনসাধারণের মতামতের তোয়াক্কাই করতে হত না। আসলে, সে যুগে জনসাধারণের মতামতের কোন মূল্যই দিত না বিদেশী শাসকরা। আর সেই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী রাজপুরুষরাও তেমন একটা গ্রাহ্য করত না তাদের।

শ্রীপতির ভাষায় সেই সোনার যুগে চাকরি করেছে সে। সেকাল আর একাল—কত তফাৎ, কত ব্যবধান।

এ যুগে আর জনসাধারণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে চাক্‌রি করা চলে না। তাদের কথা শুনতে হয়। সময় সময় হজম করতেও হয় তাদের তিক্ত মন্তব্য। নইলে চাকরি টিকিয়ে রাখাই দায়। তাই সে যুগের স্মৃতি রোমন্থন করে তৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করে শ্রীপতি। কথায় কথায় সে যুগের নজির টানে।

অমিত সাব্-ইন্সপেক্টর, অর্থাৎ দারোগা—থানার সেকেণ্ড অফিসার। আর শ্রীপতি সিনিয়র এ. এস্. আই, মানে দারোগার সহকারী। সে যুগে এ. এস্. আই কে বলা হত জমাদারবাবু। আবার কোন কোন ছোট থানায় তাদের ডাকা হত ছোটবাবু বলে।

ঢোলের সঙ্গে যেমন কাঁসি, দারোগার সঙ্গে তেমনি তার সহকারী, মানে এ. এস্. আই.।

একজন দারোগা হয়ত তার পরিচিত আর একজনকে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় পোষ্টিং এখন?

সে হয়ত জবাব দিলে, অমুক থানায়।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম ব্যক্তিটির মন্তব্য, ও—অমুক থানায় আছেন? সেখানে তো এক ঢোল এক কাঁসি। ছোট্ট থানা। বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই আছেন তা'হলে।

তার মানে, ছোট্ট ঐ থানায় মাত্র একজন দারোগা আর একজন এ. এস. আই.। ঐ সমস্ত থানাতেই দারোগাকে ডাকা হত বড়বাবু বলে, আর এ. এস্. আই.-কে ছোটবাবু।

সিভিল হলেও দেশের পুলিশ ফোর্স ডিসিপ্লিন্‌ড্ ফোর্স। তাদের আইনকানুন আদব-কায়দা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। উঁচু পদের অফিসারকে দেখা মাত্রই এ্যাটেন্‌শন্ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্যলুট্ করাই বিধি। কিন্তু থানার চাকরিতে সব সময় নিয়ম-কানুন মেনে চলা সম্ভব হয় না। থানায় পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করে এস্. আই. অর্থাৎ দারোগা আর এ. এস্. আই.। থাকেও তারা পাশাপাশি বাড়িতে। সাধারণ নমস্কার বিনিময় ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোন ঠাট বজায় রাখা সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু এ. এস্. আই. সব সময়েই দারোগাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে। এমন কি যখন তারা কোন বিষয়ে তর্ক করে, এমনকি ঝগড়াও করে তখন তারা একে অন্যের পদগৌরবের কথা সাময়িক বিস্মৃত হলেও মুখে 'স্যার' শব্দটি ঠিকই বজায় থাকে।

শ্রীপতির ধারণা এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে তার অমূল্য মনুষ্য জন্মটাকে সে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই নিয়েও খেদ্‌ও কম নয় তার। অবশ্য কথাটা নেহাৎ মিথ্যেও নয়। সেই ব্রিটিশ যুগে কনস্টেবলের চাকরিতে ঢুকেছিল। বহুদিন আগে অনেক কেঁদে কঁকিয়ে এ. এস্. আই-য়ের পদে প্রমোশন পেয়েছিল। সেও আজ প্রায় পনের বছর আগের কথা। সেই থেকে প্রমোশন দেবী সেই একই স্থানে স্থাণুর মত বসিয়ে রেখেছে তাকে। আর একটি ধাপও ওপরে উঠতে দিলেন না। দারোগাগিরি আর ভাগ্যে জুটলো না শ্রীপতির।

মেজবাবু অমিতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল শ্রীপতির।

থানায় তেমন ভিড় নেই। নিজের টেবিলে বসে কাজ করতে করতে শ্রীপতি মুখ তুলে অমিতকে বললে, বুঝলেন স্যার, পঁয়তিরিশ বছর চাকরি হল এই ডিপার্টমেন্টে। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল। সেকালের সাহেব-সুবোদেরও দেখেছি, আর একালের এঁদেরও দেখছি। কত তফাৎ!

নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, তা' তো হবেই, শ্রীপতিবাবু। কালের তফাৎও যে অনেক।

—কি যে বল্লেন স্যার, চাকরি তো আর করেন নি ব্রিটিশ আমলে। লালমুখো সেইসব বিলিতি সাহেবদের স্বভাবই ছিল আলাদা। সেকালে ওদের কাছে কাজ করে সুখ ছিল কত। গুণীর আদর করতে জানতো ওঁরা।

—কেন, একালের সাহেবরা বুঝি গুণীর আদর করতে জানে না?

কণ্ঠে অভিমানের সুর ফুটে ওঠে শ্রীপতির। বললে, আমি নিজেই তো তার নমুনা, স্যার। সারাটা জীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করলাম, কিন্তু এ. এস. আই. থেকে আর দারোগা হতে পারলাম না।

—কেন শ্রীপতিবাবু, এ যুগেও তো কত লোক কনস্টেবল্ থেকে দারোগা হচ্ছে। আপনি কেন হতে পারলেন না, তা' আপনিই বলতে পারেন।

—কি আর বলব স্যার, উচিত কথা বলতে যে আমি কাউকেই ছাড়ি না। এইটেই আমার দোষ। আর এই দোষেই আমার কিছু হল না। যদি আর দশজনের মত সাহেব-সুবোদের তেল দিতে পারতাম তো—

—এতদিনে পুলিশ সাহেব হয়ে যেতেন, তাই না, শ্রীপতিবাবু? ওপাশ থেকে ফোড়ন কাটে ধূর্জটি গাঙ্গুলী। বরাবরই একটু ঠোঁটকাটা প্রকৃতির মানুষ ধূর্জটি।

—আপনি চুপ করুন মশাই। আপনার সাথে কথা বলছি না আমি। একরকম খেঁকিয়ে ওঠে শ্রীপতি।

মৃদু হেসে নিজের কাজে মন দেয় ধূর্জটি। কথা বাড়ায় না আর।

অমিত নিজেও মনে মনে একটু হাসে। শ্রীপতির দৌড় তার অজানা নয়। তেল দিতে এবং মনরাখা কথা বলতে সে যে অন্য কারুর চাইতে খাটো নয় এ তথ্যও তার জানা। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এমনি। বিশেষ করে এই ডিপার্টমেণ্টে। যে যত বেশি খোসামোদে ওস্তাদ সে মুখে তত বেশি বড়াই করে যে ঐ একটি জিনিস জানা থাকলে সেও আর দশজনের মত একটা কেউকেটা হতে পারতো।

তা'ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে এখানে। এই ডিপার্টমেণ্টের প্রতি যার যত বেশি আসক্তি সে তত বেশি করে এর মুণ্ডুপাত করে বেড়ায়। মুখে বলে, ভাই জ্বলে গেলাম। আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে করছে না এই চাকরিতে। এ চাকরি কি মানুষে করে নাকি? কবে রিটায়ার করব তাই ভাবছি। ছেলেরা কুলীগিরি করবে তাও ভাল, তবুও এই ডিপার্টমেণ্টে ঢুকোতে চেষ্টা করবো না। কিন্তু আসলে দেখা যায় রিটায়ার করার দু'একমাস আগেই সেই অফিসারটি চুপি চুপি চাকরির এক্স্টেন্শানের জন্য দরখাস্ত করে বসে আছে। আর, একটি উপযুক্ত ছেলেকে দারোগাগিরিতে ঢুকোতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। চাকরিতে এক্স্টেন্শান হলেই বন্ধু মহলে বলে বেড়ায়, কি আর করবো ভাই! সাহেব নিজে ডেকে বললেন, আরও কিছুদিন থাকো। যে মামলাগুলো হাতে রয়েছে সেগুলো শেষ করে দাও। সাহেবের কথা ঠেলতে পারলাম না। থেকে গেলাম আর একটা বছর।

শ্রীপতি অমিতের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, যাই বলুন স্যার, সেকালের সাহেবদের কাছে কাজ করার সৌভাগ্য তো আর হয়নি আপনার। সেই স্মিথ সাহেবের কথাই ধরুন না। জন স্মিথ—খাঁটি বিলিতি সাহেব। কত ভালবাসতেন আমাকে। ওঁর আমলে রিওয়ার্ড পেয়েছি কত! সেই যেবার যুদ্ধ বাধলো—বুঝলেন স্যার, উনিশশো উনচল্লিশ কি চল্লিশ সালে, আমি তখন চন্দনপুর থানায় পোস্টেড্। সাহেব এলেন থানা ইন্‌স্‌পেক্শানে। এসেই ও. সি.-কে জিজ্ঞেস করলেন আমার কথা। আমি আবার সেদিন অসুস্থ ছিলাম স্যার। ব্যারাকেই ছিলাম। এমনি সময়—

—আঃ, আপনার সেই সেকালের গল্প একটু থামাবেন, শ্রীপতিবাবু? আপনার জ্বালায় তো দেখছি থানায় বসে কাজ করার উপায় নেই, মশাই। ওপাশ থেকে বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে

ধূর্জটি। অমিতের মনে হল বিরক্তির সঙ্গে একটা চাপা হাসির রেশও যেন মিশে ছিল সেই কণ্ঠস্বরে।

অতীতের কাহিনী বলতে গিয়ে বাধা পায় শ্রীপতি। তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকায় ধূর্জটির দিকে। তারপর চড়াসুরে বললে, আপনি আমার পেছনে এত লাগেন কেন, বলুন তো, স্যার? আপনাকে তো আর গল্প শোনাচ্ছি না, শোনাচ্ছি মেজবাবুকে। তারপর একমুহূর্ত থেমে অমিতের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, আজ তবে থাক, স্যার। আর একদিন আপনাকে শোনাব।

শ্রীপতিবাবুর এই কাহিনী মোটেই নতুন নয় অমিতের কাছে। এর মধ্যেই পাঁচ-সাতবার এসব কাহিনী শ্রীপতির মুখেই সে শুনছে। শুনে শুনে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তার।

অমিতের দুঃখ হয় শ্রীপতির জন্যে। বুড়ো মানুষ। জীবনে তেমন কিছুই করতে পারল না। তেমন একটা যোগ্যতাও অবশ্য ছিল না তার। তবুও সেও আর দশজনের মত অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই হয়ত ঢুকেছিল চাকরিতে। সে আশা পূরণ হয়নি তার। এখন কেবল অতীতের স্মৃতি নিয়েই বেঁচে আছে। হয়ত সেসব কাহিনীর মধ্যে অনেকটাই বানানো। তবুও সেই বানানো কাহিনী শুনিয়েই যদি লোকটি কিছু আনন্দ পায় তো শুনতে আপত্তি কি?

মাঝে মাঝে একটু বিরক্তও হয় অমিত। লোকটি 'সাহেব' বলতে অজ্ঞান। তবুও মুখ বুজেই বিনা প্রতিবাদে তার কথা শুনে যায় সে। আর শ্রীপতিও এমন একজন চমৎকার শ্রোতাকে পেয়ে মনের আনন্দে সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকে সেই কাহিনী।

শ্রীপতির কথায় মাথা নেড়ে সায় দেয় অমিত। বললে, ঠিক আছে শ্রীপতিবাবু, আর একদিন আপনার সেই কাহিনী শুনবো। তবে, আমার মনে হয় কি জানেন?

—কি মনে হয়, স্যার?

—সে কালের বিলিতি সাহেবরা এঁদের চাইতে সত্যিই ভাল ছিলেন। তবে কথায় আছে না, বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল। আমি আবার ঐ মতে বিশ্বাসী।

—হ্যাঁ স্যার, তা' যা বলছেন। তবে কিনা—। আমতা আমতা করে কথাটা বলতে বলতে থেমে যায় শ্রীপতি। পরিষ্কার বোঝা গেল অমিতের কথাটা তেমন মনঃপূত হল না তার।

শ্রীপতির মুখের দিকে একবার তাকিয়েই নিজের কাজে মন দেয় অমিত। কিন্তু ভাবতে থাকে ঐ শ্রীপতির কথাই।

ভদ্রলোককে দেখে সত্যিই কষ্ট হয়। সামান্য এ. এস্. আই.-য়ের চাকরি। এদিকে বাড়িতে একপাল ছেলেমেয়ে। এই বয়সেও নিশ্চিন্ত মনে একটির পর একটি সন্তানের পিতার গৌরব অর্জন করে চলেছে। থানার কোয়ার্টারেই থাকে শ্রীপতি। ওর স্ত্রী মহামায়াকেও দেখেছে অমিত। অতি শান্ত প্রকৃতির মহিলা। সামান্য এ. এস্. আই.-য়ের স্ত্রী। আর্থিক অভাব-অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী। সবাইকে দিয়ে-থুয়ে নিজে বোধহয় পেটপুরে দু'বেলা খেতেও পায় না মহামায়া। কিন্তু আশ্চর্য তার মুখের হাসিটি। মুখের সঙ্গে ঐ হাসিটির যেন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তার মুখ দেখে মনে হয়, যেন কোন অভাব কোন অভিযোগই নেই মহিলাটির। যেন আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট—পরিতৃপ্ত।

হাতে প্রচুর কাজ। বলতে গেলে শ্বাস ফেলার অবসর নেই অমিতের। একবার শহরের হাসপাতালে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে শিউপূজনকে। শিউপূজন, অর্থাৎ যাকে সেদিন অজিতেশ দত্তর সেই এ্যাল্‌সেসিয়ান্ কুকুরটা কামড়েছিল।

সেখান থেকে একবার যেতে হবে অজিতেশ দত্তর বাড়ি। অজিতেশ ও তার কন্যা স্মৃতিকণাকেও কিছু প্রশ্ন করার আছে। তা'ছাড়া ঐ অঞ্চলের আরও দু'একজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন। মামলাটা বেশ ভালই বলতে হবে। মনে হচ্ছে রিটায়ার্ড এ্যাড্‌ভোকেট অজিতেশ দত্তর বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করতে হতে পারে। তারপর আছে আদালত। সেখানেই হবে চূড়ান্ত বিচার।

স্মৃতিকণার কথা মনে হতেই কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অমিত। সত্যিই সার্থক নাম ওর। একদিনের দেখাতেই মেয়েটি অমিতের মনের মণিকোঠায় একটু স্থান করে নিয়েছে। অমিতের মন থেকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যায়নি স্মৃতিকণা।

কিন্তু কেন এমন হয়? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে অমিত। প্রশ্নের জবাবও হয়ত পায় একটা। কিন্তু সেই জবাবকে আমল দিতে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে ওঠে। একি হল তার? কেন এই দুর্বলতা? কই, এর আগে তো এমন দুর্বলতা কোনদিন বোধ করেনি অমিত? তদন্তের ব্যাপারে এর আগেও তো কত নারীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে তাকে। কই, তাদের কারুর জন্যে তো এমন মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করেনি? তবে কেন স্মৃতিকণার বেলায় মনের এই আকুলতা?

অজিতেশ দত্তর বাড়ি আর দু'একদিন আগে যাওয়া উচিত ছিল তার। না, স্মৃতিকণার জন্যে নয়। তদন্তের ব্যাপারেই যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। মনের দিক থেকে তাগিদও এসেছিল যথেষ্ট। কিন্তু ঐ সঙ্কোচটুকুর জন্যেই যেতে পারেনি। ছিঃ—ছিঃ! এটা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। সে পুলিশ অফিসার। এধরনের মানসিক দুর্বলতা মোটেই শোভা পায় না তার। এমন দুর্বল মন নিয়ে পুলিশের চাকরির গুরুদায়িত্ব সে বহন করবে কেমন করে?

থানা থেকে বেরিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলছিল অমিত।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। রাস্তার পাশে একটা বাড়ির রোয়াকে বসে আড্ডা জমিয়েছিল গুটিকয়েক ছেলে। স্কুলের, বড়জোর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হবে তারা। পরনে আধুনিক ড্রেন্ পাইপ্ প্যান্ট, গায়ে টি-সার্ট। আর পায়ে কোলাপুরী চপ্পল।

অন্যমনস্ক অমিত সেই রোয়াক অতিক্রম করতেই পেছনে একটা বিশ্রী মন্তব্য শুনে থম্‌কে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যেই একটি মস্তান গোছের ছেলে মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়েছিল অমিতের দিকে। বলেছিল, শালা, পুলিশ যাচ্ছে!

সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি ছেলে মন্তব্য করে, ব্যাটার হাঁটার কায়দাটা দেখেছিস্? যেন লাটসাহেবের বাবুর্চি যাচ্ছেন!

দ্বিতীয় ছেলেটির কথা বলার সরস ভঙ্গিতে একসঙ্গে হেসে ওঠে সকলে।

কয়েকটি মুহূর্ত। থম্‌কে দাঁড়ায় অমিত। একবার মনে হয় সোজা ছেলের দলের সামনে হাজরি হয়ে ওদের এমন বিশ্রী মন্তব্যের কৈফিয়ত তলব করবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে হয়ত একটা তিক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। তার চেয়ে মন্তব্যটা না শোনার ভান করে চলে যাওয়াই ভাল। ও. সি. ভবদেববাবুর একটা কথা মনে পড়ে অমিতের। কথায় কথায় ভবদেববাবু একদিন বলেছিল, পুলিশ অফিসারের পক্ষে সব রকম অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা সম্ভব বলে মনে হবে, কেবল সে ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। নইলে শুধু শুধুই জল ঘোলা হবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না। সুপিরিয়র অফিসারদের কাছে 'ট্যাক্টলেস্' বলে প্রতিপন্ন হতে হবে।

কথাটা না শোনার ভান করেই এগিয়ে যায় অমিত। তিক্ত মনটাকে সংযত করে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলে সে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে যেতেই মনের তিক্ততাটুকু একটু একটু করে অন্তর্হিত হতে থাকে তার। আর সেই শূন্যস্থানটুকু অধিকার করে কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া।

এরাই হচ্ছে তার দেশের লোক। এদের সেবা করবার জন্যই সে প্রবেশ করেছে এই চাকরিতে। দুঃসময়ে এদের পাশেই দাঁড়াতে হবে তাকে। এদের মঙ্গলের কথাই তাকে চিন্তা করতে হবে অহরহ।

কিন্তু কেন? কি অপরাধ তার? কেন ঐ ছেলের দল তাকে এমনিভাবে বিদ্রূপ করল? কিন্তু কই, ওদের কোন অনিষ্টই কোনদিন সে করেছে বলে তো মনে পড়ে না। তবে কেন শুধু শুধু এই অপমান?

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা থানায় বসে কথায় কথায় অমিত ঘটনাটা বলেছিল আমাকে।

অমিত আমার বন্ধু। থানায় খবর সংগ্রহ করতে যাওয়ার সূত্র থেকেই আমাদের পরিচয়। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, আর ঘনিষ্ঠতা থেকেই বন্ধুত্ব।

অমিতকে আমি ভালবাসি। ওর চরিত্র মাধুর্য মুগ্ধ করে আমাকে। ওর সংবেদনশীল মনের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। স্বামীজীর জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই যে অমিত এই চাকরি করতে এসেছে তাতে অন্ততঃ আমার নিজের এতটুকু সন্দেহ নেই। আর, সন্দেহ নেই বলেই মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে ভাবি, এযুগে তবে এমন ছেলেও সংসারে আছে!

অমিতকে নিয়ে কিন্তু আমার বিপদও কম নয়। ও আমাকে ধরে নিয়েছে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে। আমি সামান্য সাংবাদিক। দিনের বেলা কলেজে মাস্টারি করি, আর বাকি সময়টা খবরের সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াই। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবার বাসনা কোন কালেই আমার ছিল না। কিন্তু অমিত সে কথা শুনতে চায় না। পুলিশ পাব্‌লিক সম্পর্কের বিষয়ে যে কোন আলোচনায় আমাকে পাব্‌লিকের প্রতিনিধি ধরে নিয়ে তর্ক জুড়ে দেয়। যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওর প্রশ্নের জবাব দিতে হয় আমাকে। সময় সময় জনসাধারণের অঘোষিত প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দোষ-ত্রুটির জবাবদিহিও করতে হয় ওর কাছে।

সেদিন অমিতের কথার ধরনে আমি সহজেই বুঝে নিয়েছিলাম সেই ছোকরাদের আচরণে মনে আঘাত পেয়েছে সে। তাই ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার ছলে জবাব দিয়েছিলাম, এসব সাধারণ ব্যাপারে এত বিচলিত হবার কি আছে? রক্‌বাজ ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ড—

—কি বলছো তুমি? অমিত বলেছিল, তুমি হাল্কাভাবে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেও পুলিশের প্রতি জনসাধারণের মনোভাবের ধরনটা কিন্তু এতেই প্রতিফলিত হয়। কিন্তু কেন? কি অন্যায় করেছি আমরা? তুমি হয়ত বলবে, আমরা অসৎ। হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমাদের মধ্যে কিছু লোক হয়ত অসৎ। কিন্তু সবাই তো তা' নয়। সৎ-অসৎ-এর কথাই যদি বলো তো জিজ্ঞেস করি, আজকের দিনে সংসারে ক'জন লোক সৎ আছে বলতে পারো? পৃথিবীর কোন্ দেশে সরকারি বেসরকারি কোন্ বিভাগে কিছু 'ব্ল্যাক্ শিপের' অস্তিত্ব নেই বলো দেখি? এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নেবার জন্য একটু থামে অমিত।

জবাবে আমি বলেছিলাম, না ভাই, তা' নয়। আমি মনে করি ওটা ঠিক আসল কারণ নয়। আসল কারণ আরও গভীরে।

অমিত বলছিল, তুমি হয়ত বলবে, ব্রিটিশ রাজত্বে আমরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম তা' থেকেই আমাদের ওপর সাধারণের এই মনোভাবের সৃষ্টি, তাই তো?

স্বীকার করেছিলাম অমিতের কথা। বলেছিলাম, হ্যাঁ, সেটা অংশত দায়ী, তবে আসল কারণ অন্য।

—আসল কারণ তবে কি?

একটু সময় ভেবে নিয়ে জবাব দিয়েছিলাম আমি, দেখ ভাই, এর কারণ সম্ভবত সাইকোলজিক্যাল্।

—সাইকোলজিক্যাল্? বিস্মিত প্রশ্ন অমিতের।

—হ্যাঁ, তাই। নিজের যুক্তিগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে আবার বলেছিলাম আমি, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই, সমাজে বাস করতে হলে তাকে কিছু সামাজিক নিয়ম-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এই সমস্ত নিয়ম-কানুনের স্রষ্টা আবার তারা নিজেরাই। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো, তারা নিজেরা নিজেদের জন্যে আইন-কানুন তৈরি করলেও সেই আইনের অনুশাসন ঠিকমত মেনে চলতে মনের কাছ থেকে পুরোপুরি সায় পায় না। সুশৃঙ্খল সভ্য মানবসমাজের এইটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। নিজের অজান্তেই মনের ভেতর সৃষ্টি হয় সেই আইনকে প্রতিরোধ করার একটা স্পৃহা। সাধারণ মানুষ মনের সেই স্পৃহাকে অবদমন করে আইনের অনুশাসন মেনে চললেও সেই অবদমন অতি সূক্ষ্মভাবে মনের ওপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে। নিজের তৈরি আইন-কানুনের বাঁধনে আবদ্ধ থাকতে চায় না সেই মন। সে চায় মুক্তি—পরিপূর্ণ মুক্তি। আর সেই মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আইনের প্রয়োগকর্তা, অর্থাৎ পুলিশ। কাজেই, দেখা যায় পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে আইনের প্রয়োগকর্তার ওপর মানুষের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। খোদ বিলেতের দিকেই তাকিয়ে দেখ। সেখানে মেট্রোপলিটান পুলিশের কি প্রচুর নামডাক! কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, সেখানেও জনসাধারণের পুলিশের প্রতি যে ধরনের মনোভাব তা' সমাজের অন্য যে কোন বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর ওপর মনোভাবের চাইতে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এর কারণ আর কিছুই নয়, সেই মানসিক অবদমন। পৃথিবীর সর্বত্রই এই অবস্থা। কোথাও বেশি কোথাও বা কম, এই যা। আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের ঐ জাতীয় মনোভাব একটু বেশি প্রকট।

আমি থামতেই অমিত বলে উঠেছিল, তুমি ভাই সাইকোলজির ছাত্র। তোমার পক্ষেই এসব ভালভাবে বুঝতে পারা সম্ভব। তবে আমার নিজের ধারণা, এর সঙ্গে দেশের রাজনীতিরও একটা প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

অমিতকে সমর্থন করে বলেছিলাম আমি, আছেই তো। শুধু রাজনীতি কেন, সমাজনীতি, অর্থনীতিও প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোতে পুলিশের প্রতি এই মনোভাব একটু বেশি প্রকট। তা'ছাড়া আমার ধারণা, আরও একটা কারণ রয়েছে এর পেছনে।

—কি কারণ? প্রশ্ন করেছিল অমিত।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'কমপ্লেক্স'। অনেকের কাছেই হয়ত কথাটা অপ্রিয় ঠেকবে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, 'কমপ্লেক্স' বস্তুটি অল্প বেশি সকলের মধ্যেই রয়েছে। কোন না কোন কমপ্লেক্সে ভোগে না এমন ব্যক্তি জগতে সত্যিই দুর্লভ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পুলিশের ক্ষমতা, তাদের জনসাধারণের ওপর খবরদারী করবার অধিকারের ব্যাপারেই একদল

লোকের এই কমপ্লেক্স। সেদিনকার সেই রক্‌বাজ ছোকরাদের কথাই ধরো না। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম কোন ব্যাপারে তারা পুলিশের ওপর ক্ষেপে ছিল। তাই তোমাকে রাস্তায় দেখামাত্র ওরা বলে উঠেছিল—শালা পুলিশ। কিন্তু তোমার হাঁটার ভঙ্গিকে বিদ্রূপ করে তোমাকে লাটসাহেবের বাবুর্চি বলার কারণ কি থাকতে পারে? আমার ধারণা, কারণ আর কিছুই নয়, সেই কমপ্লেক্স।

সেদিন আমার সেই সাইকোলজি নিয়ে আলোচনায় অমিত সন্তুষ্ট হয়েছিল কিনা জানি না, তবে ঐ ব্যাপারে আর কিছু বলেনি।

সেই রক্‌বাজদের এড়িয়ে সেদিন দীর্ঘ পদক্ষেপে হাসপাতালে এসে হাজির হয়েছিল অমিত শিউপূজনের জবানবন্দি নেবে বলে।

হাসপাতালে কিন্তু শিউপূজনের দেখা পাওয়া গেল না। আগের দিন বিকেলে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

বাধ্য হয়েই শহরের সান্যাল পাড়ার সেই বস্তিতে আসতে হল অমিতকে।

সেদিন থানায় এসে ওই বস্তির ঠিকানাই বলেছিল শিউপূজন।

বরাত খারাপ অমিতের। বৃথা পরিশ্রম। বস্তিতে তাকে পাওয়া গেল না সেদিন। শুধু সেদিন কেন, আর কোনদিন তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলেও মনে হল না।

বস্তির পশ্চিমা মালিক বললে, শিউপূজন তো মুলুক্ চলা গিয়া, সাব্।

—কব্ চলা গিয়া?

—আজ ফজির মে।

—শিউপূজনকা মুলুক্ কাঁহা?

—ছাপরা জিলামে, সাব।

কিন্তু লোকটি তার ঠিকানা বলতে পারল না। এমনকি তার গ্রামের নামটা পর্যন্ত নয়। একটু সময় চিন্তা করে অমিত আবার প্রশ্ন করে বস্তির মালিককে, শিউপূজন কিঁউ মুলুক্ চলা গিয়া, মালুম হ্যায়?

একটু ইতস্তত করে লোকটি যা' বললে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, খোদ ওকিল সাহেব অর্থাৎ অজিতেশ দত্ত নাকি বস্তিতে এসে শিউপূজনের সঙ্গে দেখা করে কিছু টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে। সেই টাকা নিয়েই তড়ি-ঘড়ি শিউপূজন পালিয়েছে দেশে। অবশ্য, যাবার আগে বস্তিঘরের ভাড়া কড়ায়-গণ্ডায় সে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে তাকে।

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অমিত। শিউপূজন পালিয়েছে। না, পালিয়েছে নয়, তাকে টাকা দিয়ে ভাগিয়েছে রিটায়ার্ড এ্যাড্‌ভোকেট অজিতেশ দত্ত। আইনের আঁট-ঘাট অজানা নয় তার। সে ভালই জানে, খোদ অভিযোগকারীর অনুপস্থিতে তার বিরুদ্ধে মামলা চলতে পারে না।

অজিতেশ দত্তর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে অমিতের মন। সেই অতি পুরাতন অথচ চির নতুন ব্যাক-ডোর পলিসি। আইনের দণ্ড মাথা পেতে গ্রহণ করার সাহসের অভাব অথবা যেন-তেন প্রকারে আইনকে ফাঁকি দেওয়ার অপকৌশল। কিন্তু কেন? মানুষের এই সৎসাহসটুকু নেই কেন? ভেবেছিল কথাটা সে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবে অজিতেশ দত্তকে।

বস্তি থেকে সে সোজা এসে হাজির হয়েছিল অজিতেশ দত্তর বাড়ি। বাড়ি না বলে বাগান বাড়ি বললেই ঠিক মানায়। বাগান বাড়ির মতই মস্ত কম্পাউণ্ড নিয়ে বাংলো প্যাটার্ণের

দোতলা বাড়িটা। চারিদিকে দেশী বিলেতী নানা জাতের গাছের সারি মালিকের আধুনিক রুচির পরিচয় দেয়।

মনের অসন্তোষটুকু চাপা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করে গেটের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে অমিত। মনের অন্তরালে চাপা বিরক্তিটুকু ছায়াপাত করে তার মুখে। স্মৃতিকণার দেখা পাবার সম্ভাবনার নিবিড় উৎসাহ সত্ত্বেও তাদের নির্লজ্জ আচরণ থেকে থেকে পীড়া দিচ্ছিল তাকে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আর একটা দিক। বিত্তবানেরা অর্থের বিনিময়ে সহজেই আইনের বেড়াজাল পার হতে পারে। আর, বিত্তহীনেরা কিল খেয়ে বেমালুম হজম করে যায়।

অমিতকে বাইরের ঘরে বসিয়ে বাড়ির চাকর শ্রেণীর লোকটি বললে, কাল রাতে বাবুর জ্বর হয়েছে। ওপরে শুয়ে আছেন।

কিন্তু তোমার বাবুর সাথে দেখা করার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অমিত বললে।

একটু ইতস্তত করে চাকরটি। তারপর বললে, আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি। উনি যদি বলেন তো আপনাকেই বরঞ্চ ওপরে নিয়ে যাব।

মাথার টুপিটা একপাশে খুলে রেখে গদি আঁটা নরম চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে অমিত অপেক্ষা করতে থাকে অজিতেশ দত্তর জন্যে। আর সেই সঙ্গে যেন আরও একজনেরর উপস্থিতি কামনা করতে থাকে একান্তভাবে। স্মৃতিকণা—মিষ্টি নামটি। ততোধিক মিষ্টি ওর সুন্দর ছেলেমানুষীভরা মুখখানা।

বাড়িতে লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। কেমন যেন চুপচাপ। মাঝে মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের চিৎকার—নাটকের উৎস সেই এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুরটাই বোধহয়।

পরিবেশটা মন্দ লাগে না অমিতের। থানার সেই হাঁক-ডাক ও চিৎকারের বাইরে এমন শান্ত পরিবেশটুকু আকৃষ্ট করে তাকে।

ভেতরে পায়ের শব্দ ভেসে ওঠে। আর, একটু পরেই অমিতকে নিরাশ করে ভারি পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন একা অজিতেশ দত্ত।

দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারায় বার্ধক্যের স্পষ্ট ছাপ। মাথার পাতলা চুলের পনেরো আনাই সাদা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মুখে প্রশান্ত হাসি। ওই হাসিটুকু যে মেকি নয় তার প্রমাণ তার চোখের দৃষ্টি। ওই দৃষ্টিতেও যেন হাসি ছড়ানো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল অমিত। শত হলেও সম্মানিত বয়স্ক ব্যক্তি। কিন্তু অজিতেশ দত্ত কাছে এসে তার কাঁধে মৃদু স্পর্শ করে বলে ওঠেন, আরে উঠছো কেন? বসো-বসো, কি লজ্জার কথা, তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আমার আবার কাল রাতে একটু জ্বর হয়েছে কিনা। একান্ত পরিচিতের মত কথাগুলো বললেন অজিতেশ।

একজন অপরিচিত ব্যক্তির মুখে 'তুমি' সম্বোধনে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না অমিত। বিশেষ করে তার গায়ে যখন পুলিশের পোশাক রয়েছে।

মুখে সঙ্কোচের হাসি টেনে অমিত বললে, তা' আপনি কষ্ট করে নীচে এলেন কেন? আমি না হয় আর একদিন আসতুম।

—না-না, তা' কি হয়? তোমরা কাজের মানুষ। তোমাদের—। কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান তিনি। একটা লজ্জার ভাব ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সারা মুখে। তারপর আবার বললেন, এই দ্যাখো, কি ভুল! তোমাকে 'তুমি' বলতে শুরু করে দিয়েছি। ওই আমার এক দোষ।

বুড়ো হয়েছি তো, অল্পবয়সীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তুমি শব্দটি বেরিয়ে আসে। চেষ্টা করেও শোধরাতে পারি না নিজেকে। সেদিন একটি ছেলেকে তুমি বলাতে সে তো রেগেই আগুন। তুমিও হয়ত কিছু মনে—

অজিতেশের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একটু সপ্রতিভ হেসে অমিত বললে, না-না, এতে আবার মনে করার কি আছে? আপনি আমাকে তুমিই বলুন না!

একটু থেমে অমিত এবার কাজের কথা পাড়ে। অজিতেশের ব্যবহারে তার মনের সেই বিরক্তিটুকু অনেকটা প্রশমিত হয়ে এসেছে ততক্ষণে। শান্তকণ্ঠে সে বললে, আপনার সেই কুকুরের ব্যাপারটা নিয়ে—

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমাদের সেই মামলাটা নষ্ট করে দিয়েছি বলে বোধহয় রেগে গিয়েছ আমার উপর। সত্যি, ওরকম একটা কাজ করতে আমারও লজ্জা করছিল। বহুদিন তো ওকালতি করেছি, বুঝতে সবই পারি। জানতাম, ওই লোকটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলে আমার বিরুদ্ধে তোমাদের মামলা টিকবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো, কোন উপায় ছিল না আমার। আমার মেয়ে, মানে স্মৃতি—স্মৃতিকণা। মা-মরা মেয়ে তো, একটু বেশি আদুরে। ওর কোন কথাই ঠেলতে পারি না আমি। ওকে যত বোঝাই, সাধারণ মামলা, এতে জেলও হবে না, ফাঁসিও হবে না। আমার নেগ্‌লিজেন্স প্রমাণ হলে কিছু জরিমানা হবে মাত্র। কিন্তু কে শোনে আমার কথা? মা আমার নাছোড়বান্দা, তার কেবল ভয়, বুড়োকে নিয়ে তোমরা টানা-হ্যাঁচড়া করবে। টেনে নিয়ে গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। এসব কাণ্ড সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। তাই জেনেশুনেই অবশেষে এই কাজটা করতে হল আমাকে। তা' আমার শাস্তি একরকম হয়েই গেছে বলতে পারো। এসব মামলায় আদালত যা' জরিমানা করে থাকে তার চাইতে অনেক বেশি খরচ করে লোকটাকে তাড়াতে হয়েছে এখান থেকে—

—বাবা!

অমিত ও অজিতেশ যুগপৎ মুখ তুলে তাকায়।

দরজার সামনে একখানা আটপৌরে শাড়ি পরে এসে দাঁড়িয়েছে স্মৃতিকণা। সদ্য প্রসাধনের হাল্কা আভা তার মুখে। সুন্দর কমনীয় মুখখানায় একটা উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

—তুমি এসব কথা দিব্বি ওঁকে বলে যাচ্ছো? শাসনের সুরে কথাগুলো বললে স্মৃতিকণা।

—কেন মা, কি হয়েছে তাতে? অন্যায় যখন একটা করেই ফেলেছি তখন সেকথা মুখ ফুটে বলতে লজ্জা কিসের?

—তাই বলে তুমি যাকে-তাকে সেই কাহিনী শোনাবে? তোমার কি খেয়াল নেই উনি থানার লোক? শাসনের পরিবর্তে এবার অনুযোগের সুর স্মৃতিকণার কণ্ঠে।

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বৃদ্ধ সস্নেহে মেয়েকে কাছে ডাকেন, আয় মা, কাছে এসে বোস।

স্মৃতিকণা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বাপের গা-ঘেঁষে বসতেই অজিতেশ তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে ওঠেন, আমার পাগলী মা। ওরা পুলিশ তো কি হয়েছে? ওরাও তো এই দেশেরই ছেলে। তোর আমার মত দয়া-মায়া বিবেক ওদেরও আছে। অন্যায় যখন করেছি, তখন তা' স্বীকার করতে দোষ কি?

অমিত এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল স্মৃতিকণার মুখের দিকে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নিজের চোখদু'টো সরিয়ে নেয়।

অজিতেশ এবার অমিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাবা, আমার এই পাগলী মায়ের কথায় রাগ করো না কিন্তু! ওর কথাবার্তাই এরকম। আসলে, মনটা কিন্তু ফুলের মত নরম।

একটু থেমে অজিতেশ আবার বলতে থাকেন, মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে। এবার বি. এ. ফার্স্ট পার্ট দেবে। তা'ছাড়া আমার মায়ের গান যদি শোনো তো—

—বাবা! কি হচ্ছে? লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে ওঠে স্মৃতিকণার। ধমক দেয় অজিতেশকে।

—কেন মা, কিছু মিথ্যে বলেছি? ও তো আমার ছেলের বয়সী। তোর দাদা যদি বেঁচে থাকতো তো এতদিনে ওর মতই হতো।

মৃত পুত্রের কথা মনে পড়তেই বোধহয় অজিতেশ চুপ করেন। তারপর এক সময় নিজের মৌনতা ভঙ্গ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করবি নে মা?

—হ্যাঁ, যাই বাবা। বলেই উঠে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা।

—না-না, ওসবের আবার কি দরকার? মৃদু প্রতিবাদ করে অমিত।

—তা' কি হয়? বাড়িতে এসে একটু চা না খেয়েই চলে যাবে?

স্মৃতিকণা ভেতরে চলে যেতেই অজিতেশ আবার বললেন, ওই মা-মরা মেয়ে আর ওর একটা ছোট ভাই—এই দু'জনকে নিয়েই বেঁচে আছি বাবা। বলেই তিনি উচ্চকণ্ঠে ছেলেকে ডাকেন, শংকর—শংকর!

একটি চাকর ভেতরে ঢুকে জবাব দেয, দাদাবাবু খেলতে গেছে, এখনও ফেরেনি।

—ও—আচ্ছা, তুই যা।

চা পানের পর অজিতেশের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে অমিত অবশেষে একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এবার তা'হলে আমি চলি

—যাবে? ও—হ্যাঁ, তোমরা কাজের মানুষ। তোমাদের আবার বেশিক্ষণ আটকে রাখা চলে না। তা' সময় পেলে আবার এসো কিন্তু।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাইরে চলে আসে অমিত।

রাস্তায় নেমে একবার ঘাড় ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকায় সে। না, নেই। যাকে আব একবার মাত্র চোখের দেখা দেখতে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাকে কিন্তু আর দেখা গেল না কোথাও।

রাস্তায় চলতে চলতে মনের গহন কোণে কিসের যেন এক স্পষ্ট উত্তাপ অনুভব করে অমিত। একটা তরঙ্গিত স্পন্দন যেন ঝংকার তোলে তার দেহের প্রতিটি শিরায়। এক ব্যঞ্জনাময় অপার্থিব আত্ম-সুরভিত সৌন্দর্যের প্রকাশ মনটাকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলে।

অমিত অনুভব করে এই মুহূর্তে তার বিশেষ প্রয়োজন এমন একটু নির্জন স্থান যেখানে একা বসে নিজের মনটাকে নিয়ে সে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করতে পারে। মনের সেই সুরের ঝংকার শুনতে পারে কান পেতে। উপলব্ধি করতে পারে তার বর্ণ-সুষমা একাগ্রভাবে।

কিন্তু না, তা' সম্ভব নয়। ভাবে বিভোর হলে চলবে না তার। সে হচ্ছে জেলার কোতোয়ালী থানার সেকেণ্ড অফিসার। প্রচুর দায়িত্ব তার কাঁধে। কর্তব্যকর্ম অবহেলার বিনিময়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করার সুযোগ তার নেই। ও প্রসঙ্গ তোলা থাক অবসর সময়ের জন্যে।

শহরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র চকবাজার। ওখানেই পাইকারী ব্যবসাদার জয়রাম সিংয়ের দোকান। প্রকাণ্ড বড় গুদামঘর, পাহাড়-প্রমাণ উঁচু বস্তার সারি। তিন-চারটি অতিকায় দাঁড়িপাল্লায় বস্তা-বস্তা মালপত্র ওজন হয়। আট-দশজন কর্মচারী ছুটোছুটি করে কাজ করে

চলে। আর একপাশে সাদা ধবধবে ফরাস পাতা একখানা প্রশস্ত খাটের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে থাকে জয়রাম সিং।

অমিত যখন দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন কিন্তু তার সেই পরিচিত স্থানটিতে ছিল না জয়রাম।

একজন কর্মচারী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, কর্তা বাড়িতে আছেন। ডেকে দেব?

—হ্যাঁ, দিন। জবাব দেয় অমিত।

হঠাৎ পুলিশের আগমনে দোকানের কাজকর্মে ছন্দপতন ঘটে। কর্মচারীরা হাতের কাজ ফেলে তাকায় তার দিকে। পুলিশের আগমনের কারণ তাদের অজানা নয়। কানাঘুষায় ব্যাপারটা তারাও জানতে পেরেছিল।

কর্মচারীটি জয়রামকে ডাকতে পা বাড়াতেই অমিত বলে ওঠে, শুনুন, এখানে বসে কথা বলতে বিস্তর অসুবিধা। তার চেয়ে আমাকেই বরঞ্চ নিয়ে চলুন তাঁর বাড়িতে।

দোকানের কাছেই জয়রাম সিংয়ের নিজস্ব দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় থাকে ভাড়াটেরা। আর ওপরে মালিক স্বয়ং। বাড়িটা নতুন হলেও তার গঠনপ্রকৃতি খানিকটা সাবেকী ধরনের—বিহারের গ্রামাঞ্চলে ধনী ব্যবসায়ীর কোঠা বাড়ির মত। সামনে জাফরি-কাটা বারান্দা। দেয়ালের এখানে সেখানে নীল ও গেরুয়া রঙের ফুল, লতা-পাতার বাহার।

জয়রাম সিংয়ের আদি নিবাস বিহারের মজঃফরপুর জেলায়। কিন্তু, স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সে এই শহরেই বাস করে আসছে বহুকাল।

দোতলার বাইরের ঘরে একখানা চেয়ারে বিরসমুখে বসে ছিল জয়রাম। সারা মুখে চোখে তার দুর্ভাবনার চিহ্ন।

অমিতকে দেখেই উঠে দাঁড়ায় জয়রাম। ভুঁড়িসর্বস্ব ব্যবসায়ী দেহে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অমিতের সামনে এসে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে কান্নায়, এ আমার কি হল দারোগা সাহেব! মেয়েটা যে আমাকে এমনিভাবে মুখে চুণ-কালি মাখাবে তা' আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে জয়রাম। কথার মধ্যে দু'একটা হিন্দী শব্দের ব্যবহার ছাড়া তার বাংলা উচ্চারণ প্রায় নিখুঁত।

অমিত সান্ত্বনা দেয়, কি আর করবেন? যা' হবার তা' তো হয়েই গেছে। এখন দেখছি ওদের খুঁজে পাওয়া যায় কিনা!

—হ্যাঁ দেখুন, তাই দেখুন। ওই বে-সরম মাস্টারটাকে ধরে আপনারা ফাঁসিতে লটকে দিন। যত টাকা খরচ করতে হয় আমি খরচ করতে রাজি আছি, দারোগা সাহেব।

মনে মনে হাসে অমিত। গরজ বড় বালাই। প্যাঁচে পড়ে জয়রাম সিংয়ের মত কঞ্জুস ব্যবসাদার পর্যন্ত অকাতরে অর্থব্যয় করতে রাজি।

অমিত বললে, না,—না, আপনাকে খরচ করতে হবে কেন? আমরাই সব ব্যবস্থা করছি। তারপর একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে, সেই গানের মাস্টার পরাশর সেন আপনার মেয়েকে কতদিন ধরে গান শেখাতো?

—তা' প্রায় বছর তিনেক। গানের দিকে মিন্‌তির বরাবরই খুব ঝোঁক ছিল।

জয়রামের মেয়ে মিন্‌তি সিং। দেখতে শুনতে ছিল ভালই। শহরেরর একটা বাংলা মেয়ে-স্কুলে পড়ত। কথাবার্তায় ও চাল-চলনে বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে কোনই তফাৎ ছিল না তার। নামটাও বাঙালী ধরনের—মিন্‌তি সিং অর্থাৎ মিনতি সিংহ।

—ওদের মধ্যে যে এতদিন ধরে এমন একটা ব্যাপার চলছে তা' আপনারা কিছুই টের পান নি?

—কি করে টের পাবো, বলুন? মিন্‌তির বয়স সতের আঠারো, আর ওই মাস্টারের পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ তো হবেই। বৌ আছে, কতগুলো ছেলেমেয়েও আছে। লোকটা যে এমন একটা কাণ্ড করে বসবে, তা' কি বুঝতে পেরেছি? গানের মাস্টার হিসেবে লোকটার বেশ নামও আছে। তাই ওকে রেখেছিলাম। কিন্তু এই বয়সেও যে লোকটার ইমান্ বলে কোন পদার্থ নেই তা' কি করে ধারণা করবো, দারোগা সাহেব? শেষে কিনা আমার ঐ কচি মেয়েটাকে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আমার মুখে চুণ-কালি দিয়ে দিলে!

মনে মনে আবার একটু হাসে অমিত। নিজের মেয়ের অপরাধের কথা একবারও মুখে উচ্চারণ না করে অপর পক্ষের ওপরই সম্পূর্ণ দোষটা চাপাতে চাইছে মেয়ের বাপ। সংসারে এমনিই হয়।

মুখে সে বললে, পরাশর সেন যে বিবাহিত, তার যে ছেলেমেয়ে আছে একথা মিন্‌তি জানত না?

—হ্যাঁ, জানত। আমরা সবাই জানতাম।

একটু থেমে অমিত আবার বললে, তা'হলে আপনার মেয়ের কথাটাও একবার ভেবে দেখুন। কি পছন্দ তার! সব জেনেশুনেও সে সায় দিয়েছে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে জয়রাম বললে, তা' ঠিক দারোগা সাহেব। শত হলেও মেয়ে তো! ওদের ভোলাতে কতক্ষণ?

—আচ্ছা, ওরা কোথায় পালিয়ে যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—আমি তো কিছুই ধারণা করতে পারছি না দারোগা সাহেব।

—টাকাপয়সা কিছু নিয়ে গেছে?

—তেমন তো মনে হয় না। তবে মেয়েটার নিজের হাতে দশ-বিশ টাকা থাকতে পারে। আর, পরাশরের আর্থিক অবস্থা তো নাকি তেমন ভাল নয় বলেই শুনেছি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই দু'দশ টাকা ধার নিত আমার কাছ থেকে।

অমিত জয়রামের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে। তারপর একসময় সেখান থেকে বেরিয়ে শহরের আর একটা বস্তি অঞ্চলে এসে হাজির হয়। ঐ বস্তিতেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সপরিবারে বাস করত পরাশর সেন।

পরাশর সেনের স্ত্রী কনক সেন। ফরসা রোগা চেহারা। কালিপড়া লণ্ঠনের মৃদু আলোয় তার বিষাদমলিন মুখখানা নজরে পড়ে অমিতের।

মায়ের পিছু পিছু ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা তিন-চারটি ছেলেমেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের বেশধারী অমিতের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নিরুদ্দিষ্ট পিতার জন্যে দুশ্চিন্তার চাইতে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে পুলিশের এই আগমনটাই সেই মুহূর্তে তাদের শিশুমনের ওপর রেখাপাত করে বেশি।

কনকের চোখে জল নেই। কণ্ঠস্বরে কিন্তু দুখের চাইতে অভিমানের সুরের প্রাধান্য। অমিতের প্রশ্নের জবাবে নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করে সে শুধু চাপাকণ্ঠে জবাব দেয়, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি কিছুই জানি না।

—আপনি কি ব্যাপারটাকে আঁচ করেছিলেন আগে?

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে একসময় মৃদুকণ্ঠে সে জবাব দেয়, আঁচ করতে পারলেও কি করতে পারতাম?

—তা' তো বটেই। মনে মনে ভাবতে থাকে অমিত, একটি অসহায় স্ত্রীলোক যখন একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে আর্থিক অভাব অনটনে সর্বদাই বিব্রত, তখন তার পক্ষে স্বামীর ওপরে কতটা নজর রাখা সম্ভব? তা'ছাড়া সেই নজরে কাজই বা হতে পারে কতটুকু?

কিন্তু অমিত আশ্চর্য হয় কনকের মত একটি স্ত্রীলোকের ব্যবহারে। স্ত্রী ও একদল ছেলেমেয়েকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে রেখে স্বামী তার এক ছাত্রীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ। এমনি অবস্থায় যে কোন স্ত্রীলোকেরই ভেঙে পড়বার কথা। সেদিক দিয়ে কিন্তু কনককে বেশ শক্তই বলতে হবে। ভেঙে পড়েনি এখনও।

—আচ্ছা, আপনার স্বামী কোথায় যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

—জানি না। তেমনি চাপাকণ্ঠে জবাব দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কনক।

॥ আট ॥

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াটা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালেও আজ সকাল থেকেই কেন যেন উগ্রচণ্ডীরূপ ধারণ করে চোখা চোখা বাক্যবাণে স্বামীকে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করেছে থানার দারোগা পিনাকী সরকারের স্ত্রী বাসন্তী।

বাসন্তী চিরকালই একটু উগ্রপ্রকৃতির। দারোগার বৌ হয়ে সে এতদিনে বুঝতে পেরেছে সংসারে অর্থের চাইতে বড় আর কিছুই নেই। কিন্তু তার স্বামী রত্নটি এমনি যে উপরি পয়সা রোজগারের কোন চেষ্টাই তার নেই। কেউ সেধে দিলেও তা' ছোঁয় না।

মুখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলতে থাকে, উঃ, সৎ! সৎ না ছাই! সততা দিয়ে ধুয়ে জল খাবে! আসল কথা, মুরোদ নেই। পুলিশের চাকরি করে আবার সততা ফলাচ্ছো!

স্ত্রীর সঙ্গে বাক্-যুদ্ধে পিনাকী চিরকালই পশ্চাদপসরণ করে থাকে। বলতে গেলে ওটা শুধু মাত্র পিনাকীর একারই বিশেষত্ব নয়, গোটা পৃথিবীর স্বামী জাতটারই ওই বিশেষত্ব। বাক্-যুদ্ধে স্ত্রীর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা অধিকাংশ স্বামীরই নেই। তাই মৃদুকণ্ঠে পিনাকী জবাব দেয়, দেখ, এতে আর কিছু থাক্ চাই না থাক্, মনে শান্তি আছে। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি।

—তা' তো বটেই। ওই তো এক কাজ শিখেছো কেবল, ঘুম আর ঘুম। যেন আর কেউ ঘুমোয় না। তারা যেন সারা রাত দুশ্চিন্তায় জেগে বসে থাকে।

—অন্যে কে কি করে তা' দিয়ে আমার প্রয়োজন কি?

—তা' তো বটেই! যাও না। পাশাপাশি কোয়ার্টারে অন্য অফিসারও তো আছে। দেখে এসো না তাদের ঘর-কন্না। কেউ বাড়ি করেছে, কেউ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। আর তুমি কি করেছো? আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একটা গয়না পর্যন্ত তুলে দিতে পারোনি আমার গায়ে। আবার মুরোদ দেখাচ্ছো! ওই তোমাদের ও. সি.—ভবদেববাবু। বেশ দু'পয়সা করেছেন ভদ্রলোক। আর তুমি—

বাসন্তীর কথা শেষ হবার আগেই পিনাকী একটু সুর চড়িয়ে বলে ওঠে, থাক্—থাক্। যে অমন পয়সা করেছে, করুক। আমার কাজ নেই ঐ পয়সায়। জানো, সারা জেলায় সৎ বলে আমার কি সুনাম?

—কি বললে! তোমার খুব সুনাম? ভেবেছো আমি বুঝি কিছু জানি না? জেলার সবাই জানে তোমার মত এমন কুড়ের বাদশা তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে আর দ্বিতীয়টি নেই। নড়ে বসতে চাও না তুমি। আরামে চাকরি করে খেতে চাও কেবল।

—হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি একটু আরামপ্রিয়। কিন্তু সৎ তো বটে। অসৎপথে পয়সা উপার্জন করি না।

—থামো! ধমকে ওঠে বাসন্তী। অমন সততার মুখে আগুন! ওই তোমাদের ভবদেববাবু। ওঁর কড়ে আঙুলের যোগ্যতাও তোমার নেই। তোমাদের ডিপার্টমেণ্টের লোকের মুখেই শুনতে পাই সারা জেলায় ভবদেববাবুর সুনাম। অমন অফিসার নাকি আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই, উপরি পয়সা আয় করার দোষটুকু তাঁর নিজের গুণে ঢেকে গেছে। এলাকায় কি দারুণ প্রতিপত্তি তাঁর। আর তোমার? নিজের অপদার্থতার দোষে তোমার সততার গুণ ঢাকা পড়েছে। সবাই তোমাকে একটি আপদ বলে মনে করে।

এবার রেগে ওঠে পিনাকী। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, কি বললে? আমি অপদার্থ?

নিজেকে সংশোধন করে নিতে চেষ্টা করে বাসন্তী বললে, আমি বলবো কেন? সবাই বলে। সকলের মুখেই ওই কথা।

খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে থাকে পিনাকী। তারপর একসময় রণে ভঙ্গ দিয়ে পাশের ঘরে উঠে যায়। আর, রান্নাঘরে ঢুকে ঘর-কন্নার কাজ করতে করতে একা একাই ঝগড়া করতে থাকে বাসন্তী। নিজের ক্ষুব্ধ মনটাকে শান্ত করতে যতই চেষ্টা করতে থাকে, ততই সেটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নিজেকে চিরবঞ্চিতা বলে মনে হতে থাকে তার। ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয় নিজের অদৃষ্টকে। এমন একটি লোকের হাতেই পড়তে হয়েছিল তাকে।

স্বামীর কাছে তেমন কিছু দাবী ছিল না বাসন্তীর। সে চেয়েছিল পিনাকী আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করুক। একটু চট্‌পটে হোক্। দু'পয়সা উপরি আয়ও করুক। কিন্তু তার বদলে পিনাকীর এই কাজকর্মের প্রতি, এমনকি পয়সা-কড়ির প্রতিও এই আসক্তিহীনতা, কোনরকমে মাথাগুঁজে থেকে সময় কাটানো কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারত না বাসন্তী। স্বামীর মধ্যে সে দেখতে চেয়েছিল দোষ-গুণ মিশ্রিত একটা গতিশীল জীবনের স্রোত। আর তার বদলে পিনাকীর চাল-চলন হয়ে উঠল ঠিক একটা শামুকের মত। বাছবিচার অত্যন্ত বেশি। অলস আয়েসী জীবনে কামনা-বাসনার একান্ত অভাব। কোনরকমে নিজের খোলসের মধ্যে প্রাণটাকে জীইয়ে রাখা, আর সেটাকেই নিজের অসাধারণ কৃতিত্ব বলে মনে করে একটা আত্ম-সন্তুষ্টির ভাব।

সারা সকালটা বাড়িতে কাটিয়ে বেলা একটা নাগাদ পোশাক পরে থানায় এসে হাজির হয় পিনাকী। থানা ডিউটি এখন তাকেই নিতে হবে জুনিয়র এ. এস. আই. সুশান্তর কাছ থেকে।

কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করার জন্যে ছটফট করেছিল সুশান্ত। কনস্টেবল্ থেকে নতুন প্রমোশন পেয়ে এ. এস. আই হয়েছে। বিয়েও করেছে মাত্র মাস কয়েক আগে। কাজে-কর্মে বেশ চটপটে। উৎসাহ আছে, উদ্দীপনাও আছে, জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টারও অভাব নেই।

থানা-সংলগ্ন কোয়ার্টারে স্ত্রী রেখাকে নিয়ে তার সংসার। এর মধ্যেই ঝিকে দিয়ে সুশান্তকে খবর পাঠিয়েছে রেখা। কিন্তু যাই বললেই যাওয়া চলে না। হাতের কাজ শেষ করেই উঠতে হবে তাকে। তা'ছাড়া, তার কাছ থেকে থানার ডিউটি নেবে পিনাকীবাবু, তবেই তার ছুটি। আর পিনাকীবাবু যে ধরনের ব্যক্তি তাতে তার বেলা বারোটায় থানায় আসার কথা থাকলেও একটা দেড়টার আগে কিছুতেই দেখা মিলবে না। কোয়ার্টারে ডাকতে পাঠালে আবার অসন্তুষ্ট হবে। থানায় এসে গায়ের ঝাল ঝাড়বে ঐ সুশান্তর ওপর।

এমনিতেই সে জুনিয়ার এ. এস. আই.। বয়সে তো বটেই পদ-গৌরবেও থানার সর্বকনিষ্ঠ অফিসার। তাই প্রায় সকলের কাছেই ধমক খেতে হয় বেচারী সুশান্তকে। থানার কাজকর্মে কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেই সিঁড়ির ধাপের মত এক ধাপ করে নিচে নামতে নামতে অবশেষে পুরো দায়টা এসে পড়ে তারই ওপর। অবশ্য বড়বাবু অর্থাৎ ভবদেববাবু তেমন কিছু বলে না তাকে। বরঞ্চ একটু স্নেহের দৃষ্টিতেই তাকে দেখে। কাজকর্মে ভুল হলে না ধম্‌কে শান্তকণ্ঠে ত্রুটি সংশোধন করে নিতে উপদেশ দেয়।

আর মেজবাবু অমিতের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। সেকেণ্ড অফিসার হলেও সে নিজেও প্রায় তার মতই নতুন। অভিজ্ঞতাও কম। কেবল যত কিছু অসুবিধা বাকি তিনজন অফিসারকে নিয়ে—দারোগা পিনাকীবাবু ও ধূর্জটিবাবু, আর সিনিয়র এ. এস. আই. শ্রীপতি মিত্র। ধূর্জটিবাবুকে নিয়ে এমনি কোন অসুবিধা নেই। কেবল রেগে গেলেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ভদ্রলোক। তখন সে কি বলছে, কি করছে কিছুই খেয়াল থাকে না। কিন্তু পিনাকী সরকার আবার অন্য ধরনের। তার প্রতিটি কথা গায়ে যেন ভীমরুলের হুল্ ফুটিয়ে দেয়। বুড়ো হলেও শ্রীপতিও কম যায় না। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তো আছেই, আর আছে নিজের বয়সের কথা চিন্তা করে উপদেশামৃত বর্ষণ। আর সেই সঙ্গে নিজের গুণপনার শত সহস্র রকমের নজির।

কাউকেই চটায় না সুশান্ত। সকলের কথাই নির্বিবাদে হজম করে যায়, সকলের হুকুম মতই চলতে চেষ্টা করে। তার এই অল্পদিনের চাকরির অভিজ্ঞতায় সে বুঝে নিয়েছে সিনিয়র ও সুপিরিয়র অফিসারদের চটিয়ে আখেরে কোনদিনই ভাল হয় না কারুর। এই ডিপার্টমেণ্টে উন্নতির সোপান হচ্ছে চুপ করে থাকা—নট্ টু কোশ্চেন, বাট্ টু ওবে। প্রশ্ন কিম্বা আরগুমেণ্ট না করে নিঃশব্দে হুকুম তামিল করাটাই উন্নতির প্রধান রাস্তা। এই রাস্তায় চলেই সে এত অল্প সময়ের মধ্যে কনস্টেবল্ থেকে এ. এস. আই. হতে পেরেছে। এই পথেই সে এস. আই. অর্থাৎ দারোগাও হতে পারবে। তারপর ইন্‌সপেক্টর। চেষ্টা থাকলে আরও ওপরে ওঠাও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সুশান্তর মুশকিল হয়েছে স্ত্রী রেখাকে নিয়ে। গাঁয়ের মেয়ে, সরল প্রকৃতির। একটু ভীতু, একটু অতিরিক্ত সন্দেহাকুল মন।

পুলিশ সম্বন্ধে বরাবরই ভয় ছিল তার। সেই পুলিশ বরই কপালে জুটল। গ্রামাঞ্চলে পুলিশ মানেই দারোগা, তা' সে এ. এস. আই-ই হোক্ আর ইন্‌সপেক্টর-ই হোক্। বিয়ের পর প্রতিবেশিনী ঠাকুমা-দিদিমার দল ঠাট্টা করে বলেছিল তাকে, আর তোকে পায় কে? এখন তুই হলি গিয়ে দারোগার বৌ। এখন তো হাতে মাথা কাটবি সকলের।

সকলের কথা শুনে-শুনে তার নিজেরও কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল, সত্যিই বুঝি তাই। পুলিশের স্ত্রী হয়ে সে নিজে বোধহয় সত্যিই কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতারর অধিকারিণী হয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে পুলিশ কোয়ার্টারে থাকতে থাকতে সেই ধারণাটা একটু একটু করে বদলে গিয়েছিল। এখানে এসে সে দেখতে পেল পুলিশের স্ত্রী বলে কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারীণী তো সে নয়ই, উল্টে পুলিশ স্বামীকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অবধি রইল না তার। দিন-রাত চোর-ডাকাত নিয়ে কারবার, শতরকমের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এগিয়ে যেতে হয় সুশান্তকে। মাঝে মাঝেই রাত কাটাতে হয় বাইরে কোথাও, কিম্বা থানায়।

পুলিশ কোয়ার্টারে দারোগা পিনাকী সরকারের স্ত্রী বাসন্তীর কাছ থেকেই পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলল রেখা। সত্যি-মিথ্যার জাল বুনে বাসন্তী যখন নানা ধরনের কাহিনী রঙ্-চঙ্ সহযোগে বর্ণনা করে যেত, তখন দুরু দুরু বুকে একান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে যেত রেখা। বিশ্বাস করত বাসন্তীর প্রতিটি কথা।

স্বামী সম্বন্ধে সচেতন থাকতে বাসন্তীই উপদেশ দিয়েছিল রেখাকে। বলেছিল, জানো, এদের সম্বন্ধে সবসময় সাবধান থাকতে হবে। একমুহূর্তে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়েছো কি সর্বনাশ!

—কেন? প্রশ্ন করেছিল রেখা।

—কেন আবার কি? এই চাকরিতে প্রলোভনের কি অন্ত আছে? পুলিশের চাকরিতে প্রচুর সুযোগ, সবসময় সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে বাইরে বাইরে ওরা কি করে বেড়াবে তা' ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না তুমি।

—তাই নাকি, দিদি?

—তা' না হলে আর বলছি কি! এই ধর না কেন, মাঝে মাঝেই গভীর রাতে ওদের খারাপ পাড়ায় ঘুরতে হয়। সেখানে—

বাসন্তীর কথার মধ্যেই প্রশ্ন করেছিল রেখা, খারাপ পাড়া? সেটা আবার কোথায়?

আনাড়ি রেখার কথায় হেসে উঠেছিল বাসন্তী। বলেছিল, তুমি দেখছি কিছুই জানো না! খারাপ পাড়া মানে খারাপ মেয়েছেলেদের পাড়া—গণিকাপল্লী।

—সেকি? সেখানেও যেতে হয় নাকি ওদের? কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদের সুর বেজে উঠেছিল রেখার।

—কেন, সুশান্তবাবু কখনও বলে নি তোমাকে?

—না তো, অভিমানে মুখখানা থম্থমে হয়ে উঠেছিল রেখার। ওসব খারাপ জায়গায় আবার কিসের ডিউটি, দিদি?

—হ্যাঁ আছে। চোর-ডাকাতরা নাকি মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। ওদের খুঁজতে যেতে হয়। এখন ধর না কেন, সেখানে যেতে যেতেই যদি কারুর কোন খারাপ অভ্যেস দাঁড়িয়ে যায় তো বাড়িতে বসে তুমি তা' টের পাবে কি করে? আর টের পেলেই বা করবে কি?

চিন্তিত মুখে রেখা কেবল তাকিয়ে থাকে বাসন্তীর মুখের দিকে। ব্যাপারটা সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছিল তাকে। সত্যিই তো, পুরুষের এ ধরনের খারাপ অভ্যেস দাঁড়িয়ে যেতে কতক্ষণ?

একসময় সে প্রশ্ন করেছিল বাসন্তীকে, আচ্ছা দিদি, পিনাকীবাবুকেও কি যেতে হয় সেখানে?

—হয় বৈকি! প্রথম প্রথম কড়া নজর রাখতাম ওর ওপর। এখন অবশ্য আর ততটা নজর না দিলেও চলে। বয়েস হয়েছে তো! আর সত্যি কথা বলতে কি, ওসব দিকে কোনদিনই তেমন নজর নেই ওর।

—তা'হলে তো সত্যিই তুমি ভাগ্যবতী, দিদি!

—তা' যা' বলেছো! ঐ একটা দিকে আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত।

সেইদিন থেকে সুশান্তর ওপর নজরটা একটু প্রখরতর করে তুলেছিল রেখা। কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে এলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জিজ্ঞেস করত সুশান্তকে। কোথায় গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে, সেখানে কার সাথে কথা বললে, কি ধরনের কথা বললে ইত্যাদি।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে একদিন সুশান্ত হেসে বলেছিল রেখাকে, আচ্ছা বলতো, আজকাল তুমি এত কথা জিজ্ঞেস কর কেন আমাকে?'

স্বামীর দিকে কটাক্ষ হেনে মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল রেখা, তোমাদের পুরুষদের কি কিছু বিশ্বাস আছে! বিশেষ করে যখন পুলিশে চাকরি করো!

একদিন রেখা সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিল সুশান্তকে, তোমাকেও যে মাঝে মাঝে ওই সব খারাপ পাড়ায় ডিউটি করতে যেতে হয় সেকথা তো কই কোনদিন আমাকে বলো নি তুমি!

—কোন্ খারাপ পাড়ায়? বিষয়টা বুঝতে না পেরে সুশান্ত প্রশ্ন করেছিল তাকে।

—ঐ যে খারাপ পাড়ায়—যেখানে খারাপ মেয়েছেলেরা থাকে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিয়েছিল সুশান্ত, ও—তুমি প্রস্টিটুট্‌দের কথা বলছো? তা' হ্যাঁ, যেতে হয় বৈকি! প্রস্টিটুট্ কোয়ার্টার রেইডে মাঝে মাঝে যেতে হয়। তা' সে তো ডিউটি। এ কথার আর বলাবলির কি আছে?

—কিছু নেই বুঝি? কণ্ঠে অভিমানের সুর রেখার।

আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত। সুশান্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, না—না, তা' নয়। তুমি যদি বলো তো এবার থেকে ওসব জায়গায় যাওয়ার আগে তোমাকে জানিয়েই যাবো।

ঝড় আর উঠল না। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিল সুশান্ত। ঝড়ের চাইতেও বর্ষণে তার বড় ভয়। রেখার বড় বড় চোখদু'টো যেন অফুরন্ত জলের আধার। একবার বর্ষণ শুরু হলে আর রক্ষা নেই।

এরপর থেকে প্রস্টিটুট্ কোয়ার্টার রেইডে যাওয়ার আগে সে রেখাকে জানিয়েই যেত এবং ফিরে এসে লক্ষ্য করত রেখা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মুখখানা পরীক্ষা করছে, যেন একজন অভিজ্ঞ জহুরী নিবিষ্ট মনে যাচাই করে নিচ্ছে তার হীরে-জহরত।

হাসি পেত সুশান্তর। হেসে বলত রেখাকে, কি দেখলে? কিছু খুঁজে পেলে?

রেখাও হেসে জবাব দিত, খুঁজে পেলে সেকথা বলবো নাকি তোমাকে? তার আগেই গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়বো না?

স্ত্রীকে কাছে টেনে এনে আদর করতে করতে সুশান্ত শান্তকণ্ঠে বলত, বাঘ-ভালুকের জঙ্গলে যখন আমাকে ঘুরতেই হবে তখন দিনরাত কেবল ভয়ে ভয়ে থেকে আর কি করবে? তার চেয়ে আমাকে বিশ্বাস করতে শেখো। দেখবে, মনে অনেক শান্তি পাবে।

স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে সজল চোখে তার বুকে মুখ লুকোত রেখা। মন চাইত স্বামীকে বিশ্বাস করতে। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ভয়ও পেয়ে বসত তাকে। প্রচুর প্রলোভন ওদের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। ওদের সম্বন্ধে কি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকা চলে?

ছুটির দিন।

বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয়েছি অমিতের বাসায়। ভেবেছিলাম ওকে হয়· এখন পাবো না। তবুও একবার দেখে যাই বলেই এসেছিলাম। এসে দেখি অমিত বাস রয়েছে। সাধারণত এই সময় সে থাকে না। হয় ধড়াচুড়ো পরে থানায় যায়, নয়তো বেরিয়ে যায় কোন মামলার তদন্তে। সেই দিনের সেই ঘটনার পর থেকে বিরক্ত হয়ে খেলাধুলো করতে ক্লাবে আর যায় না অমিত।

ঘরে ঢুকে দেখি বিরস মুখে বসে আছে সে। একমনে কি যেন ভাবছে।

—কি হে, বসে বসে কিসের ধ্যান করছো বন্ধু এই অসময়ে? প্রশ্ন করি আমি।

অমিত একবার আমার দিকে তাকায়। মৃদুকণ্ঠে মাত্র দু'টো শব্দ উচ্চারণ করে আহ্বান করে আমাকে। তারপর আবার চুপ করে থাকে।

—কিহে, এত ভাবছো কি? আবার প্রশ্ন করি আমি।

অমিত আবার তাকায় আমার দিকে। তারপর আচমকা হঠাৎ ফেটে পড়ে আমার ওপর। বললে, ভাবছি তোমাদের কথা—তোমাদের স্বার্থপরতার কথা।

—কেন, কি হল আবার? প্রশ্ন করি আমি। বুঝতে পারি, আবার কোন একটা ব্যাপারে মনে আঘাত পেয়েছে অমিত। তাই তার এই বিরক্ত কণ্ঠস্বর।

একমুহূর্ত থেমে জবাব দেয় অমিত, জানো, এই ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছিলাম জনসাধারণের সেবা করবো বলে, বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াবো বলে, তাদের উপকার করবো বলে। কিন্তু এখন দেখছি এদেশের মানুষ এত স্বার্থপর যে, এদের ভাল করা স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য।

আমি আবার বললাম, আগে ব্যাপারটা খুলেই বলো না।

আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের মনেই বলে চলে অমিত, আর সবচাইতে দুঃখ পেয়েছি আজ বড়বাবুর কথায়। যে বড়বাবুকে আমি এত শ্রদ্ধা করি আজ তিনিই কিনা লোকের মুখ চেয়ে কাজ করতে উপদেশ দিলেন আমাকে। ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে অপরাধীর মুরুব্বির জোরের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে বললেন তিনি!

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। কাল রাতের সেই ঘটনার জের এটা। শহরের সবেদাবাগান এলাকায় কাল রাতের সেই জলসার আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম। একদল ছোকরার উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অনুষ্ঠানটি মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা বাইরে থেকে এলোপাথারি ঢিল ছুঁড়ে অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিল। ইটের টুকরোর আঘাতে পাঁচ-ছ'জন দর্শকও আহত হয়েছিল। একজনকে তো হাসপাতালে ভর্তি করতেই হয়েছিল, ভদ্রলোকের একটা চোখ বোধহয় নষ্ট হয়ে যাবে। সাংবাদিক হিসেবে অনুষ্ঠানটা 'কভার' করতে গিয়েছিলাম আমি। শেষে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচি।

অমিতকে প্রশ্ন করি, কাল রাতের সেই সবেদাবাগানের ব্যাপারটা তো?

মাথা নেয়ে সায় দেয় অমিত। বললে, হ্যাঁ, জলসার উদ্যোক্তারা একটা মামলা রুজু করেছিল সেই দলের বিরুদ্ধে। আজ সারাদিন ঘুরে ঘুরে ওদের মধ্যে চারজনকে এ্যারেস্ট করেছি। বাকিগুলো ফেরার। ভেবেছিলাম তদন্তের ফলাফল যা-ই হোক্ না কেন, ওদের দিনকয়েক হাজতে রেখে দিলে খানিকটা শায়েস্তা হবে। কিন্তু—

—কিন্তু কি? প্রশ্ন করি আমি।

—কিন্তু বড়বাবু তা' হতে দিলেন না। ওদের নিয়ে থানায় এসে পৌঁছতেই বড়বাবু বললেন ওদের জামিনে ছেড়ে দিতে। ওদের নাকি বিরাট মুরুব্বির জোর। ওদের এ্যারেস্ট

করে থানায় নিয়ে আসার মধ্যেই নাকি সেইসব বড় বড় মুরুব্বিরা বড়বাবুকে ফোন করতে শুরু করে দিয়েছিল।

—তা' ছেড়ে দিলে তাদের জামিনে? প্রশ্ন করি আমি।

—না দিয়ে উপায় কি, বলো? বড়বাবুর হুকুম! সেই মুহূর্তে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল আমার। বড়বাবুর সঙ্গে খানিকটা তর্কও করেছিলাম। বলেছিলাম, তা'হলে অপরাধীদের মুরুব্বির মুখ চেয়ে আমাদের কাজ করতে হবে?'

—জবাবে বড়বাবু কি বললেন?

বিরক্ত ভঙ্গিতে জবাব দেয় অমিত, বললেন সেই বস্তাপচা পুরনো কথা যা' অন্ততঃ ভবদেববাবুর মত ব্যক্তির মুখে আমি আশা করি নি। বললেন, প্রয়োজনে তা' করতে হবে বৈকি! নইলে সিচুয়েশনটা আরও ঘোরাল হয়ে উঠবে। আমরা ট্যাক্টলেস প্রতিপন্ন হবো।

একটু সময় চিন্তা করে আমি বললাম, বড়বাবু ঠিকই বলেছেন।

—ঠিক বলেছেন? প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে অমিত।

আমি জবাব দিই, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সময়-সময় পশ্চাদপসরণও একটা নীতি। প্রয়োজনে তাও করতে হয়। নইলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আমি ব্যাপারটা জানি। সবেদাবাগানের গণ্ডগোলটা একটা দলাদলির ঘটনা। প্রতিপক্ষের মুরুব্বির জোর প্রচুর। শহরের অনেক রথী-মহারথী ওদের দলে আছে। এই অবস্থায় ওদের জামিনে ছেড়ে না দিলে হয়ত তোমার নিজেরই কোন বিপদ হত।

—কিন্তু তাই বলে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত কাজ করার স্বাধীনতা থাকবে না আমাদের? এই কথাই বলতে চাইছো তুমি?

জবাবে আমি বলি, সময়-সময় সেই স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হয় বৈকি। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সব সময় ন্যায়-অন্যায়ের চুলচেরা বিচার করে কাজ করতে এগিয়ে গেলে ঠকতে হয়। তাই বলছি, বড়বাবু ঠিকই বলেছেন। ওই মুরুব্বিদের কথামত কাজ করে আপাততঃ সিচুয়েশনটা ম্যানেজ করে নিলেন তিনি। প্রতিপক্ষের সেই ক্ষমতাবান মুরুব্বিরা সন্তুষ্ট হল। তারা ভাবল থানার বড়বাবু এখন তাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু ওঁর নাম ভবদেব ব্যানার্জি, ওঁর হাতের মার যে কোন্ দিক দিয়ে আসবে তা' তারা ধারণাই করতে পারবে না। যখন বুঝতে পারবে, তখন কাজ শেষ। আর কিছুই করণীয় থাকবে না তখন। শেষ চালে বাজিমাৎ করে দেবেন ভবদেব ব্যানার্জি। দীর্ঘদিন দেখছি তাঁকে। এই জন্যেই ওঁর এত সুনাম। ওঁর মত ট্যাক্টফুল অফিসার সারা জেলায় আর দ্বিতীয়টি পাবে না।

কথা বলতে বলতে আমি লক্ষ্য করছিলাম অমিতকে। দেখছিলাম, ওর মুখের সেই ম্লান ভাবটা একটু একটু করে যেন সরে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, অন্ততঃ বড়বাবুর ওপর ওর সেই অভিমানটুকু অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

আমি থামতেই অমিত কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় একজন কনস্টেবল। অমিতকে স্যালুট করে কনস্টেবলটি বললে, হুজুর, বড়বাবু আপকো থানেমে বোলাতে হেঁ।

—কিস্ লিয়ে, মালুম্ হ্যাঁয় কুছ? প্রশ্ন করে অমিত।

—নেহি হুজুর। লেকিন, বর্ধমান জেলাকা পুলিশ এক আদ্মী ঔর এক লেড়কী কো এ্যারেস্ট্ করকে থানেমে লে আয়া। ইস্ লিয়ে কুছ—

কনস্টেবলটির কথা শেষ হবার আগেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অমিত বললে, ও বুঝেছি, সেই পরাশর সেন ও মিন্‌তি সিং বোধহয় বর্ধমানের কোন থানাতে ধরা পড়েছে। ওদেরই বোধহয় পাঠিয়েছে। তারপর কনস্টেবলটির দিকে তাকিয়ে আবার বললে, ঠিক হ্যাঁয়। তুম্ যাও। ম্যায় তুরন্ত্ আ রহা হ্যাঁয়।

কনস্টেবলটি চলে যেতেই আমি প্রশ্ন করি অমিতকে, ব্যাপার কি? ওরা কারা?

পোশাক পরতে পরতে অমিত জবাব দেয়, ধনী ব্যবসায়ী জয়রাম সিংয়ের মেয়ে মিন্‌তিকে নিয়ে তার গানের মাস্টার পরাশর সেন পালিয়েছিল। কিড্‌ন্যাপিং কেস্ আর কি' মনে হচ্ছে ওরাই হয়ত ধরা পড়েছে।

অমিত তার চাকরটাকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে বলে আমাকে নিয়ে বাইরে চলে আসে। তারপর বললে, তুমিও থানার দিকে যাবে নাকি, তরুণ?

শহরের অন্যদিকে একটু কাজ ছিল আমার। কিন্তু আমি সাংবাদিক। বিশেষ করে একটি মুখরোচক সংবাদের গন্ধ যখন পেয়েছি তখন তা' ছেড়ে নিজের কাজে যেতে মন চাইছিল না। তাই বললাম, বেশ, চলোই না। একবার সেই রোমিও-জুলিয়েটকে না হয় দেখেই আসি

রাস্তায় যেতে যেতে অমিত বললে, আর বলো কেন ভাই। দিনে দিনে মানুষের যে কি প্রবৃত্তি হচ্ছে বুঝতে পারি না। ঐ পরাশর সেন। স্ত্রী আছে, একদল ছেলেমেয়ে আছে, থাকে একটা বস্তিতে। কায়ক্লেশে সংসার চালায়। সেই পরাশর সেনের প্রেমে পড়ল কিনা তার মেয়ের বয়সী ধনী ব্যবসায়ী জয়রাম সিংয়ের সতেরো-আঠারো বছরের কন্যা মিন্‌তি সিং। শুধু তাই নয়, একেবারে ইলোপ্‌মেণ্ট। ভদ্রলোকের তো বটেই, মেয়েটারও প্রবৃত্তিকে বলিহারি!

অমিতের কথায় বহুদিন আগের শোনা একটা গানের কলি মনে পড়ে যায় আমার। একটু হেসে আমি বলি, প্রেম যে কানা কুছ্-না দেখ্-না সমাজ ধরম ঔর জাত।

—কিন্তু ভাই বয়সটা তো বিচার করবে, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে আছে কিনা তা তো দেখবে! আর্থিক স্বচ্ছলতার কথাটাও তো মনে রাখবে!

একটু থেমে আমি আবার বললাম, দেখ ভাই, তোমার এই প্রশ্নের জবাবটা আমি হয়ত ঠিক দিতে পারবো না। তবে একজন দিতে পারেন।

—কে? হেসে প্রশ্ন করে অমিত।

—ফ্রয়েড্। জবাব দিই আমি, 'ফ্রয়েডের ভালবাসা' বইটা ঘাঁটলে হয়ত এর জবাব পেতে পারো।

থানায় এসে আমি ও অমিত বড়বাবুর ঘরে ঢুকতেই ভবদেব ব্যানার্জি বলে উঠে, এই যে, সংবাদ-প্রভাকরকে একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছো দেখছি। তা' ভালই হল। এমন মুখরোচক খবরটা কালকের কাগজেই বেশ ফলাও করে বেরিয়ে যাবে।

বড়বাবুর টেবিলের পাশে একটা চেয়ার অধিকার করে বসতে বসতে আমি বললাম, তা' বেরোবে। আর যদি বলেন তো মামলার খোদ্ তদন্তকারী অফিসারের নামটাও কাগজে বের করে দিতে পারি। কথাটা বলেই আমি একবার আড়চোখে তাকাই অমিতের দিকে।

কৃত্রিম ক্রোধের সুরে অমিত বললে, হয়েছে—হয়েছে! আমার আর পাব্‌লিসিটির প্রয়োজন নেই।

॥ নয় ॥

বড়বাবুর ঘরের একপাশে একখানা লম্বা বেঞ্চির দু'কোণে বসেছিল মিন্‌তি সিং ও পরাশর সেন। পরাশরের উস্কোখুস্কো চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। মনে হল, দিনকয়েক বোধহয় লোকটির ভালমত স্নানাহার হয়নি। মিন্‌তির কচি মুখখানাও শুকনো। কপালে মস্তবড় সিঁদুরের টিপ, সিঁথিটিও সিঁদুর-লিপ্ত।

বড়বাবু ওদের দেখিয়ে অমিতকে বললে, বামালসমেত এই তোমার আসামী। তোমার কাগজ পেয়ে নবদ্বীপ থানা থেকে পাকড়াও করে পাঠিয়েছে। এবার এদের নিয়ে যা' হয় করো। আমি ইতিমধ্যে জয়রাম সিংকেও খবর পাঠিয়েছি। সেও এসে পড়ল বলে।

অমিত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পরাশরের সামনে বসে তাকে দু'চারটি প্রশ্ন করে। কিন্তু পরাশর যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছে। কথার জবাব তো দিলই না, এমনকি সেই যে মাথা নিচু করে রইল, সেই মাথাও আর তুলল না। হাল ছেড়ে দিয়ে অমিত এবার একজন কনস্টেবলকে ডেকে বললে, আজ আর পরাশরবাবুর মুখ থেকে একটা কথাও বের করা যাবে না। ওঁকে এবার হাজত-ঘরে নিয়ে যাও—

অমিতের কথা শেষ হতে না হতেই কিন্তু দৃপ্ত ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়ায় মিন্‌তি। ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে বললে, ওঁকে আপনারা আটকে রাখবেন নাকি?

—হ্যাঁ, আজ থানা-হাজতে থাকতে হবে ওকে। কাল সকালে কোর্টে চালান দেবো। জবাব দেয় অমিত।

—কেন, ও কি অপরাধ করেছে?

—আপনাকে নিয়ে পালিয়েছে। ওর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে মিন্‌তি আবার বললে, না, ও আমাকে নিয়ে পালায় নি। আমিই নিজের ইচ্ছেয় ওঁর সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। পরশু রাতে নবদ্বীপে আমাদের বিয়ে হয়েছে। এখন উনি আমার স্বামী।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে আমি কেবল একদৃষ্টে মিন্‌তিকে লক্ষ্য করছিলাম। ওর দৃপ্ত সপ্রতিভ কণ্ঠস্বর আমাকে বিস্মিত করেছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, কি সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা! এটা কি নিছক প্রেম, না অন্য কিছু?

জবাবে অমিত বললে, দেখুন মিন্‌তি দেবী, আপনার নিজের ইচ্ছায় চলে যাওয়াটা গ্রাহ্য কি না, তা আদালত বিচার করবে।

—সেকি! আমি নিজের ইচ্ছেমত কিছু করতে পারবো না?

—হ্যাঁ, পারবেন। আপনি সাবালিকা হলে পারবেন বৈকি! কিন্তু তা' না হলে আপনার ইচ্ছাটা গ্রাহ্য হবে না. সেক্ষেত্রে পরাশরবাবুই অপরাধী বলে গণ্য হবেন। আপনার বাবার বিনা অনুমতিতে আপনাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে বলে ওঁর শাস্তি হবে।

—এটাই কি আইন? শাণিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে মিন্‌তি।

—হ্যাঁ, আইন সেই কথাই বলে। জবাব দেয় অমিত।

একটু সময় থেমে মিন্‌তি আবার প্রশ্ন করে, আমাকেও কি আপনারা হাজতে রাখবেন নাকি?

—না, আপনি হাজতে থাকবেন কেন? আপনাকে আপনার বাবার কাছে থাকতে হবে।

—বাবার কাছে যদি আমি না যেতে চাই?

—তা'হলে আমাদের অন্য উপায় দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে আপনাকেও জেল হাজতে থাকতে হতে পারে।

—সেকি, আমাকেও জেলে পাঠাবেন?

—উপায় কি, বলুন? যতদিন এই মামলা শেষ না হয় ততদিন কোথাও তো রাখতে হবে আপনাকে! তা'ছাড়া—

অমিতের কথার মাঝখানেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করে জয়রাম সিং। সারা মুখে তার উদ্বেগের স্পষ্ট চিহ্ন।

জয়রাম সিং কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মিন্‌তির মুখের দিকে। বোধহয় লক্ষ্য করে মেয়ের ওই সিঁথির সিঁদুর। তারপর অকস্মাৎ মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে মাতৃভাষায় বলতে থাকে, এ তু কেয়া কিয়া মিন্‌তি—মেরি বেটী, এ তু কেয়া কিয়া!

খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে মিন্‌তি। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে জয়রাম সিং নিজেকে একটু সামলে নেয়। তারপর আবার বললে, শেষে কিনা তুই ঐ ভিখিরীকে বিয়ে করে বসলি? তোকে যে কত বড় ঘরে বিয়ে দেবো ভেবেছিলাম—

একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে মিন্‌তি আবার বললে, বড়ঘর-ছোটঘরে কি হবে, বাবা? আমি ওঁকে বিয়ে করেছি। ওঁর কাছেই আমি সুখে থাকবো।

—তু পাগলী বন্ গয়ি রে মিন্‌তি। উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে ওঠে জয়রাম সিং। তারপর একটু থেমে আবার বললে, তুই কি জানিস না, ওর ঘরে বৌ রয়েছে, একপাল ছেলেমেয়ে রয়েছে! ওর মধ্যে গিয়ে তুই সুখে থাকতে চাস?

—এখন ওসব কথা ভেবে কি হবে বাবা? বিয়ে আমাদের হয়েই গেছে।

—না-না। প্রায় চিৎকার করে ওঠে জয়রাম সিং, এ বিয়ে বিয়েই নয়। এ বিয়ে কিছুতেই স্বীকার করি না আমি। দু'টো আজে-বাজে মন্ত্র পড়ে কপালে সিঁদুর লাগালেই কি বিয়ে হয়? তুই বাড়ি চল্। দেখেশুনে ভাল ঘরে তোর আবার বিয়ে দেবো আমি।

খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে থাকে মিন্‌তি। কিছু বলতে গিয়ে একবার মুখ তুলেই আবার মাথা নিচু করে। তারপর আবার মাথা তুলে দ্বিধা-জড়ানো কম্পিত গলায় বললে, তা' আর হয় না বাবা। বিয়ের রাতে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতই কাটিয়েছি।

বাপের কাছে এর চাইতে খোলসা করে আর কিছু বলতে পারে না মিন্‌তি। জয়রাম সিং বোধহয় কথাটা ঠিক খেয়াল করে না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, বিয়ের রাতেই মিন্‌তি তার কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে পরাশরের কাছে।

পরাশরকে আগেই হাজত ঘরে পাঠানো হয়েছিল। ভবদেববাবু এবার মিনতিকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে জয়রাম সিংকে ডেকে বললে, শুনুন, ওকে এবার বাড়ি নিয়ে যান। ওসব কথা নিয়ে এখন বেশি আলোচনা করবেন না। নিজের পুরনো পরিবেশে আগে ওকে কিছুদিন থাকতে দিন। তারপর ধীরে-সুস্থে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাবেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মিন্‌তির বয়স কি আঠারো পূর্ণ হয়েছে?

একটু চিন্তা করে জয়রাম সিং বললে, না বোধহয়!

—ওর জন্ম রেজেস্ট্রী করানো আছে?

—হ্যাঁ, আছে।

—বেশ, তা' হলেই চলবে। যদি দেখা যায় ওর বয়স আঠারো পূর্ণ হয় নি, তা'হলে ও আদালতে দাঁড়িয়ে নিজের ইচ্ছেয় চলে যাবার কথা স্বীকার করলেও মামলা নষ্ট হয়ে যাবে না। পরাশরের শাস্তি হবেই। তবে যদি আঠারো পূর্ণ হয়ে থাকে তো একটু অসুবিধায় পড়তে হবে আমাদের। সেক্ষেত্রে আপনার মেয়েকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরাশরের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি করাতে হবে।

জয়রাম সিং মিন্‌তিকে নিয়ে চলে যেতেই ভবদেববাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, কিহে ভায়া, নাটক কেমন জমে উঠেছে?

আমি জবাব দিই, জমে উঠেছে ভালই, তবে দেখে-শুনে সন্দেহ হচ্ছে নাটকটি শেষ অংক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কি না! তোমার কি মনে হয় অমিত?

ওরা চলে যেতেই কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অমিত। কোনরকম সাদৃশ্য না থাকলেও সেই মুহূর্তে কেন যেন অন্য একটি মেয়ের কথা মনে পড়েছিল তার। সে স্মৃতিকণা। থানায় বসে আজকের এই মিন্‌তির মত সেদিন ওই স্মৃতিকণারও সেই দৃপ্ত ভঙ্গিটি দেখেছিল সে।

আমার প্রশ্নে অমিত চম্‌কে তাকিয়ে জবাব দেয়, কি বললে?

আমি হেসে উঠে বললাম, এত কি ভাবছো বলতো?

একটু আরক্ত হয়ে উঠে অমিত জবাব দেয়, এই ওদের—ঐ জয়রাম সিংয়ের কথাই ভাবছিলাম।

॥ দশ ॥

সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজে আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের প্রেমে পড়িনি। পুরুষের জীবনে প্রেমে পড়াটা সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য যা-ই হোক্ না কেন, তেমন কোন সুযোগ আসেনি বলেই ওরকম কোন ঘটনায় কখনও জড়িয়ে পড়তে হয়নি আমাকে। শুধু তাই নয়, প্রেমে পড়েছে এমন কোন ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার সুযোগও আমার ঘটে নি। তাই, প্রেমে পড়ার সিম্প্‌টম অর্থাৎ লক্ষণগুলো আমার মোটেই জানা ছিল না। জানা থাকলে বোধহয় অমিতের গোপন প্রেমের ব্যাপারটা অনায়াসেই আমি ধরে ফেলতে পারতাম। তবে কোথায় যেন পড়েছিলাম, প্রেমে পড়লে মানুষকে নাকি বোকা বোকা দেখায়। কিন্তু অমিতের চরিত্রে কিংবা চাল-চলনে তেমন কোন লক্ষণও আমার নজরে পড়েনি।

তবে কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, মাঝে মাঝেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অমিত। কারণ জিজ্ঞেস করলেই সামান্য একটু হেসে প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে।

সেদিন কেমন যেন একটু সন্দেহ হওয়ায় ওকে এড়িয়ে যেতে দিলাম না। প্রশ্নের পর প্রশ্নের বেড়াজালে ঘিরে ধরলাম ওকে। বললাম, কি হয়েছে বলতেই হবে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ো কেন? প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করো কেন?

অমিত বললে, কোথায় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছি?

বললাম, দেখ ভাই, আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু উজবুক নই মোটেই।

—আহা, আমি কি তোমাকে বোকা কিংবা উজবুক বলেছি কখনও?

—না, মুখে অবশ্য বলোনি। তবে কথায়-বার্তায় তাই প্রকাশ করতে চেয়েছো।

—কি রকম?

—এই যে তুমি আজকাল মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন চিন্তা করো, আবার আমি কিছু জিজ্ঞেস করলেই 'কিছু না' বলে আমাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করো—এটা করতে পারছো আমাকে বোকা কিংবা উজবুক ভাবছো বলেই।

—ও—এই কথা! বলেই মৃদু মৃদু হাসতে থাকে অমিত।

আমি আবার বললাম, এবার বলতো ভাই, আসল ব্যাপারটা কি?

—আসল নকল কোন ব্যাপারেই নেই এর মধ্যে। তেমনিভাবে মৃদু হাসতে হাসতেই হাল্কা সুরে জবাব দেয় অমিত।

—আবার বাজে কথা বলছো?

অমিত আর কোন জবাব দেয় না।

আমি আবার প্রশ্ন করি, বাড়ি থেকে কোন খারাপ খবর-টবর পেয়েছো নাকি?

—না-না, সেসব কিছু নয়।

—তবে, এখানে চাকরির ব্যাপারে কিছু?

—না, তাও নয়।

একমুহূর্ত চিন্তা করে আমি আবার বললাম, তবে কারুর প্রেমে-ট্রেমে পড়েছো নাকি?

একটু সময় ভেবে নিয়ে তেমনি হাল্কা সুরে অমিত বললে, পুলিশ আবার প্রেমে পড়ে নাকি?

—পড়বে না কেন? মানুষ মাত্রেই প্রেমে পড়তে পারে। তা' সে রাজা-উজিরই হোক্, কিংবা ফকির-খানসামাই হোক্। তেমন পাত্রী জুটলে প্রেমে পড়তে কারুর বাধা নেই।

—তবে না হয় ধরেই নাও আমিও কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছি!

—ধরে নেওয়ার কথা হচ্ছে না। সত্যি করে বলতো ব্যাপারটা কি?

—বললাম তো, একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি আমি।

—কে সে?

—পরিচয়টি ক্রমশ প্রকাশ্য বলেই জোরে হেসে ওঠে অমিত।

—তথাস্তু! আমিও সেদিনকার মত রেহাই দিই তাকে।

তবে, আমিও কম যাই না। একে তো ছেলে পড়িয়ে খাই, তায় আবার সংবাদপত্রের রিপোর্টার। খবরের গন্ধ পেলে ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকাই আমাদের অভ্যাস। তায় আবার প্রেম-ঘটিত খবর!

কাজেই অমিতের কাছ থেকে আসল খবরটি বের করতে বেশি বেগ পেতে হয় না আমার। বললাম, খুব ভাল কথা, এমনিভাবেই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও ব্রাদার। তবে শেষ পর্যন্ত যদি খেলিয়ে তুলতে পারো, তবেই না তোমার ক্রেডিট!

—কিন্তু ভাই, ব্যাপারটা যে এখনও একতরফের!

—সেকি! বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি আমি; ওদের ওখানে যাও না তুমি?

—হ্যাঁ, মাঝে-মধ্যে যাই। অজিতেশবাবুর সঙ্গে গল্প-গুজব করি।

—কেন, স্মৃতিকণার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পাও না?

—হ্যাঁ পাই। তবে তার কথাবার্তায় তেমন কোন— ; কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় অমিত।

আর বাকিটা পূরণ করে দিই আমি, আশার আলো দেখতে পাও না, এই তো?

অমিত চুপ করে থাকে। আমি আবার বললাম, দেখ অমিত, এই বিষয়ে আমি তোমার চাইতেও অনভিজ্ঞ। তাই তোমাকে কোনরকম সাহায্যই করতে পারবো না। তবে একটা কথা জানি, সবুরে মেওয়া ফলে, ভালবাসার পাত্রীকে করায়ত্ব করতে হলে যে গুণটি একান্তই আবশ্যক, তার নাম ধৈর্য।

স্মৃতিকণাকে নিয়ে আমার সঙ্গে অমিতের এই ধরনের কথাবার্তাগুলো ঠাট্টার ছলে হলেও অমিত কিন্তু আমাকে সত্যি কথাই বলেছে।

এক দুর্নিবার আকর্ষণে সে মাঝে মাঝেই অবসর সময়ে গিয়ে হাজির হয়েছে অজিতেশ দত্তর বাড়ি। সেখানে বুড়ো অজিতেশ দত্ত সহাস্যমুখে অভ্যর্থনা করেছে তাকে। রাজ্যের গল্প করেছে তার সঙ্গে। সেখানে স্মৃতিকণার দেখাও পেয়েছে অমিত। সেও হাসিমুখে গল্প-গুজব করেছে। অমিত লক্ষ্য করেছে, তার সম্বন্ধে স্মৃতিকণার কৌতূহলও যথেষ্ট। কিন্তু সেই কৌতূহল একজন পুলিশ অফিসারের প্রতি একজন সাধারণ নাগরিকের কৌতূহল কিংবা তার চেয়ে আরও কিছু বেশি তা' সে বুঝে উঠতে পারে নি। হয়ত তার আনাড়ী চোখে সেটা ধরা পড়েনি আজও। অথবা হয়ত আদপেই তেমন কিছু নয়। গোটা ব্যাপারটাই যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হতে পারে, তেমনি আবার সর্পতে রজ্জুভ্রম হওয়াও তেমন কিছু বিচিত্র নয়।

বরাত ভাল বলতে হবে অমিতের। একটা কঠিন পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছে সে। অজিতেশ দত্ত সেই কুকুরে কামড়ানোর ঘটনায় আগেভাগেই যদি শিউপূজনকে তার দেশে পাঠিয়ে না দিতেন তো সেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত অমিতকে। আদর্শ বনাম অনুরাগ—কর্তব্য বনাম হৃদয়াবেগ, যে কোন একটিকে বেছে নিতে হত তাকে। কুকুরে কামড়ানোর মামলায় অজিতেশ দত্তর বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করে তাঁকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে স্মৃতিকণার সান্নিধ্যলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হত। কিন্তু সেই পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে অমিত। ঘটনাচক্রে আদর্শচ্যুতি না ঘটিয়েও অজিতেশ দত্তকে রেহাই দিতে বাধ্য হয়েছিল সে। অভিযোগকারীর অনুপস্থিতিতে মামলা চলে না।

ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জিও বলেছিল সেই কথা। বলেছিল, তা'হলে আর কি করা যাবে? উকিলের বুদ্ধি, আগেভাগেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। এবার মামলায় ফাইন্যাল রিপোর্ট দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ইংরেজি ফাইন্যাল রিপোর্টকে সেকালে বাংলায় বলা হত 'খতেমী রিপোর্ট'। অর্থাৎ আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মামলা খতম হয়ে গেল। তাকে বিচারের জন্যে আদালতে পাঠান গেল না।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন থানায় বসে সেই কুকুরে কামড়ানোর মামলার খতেমী রিপোর্ট লিখতে লিখতে মনটা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল অমিতের। প্রিয়জনের বিপদ-মুক্তিতে মানুষের যেমন আনন্দ হয়, তেমনি এক আনন্দ। বোধহয় তার চেয়েও গভীর, তার চেয়েও ব্যাপক।

কর্মে সফলতায় মানুষের মনে হয় আনন্দ, আর বিফলতায় আসে দুঃখ। কোন সত্যিকারের মামলায় সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করে তদন্তকারী অফিসার যখন কারুর বিরুদ্ধে চার্জসীট

দাখিল করতে সমর্থ হয়, তখন তারও হয় আনন্দ। আর আদালতে যদি তার শাস্তি হয় তো সেই আনন্দ বর্ধিত হয় বহুগুণ। তদন্তকারী অফিসারের কর্মকুশলতাও নিরূপিত হয় তার চার্জসীট দাখিলের সংখ্যায়। চার্জসীট মানেই ডিটেকশন। অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই। আর সেই ডিটেকশানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে আদালত কর্তৃক আসামীকে শাস্তিদান। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু সত্যিকারের একটি মামলায় অজিতেশ দত্তর পক্ষে খতেমী রিপোর্ট দাখিল করতে গিয়ে অমিতের যে আনন্দ, তাকে কোনক্রমেই স্বাভাবিক বলা চলে না। এটা অস্বাভাবিক তো বটেই দৃষ্টিকটুও। প্রকৃত অপরাধীর নিষ্কৃতি লাভে এই আনন্দ স্বার্থ-কলুষিত, পক্ষপাতদুষ্ট, অমিতের আদর্শের পরিপন্থী। যদিও তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল সে।

কথাটা যে অমিতের মনে হয়নি তাও নয়। মনে মনে একটু লজ্জিতও হয়েছিল সে। নিজের আদর্শের পরিপন্থী এই মনোভাবের জন্যে লজ্জা, মনের এই দুর্বলতার জন্যে লজ্জা। কিন্তু সেই লজ্জা ঢাকতে গিয়ে যুক্তিরও অভাব হয় নি তার। সবচেয়ে বড় যুক্তিটিই তো ছিল তার হাতের কাছে। সে তো ইচ্ছে করে কিছু করেনি। ঘটনাচক্রে অজিতেশ দত্তকে নিষ্কৃতি না দিয়ে উপায় ছিল না তার।

কিন্তু যুক্তির ওপরও মন বলে একটি জিনিস আছে। তার কাছে লুকোচুরি চলে না। যুক্তির ধার ধারে না সে। ভালো, মন্দ, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য সে বিচার করে নেয় একলহমায়। ফাঁকি নেই সেখানে, চোর তার চুরি করার সমর্থনে যত অভাব-অভিযোগের যুক্তিই খাড়া করুক না কেন তার মন কিন্তু একমুহূর্তেই বুঝে ফেলে যে, চুরি করা অন্যায়।

তাই, সেই আনন্দের মধ্যেও কেমন যেন একটি ছোট্ট অন্যায়বোধ মাঝে মাঝেই খচ্ করে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে অমিতকে।

সেই কিড্‌ন্যাপিং মামলায় কিন্তু পরাশর সেনের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করেছিল অমিত। সাক্ষ্য-প্রমাণ যথেষ্টই ছিল। মিন্‌তির জন্ম-রেজিস্ট্রীর সার্টিফিকেটও ছিল সেই সাক্ষ্য প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। আসলে তার বয়স তখন সতেরো।

তা'ছাড়া, আদালতে মামলা উঠবার কিছুদিন আগে জয়রাম সিং থানায় এসে একদিন হাসি হাসি মুখে অমিতকে বললে, একটা খুব ভাল খবর আছে, স্যার।

—কি খবর? প্রশ্ন করে অমিত।

—মিন্‌তিকে রাজি করিয়েছি। আদালতে গিয়ে ও স্বীকার করবে যে, পরাশর ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

—তাই নাকি? ভাল—ভাল। মন্তব্য করে অমিত, মেয়েটার তা'হলে সুবুদ্ধি হয়েছে বলতে হবে।

—তা' হয়েছে স্যার। তবে, তার জন্যে কি কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে? আমি আর মিন্‌তির মা রাত-দিন্ বুঝিয়েছি মেয়েটাকে। অবশেষে রাজি হয়েছে। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, স্যার?

—কী?

—মনে হয় মেয়েটাকে ঐ ব্যাটা কোনরকম গুণ করেছিল।

হেসে অমিত বললে, না-না, সে-সব কিছু নয়। আসলে মনে ধরেছিল তাকে।

—কিন্তু তাই বলে অমন একটা লোককে?

আবার একটু হেসে অমিত বললে, যাক, ছেড়ে দিন ওসব কথা। মিন্‌তি যখন রাজি হয়েছে তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। নির্ঘাৎ জেল হবে পরাশরের। অমিত নিজেও নিশ্চিন্ত ছিল। মামলা এখন তাদের দিকেই, পরাশরের শাস্তি হবেই।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠবার আগেও মিন্‌তিকে একবার তালিম দিয়ে দিয়েছিল অমিত। আদালতের সামনে কি বলতে হবে আর কি বলতে হবে না, ভালমত বুঝিয়ে দিয়েছিল তাকে।

কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একেবারে উল্টোসুরে কথা বলে গেল মিন্‌তি। বললে, পরাশরের কোন দোষই নেই। সে নিজেই ইচ্ছে করে তার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। বিয়েতেও তার পুরো মত ছিল।

আসল সাক্ষীর মুখে এমনি ধরনের কথায় সরকার পক্ষের উকিল তো অবাক। বাধ্য হয়ে তিনি নিজের সাক্ষীকেই ঘুরিয়ে অনেক জেরা করেছিলেন। কিন্তু কোনই লাভ হল না। মিন্‌তির মুখ থেকে পরাশরের বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি বের করতে পারলেন না।

তবুও কিন্তু রেহাই পেল না পরাশর। আদলত মিন্‌তির সেই সম্মতিকে গ্রাহ্য করল না। তার বয়স বিবেচনায় আইনের নির্দেশমত তার সম্মতিকে অগ্রাহ্য করে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে পরাশরকে।

আদালতের রায় শুনে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েছিল মিন্‌তি। সেদিন আদালতের রায় শুনতে আমিও হাজির ছিলাম সেখানে। মিন্‌তির কান্নায় বিব্রত হয়ে পড়েছিল জয়রাম সিং। তার সেই বিব্রত ভাবের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততার ভাবও লক্ষ্য করেছিলাম আমি। পরাশরের একবছর জেল হওয়াতে স্বাভাবিক কারণেই সন্তুষ্ট হয়েছিল সে।

পরাশরের শাস্তি হওয়ায় তদন্তকারী অফিসার হিসাবে ক্রেডিট্‌টুকু ছিল অমিতেরই প্রাপ্য। তারও সেদিন আনন্দিত হবার কথা। হয়ত আনন্দিত হয়েও ছিল সে। হয়ত মিন্‌তির সেই কান্না তার আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু সেদিন আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য হয়েছিলাম অমিতের দিকে তাকিয়ে। তার মুখে কোন পুলিশী কাঠিন্য, কিংবা কোন খুশির উচ্ছ্বাস কিছুই দেখতে পাইনি আমি। তার বদলে চোখে পড়েছিল কেমন যেন এক ভাবলেশহীন অদ্ভুত মুখচ্ছবি যা' এর আগে আর কখনও দেখিনি।

॥ এগারো ॥

জগা পাগলাকে চেনে না এমন লোক এই শহরে খুব বেশি নেই।

ভাল নাম জগন্নাথ কুণ্ডু। কিন্তু তার ঐ ভাল নামে এখন আর কেউ চেনে না তাকে। শহরের ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই জগা পাগলা নামেই সে পরিচিত। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। রোগা পাতলা চেহারা। কাঁচাপাকা একমাথা রুক্ষ চুল। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। ছেঁড়া ধুতি ও ছেঁড়া হাফসার্ট গায়ে। ধুলি-ধুসরিত পায়ের কোন না কোন আঙুলে সবসময়ই একটুকরো ন্যাকড়া জড়ানো।

এই চেহারায় সকাল সন্ধ্যা শহরময় ঘুরে বেড়ায় জগা পাগলা। পথচারীদের কাছ ভিক্ষে করে। কথাবার্তায় কিন্তু পাগলের তেমন কোন লক্ষণ নেই।

তার ভিক্ষে চাওয়ার কৌশলটিও অভিনব। বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা কোন পথচারীর কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে জগা পাগলা বলে, চার আনা পয়সা দেবেন, স্যার?

ভদ্রলোক হয়ত দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে জবাব দেয়, মাপ করো। কিংম্বা হয়ত বলে, আগে দেখ।

কিন্তু জগা যায় না। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, দিন না স্যার, চার আনা পয়সা! খুব বেশি দরকার।

কেউ হয়ত প্রশ্ন করে, কি দরকার তোমার?

নিদ্ধির্ধায় জবাব দেয় জগা, মদ খাব স্যার।

ভদ্রলোক হয়ত চমকে ওঠে। লোকটা বলে কি? পাগলা নাকি? মদ খাবে বলে পয়সা চাইছে, আর সেকথা মুখ ফুটে বলতেও কোন সংকোচ নেই।

লোকটি হয়ত বিরক্ত কণ্ঠে বললে, না-না, কিছু হবে না। সরে পড় এখান থেকে। যতসব মাতালের কাণ্ড!

কিন্তু তবুও জগা পাগলা চলে যায় না। বলে, সত্যি কথাই বলছি স্যার, মদ খাব। ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যে কথা বলে আপনার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে মদ খেলে কি ভাল হত স্যার। তার চেয়ে সত্যি কথাই বলছি, ওটা না খেলে আমার চলে না স্যার। ও-জিনিস খেয়ে খেয়েই আজ এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। ওর পেছনেই বাপের রেখে-যাওয়া সবকিছু উড়িয়েছি। তবুও ছাড়তে পারিনি।

তারপর একটু থেমে হয়ত আবার বলে, ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন মদ খেতে পয়সা দেবেন না, তখন কথা দিচ্ছি, আপনার পয়সায় মদ খাব না। কিছু খাবার কিনে খাব। আজ সারাদিন পেটেও কিছু পড়েনি।

এমনিভাবেই শহরময় ভিক্ষে করে বেড়ায় জগা পাগলা। মাঝে মাঝে ধেনো মদ খেয়ে বাস্তায় মাতলামি করার জন্যে পুলিশের হাতেও পড়ে। দু'চার দিন জেল-হাজতে থেকে তারপর ছাড়া পেয়ে আবার এসে দাঁড়ায় রাস্তায়।

থানা-পুলিশকেও তেমন একটা পরোয়া করে না জগা পাগলা। ধরা পড়ে থানায় এসে ডিউটি অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সেলাম ঠুকে বলে, এলাম স্যার। ইচ্ছে করেই এলাম। মাতলামো না করলে তো আপনারা আমায় ধরবেন না। তাই মাতলামো করেছি।

ডিউটি অফিসার হয়ত জিজ্ঞেস করে, কেন জগা, তোমার আবার জেলবাসের সখ হল কেন?

—ও আবার কি কথা হল স্যার? সখ হবে কেন? দরকার, সাংঘাতিক দরকার। আজ চার-পাঁচদিন কিছু খেতে পাইনি, জেলে গিয়ে লাবসি খেয়ে গায়ে একটু জোর করে আসতে চাই, স্যার।

—খেতে পাওনি তো নিজের দোষে। ভিক্ষের পয়সায় মদ না খেয়ে কিছু কিনে খেলেই তো পারো।

—কি যে বলেন, স্যার! একটু বিজ্ঞের হাসি হাসে জগা। পয়সা হাতে পেয়ে মদ না খেয়ে যদি খাবার কিনেই খেতাম, তবে কি আজ এই দশা হত আমার?

থানায়ও বিশেষ পরিচিত জগা। কনস্টেবল্ থেকে শুরু করে স্বয়ং ও. সি. পর্যন্ত ভালমত চেনে তাকে। ধরা পড়ে থানায় এলে জগাকে নিয়ে হাসি-মস্করা চলে অফিসারদের মধ্যে।

জগার আরও একটি অভ্যাস আছে। শহরের কোন বাড়িতে কোন উৎসবের আয়োজন হলে জগা ঠিক এসে হাজির হয়। তা' সে বিয়ের উৎসবই হোক কিংবা অন্য যে কোন উৎসবই হোক না কেন, জগা ঠিক হাজির আছে সেখানে। উৎসব বাড়ির বাইরে ভিখারীদের দলে কিন্তু থাকে না জগা। সোজা নিমন্ত্রিতদের মাঝখানে গিয়ে তাদের পাশে খেতে বসে এই রবাহূত অতিথি। বেশ ভদ্রভাবেই কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত করে জগা। অবশেষে একটি পান মুখে দিয়ে একটি সিগারেট আদায় করে ফিরে আসে নিজের ডেরায়। শহরে বিশেষ পরিচিত বলেই সহসা কেউ কিছু বলে না তাকে।

সেদিন রাতে থানায় ডিউটি ছিল অমিতের। শীতের রাত। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। থানায় অন্য কেউ ছিল না সেদিন। জানালার শার্সি ভালমত এঁটে দিয়ে দরজাটা সামান্য ভেজিয়ে টেবিলে বসে কাজ করছিল অমিত। ইচ্ছে ছিল, হাতের কাজটুকু শেষ হলেই কম্বল জড়িয়ে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়বে। থানার বারান্দায় কানসুদ্ধ মাথায় মাফলার জড়িয়ে আজানুলম্বিত বারোয়ারী গরম কোট পরে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছিল সেন্‌ট্রি কনস্টেবল্।

হঠাৎ বারান্দায় জেগে ওঠে পায়ের শব্দ। আর সঙ্গে সঙ্গেই তিন-চারটি যুবক একটি লোককে টেনে এনে থানার মেঝেয় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসে অমিতের দিকে।

চোখ তুলে তাকায় অমিত। একি? এ যে জগা পাগলা!

অমিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জগার সারা মুখে কালশিরার দাগ। কপালের একটা পাশ কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। গায়ের জামাটা ছিন্ন-ভিন্ন, চোখ দু'টো আধবোজা।

মেঝেয় উপুড় হয়ে হাঁপাচ্ছিল জগা। একবার নিজের মনেই কি যেন বিড়বিড় করে বলে হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে আবার।

অমিত এবার তাকায় যুবকদের দিকে। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, ব্যাপার কি? ওকে এমনিভাবে মেরেছে কে?

একটি যুবক বীরদর্পে বলে ওঠে, আমরা স্যার। চুরি করেছিল বলে ওকে ধরে এনেছি।

—চুরি করেছে? এই লোকটা চুরি করেছে? কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর জেগে ওঠে অমিতের। জগা পাগলার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ কেউ কোনদিন এনেছিল বলে শোনা যায়নি।

—হ্যাঁ, স্যার। বললে যুবকটি, বিয়ে বাড়িতে ঢুকে নিমন্ত্রিতদের মাঝখানে খেতে বসেছিল লোকটা। আমরা দু'দুবার তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে।

—তারপর?

—তারপর ও চলে গেল। ভাবলাম, যাক বাঁচা গেছে—আপদ বিদায় হয়েছে। কিন্তু একটু পরে রান্নার জায়গায় হৈ-চৈ শুনে ছুটে গিয়ে দেখি এই লোকটা। কোন্ ফাঁকে সকলের চোখ এড়িয়ে দেওয়াল টপকে সোজা ভেতরে ঢুকে নিজের হাতে খাবার নিয়ে খেতে বসেছে—

একমুহূর্ত চুপ করে থাকে অমিত। মনে মনে ভাবে, নিশ্চয়ই জগা পাগলার খুব খিদে পেয়েছিল। নইলে এমন কাণ্ড তো কোনদিন সে করে না।

তিক্তকণ্ঠে অমিত বলল, তারপর আপনারা সবাই মিলে ধরে লোকটাকে মেরে প্রায় আধমরা করে ফেললেন, তাই না?

এবার আর যুবকটি কোন কথা বলে না।

অমিত এগিয়ে আসে জগার কাছে। জগা তখনও অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে পড়ে হাঁপাচ্ছিল। অমিত তার কপালের ক্ষতটা পরীক্ষা করে। রক্তে গালের একটা পাশ ভিজে গিয়েছে। সারা মুখটা এখানে ওখানে ফুলে উঠেছে।

বুকের মধ্যে যেন কেমন করে ওঠে অমিতের। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে কেমন করে ভেবে পায় না। তার মনের ওপর সদ্য জেগে ওঠা কর্ম-কাঠিন্যের পর্দার ঠিক নিচেই যে চিরকালের সংবেদনশীল হৃদয়টি রয়েছে, সেখানে যেন কোন একটা কিছু আঘাত করতে থাকে বার বার। অবহেলিত মানবতার ব্যাকুল আর্তনাদ ভেসে আসে তার কানে। অন্তরের অন্তস্থলে সে শুনতে পায় সেই আর্ত চিৎকার। ইচ্ছে হয় সেই ডাকে সাড়া দিতে। কিন্তু পারে না অমিত। সে সরকারি কর্মচারী, সে কর্মনিষ্ঠ অফিসার। ভাবের জোয়ারে বিভোর হয়ে ভেসে যাওয়া অন্তত তার পক্ষে শোভা পায় না। দেশে আইন আছে, আইন মত চলতে হবে তাকে। আইনের রক্ষক সে। প্রতিটি পদক্ষেপ বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করে ফেলতে হবে।

ক্ষুধা—যুগে যুগে মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় যে তাড়না, তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে চুরি করেছে একটা মানুষ। চুরি করেছে যার আছে তার কাছ থেকে। সেই চিরকালের হ্যাভ্‌স ও হ্যাভ্‌নটস্‌-এর দ্বন্দ্ব। পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির সেই প্রথম দিনটি থেকে চলে আসছে এই দ্বন্দ্ব। কিন্তু পরিসমাপ্তি আজও হয়নি। হয়ত কোনদিন হবেও না।

কঠিন-কঠোর আইন কিন্তু এসব বিচার করবে না। তার আওতার মধ্যে এসে পড়লে কাউকে সে রেহাই দেবে না। দয়া-মায়া নেই সেখানে।

নিজেকে সংযত করে যুবকদের দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে অমিত বললে, ভালই করেছেন। ওকে মেরে তাড়িয়ে না দিয়ে এখানে এনে ভালই করেছেন আপনারা।

উৎসাহের ভঙ্গিতে জবাব দেয় যুবকটি, হ্যাঁ স্যার, এসব চোর ছ্যাঁচোরের মারধোরে মোটেই শিক্ষা হয় না। জেলে গিয়ে ঘানি না ঘোরালে ওরা কিছুতেই শায়েস্তা হয় না।

—যা' বলেছেন! শ্লেষের সুর ধ্বনিত হয় অমিতের কণ্ঠে, তা'ছাড়া ওকে মেরে তাড়িয়ে দিলে হয়ত এই শীতের রাতে বিনে চিকিৎসায় কোথায় মরে পড়ে থাকত। এখানে যখন এনে ফেলেছেন, তখন হয়ত চিকিৎসার কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। তা'ছাড়া—

একটু থামে অমিত। যুবকদের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে আবার বললে, তা'ছাড়া লোকটা যদি সত্যিই মরে যায় তো দায়ী হবার জন্যে আপনাদেরও তো তখন পাওয়া যাবে, কি বলেন?

কথাটা বলেই অমিত আবার গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে।

কেমন যেন একটু চাঞ্চল্য জেগে ওঠে যুবকদের মধ্যে। ম্লানমুখে তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়। তারপর একসময় সেই যুবকটি বলে ওঠে, তা হলে আমরা এবার যেতে পারি, স্যার?

—সেকি? এত তাড়াতাড়ি যাবেন কোথায়? ঘটনাটা আগে লিখতে দিন আমাকে, আপনাদের নাম-ধাম আগে বলুন! তারপর যাবেন।

যুবকদের ম্লানমুখে যেন আরও একপোঁচ কালির ছোপ পড়ে।

সেই প্রথম যুবকটি একটু শুষ্কহাসি হেসে বললে, বুঝতে পারছেন তো স্যার, বিয়ে-বাড়ি, কত কাজ কর্ম পড়ে রয়েছে—

—নিশ্চয়-নিশ্চয়। ঘাড় নেড়ে সায় দেয় অমিত। আপনাদের বেশিক্ষণ আটকে রাখব না আমি। দরকারী কাজটুকু শেষ করেই ছেড়ে দেব।

যুবকদের বিদায় দিয়ে জগা পাগলাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে অমিত।

অবশেষে গভীর রাতে কাজকর্ম শেষ করে টেবিলের ওপর কম্বল জড়িয়ে সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। ঘুরে ফিরে ঐ জগা পাগলার কথাটাই মনে পড়তে থাকে। নেশাখোর মাতাল জগা পাগলা—সেকালের এক ধনী ব্যক্তির হতভাগ্য সন্তান জগন্নাথ কুণ্ডু।

কর্মচঞ্চল কোতোয়ালী থানা। বেলা দশটা বেজে গেছে। তবুও যাই-যাই করেও বাসায় ফেরা হয়নি অমিতের। সকাল আটটায় ডিউটি শেষ হয়েছে তার। ইচ্ছে করলে তারপরই সে বাসায় ফিরতে পারত। কিন্তু খাটুনির চাকরি, ঘণ্টা মেপে কাজ হয় না এখানে। সময়ের পরিমাপের ওপর কাজের পরিমাপ হয় না। হয় তার উল্টো। কাজের ওপরই নির্ভর করে সময়টা। কাজ শেষ করতে হবে, তাতে যত সময়ই প্রয়োজন হোক না কেন। চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। তাই থানা ডিউটি শেষ করে আবার কাজ নিয়ে পড়েছিল অমিত। প্রচুর কাজ। অনেকগুলো মামলার তদন্ত রয়েছে হাতে। সেগুলোর ডায়েরী লিখতে হবে।

কাজের মধ্যেই ডুবে ছিল অমিত। হঠাৎ ও. সি.'র ঘর থেকে ভবদেবের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। বড়বাবু অমিতকে ডাকছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাই তোলে অমিত। তারপর এসে প্রবেশ করে ও. সি.'র ঘরে।

একখানি মলিন শতছিন্ন শাড়িতে দেহের যতটা ঢেকে রাখা যায় তেমনিভাবে নিজেকে ঢেকে একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ভবদেবের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল স্ত্রীলোকটি। ছেঁড়া শাড়ির ঘোমটার ফাঁকে বেরিয়ে ছিল তার রুক্ষ চুলের খোঁপাটার একাংশ। অর্ধ-উলঙ্গ আরও তিন-চারটি ছেলেমেয়ে শঙ্কিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল স্ত্রীলোকটির গা-ঘেঁষে।

ভবদেব স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে অমিতকে বললে, একে চিনতে পারো?

অমিত তাকায় স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে। হ্যাঁ, চিনতে পেরেছে সে। কনক—পরাশর সেনের স্ত্রী কনক।

আরও শীর্ণ হয়ে উঠেছে কনক। গলার ও চোয়ালের হাড় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখ দু'টো ঢুকে গেছে গর্তে—। একটু আগেই বোধহয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কাঁদছিল। চোখের পাতা তখনও ভেজা।

ম্লান-নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে অমিতের দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নিচু করে থাকে কনক।

একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে ভবদেব বললে, অন্যায় করে একজন, আর শাস্তি ভোগ করে অন্যে। প্রেম করার দায়ে সেই সঙ্গীত সাধক তো নিশ্চিন্ত মনে জেলে বসে আছে। এদিকে এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে এই স্ত্রীলোকটি এখন যায় কোথায়? তা-ও এই দু'মাস যা-হোক করে এর-ওর বাড়ি কাজকর্ম করে কোনরকমে বেঁচে ছিল। তা' এখন তো মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত যেতে বসেছে।

—কেন, কি হয়েছে? প্রশ্ন করে অমিত।

—বস্তির বাড়িওয়ালা আর থাকতে দিতে নারাজ। চার মাসের বাড়ি ভাড়া একশো টাকা বাকি পড়ার দায়ে আজ সকালে নাকি ওর ঘরের জিনিসপত্র বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ভবদেব বললে।

—ভাড়া দিতে না পারলে বাড়িওয়ালাই বা থাকতে দেবে কেন? মৃদুকণ্ঠে বলে অমিত।

—তা' তো বটেই! ভবদেব বললে, আর এক্ষেত্রে আমরাই বা কি করতে পারি?

এমন সময় কনক আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, ভদ্রঘরের মেয়ে আমি। ঝি-গিরি করে একবেলা খাইয়ে এখনও এদের বাঁচিয়ে রেখেছি। জানি না, আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারব। কিন্তু মাসে মাসে পঁচিশ টাকা করে ঘরভাড়া দেব কোত্থেকে? আর, এদের নিয়ে যাবই বা কোথায়?

অমিত বললে, বাড়িওয়ালাকে একটু বলে-কয়ে—

—অনেক বলেছি, অনেক অনুনয়-বিনয় করেছি। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয়নি। তবে—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে যায় কনক।

—তবে কি? আবার প্রশ্ন করে ভবদেব।

একটু দ্বিধাজড়ানো গলায় কথাটা সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করে কনক, তবে—

কিন্তু আবার থেমে যায় সে। অসম্পূর্ণ কথাটা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

—তবে কি? আবার প্রশ্ন করে অমিত।

এবার ঘুরিয়ে জবাব দেয় কনক, লোকটার স্বভাব-চরিত্র তেমন ভাল নয়।

—ও—বুঝেছি। মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে ভবদেবের। লোকটা তোমার অসহায়তার সুযোগ নিতে চায় বুঝি?

কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে থাকে কনক।

ভবদেব কনকের মুখের দিকে তাকায়। একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ছেলেমেয়েগুলোর ওপর। তারপর অমিতের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি এখনই একবার যাও সেই লোকটার কাছে। ভালমত ধমকে দিয়ে এসো। বলে এসো, এমনি চালে চললে বেশিদিন এই এলাকায় থাকতে হবে না তাকে। অন্ততঃ ছ'টি মাস তার জেলে থাকার ব্যবস্থা আমি করব। বুঝলে?

মাথা নেড়ে সায় দেয় অমিত।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। বলতে থাকে ভবদেব, তাকে আরও বলবে, যে চারমাস এদের ভাড়া বাকি পড়েছে সেই টাকা এখন সে পাবে না। ঐ টাকার যা' হয় পরে একটা ব্যবস্থা হবে। এখন থেকে প্রতিমাসে ওদের বাড়িভাড়ার পঁচিশ টাকা সে যেন আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়।

অমিত ভবদেবের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনা থেকেই নুয়ে পড়ে তার।

একমুহূর্ত থেমে ভবদেব আবার বললে, ওহো—দেখেছো, একদম ভুলেই গিয়েছিলাম! তুমি কাল নাইট ডিউটি করেছো। তবে থাক, তোমাকে আর যেতে হবে না, আমি বরঞ্চ ধূর্জটিবাবুকে পাঠাচ্ছি। এসব ব্যাপারে ওঁর জুড়ি নেই। তারপ কনকের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার কোন চিন্তা নেই মা। তুমি যাও, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

হঠাৎ কনক একটু সরে গিয়ে নিচু হয়ে ভবদেবের পায়ের ধুলো নিতে যেতেই ভবদেব একেবারে হা-হা করে ওঠে। বললে, এ কি করছো—এ কি করছো! আমি আর এমন কি করতে পেরেছি? গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সারছি কেবল। এতে আমার নিজের কৃতিত্ব কতটুকু?

সেই মুহূর্তে অমিতের নিজেরও ইচ্ছে করছিল ভবদেবের পায়ের ধুলো নিতে। বলতে ইচ্ছে করছিল, এই সংসারে গঙ্গাজলেই বা গঙ্গাপূজা করতে পারে ক'জন?

সেদিন দুপুরে একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়েই বাসায় ফিরে এল অমিত। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, ঐ কনক আর তার হতভাগ্য ছেলেমেয়েগুলোর এই কষ্টের জন্যে কেবল সে নিজেই যেন দায়ী। কিড্ন্যাপিং কেসের মামলায় সে-ই পরাশরকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু সে নিজে কি আর করতে পারত? সে তো নিমিত্ত মাত্র। নিজের কর্তব্য করেছে কেবল। তদন্ত করে মামলার মাল-মশলা উপস্থিত করেছিল আদালতের সামনে। আদালতের বিচারেই পরাশর শাস্তি পেয়েছে।

কিন্তু তবুও কেন যেন মনটা ভারি হয়ে থাকে অমিতের। তার ওপর কাল রাতের সেই ঘটনা। জগা পাগলার নাকি এখনও জ্ঞান ফেরেনি হাসপাতালে। কে জানে, হয়ত আর কোনদিনই ফিরবে না। হয়ত কাল রাতের সেই চুরি করে খাওয়াই জগা পাগলার জীবনের শেষ খাওয়া।

বাসায় ফিরে পোশাক ছেড়ে একটু বসতেই চাকরটা এসে একখানি চিঠি দেয় অমিতকে। লিখেছেন অজিতেশবাবু। আট-দশ দিনের মধ্যে তাঁর বাড়িতে না যাওয়ার জন্যে অনুযোগ করে আজ বিকেলে অমিতকে একবার যেতে বলেছেন।

সত্যিই তাই, কাজের চাপে গত সপ্তাহে একদিনও সে যেতে পারেনি ওদিকে। স্মৃতির কথা মনে এলেও সেদিকে নজর দেবার অবসর ছিল না তার।

চিঠিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে আবার মনে পড়ে যায় স্মৃতির কথা। কিন্তু কই, স্মৃতি নিজে তো কখনও তাকে যেতে বলেনি। অবশ্য ওদের বাড়ি গেলে স্মৃতি কাছে এসেছে, হেসে গল্প করেছে তার সঙ্গে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার পুলিশী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু ফিরে আসার সময় কোনদিন বলেনি আবার আসবেন কিন্তু। তা'ছাড়া এই এতদিনের পরিচয়ে স্মৃতি তার সম্বোধনটা পর্যন্ত 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামাতে পারেনি। অবশ্য একদিন স্মৃতিকে একা পেয়ে কথাটা বলেই ফেলেছিল অমিত। বলেছিল, 'আপনি' শব্দটির চেয়ে 'তুমি' শব্দটি এমনিতে শ্রুতিমধুর কিম্বা শ্রুতিকটু যা-ই হোক না কেন, উচ্চারণ করতে কিন্তু অনেক সহজ, তাই না?

কলেজে পড়া আধুনিক মেয়ে স্মৃতিকণার পক্ষে অমিতের কথার আসল অর্থটি ধরে ফেলতে মোটেই অসুবিধা হয়নি। মুহূর্তে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল সে। রাঙা হয়ে উঠেছিল গালদু'টো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দিতে চেষ্টা করে খিল-খিল শব্দে হেসে উঠে বলেছিল, বাঃ—জানেন না, শাস্ত্রে আছে বাঘ আর পুলিশের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ হতে নেই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশ ছুঁলে আঠারো দু'গুণে ছত্রিশ ঘা।

স্মৃতিকণার কথার ভঙ্গিতে অমিত নিজেও না হেসে পারেনি সেদিন। কিন্তু পরে তার অনেকবার মনে হয়েছে, ওটা কি স্মৃতির শুধু ঠাট্টা, না আসল মনের কথা?

চিন্তায় ভারী মনটা কিন্তু বেশ হাল্কা হয়ে ওঠে অমিতের। চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কে এই চিঠিটা দিয়ে গেল?

—একটি সুন্দর মত খোকাবাবু।

হ্যাঁ, শঙ্কর—শঙ্কর এসেছিল বোধহয়। স্মৃতির ছোট ভাই শঙ্কর।

দুপুরে আর বিশ্রাম করা হল না অমিতের। ইচ্ছে ছিল, দুপুরে বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে কতকগুলো জরুরী কাজ সেরে ফেলতে বাইরে যাবে। কিন্তু বিকেলে যেতে হবে অজিতেশ দত্তর বাড়ি। এদিকে জরুরী কাজগুলোও ফেলে রাখা চলে না। তাই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরেই পোশাক পরে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অমিত।

সন্ধ্যা নাগাদ বাসায় ফিরে পাটভাঙা পাজামা পাঞ্জাবির ওপর সাদা র‍্যাপার চাপিয়ে রওনা হল অজিতেশ দত্তর বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যার পর অজিতেশবাবু চোখে কম দেখেন। পড়াশোনা করতে কষ্ট হয়। ঘরে একটি টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় স্মৃতিকণা একটা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিল অজিতেশবাবুকে।

অমিতকে দেখেই পড়া বন্ধ করে স্মৃতিকণা। ঘাড় ফিরিয়ে অমিতকে দেখেই অজিতেশবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, আরে এসো এসো, তোমার যে একেবারে দেখাই নেই! সারাদিন বাড়িতে একা বসে কাটাই। রোজই ভাবি তুমি আসবে। তাই, আজ বাধ্য হয়ে খোকাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি।

একটু হেসে চেয়ারে বসতে বসতে অমিত জবাব দেয়, ইচ্ছে থাকলেও সময় করে উঠতে পারি না। রোজই একটা না একটা ঝামেলা লেগেই থাকে।

—তা' তো বটেই। সোজা কথা তো নয়, জেলার কোতোয়ালী থানা। হাঙ্গামা-হুজ্জত তো লেগেই আছে। তা' কেমন আছো বলো?

—ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?

—আমাদের আর থাকা না থাকা! বুড়ো হয়েছি. এবার ওপারের ডাকের জন্যে তৈরি হচ্ছি।

স্মৃতিকণা এই সময় আঙ্গুল তুলে শাসনের সুরে অজিতেশবাবুকে বললে, আবার তোমার ঐ কথা বাবা? সেদিন না তোমায় বারণ করেছি! তারপর অমিতের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, আজকাল বাবার কি হয়েছে জানেন, কথায় কথায় কেবল ঐসব বাজে কথা তুলবেন।

অমিত কিছু জবাব দেবার আগেই অজিতেশবাবু কন্যার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, এই করে কি তুই আমাকে চিরকাল আটকে রাখতে চাস নাকি?

জবাব দেয় অমিত, না-না, সেকথা হচ্ছে না। তবে যখন বারণ করে তখন এসব কথা না ভাবলেই তো পারেন।

—আচ্ছা, হয়েছে—হয়েছে। তোমাদের দাপটে আর টিকতে পারব না দেখছি। বলেই একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসি হেসে অমিতকে বললেন, তোমার বাড়ির খবর কিছু পেয়েছো?

—হ্যাঁ, পরশু বাবার চিঠি পেয়েছি। ভালই আছেন তাঁরা।

—হ্যাঁ বাবা, ভাল থাকলেই ভাল। যা' দিনকাল পড়েছে তাতে ইচ্ছে থাকলেও কি ভাল থাকার জো আছে? এই দেখ না—। কথাটা বলতে গিয়েই থেমে যান অজিতেশবাবু। তারপর স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, সন্ধ্যা যে হয়ে এল, আমার পুজোর জোগাড় করে দিবি না মা?

—এই যে দিচ্ছি বাবা। বলেই উঠে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা।

—অমনি অমিতের চা-জলখাবারের কথাও বলে দে ঠাকুরকে।

স্মৃতিকণা চলে যেতেই অজিতেশবাবু আবার বললেন, বুঝলে অমিত, মা আমার দশভূজা। সব দিকে লক্ষ্য ওর। ঠিক ওর নিজের মায়ের মত। নিজে কলেজ করে, মাঝে মাঝে ভাইয়ের পড়াশোনায়ও সাহায্য করে। আবার ঠাকুর চাকরদের সামলায়। তার মধ্যেই আবার এই বুড়োটার সুখ-সুবিধার দিকেও প্রখর নজর। তুমি দেখে নিও, মা আমার যার ঘরে যাবে সেই ঘর আলো করে রাখবে।

অমিত জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

এবার অজিতেশবাবু উঠে দাঁড়ান। তারপর বললেন, আমি একবার ঠাকুর ঘর থেকে ঘুরে আসি বাবা। তুমি আবার এর মধ্যে পালিয়ে যেও না।

—না-না, আপনি পূজোপাঠ সেরেই আসুন।

অজিতেশবাবু বেরিয়ে যেতেই টেবিলের ওপর থেকে একটা মাসিক পত্রিকা টেনে নেয় অমিত।

একটু পরেই স্মৃতিকণা আবার ফিরে আসে। অমিতের পাশে আর একটা চেয়ারে বসে পড়ে মৃদু হেসে বললে, আচ্ছা, এই শহরের চোর-বদমাসগুলো আপনাকে চেনে?

অদ্ভুত প্রশ্ন! সহসা জবাব খুঁজে পায় না অমিত। তারপর একসময় জবাব দেয়, কেউ কেউ হয়ত চেনে। তা' হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?

—যাক্, বাঁচা গেল। আপনি যে আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসেন তা' নিশ্চয়ই ওরা টের পেয়েছে। তাই আমাদের আশেপাশে দু'তিনটা বাড়িতে পর পর রাত্রে চুরি হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের বাড়ি ঢুকতে বোধহয় সাহস হয়নি ওদের। বলেই আবার হেসে ওঠে স্মৃতিকণা।

হাতের মাসিক পত্রিকাটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে অমিতও হেসে বললে, হ্যাঁ, সেই আনন্দেই থাকো। যেদিন ঢুকবে, সেদিন টের পাবে।

—বাঃ, তা'হলে আপনারা আছেন কেন?

—আমরা তো আছিই, চেষ্টাও করছি। তাই বলে কি দেশের চুরি-ডাকাতি একেবারে বন্ধ করা সম্ভব?

একটু থেমে স্মৃতিকণা আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা, এই গভীর রাতে আপনারা একা একা পাহারা দিতে বেরোন, আপনাদের ভয় করে না? ক্রিমিন্যালরা তো ইচ্ছে করলেই আপনাদের অনিষ্ট করতে পারে!

—পাহারা দিতে বেরোই! কে বললে তোমাকে?

—কেন, আমি বুঝি জানি না! সেদিন—একটু ভেবে নিয়ে স্মৃতিকণা আবার বললে, হ্যাঁ—পরশুদিন। পরশুদিন গভীর রাতেই তো আপনি আমাদের বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়ে সাইকেলে একা একা যাচ্ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ, নাইট-রাউণ্ডে বেরিয়েছিলাম। ওটা ঠিক পাহারা দেওয়া নয়। যেসব কনস্টেবলরা রাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়, তারা ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা চেক্ করে দেখতে হয় আমাদের। ঠিক বলেছো, পরশু তোমাদের এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছিলাম। তা' অত রাতে তুমি আমাকে দেখলে কি করে? জেগে ছিলে নাকি?

—হ্যাঁ, সেদিন একটুও শীত ছিল না। রাতে ঘুম ভেঙে যেতেই মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিতে এসে দেখলাম আপনাকে।

—যাক্, আমার বরাত ভাল বলতে হবে! মৃদু হেসে বললে অমিত।

—কেন? ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা।

—তা'ছাড়া আর কি? ধড়াচুড়ো সত্ত্বেও যখন এতদূর থেকে আমাকে চিনতে তোমার অসুবিধা হয়নি, তখন—

—আহা, এ আবার এমন কি কৃতিত্বের কাজ!

—না, ঠিক তা' নয়। তবে অনেক সময় একেবারে কাছে থেকেও চিনতে পারো না কিনা! তাই বলছিলাম—

—সেকি, কবে আপনাকে চিনতে পারিনি?

একটু থেমে অমিত আবার বললে, কেন, সেদিন বিকেলে আরও তিন-চারটি মেয়ের সঙ্গে কলেজ থেকে ফেরার পথে আমাকে দেখে কি চিনতে পেরেছিলে? তোমাদের পাশ দিয়েই তো চলে গেলাম। দেখে মনে হল, যেন চিনতেই পারোনি।

একমুহূর্ত চুপ করে থাকে স্মৃতিকণা। তারপর জবাব দেয়, আপনাদের বুদ্ধি-সুদ্ধিও যে একটু মোটা ধরনের হয়ে থাকে তা' কিন্তু আমার জানা ছিল না।

—কেন? প্রতিবাদ করে ওঠে অমিত। বুদ্ধির ঘাটতি আবার কোথায় দেখলে?

—তা' নয় তো কি? রাস্তায় আপনাকে চিনতে পারি, আর বান্ধবীদের নানা প্রশ্নে আমাকে নাজেহাল হতে হয়, তাই বুঝি ভাল হতো?

—তা' বটে! মৃদু হেসে চুপ করে থাকে অমিত। ব্যাপারটা এতটা তলিয়ে দেখেনি সে।

ইতিমধ্যে ঠাকুর চা ও জল খাবার এনে রেখে গেছে। স্মৃতিকণা বললে, নিন, এটুকু খেয়ে নিন।

খাবারের দিকে তাকিয়ে অমিত বললে, ওরে বাবা, এত খাবার আমি খেতে পারব না।

কৃত্রিম নির্লিপ্ত সুরে স্মৃতিকণা বললে, খান বা না-খান সেটা আপনার ইচ্ছে। আমার কাজ আমি করলাম। বাবা ঠাকুরঘর থেকে এসে পড়লেন বলে। না খেলে তিনি হয়ত দুঃখ পাবেন।

মৃদু হেসে অমিত বললে, না খেলে বাড়ির কর্তা দুঃখিত হবেন, কিন্তু পরিবেশনকারিণী বোধহয় দুঃখিত হবেন না?

—আমার বয়েই গেছে বলেই খাবারের থালাটা আরও একটু অমিতের দিকে ঠেলে দেয় স্মৃতিকণা।

চটিজুতোর শব্দ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করেন অজিতেশবাবু। অমিতের দিকে তাকিয়ে বলেন, নাও বাবা, খেয়ে নাও। বলেছি তো, মা আমার দশভূজা। তুমি আসবে বলে আজ কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজের হাতেই খাবারগুলো তৈরি করেছে।

—বাবা! প্রায় ধমকে ওঠে স্মৃতিকণা। লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে ওঠে তার। বললে, কি যে তোমার বুদ্ধি বাবা! এই বুদ্ধি নিয়ে সারাটা জীবন তুমি যে কি করে ওকালতি করলে, ভেবে পাই না।

—কেন কি হল? সরল কণ্ঠস্বর অজিতেশের।

অমিত খেতে খেতে স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

খাওয়া শেষে অমিত সবে জলের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়েছে, ঠিক এমনি সময় বাইরের দরজা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা। সঙ্গে একটি অল্পবয়সী লোক।

মহিলাটির চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। পরনে অতিমিহি ধুতি। গায়ে সাদা নক্সা-কাটা একখানা দামী আলোয়ান।

মহিলাকে দেখেই স্মৃতিকণা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, একি পিসিমা, তুমি হঠাৎ?

জবাব দেয় মহিলাটি, হ্যাঁ, হঠাৎই এলাম। অনেকদিন খোঁজ-খবর পাই না তোদের। তোরাও তো কোন খবর দিবি না, তাই নিজেকেই আসতে হল।

অজিতেশবাবুও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আয় নলিনী, এদিকে আয়।

নলিনী আরও একটু এগিয়ে আসতেই অমিতের দিকে তার নজর পড়ে। ভ্রূ কুঁচকে বললে, এ আবার কে?

হেসে জবাব দেয় অজিতেশবাবু, এখানকার থানার অফিসার। এখানে—

অজিতেশবাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নলিনী বলে ওঠে, ও—এই সেই পুলিশের লোকটি! হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে এর কথা। কি যেন নাম, অজিত না কি যেন! কথা বলতে বলতে মহিলাটি একবার অমিতের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে। কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগল আরও কুঞ্চিত হয়ে ওঠে তার।

মহিলাটির ভাবভঙ্গি, কথার ধরন তেমন ভাল লাগে না অমিতের। হাত জোড় করে নমস্কার করে সে শুধু বললে, আমার নাম অমিত রায়।

—ঐ হল, অমিতকে না হয় অজিত বলে ফেলেছি, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? তারপর অজিতেশবাবুর দিকে তাকিয়ে সে আবার বললে, তা' দাদা, একে ধরেই তো তুমি সেই কুকুরে কামড়ানোর মামলা থেকে রেহাই পেয়েছিলে, তাই না?

একটা ঢোক গিলে অজিতেশবাবু বললেন—ঠিক তা' নয়—

—হয়েছে—হয়েছে, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না তোমাদের। তোমরা না বললেও সব শুনেছি আমি।

কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল অমিত। ঘৃণায় ও লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। এদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তা'হলে এই কথাই প্রচার হয়েছে যে, অমিত ইচ্ছে করেই অজিতেশবাবুকে সেই মামলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু নলিনী এরপর যে কথাটা উচ্চারণ করলে তা' কোনদিন কল্পনাতেও আনতে পারেনি অমিত। মানুষের মন যে এত ছোট, এত নীচ হয় কি করে তা' ছিল তার ধারণার অতীত।

অমিত ও স্মৃতিকণার দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে নলিনী অজিতেশবাবুকে আবার বললে, তুমি তো জানো দাদা, আমি বরাবর উচিত কথাই বলি। আমার কিন্তু ধারণা তোমাদের এই হিতাকাঙ্ক্ষী লোকটি সেই উপকারের পরিবর্তে বড় বেশি দাম চাইছে। তোমাকেও পেয়েছে সদাশিব লোক। তেমন অবস্থায় ওকে তো কিছু টাকা দিয়েই বিদেয় করতে পারতে। এর মধ্যে আবার এই মেয়েটাকে টেনে আনলে কেন?

পরিষ্কার ইঙ্গিত। সত্যিই রেখে-ঢেকে কথা কইতে জানে না নলিনী।

ঘৃণায়, লজ্জায় স্মৃতিকণার মাথা নিচু করে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর এক সময় মৃদু কম্পিতগলায় 'আমি আসছি' বলেই ছুটে পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে অজিতেশবাবু বললেন, আহা, তুই ঠিক বুঝতে পারিসনি ব্যাপারটা, নলিনী। এখানে নয়—এখানে নয়, এই ঘরে আয়। বলছি—বলছি তোকে, এই ঘরে আয়। বলতে বলতে নলিনীর হাত ধরে একরকম টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করেন অজিতেশবাবু।

একা ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অমিত। পা'দুটো যেন জগদ্দল পাথরের মত ভারী লাগছে। সমস্ত দেহটা কেমন যেন অবসন্ন। এতদিন সে কেবল শুনেই এসেছে মানুষের জিভের বিষ নাকি কেউটের বিষের চাইতেও সাংঘাতিক হতে পারে। আজ সে সত্যি সত্যি তা' টের পেল।

এখন সে কি করবে? পালিয়ে যাবে? দৌড়ে পালিয়ে যাবে এখান থেকে?

কিন্তু না, পালাবে না অমিত। পাশের ঘর থেকে মহিলাটির গলার আওয়াজ তখনও ভেসে আসছে। ওর সব কথা না শুনে পালাতে পারে না অমিত। সে দেখতে চায়, জানতে চায়, বুঝতে চায় মানুষ তার জিভের মধ্যে কতটা বিষ লুকিয়ে রাখতে পারে। সেই বিষের জ্বালা কতটা যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে।

নলিনী তখনও সমানে তর্ক করে চলেছে তার দাদার সঙ্গে। বলছে, বলছি তো, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যেও না দাদা। ওই কচি মেয়েটার মাথাটা চিবিয়ে খাবার ব্যবস্থা করেছো তুমি। ওরা হচ্ছে পুলিশ। ওদের পেটে পেটে প্যাঁচালো বুদ্ধি। তোমার সংসারের ঐ লোকটা সুঁচ হয়ে ঢুকবে আর ফাল হয়ে বেরিয়ে যাবে। রেখে যাবে কেবল ছিঁবড়ে—

আর শুনতে পারে না অমিত। সেই শীতের রাতেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে সে। একটা প্রচণ্ড কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকার যেন বাইরে আসতে চায় তার বুকের পাঁজর ভেদ করে।

ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে অমিত। বাইরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে যেন বাঁচে।

থানায় ঢুকতেই বড়বাবু বললে, এই যে সংবাদ-প্রভাকর! তোমার কর্সিক ব্রাদারটির তো এখনও দেখা নেই।

—কেন, অমিত আজ থানায় আসেনি? প্রশ্ন করি আমি।

—না, এখনও তার দেখা নেই। কাল রাতে নাইট ডিউটি করেছে, বোধহয় শরীর খারাপ হয়ে থাকবে।

—তা'হলে একবার ওর বাসা থেকে ঘুরেই আসি, কি বলেন?

—যেতে যখন ইচ্ছে করেছে, যাও। বন্ধুকে ছাড়া আমাদের সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগবে? বলেই মৃদু হাসে বড়বাবু।

অমিতের বাসায় ওর ঘরে ঢুকেই কিন্তু থমকে দাঁড়াই আমি। ঘরের ভেতরে অল্প পাওয়ারের আলোটা জ্বলছে। উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে কন্‌কনে শীতের হাওয়া প্রবেশ করছে ঘরে। আর খাটের ওপর চুপ করে শুয়ে আছে অমিত। পরনে পাজামা, গায়ে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি। ডান হাতটা রেখেছে নিজের কপালের ওপর। দামী গরম আলোয়ানের একাংশ খাটের ওপর, আর বাকিটা লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়।

সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসেবে অনুমানের ওপর অনেক সময়ই নির্ভর করতে হয় আমাদের। যার অনুমান যত নির্ভুল, তারই নামডাক তত বেশি। এই জন্যেই সংবাদ জগতে 'স্কুপ' নামক ইংরেজি শব্দটি বিশেষ প্রচলিত।

অমিতের পোশাক ও তার অবস্থা দেখে আমি অনুমান করি, সে বোধহয় আজ অজিতেশ দত্তর বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যা' নাকি তার এই অবস্থার জন্যে দায়ী।

কিন্তু কি ঘটতে পারে এমন? অজিতেশ দত্ত কিছু বলেছেন, অথবা অমিতের সেই মানস-প্রতিমা স্মৃতিকণার সঙ্গে কোনরকম মনোমালিন্য কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু একটা ঘটেছে নাকি?

অমিতের খাটের পাশে বসে ওকে আমি ডাকি, অমিত—অমিত!

কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার ডাকি, অমিত! এই অসময়ে এমনিভাবে শুয়ে রয়েছো যে? কি হয়েছে?

এবারেও কোন সাড়া দেয় না অমিত।

ওর গায়ের ওপর একটা হাত রেখে আবার ডাকি, অমিত।

এবার আস্তে আস্তে কপালের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নেয় অমিত। চোখ মেলে তাকায় আমার দিকে।

—কি হল? এমনিভাবে শুয়ে রয়েছো কেন? প্রশ্ন করি আমি।

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে খাটের ওপর উঠে বসে অমিত। তাকিয়ে দেখি, ওর শুকনো চোখদু'টো জবাফুলের মত টকটকে লাল।

—অজিতেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলে নাকি?

শান্তকণ্ঠে এতক্ষণে জবাব দেয় অমিত, হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তারপর একটু থেমে আবার বললে, সেখানে কেউটে সাপের চেয়েও এক সাংঘাতিক জীব আমাকে তাড়া করেছিল, ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম।

—হেঁয়ালি রাখো, বলো কি হয়েছে? ঝগড়া হয়েছে?

একটু ম্লান হাসি জেগে ওঠে অমিতের ওষ্ঠপ্রান্তে। তেমনি শান্তকণ্ঠে সে জবাব দেয়, তুমি তো বেশ কথা বলছো! ঝগড়া হয় মানুষে-মানুষে। পুলিশে-মানুষে ঝগড়া হয় নাকি?

ব্যাপারটা যেন খানিকটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি ঝগড়ার অন্য পক্ষ অজিতেশবাবু কিম্বা তাঁর কন্যা স্মৃতিকণা নয়। সে হচ্ছে এক তৃতীয় ব্যক্তি।

—হেঁয়ালি রেখে আসল ব্যাপারটা খুলেই বলো না! আমি বললাম।

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে সেই একজোড়া রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গলার আওয়াজে দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলে অমিত বললে, সেই কীপলিং সাহেব বলেছিলেন না—দি ইস্ট ইজ ইস্ট, দি ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট, দি টুইন শ্যাল্ নেভার মিট্। জনসাধারণ ও পুলিশ বোধহয় কোনকালেই মিলতে পারবে না।

আমি জবাব দিই, কিন্তু পরবর্তীকালে কীপলিং সাহেবের সেই ধারণা ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ধরা গলায় অমিত বলে ওঠে, দেখ তরুণ, বিশ্বাস করো ভাই, আমার আজকের এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলেই এতদিন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এসেছি। সেই বিশ্বাসে অবিচল থেকেই একদিন এই ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করেছিলাম। জনসাধারণের সেবা করব—এই মনোভাব নিয়েই এসেছিলাম এখানে। তাদের শাসন করবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাদের সঙ্গে মিশব, দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব—একথাই ভেবে এসেছি বরাবর। ভেবেছিলাম, 'মানি বিগেট্স্ মানি'-র মত ভালবাসাই ভালবাসা আনে। ভালবাসা পেতে হলে আগে ভালবাসতে হয়। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। আমার সেই বিশ্বাসের মূলে যেন ফাটল ধরছে। মনে হচ্ছে, না, তা' হবার নয়। কীপলিং সাহেবের কথাই বোধহয় ঠিক। ব্রিটিশ আমলের পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সেই শাসক ও শাসিত সম্পর্কের ভূতকে এত দিনেও আমরা তাড়াতে পারিনি। দোষ বোধহয় দু'পক্ষেরই। দু'পক্ষই সমান অপরাধে অপরাধী।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থামে অমিত। আমি সেই মুহূর্তে তাকিয়ে দেখি ওর সারা মুখে কেমন যেন এক নিরাশার ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। আর বেদনাময় হয়ে উঠেছে ওর চোখজোড়া।

॥ বারো ॥

পাঁচ নম্বর আইন—এ্যাক্ট ফাইভ্ অব্ এইটিন সিক্সটি ওয়ান—সহজ ভাষায়, পুলিশ আইন।

সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তীকাল। খাস বিলেতে তখন তুমুল আলোড়ন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ভারতের মাটি প্রচুর ব্রিটিশ রক্ত শুষে নিয়েছে। বহু ব্রিটিশ সৈন্য ও ইংরেজ নরনারী প্রাণ হারিয়েছে বিদ্রোহীদের হাতে। ব্রিটিশ জনসাধারণের সামনে কৈফিয়ৎ নিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে ব্রিটিশ সরকারকে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্রিটিশ সরকার—চিন্তিত ইংলণ্ডেশ্বরী—বিমূঢ় ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং।

বিদ্রোহ দমনের লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে বসে ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল, ভারতবর্ষের মত একটা বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার আর কোন ক্রমেই ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত একটা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের হাতে রাখা নিরাপদ নয়। তাই, ভারতবর্ষের শাসনভার সরাসরি নিজের হাতে তুলে নিল ব্রিটিশ সরকার। ইংলণ্ডের মহারাণী এক ঘোষণায় ভারতের শাসনভার একটি কাউন্সিল ও একজন সেক্রেটারির হাতে তুলে দিলেন। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে একজন ভাইস্রয় নিযুক্ত করবার নীতি গৃহীত হল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল এ্যাক্ট পাশ হয়ে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হল। ঐ বছরই ২রা মার্চ পাশ হল সেই পাঁচ নম্বর আইন—পুলিশ কানুন—ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিরাট পুলিশ বাহিনী সংক্রান্ত আইন।

সেই পাঁচ নম্বর আইন আজও বলবৎ। এই দীর্ঘ সময়ে বিলেতের টেম্স্ নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। বয়ে গেছে এদেশের গঙ্গায়ও। কিন্তু ঐ আইনটি আজও ঠিক আছে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সামান্য কিছু অদল-বদল হলেও মূল আইনটির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি আজও।

গোটা দেশের পরিবর্তন হয়েছে অনেক—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সমস্ত ক্ষেত্রেই বিরাট পরিবর্তন এসেছে এই দীর্ঘ সময়ে। শুধু পরিবর্তন নয়, সময় সময় মনে হয়, যেন অতীতের সেই কাঠামোটাকেই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজতে যাওয়াটাই কেবল পণ্ডশ্রম। সারা দেশের আকাশে-বাতাসে একটা পরিবর্তনের জোয়ার। রাজনৈতিক মূল্যবোধের মান পরিবর্তিত হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের। সবচাইতে বেশি পরিবর্তন এসেছে সম্ভবত সামাজিক ক্ষেত্রে। গোটা সমাজ-ব্যবস্থাই যেন উল্টে-পাল্টে তালগোল পাকিয়ে একটা অদ্ভুত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সভ্যতা, ভব্যতা, শালীনতা প্রভৃতি শব্দগুলো যেন তাদের অভিধানগত অর্থ হারিয়ে প্রায় নিরর্থক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আজ। মনুষ্যত্ব, মহত্ব যেন এখন অতীতের বস্তু। সেকালের মনীষীদের জীবন-কাহিনীতেই কেবল ওদের স্থান। ধৈর্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা এখন যেন অক্ষমের অবলম্বন। আর স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলো এখন যেন মানুষের বিকল মনের উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই যখন দেশের সমাজ জীবনের চেহারা, তখন ঐ পাঁচ আইনের আওতার মধ্যে থেকে যারা চাকরি করে, তাদের চিন্তা কিম্বা কর্মধারার মধ্যে এই তথাকথিত নব্য চিন্তার প্রতিফলন দুঃখের বিষয় হলেও আশ্চর্যের ব্যাপার নয় মোটেই। রক্তের মধ্যে যদি কোনক্রমে একবার বিষ প্রবেশ করে, তখন সেই বিষাক্ত রক্তের সঞ্চালন মানুষের মস্তিষ্কটাকে অসাড় করে তোলে। তা' থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই কঠিন। এজন্যে দেহের কোন বিশেষ অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গকেও দায়ী করা চলে না। দায়ী যদি করতে হয় তো একমাত্র রক্তের মধ্যে সেই বিষের অনুপ্রবেশকেই করা চলে।

দেশের এই ডামাডোলের মধ্যেও কিন্তু সামান্য কিছু ব্যক্তি মানুষের ধর্মকে এখনও একেবারে ভুলে যায়নি। তাদের কাছে মনুষ্যত্ব, ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলো এখনও স্ব-অর্থেই টিকে আছে। তারা এই বর্তমান গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যেও কিন্তু অতীতের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করে। তাদের কার্যকলাপ দেখে কেউ হয়ত হাসে, কেউ হয়ত টিটকিরি দেয়। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না তারা। এরা সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু সংখ্যাধিক্যই তো সব নয়। তাই যদি হত তা'হলে এই পৃথিবীর আকাশে বাতাসে মানুষের লক্ষ কোটি গুণ বেশি 'ভাইরাস্' পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে নিঃশেষে মুছে দিতে পারত।

এই জেলা-শহরের কোতায়ালী থানার সেকেণ্ড অফিসার অমিত রায় কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের দলেই। তাই, সে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে এসে জনসেবার স্বপ্ন দেখে। তাই, পঙ্কিল রাজনীতির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাওয়া রাজনৈতিক নেতাদের কথার চাইতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তার কাছে অনেক বড়। তাই সে জনসাধারণকে ভালবাসতে চায়, পেতে চায় তাদের ভালবাসা। তার কানের কাছে সর্বদা ধ্বনিত হয় গীতার শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী—'পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম'.......। তার মতে স্বয়ং ভগবানের সেই বাণীকে সার্থক করে তোলার সবচাইতে প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র এই পুলিশ বিভাগ। এই বিভাগে কাজ করেই সে শান্তিপ্রিয় নাগরিককে রক্ষা করতে পারবে, শাস্তি দিতে পারবে দুষ্কৃতকারীকে।

কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন মুষড়ে পড়ে অমিত। মানুষের দীনতা, নীচতা ব্যথা দেয় তাকে। সময় সময় নিজের বিশ্বাসের ওপরই যেন সে আর আস্থা রাখতে পারে না। বিভ্রান্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে।

সময় সময় আমি নিজের মনেই ভাবি, দেশের পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি কর্মচারীই যদি অমিতের মত হত। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারি। নিজেকেই জবাব দিই, তা' কি করে হবে? এদেশের পুলিশ বাহিনীর কর্মচারীদের তো স্বর্গ থেকে ধরে আনা হয়নি। এদেশের লোক তারা—এদেশের জনসাধারণেরই একটা অংশ। তাই, গোটা দেশের জনসাধারণের নৈতিক মানই যখন অনেক নিচে নেমে গেছে, তখন কেবলমাত্র ওদের দোষ দিয়ে তো কোন লাভ নেই। অমিত রায় হচ্ছে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। এমন প্রহ্লাদ তো গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মে না। ওরা সর্বদেশে সর্বকালেই মুষ্টিমেয়।

রিটায়ার্ড এ্যাড্‌ভোকেট্ অজিতেশ দত্তর বাড়িতে সেদিন রাতের ঘটনায় মনে দারুণ আঘাত পেয়েছিল অমিত। তাই, তারপর থেকে ঐ বাড়িতে যাওয়া একরকম ছেড়েই দিল সে।

সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে একদিন অমিতকে আমি জিজ্ঞেস করি, কি হে, ওদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললে নাকি?

ওদের' বলতে আমি কাদের বোঝাতে চেয়েছি, তা' বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না তার। তাই একটু সময় চুপ করে থেকে অভিমানের সুরে অমিত জবাব দেয়, না চুকিয়ে আর উপায় কি বলো? সেদিনের পর থেকে ওদের বাড়ি থেকেও তো কেউ এসে আজ পর্যন্ত আমার একটা খবর নিলে না!

—বাঃ, বেশ কথা বললে! আমি বললাম, কে আসবে ওদের বাড়ি থেকে? অজিতেশবাবু বুড়ো মানুষ। যতদূর জানি, তিনি বাইরে একরকম বেরোন না। বাকি তো রইল তার সেই ছোট ছেলেটি আর তোমার সেই মানসী স্মৃতিকণা। তুমি কি চাও স্মৃতিকণা নিজে এসে

তোমার মান ভাঙিয়ে তোমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যাবে? তাও যদি বুঝতাম, তাদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে অপরাধ করেছে। দোষ করল স্মৃতিকণার সেই পিসি, আর তুমি দণ্ড দিচ্ছ ওদের? এ তোমার কেমন ধারা বিচার, অমিত?

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল অমিত। তারপর একসময় বললে, বুঝলে তরুণ, অনেক ভেবে দেখলাম। আমার মত একজন পুলিশ অফিসারের পক্ষে ওদের সাথে বেশি মেলামেশা করা উচিত নয়। তা ছাড়া, সেই কথায় আছে না—শত হস্তেন বাজিনঃ.......

—তার মানে?

—মানে কি এতই কঠিন যে বুঝতে পারছো না? একটু ম্লান হেসে অমিত বললে।

জবাবে আমি বললাম, বাজি মানে তো ঘোড়া। জ্ঞানীব্যক্তিরা ঘোড়া থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে বলেছেন। তা' এখানে ঘোড়াটি কে? অজিতেশবাবু, না তাঁর কন্যা?

তেমনি ম্লান হেসে অমিত জবাব দেয়, ঘোড়া অর্থে ঠিক কোন ব্যক্তি বিশেষকে বোঝাতে চাচ্ছিনা। এখানে সমস্ত জনসাধারণকেই আমি ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করছি। আমাদের মত পুলিশ অফিসারের পক্ষে জনসাধারণের খুব ঘনিষ্ঠ হতে যাওয়া ঠিক নয়, তাতে বিপদের সম্ভাবনা।

—কিসের বিপদ?

—ক্ষুরের চাট্ খাওয়ার।

—তোমার কি ধারণা সব ঘোড়াই ক্ষুরের চাট্ মারে?

—বোধহয় অধিকাংশই। ওটা ওদের বৈশিষ্ট্য। তাই জ্ঞানীব্যক্তিরা সাবধান করে দিয়েছেন।

আমি এবার একটু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিই, না এটা তোমার ভুল ধারণা। যে ঘোড়া চাট্ মারে, তার ঐ চাট্ মামার পেছনে নিশ্চয়ই কোন ভয় কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু একটা লুকিয়ে থাকে। সেই ভদ্রমহিলার কথাই ধরো না। তিনি তোমাকে চরম অপমান করেছেন। তুমি কি মনে করো, তোমাকে সেদিন ঐরকম অপমান করার পেছনে কোন কারণ নেই? নিশ্চয়ই আছে। হয়ত তিনি কোন ভুক্তভোগী, হয়ত কোনদিন কোন পুলিশ অফিসারের কাজে কিম্বা ব্যবহারে তোমাদের ডিপার্টমেন্টের ওপর তাঁর এমনি একটা ধারণা হয়ে থাকবে। অবশ্য, এটা স্বীকার করছি যে, সেদিন তোমার সঙ্গে তাঁর ওরকম ব্যবহার করা মোটেই সমীচীন হয়নি। কারণ, মনুষ্য চরিত্র তো ঠিক ভাত নয় যে, একটা কিম্বা দু'টো ভাত টিপেই হাঁড়ির সমস্ত ভাতের খবর জোগাড় করা যাবে। কাজেই ক্ষুরের চাট্ মারা যে ঘোড়ার স্বভাব ঐ ধারণা তোমার ঠিক নয়। কেউ মারে, কেউ মারে না। এমন কি তেমন তুখোড় সওয়ারী পেলে চাট্ মারা তো দূরের কথা, সওয়ারীকে কাঁধে চাপিয়ে পরমানন্দে সে ছুটে বেড়ায়।

আমার কথার জবাব না দিয়ে অমিত কেবল চুপ করে থাকে। তার মৌনতার সুযোগ নিয়ে আমি আবার বললাম, ঐ অজিতেশবাবু কিম্বা তাঁর কন্যা, ওঁদের কথায় কিম্বা ব্যবহারে কোনদিন তেমন কিছু লক্ষ্য করছো কি? তবে কেন বলছো যে, ঘোড়ামাত্রই চাট্ মারে? আসলে পুলিশই বলো, আর বাদবাকি জনসাধারণই বলো, একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করা চলে না।

এবার মৃদুকণ্ঠে অমিত জবাব দেয়, অধিকাংশকেই চলে বোধহয়।

—তা' হয়ত চলে। কিন্তু অধিকাংশের বাইরে যারা রয়ে গেল তাদের কি হবে? বিনা দোষে তারা শাস্তি পাবে কেন?

সেদিন যুক্তির সাহায্যে অমিতের মনের মেঘ কতটুকু সরাতে পেরেছিলাম জানি না। তবে, আমার কথা শেষ হতেই হঠাৎ সে বলে ওঠে, অনেকদিন সিনেমায় যাইনি। যাবে? একটা ভাল ইংরেজি বই হচ্ছে।

একটু চিন্তা করে জবাব দিই, বেশ চলো।

পথে যেতে যেতে অমিতকে জিজ্ঞেস করি, কি ব্যাপার, আজ যে হঠাৎ সিনেমা দেখতে শখ হল? হাতে বুঝি তেমন কাজকর্ম নেই?

হেসে জবাব দেয় অমিত, এবার সত্যিই তুমি হাসালে, তরুণ। পুলিশ অফিসারের হাতে কাজ নেই, এমন একটা অবস্থার কথা এদেশে পুলিশ অফিসাররা চিন্তাই করতে পারে না। বরঞ্চ বলতে পারো, এত বেশি কাজ যে, কোন্‌টাকে ছেড়ে কোন্‌টাকে করা উচিত ভেবে না পেয়ে শেষপর্যন্ত কোনটাই আর করা হয়ে ওঠে না। বলেই একটু জোরে হেসে ওঠে।

. আমিও হেসে জবাব দিই, তাই বুঝি দিশেহারা হয়ে সিনেমায় ছুটে চলেছো?

—সত্যি ভাই, বলতে থাকে অমিত, মাঝে মাঝে সত্যিই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। কেমন যেন সব একঘেয়ে লাগে। তাই সিনেমায় চলেছি সেই একঘেয়েমি দূর করতে। হল থেকে বেরিয়ে সোজা থানায় যেতে হবে। হাতে প্রচুর কাজ।

জমজমাট থানা।

অফিসাররা সকলেই আজ উপস্থিত। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। থানা ডিউটি আজ পিনাকী সরকারের।

বাইরের বড় হলঘরে জেনারেল ডাইরী বইটা সামনে খুলে রেখে অর্ধনির্মীলিত নেত্রে সিগারেট টানতে টানতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিম্নশ্রেণীর লোকটির বক্তব্য শুনছিল পিনাকী, আর মাঝে মাঝে ধম্‌কে উঠছিল তাকে—ইস্‌, ব্যাটা আমার নবাবপুত্তুর! কথাটা গুছিয়ে বলতে পারে না, আবার থানায় এসেছে ডাইরী করাতে! নে-নে, ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে হবে না। অত সময় নেই আমার। সোজা ভাষায় মোদ্দা কথাটা বলে ফেল্‌ দেখি!

ধমক খেয়ে বেচারা আরও ঘাবড়ে যায়, নিজের বক্তব্য আরও গুলিয়ে ফেলে। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক। নিজের কথাটা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা সত্যিই তার নেই। নেহাত দায়ে না পড়লে থানা-পুলিশের চতুঃ-সীমানায়ও আসে না এরা। কিন্তু পিনাকী দারোগা অতশত বোঝে না। লোক দেখলেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। এইটুকু বিবেচনা করার শক্তি নেই যে, এরা বিপদে না পড়লে থানায় আসে না।

থানার দেউড়ীতে বন্দুক হাতে হিন্দুস্থানী সেন্ট্রি কনস্টেবল্‌ বাঁ হাতে নিজের গোঁফজোড়া পাকাতে পাকাতে গুটিকয়েক ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় ব্যস্ত। থানার সিনিয়র এ. এস্‌. আই. শ্রীপতি মিত্রের পুত্র-কন্যা বাহিনীর সামান্য একটা অংশ এরা। থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বহুকালের পুরানো ভাঙা অচল মোটর গাড়িকে সচল করবার চেষ্টায় প্রতিদিন এরা এসে জড়ো হয় এখানে। গাড়িটার বিভিন্ন অংশে বসে এরা খেলা করে। থানা, পুলিশ, বন্দুককে এরা ভয় করে না। জন্ম থেকেই এরা এই আবহাওয়ায় মানুষ।

মোটর গাড়িটা বহুকালের পুরানো। টায়ারহীন তিনটি চাকা মাটিতে বসে গেছে। চতুর্থ চাকাটির অস্তিত্বই নেই। ছাদটা ভেঙে দুম্‌ড়ে পড়েছে অনেক কাল আগে। মাটিতে বসে যাওয়া সামনের ইঞ্জিনটার পাশে জন্মেছে একটি অশ্বত্থগাছের চারা। কোন্‌কালে, কত বছর আগে এই

গাড়িটাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ আজ হয়ত অনেকেই জানে না। তবে হিসেব একটা নিশ্চয়ই আছে। থানার মালখানা বইটা খুললেই গাড়িটার নাড়ী নক্ষত্রের খবর জানতে পারা যাবে। প্রায় দশ-বারো বছর আগে এ্যাক্সিডেণ্টে দুমড়ে যাওয়া এই গাড়িটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। সেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বহুকাল আগে। কিন্তু গাড়ির মালিক আর গাড়িটাকে নিয়ে যেতে আসেনি। আসলে, সেই এ্যাক্সিডেণ্টে গাড়ির মালিক নিজেই নিহত হয়েছিল। বোধহয় সেদিন তার তেমন কোন ওয়ারিশান ছিল না বলেই কেউ এসে ক্লেম করেনি গাড়িটা। কিন্তু সরকারি আইন—সেদিন না এলেও ভবিষ্যতে কেউ হয়ত এসে গাড়িটা দাবী করতে পারে, তাই গাড়িটা থানার হেপাজতেই পড়ে রইল। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এখন ওটা ওজনদরে বিক্রি হতে পারে মাত্র। অবশ্য নিয়মমত আন্‌ক্লেমড্ প্রপার্টি হিসেবে ওটা নীলামে বিক্রি করে টাকাটা সরকারের খাতায় জমা হতে পারত। বছর সাতেক আগে এই কোতোয়ালী থানায় যিনি অফিসার-ইন্-চার্জ ছিলেন তিনি তেমন একটা চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু নীলামের খবর ছড়িয়ে পড়তেই, এবার একজন নয়, একেবারে দু'জন দাবীদার একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছিল। অবশেষে নীলাম স্থগিত রইল, আসল দাবীদার কে হবে তা' প্রতিপন্ন করতে দু'জন দাবীদারই দেওয়ানী আদালতের দ্বারস্থ হল। আদালতের হুকুমে গাড়িটা থানার হেপাজতেই রয়ে গেল। দেওয়ানী আদালতের বিচার পর্ব সমাধা হয়েছে কি হয়নি, তা' আজ পর্যন্ত থানার কেউ জানে না। হয়ত ঐ ভাঙা গাড়িটাকে উপলক্ষ্য করে দু'পক্ষের যত টাকা খরচ হয়েছে, তাতে একটা নতুন গাড়ি কিনতে পারা যেত। কিন্তু মানুষের জেদ্ বস্তুটি সবসময় লাভ-লোকসানের হিসেব মেনে চলে না। হয়ত একদিন একপক্ষ মামলায় জিতে আদালতের মোহরযুক্ত কাগজ নিয়ে থানায় এসে হাজির হবে। তারপর গাড়ির লোহালক্করগুলো সের দরে বিশ-পঁচিশ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে ম্লানমুখে বাড়ি ফিরে যাবে।

কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তা' না হচ্ছে ততদিন ওটা শ্রীপতি মিত্রের ছেলে-মেয়েদের খেলার সামগ্রী হয়েই থাকবে। আর ওর ইঞ্জিনের পাশে গজিয়ে ওঠা অশ্বত্থ চারাটিও একটু একটু করে বড় হতে থাকবে।

থানার দেউড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় একটি মহিলা। সঙ্গে হাফ-প্যাণ্ট পরা একটি ষোল-সতের বছরের ছেলে।

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মত বয়স হবে মহিলাটির। দোহারা গড়ন, ফর্সা। মাথার ঘোমটাটি খোঁপা পর্যন্ত নেমে এসেছে। কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতেও সিঁদুরের ছোঁয়া। দু'হাতে আটগাছা করে ষোলগাছা খাঁটি সোনার চুড়ির সঙ্গে দু'গাছা শাঁখা। গলায়ও মোটা সোনার হার। মহিলাটিকে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ বধূ বলেই মনে হয়।

সঙ্গের ছেলেটির গায়ের রঙ কিন্তু ময়লা। ছিপছিপে চেহারা। সারা চোখে-মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। দু'গালে কালশিরার দাগ। গায়ের জামাটি পিঠের কাছে ছেঁড়া।

ছেলেটিকে নিয়ে মহিলাটি দেউড়ির ওপর উঠে দাঁড়াতেই সেণ্ট্রি কনস্টেবল্ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, কি চাই, মাঈজী?

গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দেয় মহিলাটি, ডাইরী করব।

—কেয়া হুয়া, মাঈজী? কনস্টেবলটি আবার প্রশ্ন করে।

একটা ঢোক গিলে মহিলাটি সঙ্গের ছেলেটিকে দেখিয়ে বললে, একজন লোক একে মেরেছে। তার নামেই ডাইরী করাতে এসেছি।

প্রহরী কনস্টেবল্ হাত দিয়ে থানার হলঘরটি দেখিয়ে দিয়ে বললে, উধার দারোগাবাবুকা পাশ চলে যান। ওখানেই ডাইরী হোবে।

একটু আগেই সেই নিম্নশ্রেণীর লোকটির গরু-চুরির মামলা রুজু করতে হয়েছে। লোকটিকে বিদায় দিয়ে পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতে ডিউটি অফিসার পিনাকী সরকার একটি সিগারেট ধরিয়ে সবে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসেছে। ঠিক এমনি সময় সেই ছেলেটিকে নিয়ে মহিলাটি এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে পিনাকীর। বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি চাই আপনার?

—একটা ডাইরী করাতে এসেছি। মৃদুকণ্ঠে মহিলাটি জবাব দেয়।

—কি হয়েছে আপনার?

মহিলাটি ছেলেটিকে কাছে টেনে এনে দু'হাতে তার মুখখানা তুলে ধরে কালশিরার দাগগুলো পিনাকীকে দেখিয়ে বললে, এই দেখুন, কি অমানুষিক মার মেরেছে একে! গায়ের জামাটাও ছিঁড়ে দিয়েছে। আমি ঠিক সময়ে এসে না পড়লে হয়ত একে মেরেই ফেলত। বলতে বলতে মহিলাটির চোখদু'টো দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

তারপর, তীক্ষ্ণকণ্ঠে আবার বলতে থাকে, আমিও ওকে দেখে নেব। অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। এবার ওকে আমি জেলে পুরে ঘানি ঘোরাব।

বিরক্তকণ্ঠে পিনাকী বললে, বেশ, বেশ! এখন থামুন। যখন ঘানি ঘোরাবার তখন ঘোরাবেন। এখন ডাইরী করাতে এসেছেন, ডাইরী করিয়ে চলে যান। কি নাম আপনার? কোথায় থাকেন?

একটু সময় চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে মহিলাটি জবাব দেয়, হেমাঙ্গিনী আদক।

—এটি বুঝি আপনার ছেলে? প্রশ্ন করে পিনাকী।

হেমাঙ্গিনী দ্বিধাগ্রস্তকণ্ঠে কিছু একটা জবাব দিতে চায়। কিন্তু তার আগেই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে পিনাকী আবার জিজ্ঞেস করে, কি নাম তোমার?

ছেলেটি কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দরজায় পা দিয়েছে। গালের ওপর দু'চারটে ব্রণ সবে জেগে উঠেছে। নাকের নীচে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট গোঁফের রেখা।

ছেলেটি একবার আড়চোখে হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, আমার নাম বলাই দে। আমি এদের বাড়িতেই থাকি। বলেই হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়ে দেয়।

বলাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই হেমাঙ্গিনী বলে ওঠে, হ্যাঁ, ও আমার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করে। আমাদের গ্রামের ছেলে। ওর বাপের অবস্থা তেমন ভাল নয়। কিন্তু বলাইয়ের পড়াশোনার খুব ইচ্ছে। মাথাও ভাল। তাই আমি ইচ্ছে করেই ওকে গাঁ থেকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রেখেছি। স্কুলে ও প্রতিবছর প্রথম হয়।

হেমাঙ্গিনীর হয়ত বলাই সম্বন্ধে আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আগেই পিনাকী তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, তা' তো বুঝলাম। এবার বলুন কে ওকে মারধোর করেছে? কেনই বা করেছে?

হেমাঙ্গিনী কিন্তু সরাসরি জবাব না দিয়ে বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, কিরে, চুপ করে আছিস কেন? নামটা বল্!

মৃদুকণ্ঠে বলাই জবাব দেয়, আমার মেসোমশাই পরিতোষ আদক।

—হ্যাঁ, সে-ই আমার স্বামী। বলাই আমাকে মাসী বলে ডাকে। আমার স্বামীই আজ বলাইকে মেরে প্রায় আধমরা করেছে। জবাব দিয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে হেমাঙ্গিনী।

ব্যাপারটা কেমন যেন একটু আশ্চর্য ঠেকে পিনাকীর কাছে। মহিলাটির স্বামী পরিতোষ আদক বলাইকে মেরেছে। তাই তার স্ত্রী এসেছে স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় ডাইরী করাতে।

—একটু আগে আপনি আপনার ঐ স্বামীকেই তা'হলে জেলে পুরে ঘানি ঘোরাবার কথা বলছিলেন। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে হেমাঙ্গিনীকে প্রশ্ন করে পিনাকী।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তার কথাই বলছিলাম। কি আর বলব? নিজমুখে স্বামীর নিন্দা করতে নেই। লোকটা এক নম্বরের মাতাল। পাঁড় মাতাল। আমার পয়সায় থাকবে খাবে, আর আমার চোখের সামনেই ছেলেটাকে মারবে! অতি বদ-চরিত্রের লোক।

মৃদু হেসে পিনাকী বললে, সত্যিই তো, নিজমুখে স্বামী নিন্দা আপনি করবেন কেন? আমি সবই বুঝতে পারছি। আপনার স্বামী একটি রত্ন বিশেষ, এই তো? তা' না হলে, আপনার মত স্ত্রী স্বামীকে জেলে পুরে ঘানি ঘোরাতে চায়?

পিনাকীর কথার মধ্যে যে যে শ্লেষটুকু ছিল সেদিকে লক্ষ্য না করে হেমাঙ্গিনী বলতে থাকে, আমার মত মেয়েছেলে বলেই এখনও ঘর করছি। তেমন কোন মেয়ের পাল্লায় পড়লে কবে ঝাঁটা-পেটা করে বিদেয় করত!

হেমাঙ্গিনীর কথাবার্তার ধরনে পিনাকী এতক্ষণে বুঝতে পারে, মেয়েটির চেহারা ভদ্রগোছের হলেও আসলে সে একেবারেই গেঁয়ো প্রকৃতির। অবস্থা হয়ত ভাল, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার কাছেও কোনদিন ঘেঁষেনি। তাই ভদ্র চেহারা নিয়ে শহরে বাস করলেও স্বভাবের কোনই পরিবর্তন ঘটেনি।

পিনাকী আবার প্রশ্ন করে, তা' আপনার স্বামী বলাইকে মারল কেন?

—কোন কারণ নেই। সত্যি বলছি, একেবারেই কোন কারণ নেই। আসলে ওকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। নিজের পেটে তো কানাকড়ি বিদ্যে নেই। তাই বলাইয়ের এখানে থেকে পড়াশোনা করাটা তার পছন্দ নয়। এদিকে আমার ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। তাই ওর ওপর যত আক্রোশ।

হেমাঙ্গিনী এত জোরে কথা বলছিল যে, থানায় কর্মব্যস্ত অন্য অফিসাররাও কাজ থামিয়ে তার কথা শুনছিল। হাতের পেন্সিল নামিয়ে রেখে মুখে একটি বিশেষ ভঙ্গি করে অমিতের দিকে তাকিয়ে নীচুকণ্ঠে ধূর্জটি বলে ওঠে, শুনছেন মেজবাবু, মেয়েছেলে তো নয়, এক খাণ্ডারণী!

ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে অমিত সামান্য একটু হাসে। তারপর আবার মাথা নীচু করে নিজের কাজে মন দেয়।

ওদিকে, হেমাঙ্গিনীর কথামত পিনাকী তার অভিযোগ ডাইরী করে নিয়ে তাকে বললে, ঠিক আছে। আপনার কথামত সব লিখে নিয়েছি। এবার আপনি আদালতে গিয়ে আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন।

—তার মানে? ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বলে ওঠে, আদালতে গিয়ে মামলা করব কেন? আপনারা তদন্তে যাবেন না?

—না। ছোট্ট সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় পিনাকী।

—লোকটা বলাইকে মেরে আধমরা করে ছাড়লে, আর আপনারা লোকটাকে গ্রেপ্তার করবেন না?

—না। আবার সেই সংক্ষিপ্ত জবাব পিনাকীর।

—তা'হলে, এতবড় একটা অন্যায় আপনারা কেবল বসে বসে দেখবেন?

—হ্যাঁ, তাই দেখব?

—অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে না?

—হবে। নিশ্চয়ই হবে। আদালতে যান।

—কিন্তু— এতক্ষণে কেমন যেন অসহায় শোনায় হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর।

জবাবে পিনাকী আবার বললে, আমরা তো খুশিমত কিছু করতে পারি না। আপনার কথামত চলাও আমাদের কাজ নয়। আপনার স্বামী ঐ বলাইকে মারধোর করে যে অন্যায় করেছে, তাতে আমরা ডাইরী পর্যন্ত করে রাখতে পারি। তার বেশি কিছু করতে পারি না। এতে কোন পুলিশ কেস হয় না। আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করাও চলবে না। এর বেশি কিছু করতে চাইলে আপনাকে আদালতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে।

পিনাকী কোন বে-আইনী কথা বলেনি। এটাই নিয়ম। নিয়মমত কথাই সে হেমাঙ্গিনীকে বলেছে। কিন্তু তার কথার ধরনটাই এমনি যে, কোন ভাল কথাও কেমন কঠোর-কঠিন শোনায় তার মুখে। অন্য অফিসাররা যেখানে মিষ্টি কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করত, সেখানে পিনাকী কেবল শুষ্ককণ্ঠে আইনের কথাটি শুনিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকে।

নির্যাতিত বলাই কিন্তু কোন কথা বলে না। সে কেবল চুপ করে মাথা নীচু করে থাকে।

এতক্ষণে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ফুটে ওঠে। ছল্ ছল্ চোখে পিনাকীর দিকে তাকিয়ে সে বললে, দয়া করে আমার স্বামীকে আপনারা গ্রেপ্তার করুন। নইলে, একদিন সুযোগ পেয়ে ওকে হয়ত মেরেই ফেলবে।

অধৈর্যকণ্ঠে এবার পিনাকী বলে ওঠে, কেন, মেরে ফেলবে কেন? স্বীকার করছি আপনার স্বামী ওকে দেখতে পারে না। তাই বলে ওকে মেরে ফেলবে কেন? আপনার স্বামীর কি মাথা খারাপ হয়েছে? একটা অতি সাধারণ সাংসারিক ব্যাপারে এত উতলা হচ্ছেন কেন? কোন্ বাড়িতে গার্জেনরা ছেলে-মেয়েদের একটু-আধটু মারধোর করে না?

—গার্জেন—গার্জেন বলছেন কাকে? আমার স্বামী ওর গার্জেন নাকি? ঝংকার দিয়ে ওঠে হেমাঙ্গিনী, ওর গার্জেন একমাত্র আমি, আর কেউ নয়। গার্জেন হবার মুরোদ কোথায় তার? শ্বশুরের ভিটেয় ঘর-জামাই হয়ে আছে। তিনকুলে কেউ নেই। আমার বাবার পয়সাতেই নিশ্চিন্তে নেসা-ভাং চালিয়ে যাচ্ছে। সে হবে গার্জেন!

এতক্ষণে ব্যাপারটা আরও একটু খোলসা হয়। পরিতোষ আদক ঘর-জামাই, কাজকর্ম কিছুই করে না। তাই, তার এই স্ত্রী-রত্নটির এত মেজাজ।

ঠিক এই সময় কি একটি কাজে অফিসার-ইন্-চার্জ ভবদেব ব্যানার্জি হলঘরে এসে দাঁড়ায়। পিনাকীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার, এত হৈ-হল্লা কিসের?

হেমাঙ্গিনী ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ভবদেবের দিকে। তার চেহারা, কথা বলার ভঙ্গিতে হেমাঙ্গিনীর মন হয় ভবদেব নিশ্চয়ই পিনাকীর চাইতে কোন উঁচুস্তরের অফিসার হবে। তাই সে ভবদেবের সামনে সরে এসে হাতজোড় করে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিন। নইলে সে এই ছেলেটিকে মেরেই ফেলবে।

ভবদেব হেমাঙ্গিনীর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় পিনাকীর কাছে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে ডাইরী-বইটা তুলে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে

হেমাঙ্গিনীকে বললে, এত চিন্তিত হবার কি আছে এতে? আপনি বাড়ি চলে যান। আপনার স্বামী যদি আবার গণ্ডগোল বাধায় তো চলে আসবেন এখানে? আমি ব্যবস্থা করব।

কিন্তু হেমাঙ্গিনী নাছোড়বান্দা। সে ভবদেবকে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনুরোধ করতে থাকে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে ভবদেব। পিনাকী আইনমত কাজই করেছে। এমন একটা সাধারণ ব্যাপারে তাদের কিছুই করণীয় নেই। তবুও মহিলাটি যখন এত করে অনুরোধ করছে—

হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে ভবদেব বললে, ঠিক আছে। আপনি বাড়ি যান। বিকেলের দিকে একজন অফিসার পাঠাব আপনার বাড়িতে। প্রয়োজন হলে তিনি ধমকে আসবেন আপনার স্বামীকে।

—কিন্তু, শুধু ধমকে দিলেই সে শায়েস্তা হবে ভেবেছেন নাকি? সে তেমন পাত্রই নয়। তাকে জেলে পুরতে হবে।

—বেশ—বেশ। দেখা যাবে। যে অফিসারটি আপনার বাড়ি যাবেন তিনিই প্রয়োজন মনে করলে আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে আনবেন।

এতক্ষণে হাসি ফোটে হেমাঙ্গিনীর মুখে। গাঁয়ের আঁচলটা একটু সামলে নিয়ে জোড়হাতে ভবদেবকে নমস্কার করে বললে, তা'হলে এবার চলি? বিকেলবেলা দারোগাবাবু আসছেন তো আমার বাড়িতে?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। জবাব দেয় ভবদেব।

বলাইকে নিয়ে হেমাঙ্গিনী বেরিয়ে যেতেই ভবদেব পিনাকীর দিকে তাকিয়ে বললে, বুঝলেন পিনাকীবাবু, ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে। নইলে, শুধুমাত্র ঐ ছেলেটাকে মারধোর করার জন্যে মহিলাটি তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করাতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠত না। তা' আজ বিকেলের দিকে একবার—

কথাটা শেষ করতে পারল না ভবদেব। তার আগেই পিনাকী মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলে ওঠে, আমার আবার শরীরটা তেমন ভাল নেই, বড়বাবু। ভাবছি, এই থানা-ডিউটির পরই সিক্ রিপোর্ট করব।

পিনাকীর স্বভাবের সঙ্গে ভবদেব বিলক্ষণ পরিচিত। কাজের নাম শুনলেই পিনাকীর গায়ে জ্বর আসে।

ভবদেব পিনাকীকে মুখে কিছু না বলে সামান্য একটু হাসে মাত্র। তারপর অমিতের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমিই বরঞ্চ বিকেলের দিকে ঐ মহিলাটির বাড়ি থেকে একবার ঘুরে এসো, কেমন?

ডাইরীর পাতা থেকে মুখ তুলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় অমিত।

সত্যিই মনুষ্য চরিত্র বিচিত্র। ততোধিক বিচিত্র স্ত্রী চরিত্র। মানুষের বাসনা-কামনা যে কখন কোন্ খাতে কিভাবে বইবে তা' বোধকরি তারা নিজেরাও আগে থেকে অনুমান করতে পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন আর কিছুই করার থাকে না। সময় সময় অমৃত ও বিষের মধ্যে পার্থক্যটুকুও চোখে ধরা পড়ে না। বিষের জ্বালায় কণ্ঠদেশ জর্জরিত হতে থাকলেও সেই মুহূর্তে সেই বিষই অমৃত বলে মনে হয় নিজের কাছে। সেই বিষ পান করে, বুঁদ হয়ে পড়ে থাকার মধ্যেই তারা তৃপ্তির স্বাদ পায়।

পরিতোষ আদকের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী আদক কিছুদিন ধরে তেমনি একটা বিষাক্ত নেশায় মেতে উঠেছিল। আর, তারই প্রত্যক্ষ ফল তাদের আশ্রিত বলাইয়ের ওপর পরিতোষের আক্রমণ।

থানার বড়বাবুর নির্দেশমত সেদিন বিকেলে হেমাঙ্গিনীর বাড়ি এসে হাজির হয় অমিত। ইচ্ছে ছিল, কিছু মিষ্টি কথায় হেমাঙ্গিনীকে তুষ্ট করে, দু'চারটে কড়া কথায় পরিতোষকে একটু সমঝে চলতে নির্দেশ দিয়েই সে চলে আসবে। এসব পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে তাদের ব্যস্ত থাকা চলে না।

কিন্তু হেমাঙ্গিনীর বাড়ির দোরগোড়ায় যে ব্যক্তিটির সাথে তার দেখা হয়ে গেল, তাকে ঠিক ঐ সময় ঐখানে আশা করেনি অমিত।

বিস্মিত দৃষ্টিতে উঁচু দাঁতওয়ালা অনঙ্গ দাসের দিকে তাকিয়ে অমিত প্রশ্ন করে, একি, অনঙ্গ! তুমি এখানে কেন?

ঠোঁটের পাশে বেরিয়ে থাকা দাঁতগুলোকে আরও একটু বের করে কৃতার্থের ভঙ্গিতে হাত কচলে দু'পা এগিয়ে আসে অনঙ্গ। তারপর বিগলিতকণ্ঠে জবাব দেয়, এই—আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, মেজবাবু। এ বাড়ির লোকজন আমার পরিচিত কিনা, তাই—। কথাটা সেখানেই শেষ করে আবার একটু হাসে অনঙ্গ দাস।

পুরো নাম অনঙ্গমোহন দাস। নিবাস, এই শহরেরই কোন বস্তি এলাকায়। পেশায় পুলিশের টাউট অর্থাৎ দালাল।

এই জাতীয় অনঙ্গ দাসেরা দু'একজন করে প্রায় প্রতিটি থানাতেই ঘোরাফেরা করে। এদের বিদ্যা নেই, কিন্তু বুদ্ধি প্রখর। সেই বুদ্ধিকে মূলধন করেই জীবিকা নির্বাহ করে এরা। এদের বলা চলে বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি। থানা ও জনসাধারণের মধ্যে 'লিয়াঁস' অফিসারের কাজ করে এরা। সহজ সরল নাগরিকদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দু'পয়সা রোজগার করে। থানার বাবুদের মন জুগিয়ে চলাই এদের কাজ। তাদের ফাই-ফরমাস খাটে। এলাকার ছোটখাট খবরও জোগাড় করে এনে দেয়। তা'ছাড়া মামলার সাক্ষী জোগাড় করা, থানার বাবুরা সরকারী কাজে মফঃস্বলে কিম্বা বাইরে কোথাও গেলে তাদের পরিবার-পরিজনদের দিকে নজর রাখা, তাদের বাজার-হাট করা প্রভৃতি সমস্ত কাজেই এরা ওস্তাদ।

এই অল্পদিনের চাকরিতেই অমিত এই অনঙ্গ দাসের দলকে চিনে নিতে ভুল করেনি। তাই হেমাঙ্গিনীর বাড়ির সামনে হঠাৎ অনঙ্গকে দেখে একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে।

অনঙ্গ অমিতের আরও একটু কাছে সরে এসে প্রায় চুপি চুপি বললে, বুঝলেন স্যার, ঐ মেয়েটা মিথ্যে বলেনি, সুযোগ পেলে ওর স্বামী সেই ছেলেটাকে খুন করেই ফেলবে। তাই, পারেন তো ঐ লোকটাকে গ্রেপ্তার করেই নিয়ে যান। লোকটা সত্যিই পাঁড়-মাতাল।

—তা' তো বুঝলাম, জবাব দেয় অমিত, কিন্তু ঐ ছেলেটার ওপর পরিতোষ আদক এত ক্ষেপে গেল কেন?

এবার শুধু দাঁতের পাটি নয়, মাড়ি পর্যন্ত বের করে হাসে অনঙ্গ। তারপর বললে, দোষ ঐ মেয়েটারও কম নয়। তুই বেটী সোমত্থ মেয়েছেলে। তোর পক্ষে কি তোর ছেলের বয়সী ঐ ছোকরার সাথে—বুঝলেন স্যার, এসব বিশ্রী ব্যাপার। থানার অফিসার হলেও আপনি এখনও ছেলেমানুষ। এসব নোংরা ব্যাপার ঠিক বুঝবেন না। তাই বলছি, ঐ পরিতোষ আদককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেই ভাল করবেন। তেমনি অবস্থা বুঝলে না হয় থানায় গিয়ে জামিনে ছেড়ে দেবেন। আমি তা'হলে এবার আসি স্যার। এই কথাটা বলতেই এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

অনঙ্গ চলে যেতেই একমুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে তার কথাই ভাবতে থাকে অমিত। হেমাঙ্গিনী সম্বন্ধে অনঙ্গ যে খবরটি দিয়ে গেল তা' নিঃসন্দেহে দামী। কিন্তু পরিতোষ

আদককে গ্রেপ্তার করাতে তারও এত উৎসাহ কেন? তা' কি কেবল ঐ বলাই ছেলেটার মঙ্গলের জন্যেই, না অন্য কিছু?

হেমাঙ্গিনীর বাড়ির কড়া নাড়তেই স্বয়ং হেমাঙ্গিনী এসে দরজা খুলে দিয়ে একগাল হেসে অমিতকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর বাড়ির ঢাকা বারান্দার একখানা চেয়ারে অমিতকে বসিয়ে তার দুর্বিনীত স্বামীর অত্যাচারের কাহিনী আবার সালঙ্কারে বলতে থাকে।

এসব কথা অমিতের অজানা নয়। হেমাঙ্গিনী থানায় গিয়ে যা' বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি। তাই অমিত তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করে, আপনাদের সেই বলাই ছেলেটি বাড়ি আছে? তাকে একবার ডাকুন।

—হ্যাঁ, বাড়ি আছে। নিজের ঘরে বসে পড়াশোনা করছে। একটু বসুন, ডেকে দিচ্ছি তাকে।

বলেই হেমাঙ্গিনী উঠে দাঁড়াতেই অমিত আবার বলে ওঠে, না-না, এখানে নয়, চলুন ওর পড়ার ঘরেই যাই।

—বেশ, চলুন।

হেমাঙ্গিনী অমিতকে নিয়ে এসে হাজির হয় বলাইয়ের পড়ার ঘরে। আসবাবহীন ছোট্ট ঘরখানার একপাশে একখানা তক্তপোষ. তারই সামনে একটা টেবিলের ওপর বলাইয়ের বইপত্র।

শুষ্কমুখে বিছানায় শুয়ে ছিল বলাই। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে পুলিশের পোশাক পরা অমিতকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে মুখ নীচু করে চুপ করে থাকে।

হেমাঙ্গিনী বললে, দারোগাবাবু তোকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান, বলাই। ওঁর কথার জবাব দে।

অমিত কিন্তু বলাইয়ের দিকে না তাকিয়ে হেমাঙ্গিনীর দিকে ফিরে বললে, হ্যাঁ, আমার প্রশ্নের জবাব বলাই নিশ্চয়ই দেবে। তবে আপনি এবার একটু বাইরে যান। আমি একা বলাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলব।

—সেকি! চোখে-মুখে কেমন যেন একটু বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে হেমাঙ্গিনীর, কেন, আমি কাছে থাকলে আপনাদের কি কোন অসুবিধা হবে?

অমিত গম্ভীরকণ্ঠে বললে, সুবিধা-অসুবিধার কোন কথা নয়। আমি ওর সাথে একা কথা বলতে চাই।

—কেন? এমন কি কথা আপনাদের যে, আমি ওর আপনজন হয়েও শুনতে পাব না?

এবার সত্যিই বিরক্ত হয়ে ওঠে অমিত। কণ্ঠস্বর আরও একটু দৃঢ় করে বললে, দেখুন, আপনার কথামত আমি চলতে বাধ্য নই। আপনি আমাকে ওর সাথে একা কথা বলতে দেবেন কিনা বলুন, নইলে আমি এখনই আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

হেমাঙ্গিনীর এতক্ষণের বিব্রতভাবটুকু তীব্রতর হয়ে ওঠে। শঙ্কিতকণ্ঠে সে আবার বললে, ও ছেলেমানুষ, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কি বলতে কি বলে ফেলবে—

—সেজন্যে আপনাকে চিন্তিত হতে হবে না। আমার প্রশ্নের জবাব না দিতে পারার মত ছেলেমানুষ ও নয়। ঠিক জবাব দেবে। এবার একটু বাইরে যান।

অগত্যা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেমাঙ্গিনীকে বাইরে চলে যেতে হয়।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে তক্তপোষের ওপর বলাইয়ের একেবারে গা ঘেঁষে এসে বসে অমিত। তারপর তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে অতি মোলায়েম কণ্ঠে

বললে, আমার কাছে ভয় কিম্বা লজ্জা করো না, ভাই। সত্যি কথা বলো। যাতে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে না পারে সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখব।

এবার ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে অমিতের চোখের দিকে তাকায় বলাই।

অমিত লক্ষ্য করে ছেলেটার চোখ-মুখে কেমন যেন একটা ক্লান্তির চিহ্ন। কালিপড়া চোখদু'টো সামান্য কোটরগত। চোয়াল দু'টো উঁচু হয়ে উঠেছে। জেগে উঠেছে কণ্ঠার হাড়। যৌবনের প্রারম্ভে মুখের ওপর যে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য জেগে ওঠার কথা, সেখানে কেমন যেন একটা নিষ্প্রভ ভাব।

অমিতের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই আবার মাথা নীচু করে থাকে বলাই। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, কিসের সত্যি জবাব দিতে বলছেন?

অমিত কিন্তু বলাইয়ের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য কথা পাড়ে। বললে, তুমি নাকি পড়াশোনায় খুব ভাল? স্কুলে ফার্স্ট হও?

খানিকক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলাই একসময় মুখ তুলে অমিতের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

ব্যস্ত হয়ে উঠে অমিত। বললে, ওকি, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

কান্না-জড়িতকণ্ঠে বলাই বলতে থাকে, গত বছর পর্যন্ত স্কুলে ফার্স্ট হয়েছি। কিন্তু আর তা' হতে পারব না।

—কেন?

—পড়াশুনো আর ভাল লাগে না। কিছুই মনে থাকে না। সব ভুলে যাই।

—কেন এমন হল? প্রশ্ন করে অমিত।

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে বলাই।

অমিত তেমনি মোলায়েম কণ্ঠে আবার বললে, তুমি না বললেও আমি জানি কেন এমন হয়েছে। তোমার ঐ মাসীর জন্যেই তোমার এই দুরবস্থা, তাই তো?

বলাইয়ের মাথাটা আবার নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

অমিত আবার বললে, এতে লজ্জার কি আছে? তুমি তো নিজের ইচ্ছেয় কিছু করোনি।

হঠাৎ বলাই অমিতের হাতদু'টো জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলতে থাকে, আপনি—আপনি এত কথা জানলেন কি করে? আমার ঐ মাসী—ওর জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা। একটিবার আমাকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পর্যন্ত দেয় না। আমার এই পড়ার ঘরে ঢুকে এমন সব যা'-তা' আরম্ভ করে যে, আমিও কেমন যেন সবকিছু ভুলে যাই।

অমিত বুঝতে পারে এই নিষ্পাপ মেধাবী ছেলেটি সত্যিই মাসীরূপী এক ডাকিনীর পাল্লায় পড়ে ওর নিজের ইহকালটি খোয়াতে বসেছে। হেমাঙ্গিনীর অস্বাভাবিক ইচ্ছার রসদ যোগাতে গিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনতে বাধ্য হয়েছে। আর, সম্ভবতঃ এইজন্যেই পরিতোষও মারমুখী হয়ে উঠেছে ওর ওপর। নিজের স্ত্রীকে সামলাবার তার ক্ষমতা নেই। তাই তার যত আক্রোশ বলাইয়ের ওপর।

অমিত আবার বললে, কিন্তু তুমি তোমার মাসীর কথামত না চললেই তো পার!

—তা'হলে যে মাসী আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমার পড়াশোনার খরচ চালাবে না। আমার বাবার তো এমন অবস্থা নয় যে, আমার পড়ার ব্যবস্থা করবে।

—কিন্তু এখন তুমি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছো, তাতে যে তোমার পড়াশোনাও হবে না, মাঝে থেকে জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে।

একটু সময় চুপ করে থেকে বলাই অশ্রুপূর্ণ চোখে অমিতের দিকে তাকিয়ে বললে, তা'হলে আমি এখন কি করব?

—তুমি বরঞ্চ তোমার দেশে মা-বাবার কাছেই ফিরে যাও। কাজ নেই তোমার এমন পড়াশোনার। যদি কোনদিন সুযোগ পাও তো পড়াশোনা করবে, নইলে করবে না। কিন্তু তাই বলে এই রাক্ষুসীর কাছে থাকলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

—কিন্তু মাসী যদি আমাকে যেতে দিতে না চায়?

—না চাওয়াই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে আমরা আছি। তেমন বুঝলে তুমি সোজা থানায় গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে। ঐ রাক্ষুসীর সাধ্য হবে না তোমাকে আটকে রাখে।

এতক্ষণে যেন একটু আশার আলো ফুটে ওঠে তার চোখে-মুখে। স্বভাবতঃই ভীরু-চরিত্রের ছেলে বলাই। এমনি একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। জামার আস্তিনে চোখ মুছে বলাই বললে, তা'হলে কালই আমি এখান থেকে পালিয়ে যাব।

—হ্যাঁ, তাই যাবে। বলেই অমিত উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দরজা খুলতেই অমিতের চোখে পড়ে, সামনে গম্ভীরমুখে হেমাঙ্গিনী দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে নজর পড়তেই অমিতের সর্বাঙ্গ ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে। মানুষের, বিশেষতঃ কোন স্ত্রীলোকের আসক্তি যে এত নিচে নেমে যেতে পারে এই ঘটনার আগে তা' ছিল তার ধারণারই অতীত।

হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে অমিত বললে, আপনার স্বামী বাড়ী আছে?

একটা বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষে অমিতের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম উদাসীন কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী জবাব দেয়, দেখুন গে, ঐ বারান্দায় মাদুরের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। সারাদিন নেশা-ভাং করে এই অবেলা কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিচ্ছে।

অমিতের ডাকে বিরক্ত ভঙ্গিতে মাদুরের ওপর উঠে বসে পরিতোষ। মাথায় বাবরি চুল। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো। চোখদু'টো জবাফুলের মত টকটকে লাল।

অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হতে কি একটা গালাগাল দিতে যাচ্ছিল পরিতোষ। কিন্তু সামনে ধড়াচুড়ো পরা অমিতকে দেখে অকস্মাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে। তারপর একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে যেতেই অমিত বলে, আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে আপনার স্ত্রী আমাকে ডেকে এনেছে।

মুহূর্তে মুখের ভাব পাল্টে যায় পরিতোষের। একটা নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে সে বললে, কেন, আমি কি করেছি?

—আপনি বলাইকে মেরেছেন।

—হ্যাঁ, মেরেছি। ঠিকই করেছি। একশোবার মারব। একেবারে যে মেরেই ফেলিনি তা-ই ওর বাপ-মায়ের ভাগ্যি।

একটু থেমে পরিতোষ আবার বলতে থাকে, আপনি বাইরের লোক দারোগাবাবু, আপনার কাছে ঘরের কথা আর কি বলব? এ কেলেঙ্কারীর কথা কাউকে বলতেও পারি না, সইতেও পারি না। আমি নেশা-ভাং করে বেড়াই সত্যি, শ্বশুরের ভিটেয় ঘর-জামাই আছি তাও সত্যি, কিন্তু ঘরের বৌয়ের এসব কি কাণ্ডকারখানা বলুন তো! না-না দারোগাবাবু, এসব কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

এবার একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে অমিত বললে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে না পেরে শেষে ঐ ছেলেটার ওপরই গায়ের ঝাল ঝাড়ছেন, তাই না?

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে পরিতোষ।

অমিত এবার কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললে, আর কখনও মারধোরের মধ্যে যাবেন না, পরিতোষবাবু। আপনি তো ঐ বলাইকে এখান থেকে তাড়াতে চাইছেন? তাই হবে। ও চলেই যাবে। তারপর পারেন তো নিজের স্ত্রীকে সামলাবেন।

কথাটা বলতে বলতে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায় অমিত। পরিতোষও তার পরনের লুঙ্গিটা সামলাতে সামলাতে অনুসরণ করে তাকে।

অমিত সবে বাইরের সিঁড়িতে পা দিয়েছে, অকস্মাৎ হেমাঙ্গিনী ঝড়ের বেগে এসে হাজির হয়ে একধাক্কায় পরিতোষকে সরিয়ে দিয়ে অমিতকে বললে, একি দারোগাবাবু, আপনি চললেন?

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অমিতের। বললে, হ্যাঁ, চললুম।

—কিন্তু এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন না? বলেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পরিতোষকে দেখিয়ে দেয়।

—না, তার প্রয়োজন নেই। বলাইয়ের ওপর আর কখনও কোন অত্যাচার হবে না।

—কিন্তু, এই লোকটাকে জেলে পুরতে না পারলে যে এ আমার হাড়-মাস কালি করে তবে ছাড়বে।

—তাই বুঝি? বিকৃতকণ্ঠে বলে ওঠে পরিতোষ।

অমিত আর সেখানে একমুহূর্তও দাঁড়ায় না। এখন হয়ত স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া কিম্বা হাতাহাতি শুরু হয়ে যাবে।

রাস্তায় নেমে হন্ হন্ করে হাঁটতে আরম্ভ করে অমিত। পেছনে তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই কণ্ঠস্বরের পর্দা একটু একটু করে চড়ছে।

পথে যেতে যেতে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের পাঁচশ' এগারোটি ধারা মনে মনে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে অমিত। কিন্তু কোন ধারাতেই না ফলতে পারে হেমাঙ্গিনীকে, না ফেলতে পারে বলাইকে। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে ব্যভিচারের দোষে দায়ী করা চলে না বলাইকে। তাই এডাল্টারির চার্জে তাকে কোনমতেই ফেলা যায় না। আর, পেনাল কোডের রচয়িতা মেকলে সাহেব তো ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের শাস্তির কোন ব্যবস্থাই করে যাননি।

হেমাঙ্গিনীর বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা থানার রাস্তা না ধরে হাতের কিছু জরুরী কাজ সেরে ফেলতে অন্য রাস্তায় পা বাড়ায় অমিত।

ইতিমধ্যে রাত প্রায় আটটা নাগাদ থানার সামনে এসে হাজির হয় হেমাঙ্গিনী। চোখে-মুখে তার উত্তেজনারর স্পষ্ট চিহ্ন।

এবার সে ডিউটি অফিসারের সামনে না গিয়ে সোজা বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জির কক্ষে ঢুকে পড়ে।

মুখ তুলে হেমাঙ্গিনীকে দেখেই ভবদেব তার স্বভাবসিদ্ধ শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি আবার কেন এসেছেন? বিকেলে আপনার বাড়ি কেউ এন্‌কোয়ারী করতে যায়নি?

ভারীকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী জবাব দেয়, গিয়েছিল। একজন ছোকরা মত দারোগাবাবু আমার বাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু যার জন্যে যাওয়া তার কিছুই না করে শুধুহাতে ফিরে এসেছে।

—তার মানে? ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে ভবদেব।

হেমাঙ্গিনী বললে, আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার না করেই চলে এসেছে।

—ও—এই কথা? একটু হেসে বলতে থাকে ভবদেব, আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন নেই বলেই করেননি।

—কিন্তু ওকে গ্রেপ্তার করার আশ্বাস পেয়েই না আমি দু'দুশো টাকা খরচ করেছি! কণ্ঠস্বরে অনুযোগের সুর হেমাঙ্গিনীর।

—সেকি? দু'শো টাকা খরচ করেছেন? কার পেছনে খরচ করলেন টাকাটা?

—কেন? সেই দারোগাবাবুর পেছনে! ঐ আশ্বাস পেয়েই না তাকে টাকাটা দিয়েছি!

—আপনি সেই দারোগাবাবুকে টাকা দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, দিয়েছি। জবাব দেয় হেমাঙ্গিনী।

একমুহূর্ত চুপ করে ভবদেব অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, সত্যি কথা বলুন, সেই দারোগাবাবুকে আপনি নিজের হাতে দু'শো টাকা দিয়েছেন?

একটু থতমত খেয়ে হেমাঙ্গিনী জবাব দেয়, না, ঠিক দারোগাবাবুর হাতে টাকা আমি দিইনি। আপনাদের থানার যে লোকটি সকালে আমার সঙ্গে আমার বাড়ি গিয়েছিল, টাকাটা তাকেই দিয়েছি। সে বলেছে টাকাটা সে দারোগাবাবুকে দিয়ে দেবে।

—থানার লোকটি? কে সে? কিরকম দেখতে বলুন তো?

—রোগা লম্বাটে ধরনে। দাঁত উঁচু।

—অনঙ্গ—সেই অনঙ্গ ব্যাটার খপ্পরে পড়েছিলেন বুঝি? ও—বুঝেছি। সেই লোকটাই বোধহয় আপনাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করবে? এতক্ষণে মনের সংশয় দূর হয় ভবদেবের।

মাথা নেড়ে সায় দেয় হেমাঙ্গিনী।

একটু সময় চুপ করে থেকে ভবদেব বললে, সেই লোকটা আমাদের থানার কেউ নয়। একটা বাইরের লোক। সে আপনাকে ঠকিয়েছে। দারোগাবাবুর নাম করে সে নিজেই টাকাটা নিয়েছে। তারপর একটু হেসে আবার বললে, আপনি যে দারোগাবাবুর কথা বললেন, তিনি এসব পয়সা ছোঁন না। তাই আপনার কথায় বিস্মিত হয়েছিলাম।

—তা'হলে আমার টাকাটা শুধু শুধু জলে গেল?

—না, তা' যাবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কালই যা'তে সেই লোকটা নিজে আপনার কাছে গিয়ে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে আসে তার ব্যবস্থা আমি করব।

হেমাঙ্গিনী চলে যেতেই ভবদেব সেণ্ট্রি কনস্টেবল্ রামলক্ষ্মণ চৌবেকে ডেকে বললে, অনঙ্গ এখানে আছে?

—না, হুজুর। বিকেলে তো ওকে দেখিনি।

—কাল সকালে সেই ব্যাটা যদি থানায় আসে তো আমার কাছে এনে হাজির করবে। আর না আসে তো ওর বাড়ি গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসবে, বুঝলে?

—ঠিক হ্যায়, হুজুর। জবাব দেয় চৌবে। তারপর হাতের বন্দুকটি ঘাড়ের ওপর ফেলে বারান্দার দিকে যেতে যেতে অনঙ্গর ওপর বড়বাবুর এই হঠাৎ চটে ওঠার কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করে।

॥ তেরো ॥

আজকাল আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি, কথা বলতে বলতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে অমিত।

তাই একদিন ওকে একান্তে প্রশ্ন করি, কি হে, তোমার কি ধনুর্ভঙ্গ পণ নাকি যে, অজিতেশবাবুর বাড়ি আর যাবে না?

আমার দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে চুপ করে থাকে অমিত। কোন জবাব দেয় না।

মৃদু হেসে আমি আবার বললাম, বুঝলে হে, ব্যাটাছেলেদের অত অভিমান ভাল নয়।

—কেন? অভিমান বস্তুটি কি কেবল মেয়েদেরই একচেটে? বলে ওঠে অমিত।

—প্রায় তাই বলতে পারো। ওরা জীবনভর কেবল অভিমান করেই যাবে, আমাদের জীবনভর কেবল সেই অভিমান ভাঙাতে হবে—এটাই বোধহয় প্রকৃতির নিয়ম।

—তুমি তো দেখছি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কিছুই শিখে ফেলেছো এর মধ্যে। এত কথা শিখলে কোত্থেকে? নিজের জীবনে তেমন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে নাকি? থাকে তো বলো, একটু শুনি। মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে ঠাট্টার সুরে অমিত বললে।

—হায় রে পোড়াকপাল, তেমন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাই যদি থাকত তবে কি তোমাকে এমনি দু'চারটে কথা বলেই রেহাই দিতাম? জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তোমার কানদু'টো ঝালাপালা করে ছাড়তাম না? না ভাই, এখনও তেমন কোন মানসীর সাক্ষাৎ পাইনি। পেলে, সর্বপ্রথম তুমিই জানতে পারবে—একথা নিশ্চিত।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, তা' হাসি-ঠাট্টা যা'ই করো না কেন, তোমার কিন্তু এটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে। আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি তো বুঝতে পারছি যে, ওদের সংশ্রব ত্যাগ করে তুমি খুব সুখে নেই। কেন মিছিমিছি নিজেও কষ্ট পাচ্ছো, আর, একটা মেয়েকেও কষ্ট দিচ্ছো?

অমিত কিন্তু আর কিছু না বলে কেবল চুপ করেই থাকে।

আমি আবার বললাম, নাঃ, এবার দেখছি আমাকেই এগিয়ে যেতে হবে। জীবনে অন্ততঃ একটা পুণ্যের কাজ করতেই হল দেখছি!

মৃদুকণ্ঠে অমিত বললে, কোথায় এগিয়ে যেতে চাইছো?

—কেন, অজিতেশবাবুর বাড়ির দিকে। না হে, ভয় নেই, তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি তোমার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। বলেই আমি মুখ টিপে একটু হাসি।

উদাসকণ্ঠে অমিত বললে, গিয়ে কি বলবে?

—কি আর বলব? বলব যে, আমার বন্ধুটি বিরহ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নাওয়া-খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। এবার চাকরিটাও ছাড়বার মতলব করছে। পারেন তো এখনও ওকে ফেরান।

—ডাহা মিথ্যে কথাটা বলতে তোমারর মুখে বাধবে না?

—মিথ্যে কোথায়, শুনি? কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়া, ডাইরী লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে চিন্তার সাগরে ডুবে যাওয়া—এসব তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেবার পূর্বলক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

—দেখ ভাই তরুণ, আমার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম গম্ভীরকণ্ঠে বলতে থাকে অমিত তোমার ঐ হিউম্যান সাইকোলজির বিদ্যেটা তোমার কলেজের ছেলেদের জন্যেই তোলা থাক্। আমাদের ওপর ঐ বিদ্যা ফলাতে এলে কিন্তু ঠকবে ভাই—এই তোমাকে বলে রাখলাম।

হেসে জবাব দিই, ঠকি-জিতি কুছ্ পরোয়া নেই। পূণ্য অর্জনের এমন একটা সুযোগ কিছুতেই আমি হাতছাড়া করতে চাই না। অজিতেশবাবুর বাড়ি একদিন যেতেই হবে, তা' তুমি যা'ই বলো না কেন।

একদিন সত্যি সত্যিই অজিতেশবাবুর বাড়ি এসে হাজির হলাম।

অজিতেশবাবু আমার পরিচিত নন। তাই তাঁর বাড়ির বাইরের ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভেতরে ঢুকতে একটু ইতস্ততঃ করছি, ঠিক এমনি সময় একটি চাকর শ্রেণীর লোক এসে জিজ্ঞেস করে, কাকে খুঁজছেন?

—এটাই তো অজিতেশ দত্তর বাড়ি?

মাথা নেড়ে সায় দেয় চাকরটি।

—তিনি বাড়ি আছেন?

—হ্যাঁ, আছেন। তিনি বাড়িতেই থাকেন, বাইরে বেরোন না।

চাকরটি আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে খবর দিতে ভেতরে চলে যায়। আর আমি নরম সোফায় দেহভার এলিয়ে দিয়ে অজিতেশবাবুর সঙ্গে কেমন করে কথা শুরু করব তাই ভাবতে থাকি।

একটু পরেই সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত কক্ষে প্রবেশ করেন।

আমি উঠে দাঁড়াতে যেতেই অজিতেশবাবু বললেন, না-না, বসো ভাই, বসো। উঠে সম্মান দেখাতে গিয়ে আর সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে হবে না। বলতে বলতে হাতের লাঠিখানায় ভর দিয়ে বৃদ্ধ সামনের সোফাটায় বসে পড়েন। তারপর মুখ তুলে মোটা লেন্সের চশমার ফাঁকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, কিন্তু এর আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে করতে পারছি না!

জবাবে আমি বললাম, না। আমাকে এর আগে আর কখনও দেখেননি।

—ও—তাই বলো! তা' ভাই তুমি বোধহয় কাছাকাছিই থাকো। আলাপ করতে এলে বুঝি? ভাল—ভাল। আজকাল আর কেউ আলাপ-পরিচয় করতে আসেও না। বুড়ো হয়েছি। বুড়োর সঙ্গে আলাপ করতে কে আর আসবে? তাই একা একাই দিন কাটে। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধ নিজের কথাই বলে যেতে থাকেন। অবশেষে কথা শেষে হেসে ওঠেন।

আমি কিছু বলতে যেতেই অজিতেশবাবু আবার বললেন, এই দ্যাখো, তোমার সঙ্গে আলাপ নেই পরিচয় নেই দিব্বি 'তুমি' বলে সম্বোধন করে চলেছি তোমাকে। এটা আমার একটা মস্ত দোষ। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে শোধরাতে পারি না। বলেই বৃদ্ধ আবার প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠেন।

সংসারে এমন একদল মানুষ থাকে যারা সহজেই অন্যকে আকর্ষণ করে। তাদের কথাবার্তায়, ব্যবহারে অন্যে আপনিই আকৃষ্ট হয় তাদের দিকে। বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত সেই শ্রেণীর ব্যক্তি। প্রথম দর্শনেই তাই ওঁকে ভাল লাগে আমার।

সুযোগ পেয়ে একসময় আমি বললাম, না-না, তা'তে কি হয়েছে? আপনি বুড়ো মানুষ। আমাকে 'তুমি' বলবেন বৈকি। তা'ছাড়া আমি অমিতের বন্ধু।

—কি বললে? তুমি অমিতের বন্ধু? আমাদের অমিত? থানার অফিসার অমিত রায়ের কথা বলছো? উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠেন অজিতেশবাবু।

মাথা নেড়ে সায় দিই আমি।

—সে কেমন আছে বলতে পারো?

—ভালই আছে। আমি জবাব দিই।

—ভাল থাকলেই ভাল। বড় ভাল ছেলে ঐ অমিত। আমার এখানে প্রায়ই আসত। গল্পগুজব করত। কিন্তু কিছুদিন আগে আমার এখানেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা'তে সে সেই থেকে এখানে আসাই ছেড়ে দিলে। বলতে বলতে বৃদ্ধের গলার আওয়াজ একটু ভারি হয়ে ওঠে।

ক্ষণকাল মৌন থেকে অজিতেশবাবু আবার বলতে থাকেন, দোষ সম্পূর্ণ আমারই। সেদিন সে এখানে বসে যেভাবে অপমানিত হয়েছিল তা'তে তার রাগ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো ভাই, সেদিন তার সেই অপমানে আমিও কম দুঃখ পাইনি। কিন্তু—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে অজিতেশবাবু থেমে যেতেই আমি বললাম, আপনাকে কিছুই বলতে হবে না, আমি সবই জানি।

—তাই নাকি? বড়ই অভিমানী ছেলে। এই বৃদ্ধের অনিচ্ছাকৃত অপরাধটুকুও সে ক্ষমা করতে পারলে না। তাই সে এখানে আসাই ছেড়ে দিল। আমার শক্তি নেই। বাইরে বেরোন ডাক্তারের একদম বারণ। নইলে আমি নিজে গিয়েই একদিন ওকে ধরে নিয়ে আসতাম। কতদিন আমার মাকে বলেছি ওর বাসায় গিয়ে একটা খবর নিয়ে আসতে। ছেলেটাকেও বলেছি কতদিন। কিন্তু কি যে ওদের মনোভাব বুঝতে পারি না। আমার স্মৃতি-মা নিজেও যাবে না, ছেলে শঙ্কর কিম্বা অন্য কাউকে পাঠাতেও দেবে না। কি যে ওরা ভাবে, ওরাই জানে। ওহো—এই দ্যাখো, আমার মায়ের সঙ্গে তো তোমার আলাপ নেই। দাঁড়াও, ডাকছি তাকে। বলেই অজিতেশবাবু একটি চাকরকে ডেকে বললেন—দিদিমণিকে একবার ডেকে দে তো।

চাকরটি ভেতের চলে যেতেই অজিতেশবাবু আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে থাকেন, নিজের মেয়ে বলে বলছি না, সত্যিই মা আমার স্বভাবে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী। একটু সময় আলাপ করেই বুঝতে পারবে।

মৃদু হেসে আমি জবাব দিলাম, আপনার মেয়ের কথা আমি শুনেছি।

—শুনবেই তো—শুনবেই তো! ঐ মেয়ের জন্যেই আমি এখনও বেঁচে আছি। আমার মা-মরা মেয়ে। ভাইটিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। তা'ছাড়া—

অজিতেশবাবুর কথার মাঝখানেই যে মেয়েটি কক্ষে প্রবেশ করে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে দেখে সেই মুহূর্তে আমার কেবল একটিমাত্র কথাই মনে পড়ে—অমিতের সত্যিই টেস্ট্ আছে।

স্মৃতিকণা তার বাবার পাশে বসতেই বৃদ্ধ মেয়ের পিঠে একটা হাত রেখে আমাকে দেখিয়ে বললেন, একে তুই চিনিস না। এর সঙ্গে আলাপ করতেই তোকে ডেকেছি, মা। এ হচ্ছে আমাদের অমিতের বন্ধু। এর নাম—এই দ্যাখো, এতক্ষণ তোমার নামটি জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি।

অমিতের নাম শুনেই স্মৃতিকণার ফর্সা গালে যে সামান্য লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল সেইদিকেই লক্ষ্য ছিল আমার। বৃদ্ধের প্রশ্নে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি জবাব দিই, আমার নাম তরুণ ঘোষ। এখানকার কলেজেই মাস্টারী করি। আর কিছু সাংবাদিকতাও করে থাকি।

—তাই নাকি? তুমি তো তা'হলে গুণী লোক হে! উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ। তারপর একটু থেমে কন্যার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, অমিত তো আর আসে না। তাই এ নিজে যেচে আমাদের খবর নিতে এসেছে। আর তোর কি কাণ্ড বল্ তো! এত করে বলছি, কিন্তু

কিছুতেই না যাবি সেই ছেলেটার একটা খবর নিতে না কাউকে পাঠাবি। অন্যায় তো আমরাই করেছি। আমাদেরই তো উচিত ওর কাছে গিয়ে—

অজিতেশবাবু তাঁর কথা শেষ করার আগেই স্মৃতিকণা শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, না বাবা, তুমি আমি কেউই অন্যায় করিনি। যিনি করেছেন তিনি আমাদের আত্মীয় হলেও এ বাড়ির কেউ নন। তাই বলে কেউ যদি শুধু শুধু আমাদের ওপর দোষারোপ করে—

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে স্মৃতিকণা হঠাৎ আবার বলে ওঠে, এই দেখ, আমি এখানে বসে বসে তোমাদের সঙ্গে গল্প করছি। যাই, ওঁর চায়ের ব্যবস্থা করি গিয়ে। বলেই স্মৃতিকণা অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

স্মৃতিকণার এই হঠাৎ চলে যাবার অর্থ অজিতেশবাবু কি বুঝলেন তা' তিনিই জানেন। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, অমিতের সম্বন্ধে আলোচনা এড়াতে গিয়েই সে চায়ের নাম করে এখান থেকে পালিয়ে গেল। আমি আরও বুঝতে পারলাম যে, অভিমান তা'হলে শুধুই এক তরফের নয়, দু'তরফেরই।

চা এল। সঙ্গে প্রচুর খাবারও। কিন্তু যে অদৃশ্য হাত এই ডিসের খাবরগুলোকে নিপুণ হাতে সাজিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিল, সেই হাতের অধিকারিণীকে আর দেখা গেল না। আমিও এমনিই একটা কিছু আশা করেছিলাম। স্মৃতিকণার চলে যাবার ভঙ্গি দেখে তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, সে আর এখানে আসবে না।

চা পর্ব শেষে আমি যাওয়ার উদ্যোগ করতেই অজিতেশবাবু অকস্মাৎ আমার হাত'দুটো চেপে ধরে ধরাগলায় বললেন, তুমি ভাই অমিতকে একটু বুঝিয়ে বলো, যেন সে একবার আসে! বলো তাকে, এই বৃদ্ধ তার পথ চেয়েই বসে থাকে। আর—আর, সে যেন আমাদের ক্ষমা করে।

তাঁর কথার ভঙ্গিতে আমি নিজেও একটু বিচলিত হয়ে পড়ি। তাঁকে কথা দিয়ে এলাম, যে করেই পারি অমিতকে একবার পাঠিয়ে দেবই। অথবা একদিন নিজেই সঙ্গে করে তাকে এনে হাজির করব।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমি অমিতের সঙ্গে দেখা করতে থানায় যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছি, এমনি সময় আরম্ভ হল তুমুল বৃষ্টি। জামা-কাপড় পরেই বৃষ্টি থামবার আশায় বাড়িতে আটকে থাকতে হল আমাকে।

অবশেষে রাত প্রায় দশটা নাগাদ বৃষ্টির বেগ একটু কমে আসতেই বিরক্ত হয়ে একটা ছাতা মাথায় দিয়ে রওনা হলাম থানার দিকে।

থানায় এসে দেখি অমিত নেই। নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠি। ঝড়-জল মাথায় করে এতদূর এসেও অমিতের দেখা পেলাম না। এদিকে বৃষ্টিও আবার চেপে আসছে। তাই ও. সি. ভবদেববাবুর ঘরের দিকে পা বাড়াই।

আমাকে দেখেই ভবদেব ব্যানার্জি তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে অভ্যর্থনা করে বললে, এই যে সংবাদ-প্রভাকর, এসো, এসো! অমিতকে না পেয়ে মেজাজটা বুঝি খুব খারাপ হয়ে গেল? তাকে বুঝি বিশেষ প্রয়োজন?

লোকটি কি অন্তর্যামী নাকি? ভবদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিতকণ্ঠে আমি প্রশ্ন করি, আপনি কি করে জানলেন যে, অমিতকে খুঁজতেই আমি এসেছি।

—অতি সহজে। মৃদু হেসে ভবদেব বললে, সাংবাদিক হিসেবে তোমাকে খাটো না করেও একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, এই ঝড়-জল মাথায় করে এই সময় তুমি নিশ্চয়ই

খবর জোগাড় করার আশায় এখানে আসোনি। তা'হলে এখানে আসার তোমার একটিমাত্র অর্থই দাঁড়ায়, আর সেটা হচ্ছে অমিতের সঙ্গে দেখা করা। আর সেই দেখা করাটা এমনই জরুরী যে, এই বৃষ্টির মধ্যেও তোমা হেন লোককে ছাতা মাথায় দিয়ে আসতে হল, যে নাকি পারতপক্ষে কখনও ছাতা ব্যবহার করে না। কি, এবার হল তো? কথা শেষে তেমনি মৃদু হাসতে থাকে ভবদেব।

ভবদেবের প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে সেই মুহূর্তে আমি আরও একবার অভিভূত হয়ে পড়ি।

রাত এগারোটা নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরে আসতেই থানা থেকে বেরিয়ে পড়ি আমি। কেমন যেন একটা রোখ চেপে যায় আমার। দেখা করতেই হবে অমিতের সঙ্গে। তাই বাড়ির পথে পা না বাড়িয়ে অমিতের আস্তানার দিকেই চলতে শুরু করি।

অমিতের বাসায় যখন এসে হাজির হলাম, তখন সে সবে খেতে বসেছে। অত রাতে আমাকে দেখে বিস্মিতকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার? এত রাতে যে?

—কি আর করি বলো? থানায় গিয়ে তোমার দেখা পেলাম না। বৃষ্টিতে আটকে গেলাম সেখানে। তাই এখানে আসতে হল।

—এসে ভালই করেছো। খিচুড়ি হয়েছে আজ। বসে পড়ো। গরম গরম খিচুড়ি খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

অমিতের বাসায় খাওয়া আমার এই প্রথম নয়। তাই বিনা আপত্তিতে তার পাশের আসনে বসে পড়ি।

খেতে খেতে কথা বলতে থাকি অমিতের সঙ্গে। বললাম, কাল অজিতেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। কথাটা বলেই একবার আড়চোখে তাকাই ওর দিকে।

কথাটা যেন শুনতে পায়নি, এমনিভাবে একমনে খেয়ে যেতে থাকে অমিত।

—কি হে, কথাটা শুনতে পাওনি নাকি?

—পাব না কেন? জবাব দেয় অমিত, তবে কি মন্তব্য করব তা' বুঝতে পারছি না।

—মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন নেই। বললাম আমি, মোদ্দা কথা তোমাকে একবার যেতে হবে ওঁদের বাড়িতে। বৃদ্ধকে কথা দিয়ে এসেছি।

এবার অমিত বললে, কথা যখন দিয়ে এসেছো, তখন কথা রাখার গরজও তোমারই।

—আমারই তো। একটু থেমে আবার বললাম, কি আশ্চর্য কাণ্ড, তোমরা দু'জনে দু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে গোঁসা করে বসে রইলে, আর মাঝখান থেকে সেই বুড়ো মানুষটা কষ্ট পাচ্ছেন। বলেই সেদিন ওদের বাড়িতে স্মৃতিকণার মনোভাব যতটুকু আন্দাজ করতে পেরেছিলাম বললাম তাকে।

গম্ভীর মুখে নিশব্দে সব কথা শুনে গেল অমিত। অবশেষে একসময়ে জলের গ্লাসটা মুখের সামনে তুলে ধরে এক ঢোক জল খেয়ে বললে, নাও, চটপট খেয়ে নাও। আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সেকি! এই ঝড়-জলের রাতে কোথায় যেতে হবে তোমাকে?

—থানায়।

—কেন, আজ তোমার নাইট-ডিউটি নাকি?

—না, নাইট-ডিউটি নয়। হাতে প্রচুর কাজ জমে গেছে। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত থানায় বসে সেগুলো সেরে নাইট-রাউণ্ডে বেরোব। ফিরতে ফিরতে সেই ভোর রাত।

হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে অমিতকে আবার বললাম, তা'হলে কিন্তু সময় মত একদিন তোমাকে ওঁদের বাড়ি যেতেই হবে। একা যেতে না চাও তো আমিও সঙ্গে যেতে পারি। অবশ্য তাতে যদি তোমাদের কোন অসুবিধা না হয়। বলেই আমি একটু মুখ টিপে হাসি।

পোশাক পরতে পরতে অমিত জবাব দেয়, তা' পরে দেখা যাবে। তবে তোমাকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, যে আজ পর্যন্ত 'আপনি, থেকে 'তুমি' স্তরে নেমে আসতে পারেনি তার সঙ্গে তোমার সামনে কথা বলতে আমার অন্তত কোন অসুবিধে হবে না। বলেই সে একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসে।

মনে মনে একটু আশ্বস্ত হই। যাক, এতক্ষণে তবে নিমরাজি হয়েছে অমিত। বন্ধুর এতটুকু কাজে লাগতে পেরেছি ভেবে মনে মনে সত্যিই উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

রাস্তায় এসে বাড়ির পথে পা বাড়াই আমি। অমিত থানার পথ ধরে।

রাত প্রায় দেড়টা। গভীর নিশুতি রাত। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই কোথাও। দূর থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা রাতজাগা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু রাস্তায় এখানে-ওখানে তখনও জল জমে রয়েছে। রাস্তার আলোগুলোও নিষ্প্রভ।

সাইকেলে চেপে নাইট রাইণ্ডে বেরিয়েছে কোতোয়ালী থানার সেকেণ্ড অফিসার অমিত রায়। অতি সন্তর্পণে আস্তে সাইকেল চালাচ্ছে অমিত। অসাবধানে রাস্তার জমে থাকা জল ছিটকে উঠে পোশাক নষ্ট করে দেবার সম্ভাবনা।

বাজারের কাছে রাস্তার একপাশে জড়ো করা ঠেলাগাড়ির নিচে আশ্রয় নিয়েছে একজোড়া কুকুর। ঠেলাগাড়িগুলো একসঙ্গে লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা। নইলে চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। গোটাকয়েক সাইকেল রিক্সাও জড়ো করা রয়েছে একপাশে। পাশের বস্তির কোন খুপরির মধ্যেই হয়ত রিক্সাওয়ালারা বর্ষা রাতের নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছে।

অমিতের সাইকেলের শব্দে ঠেলাগাড়ির নিচ থেকে কুকুর দু'টো একবার চোখ মেলে ঘাড় উঁচু করে তাকায়। অসময়ে নিদ্রা ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত ভঙ্গিতে একবার গোঁ গোঁ শব্দ করে। তারপর অমিতের সাইকেল চলে যেতেই আবার মাথা নিচু করে ঘুমোতে চেষ্টা করে।

সারা শহরটা যখন মুখে অচেতন তখন রাতের প্রহরী অমিত রায় চলেছে নিম্নতম প্রহরীদের সতর্কতার পরীক্ষা নিতে। এটাই তার কাজ। অফিসাররা ঠিক পাহারা দেয় না। যারা পাহারা দেয় তাদের কাজ 'চেক' করাই অফিসারদের ডিউটি।

মনটা আজ তেমন ভাল নেই অমিতের। বর্ষা রাতেই কেন যেন বাড়ির কথা মনে পড়ে। অমিতের বাড়ি উত্তরবঙ্গের একটা মহকুমা শহরে। উত্তরবঙ্গে স্বভাবতই বর্ষা একটু বেশি। তাই বিশেষ করে বর্ষায় রাতেই তার বাড়ির কথা, মা-বাবার কথা মনে পড়ে।

মা'র কথা মনে করে একটু হাসিও পায় অমিতের। তার স্বাস্থ্যের প্রতি কি নজরটাই না ছিল তাঁর। ছাত্রাবস্থায় একটু বেশি রাত জেগে পড়াশোনা করলেই তিনি বকাবকি করতেন। বলতেন, রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। সেই অমিতই এখন রাতের পর রাত জেগে ডিউটি করছে। এখন আর বলা-কওয়ার কেউ নেই। আর, থাকলেও এখন তাকে রাত জাগতেই হবে। এটাই তার চাকরি।

সোজাপথে না গিয়ে ইচ্ছে করেই একটু ঘুরপথে সাইকেল চালায় অমিত। ঐ ঘুরপথেই অজিতেশ দত্তর বাড়ি। যেতে যেতে নানারকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা তার মাথায় খেলে যায়। যেতে যেতে সে যদি দেখতে পায় বাড়ির গেটের সামনে স্মৃতিকণা তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

রয়েছে! আরে দূর ছাই, তা' হয় নাকি? এত রাতে স্মৃতি দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? আর সে জানবেই বা কেমন করে যে, অমিত আজ নাইট-রাউণ্ডে বেরোবে?

তবে, বাইরে না হোক, ছাতের ওপরে আলসের কাছেও তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে স্মৃতিকণা। ওদের ছাত থেকে তো এই রাস্তাটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। তার জন্যে না হোক, রাতে ঘুম হল না বলেও তো স্মৃতি ছাতের ওপর পায়চারি করতে পারে। না, তাও সম্ভব নয়। এই বর্ষার রাতে নরম বিছানা ছেড়ে কে একা একা ছাতের ওপর পায়চারি করতে যাবে? তবে নিজের ঘরের জানলার পাশে তো এসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে স্মৃতি! অমিতকে মাঝে মাঝে নাইট-রাউণ্ডে বেরোতে হয় তা' তো অজানা নয় তার।

অজিতেশ দত্তর বাড়ির কাছে এসে পড়েছে অমিত। কেন যেন ইচ্ছে করেই সাইকেলের গতিবেগ কমিয়ে দেয় সে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায় বাড়িটার দিকে। মুখ উঁচু করে ছাতের দিকে তাকায়। না, কেউ কোথাও নেই। আলোর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

মনে মনে একটু নিরাশ হয় অমিত। কল্পনা অসম্ভব জেনেও মনের মধ্যে সেই কল্পনাকে লালন-পালন করার ফলে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় সেই আশা নিষ্ফল হলে মানুষের মন স্বভাবতঃই নৈরাশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রয়োজন না থাকলেও অমিত কয়েকবার সাইকেলের বেল বাজায়। তারপর ধীরে ধীরে নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

সরকারি ট্রেজারী। সারা জেলার সরকারি টাকা-পয়সা জমা থাকে ঐ ট্রেজারীতে। দিনরাত রাইফেল হাতে পুলিশ পাহারা থাকে সেখানে। সদা সতর্ক পাহারা। লক্ষ লক্ষ টাকা জমা রয়েছে সেখানে। একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ।

তাই বিশেষ করে রাতের বেলা তাদের কাজ 'চেক' করতে হয় অফিসারদের। পরীক্ষা করে দেখতে হয়, তারা সতর্ক আছে কি নেই।

চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ট্রেজারী। একপাশে প্রধান ফটক।

ট্রেজারী ফটকের সামনে অমিত সাইকেল থেকে নামতেই ভেতরের সেণ্ট্রি কনস্টেবল্ রাইফেল উঁচিয়ে তার দিকে তাক্ করে চিৎকার করে ওঠে,—হল্ট্! হু কাম্স্ দেয়ার?

সঙ্গে সঙ্গে অমিত জবাব দেয়,—ভিজিটিং রাউণ্ড।

সেণ্ট্রি কনস্টেবলটির তবুও বিশ্বাস হয় না। সেই অবস্থাতেই অমিতের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে রেখে তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে নিজের হুইস্ল্ বাজায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে আরও চার-পাঁচজন রাইফেলধারী কনস্টেবল্ বেরিয়ে এসে সামনের মাটির ঢিবির পেছনে, সিঁড়ির পাশে, বাড়ির কোণে এসে দাঁড়ায়। সকলের রাইফেলই তাক্ করা রয়েছে অমিতের দিকে। যেন একচুল বেকায়দা দেখলেই একসঙ্গে সবাই গুলি করবে তাকে।

কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অমিত।

এবার ধীরে ধীরে প্রহরীদের অধিনায়ক এগিয়ে আসে অমিতের দিকে। হাতে তার একগোছা চাবি। অমিতের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেও তাকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। কে বলতে পারে ডাকাতদলের কেউ পুলিশের পোশাক পরে এসে হাজির হয়ে তাদের চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করছে কিনা।

প্রহরীদের অধিনায়ক সামনে এগিয়ে এসে নিচুকণ্ঠে অমিতের সাংকেতিক শব্দটি জিজ্ঞেস করে।

অধিনায়কের প্রশ্নে অমিত নিচুকণ্ঠে সাংকেতিক শব্দটি উচ্চারণ করে। এতক্ষণে বিশ্বাস হয় তার। হাতের চাবি দিয়ে গেটের তালা খুলে দেয় সে। সাইকেলটা নিয়েই ভেতরে প্রবেশ করে অমিত। অধিনায়ক এবার স্যালুট্ করে তাকে।

আর কোন ভয় নেই। প্রতারিত হবার সম্ভাবনা নেই আর। তাই রাইফেলধারী কনস্টেবলরা একে একে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। সেণ্ট্রি কনস্টেবলটি তার বাঁ কাঁধের ওপর রাখা রাইফেলের বাটের ওপর ডান হাতের চোটোর সাহায্যে একটা শব্দ করে অভিবাদন করে অমিতকে।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ট্রেজারী গার্ড 'চেক' করা শেষ হয় অমিতের। তারপর সাইকেল নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

এবার 'চেক' করতে হবে ম্যাগাজিন্ গার্ড। সারা জেলার গুলি-বন্দুকের গুদামঘর ওই ম্যাগাজিন্। এখানেও থাকে দিনরাত কড়া পুলিশ পাহারা। সদাসতর্ক দৃষ্টি নিয়ে প্রহরীরা এখানেও পাহারা দেয় যাতে দুষ্কৃতকারীরা এখানে প্রবেশ করতে না পারে। রাতের বেলা ট্রেজারীর মত এই ম্যাগাজিনও নিষিদ্ধ এলাকা। সাংকেতিক শব্দ ছাড়া এখানেও প্রবেশ করা চলে না। সন্দেহজনক ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে গুলি খেয়ে মরতে হবে।

ম্যাগাজিন্ থেকে বেরিয়ে এসে আবার সাইকেলে চেপে বসে অমিত। এতক্ষণে মেঘ কেটে গিয়ে নীল আকাশে চাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে। চারিদিকে আবছা জ্যোৎস্না। বর্ষা-শেষের দক্ষিণে হাওয়ায় মনটা জুড়িয়ে যায় অমিতের।

শহরের একটা ঘিঞ্জি এলাকায় এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে অমিত। এই এলাকায় দু'জন কনস্টেবল্ পাহারায় বেরিয়েছে। তাদের খুঁজে বের করতে হবে।

অমিত নিজের পকেট থেকে বাঁশি বের করে বাজায়। একবার—দু'বার—তিনবার।

এতক্ষণে অনেক দূর থেকে আরও একটা বাঁশির শব্দ ভেসে আসে। অমিত বুঝতে পারে কনস্টেবলরা জেগে আছে। হয়ত ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে কোন বাড়ির রোয়াকে কিম্বা কোন বন্ধ চা-দোকানের বাইরের বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম করছে। তবে তার বাঁশির শব্দ যখন একবার শুনতে পেয়েছে তখন নিশ্চয়ই তার কাছে এসে হাজির হবে।

অমিত থেকে থেকে আবার বাঁশি বাজায়। আর সেই শব্দ অনুসরণ করে একটু পরেই দু'জন কনস্টেবল্ এসে হাজির হয়। হাতে তাদের লাঠি।

কনস্টেবলদের দু'চারটি প্রশ্ন করে তাদের নোটবইতে নিজের নাম সই করে আবার সাইকেলে চড়ে বসে অমিত। এখনও অনেক কাজ বাকি। অন্য দু'তিনটে বিটের কনস্টেবলদের ডিউটি 'চেক' করতে হবে। তা'ছাড়া দু'তিনজন দাগী আসামীর বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজ-খবরও নিতে হবে।

দাগী আসামী মানে মার্কামারা দুষ্কৃতকারী। অতীতে একাধিক চুরি-ডাকাতির মামলায় তাদের শাস্তি হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে যাতে তারা আবার কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে না পারে তার জন্যে তাদের ওপর পুলিশের থাকে কড়া নজর। বিশেষ করে রাতে তারা যাতে বাড়ির বাইরে যেতে না পারে তার জন্যে পুলিশ এসে তাদের খোঁজ-খবর নেয়। নিজের বাড়ি ছেড়ে তাদের অন্য কোথাও যেতে হলে থানার অনুমতি নিতে হয়।

এই দাগী আসামীরা নিজের এলাকায় সাধারণত অপরাধ করে না। কারণ, তারা জানে তা'হলে পুলিশের প্রথম নজরই পড়বে তাদের ওপর। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বে-

পাড়ায় গিয়ে অপরাধ করে আসে। কেউ কেউ আবার বাইরের কোন দুষ্কৃতকারী দলকে নিজের এলাকায় চুরি-ডাকাতি করতেও সাহায্য করে।

শহরের একটা কুখ্যাত এলাকা দিয়ে সাইকেলে চেপে যাবার সময় অমিতের গা'টা একটু ছম্ ছম্ করে। প্রথম প্রথম এইসব এলাকায় গভীর রাতে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভয়ই করত। তাই তখন সঙ্গে নিয়ে যেত একজন কনস্টেবল্। আজকাল ভয় অনেকটা কমেছে। খুব একটা বেকায়দায় না পড়লে কোন দুষ্কৃতকারীই সহসা পুলিশের গায়ে হাত দেয় না।

যেতে যেতে স্মৃতিকণার একটা কথা মনে পড়ে অমিতের। পটলচেরা ভীরু চোখদু'টো মেলে অমিতের নাইট রাউণ্ডের কাহিনী শুনতে শুনতে সে একদিন মন্তব্য করেছিল—যাই বলুন, আপনাদের এত সাহস কিন্তু ভালো নয়। কি প্রয়োজন ওসব এলাকায় একা একা গিয়ে?

জবাবে একটু হেসে অমিত বলেছিল, ভয় ও সাহস শব্দ দু'টো পরস্পরের এত কাছাকাছি যে, একটা একটু কমে এলেই অন্যটা আপনিই বেড়ে ওঠে। অবশ্য স্বীকার করছি সাবধানের মার নেই, কিন্তু সবসময় ঠিক ঠিক ওসব আপ্তবাক্য মেনে কাজ করা চলে না। সময় সময় অপ্রয়োজনীয় বলেও মনে হয়।

—তা' যাই বলুন, আমার কিন্তু মনে হয় আপনাদের এই চাকরিতে সাহস একটু কম থাকাই ভালো। তাতে বিপদের সম্ভাবনা কম। কথাটা বলে ফেলেই কেমন যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল স্মৃতিকণা। মনে মনে ভেবেছিল, ছি-ছি, অমিতের নিরাপত্তার ব্যাপারে তার এত উদ্বেগ প্রকাশ করাটা সত্যিই দৃষ্টিকটু। অমিত নিজেই বা কি মনে করলে?

অমিত কিন্তু সেদিন স্মৃতিকণার এই উদ্বেগটুকু সত্যিই বেশ উপভোগ করেছিল। নিজের সম্বন্ধে প্রিয়জনকে ভাবিয়ে তোলার মধ্যে যে সূক্ষ্ম আনন্দটুকু লুকিয়ে থাকে অমিত সেই আনন্দেরই স্বাদ পেয়েছিল সেদিন। স্মৃতিকণার শঙ্কাউদ্বেলিত হৃদয়ের সামান্য উত্তাপটুকু সেদিন তার মনে এক স্বপ্ন বিধুর ভাবের সৃষ্টি করেছিল।

শহরের ঐ কুখ্যাত এলাকার দাগী আসামী রতন মাঝি। মধ্যবয়সী ওই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি অনেকবার জেল খেটেছে। মাত্র মাসতিনেক আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তাই, ওর ওপর পুলিশের কড়া নজর।

একটা সরু গলির শেষপ্রান্তে রতনের বাড়ি। অমিত সাইকেল থেকে নেমে প্রবেশ করে সেই গলির মধ্যে।

রতনের বাড়ির দরজায় এসে অমিত ডাকে,—রতন, রতন!

প্রথমবারে কেউ সাড়া দেয় না।

অমিত কণ্ঠস্বর আরও একটু চড়িয়ে আবার তাকে ডাকে।

এবার ভেতরে থেকে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,—উঁ!

—বাইরে এসো। অমিত ডাকে।

ভেতর থেকে আবার তেমনি কণ্ঠস্বর,—উঁ!

এবার ধমকে ওঠে অমিত,—কি উঁ-উঁ করছো? বাইরে এসো!

দরজার খিল খোলার শব্দ হয়। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ায় রতন মাঝি।

কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটিয়ে তুলে রতন বললে,—আপনাদের জন্যে কি স্যার, রাতে একটু ঘুমোতেও পারব না?

রতনের কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে অমিত বললে,—বেশ, যাও এখন, ঘুমোও গিয়ে।

উপায় নেই। ওদের রাতের ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে না তুলে উপায় নেই। এমন ঘটনারও নজির আছে যে, কোন অফিসার হয়ত মানবতার খাতিরে ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসা 'উঁ' শব্দ শুনেই নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেছে। আর ঠিক তখনই সেই লোকটা হয়ত অন্য কোথাও গিয়ে চুরি-ডাকাতি করেছে। তার ঘরের ভেতর থেকে অন্য কেউ তার হয়ে প্রক্সি দিয়ে অফিসারটির চোখে ধুলো দিয়েছে।

এই ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে অমিতের একদিন জোর তর্কও হয়ে গেছে। কথায় কথায় একদিন আমি বলেছিলাম, দেখ ভাই অমিত, তুমি যা-ই বলো না কেন, জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দাগী আসামীর পেছনে তোমরা এমন আঠার মত লেগে থাকো যে, ইচ্ছে থাকলেও বেচারারা আর সৎভাবে জীবন-যাপন করতে পারে না।

অমিত প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি বলতে চাও, ওদের সৎভাবে জীবন-যাপনের আমরাই প্রধান প্রতিবন্ধক?

—প্রধান অপ্রধান বুঝি না। তবে সময় সময় তোমরা তাদের বাধ্য করো অপরাধ করতে, একথা অস্বীকার করতে পারো?

একটু সময় থেমে অমিত আবার বলেছিল, এরপরই তুমি কি কথা বলবে আমি জানি। সেই চিরাচরিত কথার পুনরাবৃত্তি করবে তো? বলবে, সন্দেহ বশে তাদের গ্রেপ্তার করে আমরা চালান দিই। আর জামীনে বেরিয়ে এসে মামলার খরচ জোগাতে আবার তাদের অপরাধ করতে হয়, তাই তো?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আমি বলি,—শুধু কি তাই? বেচারাদের সৎভাবে খেটে খাবারও আর উপায় থাকে না। কেউ তাদের আর কাজ দিতে চায় না।

একটু হেসে অমিত জবাব দিয়েছিল, দেখ তরুণ, একটু ভেবে দেখলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, এই ব্যাপারে আমরা যতটা দায়ী তার চাইতেও বেশি দায়ী আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থা। সব সময় না হলেও সময় সময় সন্দেহ বশে ওদের গ্রেপ্তার না করে উপায় থাকে না। অপরাধের সূত্র খুঁজতে গিয়েই ওদের গ্রেপ্তার করতে হয়। তা'ছাড়া, দাগী অপরাধীকে কে না সন্দেহ করে? কারুর বাড়ি চুরি-ডাকাতি হলে বাড়ির কর্তা প্রথমেই সন্দেহ করে সেই অঞ্চলের কোন পরিচিত দাগী আসামীকে। অবশ্য তারা সন্দেহ করলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করতে ছুটে যাই না। সন্দেহটা অমূলক কিনা তা' যাচাই করে নিতে চেষ্টা করি। তবে এর অন্যথাও ঘটে। সেক্ষেত্রে উপায় কি বলো? তাদের গ্রেপ্তার না করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

প্রশ্ন করি আমি,—কিন্তু বিদেশে কি হয় জানো?

—বিদেশের কথা না তোলাই ভালো। বলতে থাকে অমিত, এদেশে কি বিদেশের মত অপরাধীদের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের, তাদের সৎভাবে জীবন যাপন করবার, সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবার তেমন কোন ভালো সুযোগ আছে? তা' যখন নেই তখন বিদেশের নজীর টেনো না, ভাই।

সেদিন অমিতের সেই যুক্তিকে পুরোপুরি মেনে নিতে না পারলেও তা' একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারিনি। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ভিন্ন সামাজিক উন্নতি যে এই যুগে সম্ভব নয় সেকথা অর্থনীতিতে বিশেষ জ্ঞান না থাকলেও সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।

সেদিন নাইট-রাউণ্ড শেষে অমিত যখন নিজের বাসায় ফিরে এল তখন ভোরের আকাশে সবে লাল্‌চে আভা দেখা দিয়েছে।

॥ চোদ্দ ॥

রাতের বৃষ্টির পর সকালেই কড়া রোদের ঝলমলানি। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে শহরের চারিদিকে।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে জেলার কোতোয়ালী থানাও। সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি, সেই একই পুলিশী জীবনের গতানুগতিক ধারা প্রবাহ। কেউ বলে বৈচিত্র্যপূর্ণ, কেউ বলে বৈচিত্র্যহীন। আমার নিজেরও তেমনি একটা ধারণা ছিল, পুলিশ জীবন সত্যিই বৈচিত্র্যপূর্ণ। একঘেয়েমি নেই এতে। কিন্তু, একদিন ঐ কোতোয়ালী থানায় বসেই আলাপ হয়েছিল একজন প্রবীণ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। ভদ্রলোক অন্য কোন একটা থানার অফিসার-ইন্-চার্জ। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি হয়েছে তাঁর। রিটায়ার করতে আর মাত্র মাসখানেক বাকি।

ভদ্রলোককে প্রশ্নটি করতেই তিনি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার পরিচয় নিলেন। তারপর বললেন,—আপনি এই ডিপার্টমেন্টের লোক নন বলেই এমন কথা বলছেন। আসলে এই পুলিশী জীবন একঘেয়েমিতে ভরা।

—সেকি? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম আমি, কিসের একঘেয়েমি? কত নতুন, কত অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিদিন, কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হচ্ছে আপনাদের—এতেও যদি একঘেয়েমি থাকে তো—

প্রবীণ ভদ্রলোক একটু ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিলেন, বৈচিত্র্যহীন জীবনে বৈচিত্র্যহীনতাই যেমন একঘেয়েমি, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যও তেমনি একধরনের একঘেয়েমী। কথাটা হয়ত পরস্পর বিরোধী বলে মনে হবে আপনার কাছে, কিন্তু এটাই আসল সত্য। মানুষ জীবনে বৈচিত্র্য চায়, কিন্তু বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য সাংঘাতিক বিরক্তিকর। ভুক্তভোগী ছাড়া একথা সহসা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না। আর আপনি ঠিক ভুক্তভোগী নন বলে আপনাকে বোঝানও হয়ত সহজসাধ্য হবে না।

সেই প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন এ নিয়ে আর কোন তর্ক করিনি আমি। তবে ভদ্রলোকের কথাটা পুরোপুরি মেনে নিতেও পারিনি। কিন্তু অনেকদিন পরে স্বয়ং ভবদেব ব্যানার্জি একদিন কথায় কথায় অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা বলেছিল আমাকে। বলেছিল,—দেখ ভাই সংবাদ-প্রভাকর, বৈচিত্র্যপূর্ণ, বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়েমি প্রভৃতি শব্দগুলোকে তোমরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করো আমি জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারি, এসব শব্দগুলোর অর্থ নির্ভর করে মানুষের নিজ নিজ চরিত্রের বিশেষত্বের ওপর। আমরা দশজনে যাকে একঘেয়েমি কাজ বলে মনে করি তেমন কোন কাজের ভেতর বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়ে কোন মানুষ আনন্দে একেবারে মেতে রয়েছে—এমনি কোন ঘটনা কি কখনও তোমার চোখে পড়েনি? আবার, এর উল্টোটাও তো সংসারে আকছার হচ্ছে।

সেদিন ভবদেব ব্যানার্জির যুক্তিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি।

বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরগরম হয়ে ওঠে কোতোয়ালী থানা। অফিসাররা প্রায় সবাই উপস্থিত। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। থানা-ডিউটি পিনাকী সরকারের।

হঠাৎ একটি নিম্নশ্রেণীর বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পায়ে পায়ে পিনাকী সরকারের সামনে এসে দাঁড়াতেই পিনাকী খিঁচিয়ে ওঠে, তাকে,—একি, তুই এখানে কেন? কে তোকে এখানে আসতে দিলে? এটা কি ভিক্ষে করবার জায়গা নাকি? বলেই 'সেন্ট্রি—সেন্ট্রি' বলে চিৎকার করে দেউড়ির পাহারাদার কনস্টেবলকে ডাকতে থাকে পিনাকী।

হাতের বন্দুকটির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে খৈনি টিপছিল কনস্টেবল্ রামসেবক। ডিউটি অফিসারের ডাকে বাঁ-হাতের চেটোতে ডান হাতের চড় বসিয়ে খৈনির ধুলো ঝেড়ে ফেলে মুহূর্তে সেই তামাক ঠোঁটের কোণে গুঁজে দিয়ে লম্বা পায়ে এসে দাঁড়ায় পিনাকীর সামনে।

পিনাকী একটু চড়া সুরে রামসেবককে ধমকে বলে ওঠে,—কিহে, বাইরে দাঁড়িয়ে কি ঝিমুচ্ছিলে? রাস্তার ভিখিরিগুলো থানার মধ্যে ঢুকে উৎপাত করছে, আর তুমি হাঁ করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে!

দোষ রামসেবকেরই। খৈনি টিপতে টিপতে থানার চৌহদ্দির মধ্যে নিজের হাতে লালন-পালন করা ঢেড়স গাছগুলোর দিকে যখন সে তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল সেই ফাঁকে থানায় ঢুকে পড়েছিল এই বৃদ্ধা।

তাড়া খেয়ে বৃদ্ধার সামনে এসে চোখ পাকিয়ে তিরিক্ষি মেজাজে হাঁক পাড়ে রামসেবক,—হেই বুড়ি, নিকালো—আভি নিকালো হিঁয়াসে!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বুড়ি এবার হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

বুড়ির কান্না যতই বাড়তে থাকে রামসেবকের ধমক ততই জোরালো হতে থাকে।

দোষ অবশ্য পিনাকী সরকারেরও নয়। বৃদ্ধার উস্কোখুস্কো সাদা চুল, কোটরে ঢোকা চোখ, অস্থিচর্মসার দেহ ও শতছিন্ন কাপড় দেখে তাকে ভিখিরি বলেই মনে করেছিল সে।

কান্নার মধ্যে বুড়ি ইনিয়ে-বিনিয়ে যা' বললে, তার অর্থ বুঝতে পেরে পিনাকী রামসেবকের আস্ফালন থামিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে প্রশ্ন করে, কি, ডাইরী করাতে এসেছো?

চোখের জলের মধ্যে এবার ফোক্‌লা দাঁতে বুড়ি একটু হাসে। তারপর মাথা নেড়ে বললে,—হ্যাঁ বাবু, মান্‌কের মা বলল, উপায় যখন আর কিছু নেই, তখন সোজা থানায় গিয়ে বাবুদের ধরে পড় গে। উপায় একটা হবেই। তাই তো মানকের মা'র কথায়—

অধৈর্যকণ্ঠে পিনাকী বলে ওঠে,—রেখে দাও তোমার সেই মান্‌কের মা'র কাহিনী। ওসব শোনার দরকার নেই আমার। তোমার কি দরকার তাই বলো।

বৃদ্ধার সেই ফোক্‌লা দাঁতের হাসিটি শুকিয়ে যায়। মান্‌কের মা তার সবচেয়ে বড় হিতৈষিণী। তার দয়াতেই সে বেঁচে আছে এখনও। নইলে কবে না খেয়ে শুকিয়ে মরে যেত। তার বুদ্ধি ধার করেই থানায় এসে হাজির হয়েছে সে। শুধু কি তাই, তার বুদ্ধি মতই এখানে আসার সময় জিনিস ক'টি আঁচলে বেঁধে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। এখানে এসে বাবুদের কাছে কি কি বলতে হবে তা-ও মান্‌কের মা বার বার বলে দিয়েছে তাকে। এহেন মান্‌কের মা'র মত তার সবচাইতে বড় হিতৈষিণীর কথা বাবুরা শুনতে না চাওয়ায় একটু দমে যায় বৃদ্ধা।

পিনাকী আবার তাড়া দিয়ে ওঠে,—কি, চুপ করে রইলে কেন? কি তোমার নালিশ বলো?

বৃদ্ধা তখন মান্‌কের মা'র বলে-দেওয়া কথাগুলোই মনে করতে চেষ্টা করছিল। তাড়া খেয়ে কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। একটা ঢোক গিলে শুধু বলল,—রামু, রামু আমাকে খেতে দেয় না।

—কে রামু? প্রশ্ন করে পিনাকী।

—আমার নাতি। সেই এতটুকু বেলা থেকে মা-বাপ মরা ঐ ছেলেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। নিজে না খেয়ে ওকে খাইয়েছি। নিজে ছেঁড়া কাপড় পরে ওকে ভাল জামা-কাপড় পরিয়েছি। আর আজ—আজ সেই রামু কিনা দু'বেলা দু'মুঠো খেতেও দেয় না

আমাকে। বলে, তুই বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে। তুই রাক্কুসী—তুই ডাইনী। আরও কত কী—বলতে বলতে বৃদ্ধা অশ্রু সংবরণ করতে করতে আবার বলে ওঠে, তাই তো মান্‌কের ম বললে—

—ব্যস্ হয়েছে। বুঝতে পেরেছি। মানকের মাকে আর দরকার নেই। তা' তোমার সে নাতি কখনও মার-ধোর করেনি তো তোমাকে?

ফোঁস করে ওঠে বৃদ্ধা। বললে,—মার-ধোর? না বাবা, সে সাহস এখনও হয়নি রামুর কুঁড়েঘরটা যে এখনও আমার নামেই রয়েছে। যত বাউণ্ডুলেপনাই করুক না কেন, রাতে বেলা শোবার জায়গা যে ওটাই।

—বেশ বেশ, একটু থেমে পিনাকী আবার বললে, সব তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার কথ তো লিখে নেবার মত নয়। তাই লিখি কি করে? তোমাকে খেতে দেওয়া না দেওয়া রামু ইচ্ছে। আমরা তার কি করতে পারি?

এবার অবিশ্বাসের হাসি জেগে ওঠে বৃদ্ধার শিথিল ওষ্ঠপ্রান্তে। মাথা দোলাতে দোলাতে সে বলতে থাকে,—তা' কি হয় নাকি? তোমরা বললে সে কি না শুনে পারে? তোমর দারোগা-পুলিশেরা বললে সে শুনবে না, তার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

—কিন্তু, আমরা এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে যাব কেন?

বৃদ্ধা এবার অনুনয়-বিনয় করতে থাকে,—লক্ষ্মী আমার—দাদা আমার। বুড়ির এ উপকারটুকু করো বাছা। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। ছেলেমেয়ে তোমার বেঁচে-বর্তে সুখে থাকবে। তোমার—

বৃদ্ধা বোধহয় আরও কিছু আশীর্বাদ করতে যাচ্ছিল পিনাকীকে। কিন্তু তার আগে পিনাকী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, থাক—থাক। ছেলেমেয়ে আমার নেই। আর, দরকারও নেই। আমি বরঞ্চ তোমার কথা দু'কলম লিখে নিচ্ছি। তারপর তুমি যা' পারো করো গিয়ে বলেই খোলা ডাইরী বইটা সামনে টেনে নেয় পিনাকী।

বৃদ্ধা কিন্তু এতেই ভারী খুশি হয়ে ওঠে। সে তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি যে ডাইরীতে দু'কলম লিখে নেওয়া মানেই তার সমস্যার সমাধান নয়।

বৃদ্ধার বক্তব্য সংক্ষেপে ডাইরীর পাতায় লিখে নিয়ে পিনাকী বললে,—এই তো লিখে নিলাম। এবার বাড়ি যাও।

খুশি মনে বৃদ্ধা তখন তার কাপড়ের আঁচল খুলে গোটাকতক কাঁচাপাকা পেয়ারা বের করে পিনাকীর সামনে টেবিলের ওপর রাখে।

পিনাকী পেয়ারাগুলোর দিকে তাকিয়েই তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে,—এগুলো কি?

—আমার গাছের পেয়ারা বাবা। তোমরা খাবে বলেই এনেছি। মুখে হাসি ফুটিয়ে বৃদ্ধা বললে।

পিনাকী পেয়ারাগুলোর দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকে। মনে মনে হয়ত ভাবে এগুলো ঘুষের নামান্তর কিনা।

পিনাকীর হাবভাবে কেমন যেন একটু বিব্রত বোধ করে বৃদ্ধা। কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ফুটিয়ে তুলে বললে,—নাও না বাবা, আমার গাছের পেয়ারা—

মুখে-চোখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে পিনাকীর। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে কিছু বলতে যেতেই পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়ায় ধূর্জটি। সম্ভবতঃ পেয়ারার ব্যাপারটা কানে গিয়েছিল তার।

ধূর্জটি কিন্তু একমুহূর্তও সময় নষ্ট করে না। সোজা পিনাকীর সামনে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর থেকে একটা বড়গোছের পেয়ারা তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে।

খেতে খেতে মন্তব্য করে ধূর্জটি,—বাঃ বুড়িমা, চমৎকার পেয়ারা তোমার গাছের!

ধূর্জটির সরব মন্তব্য ওপাশের ঘরে সুশান্তর কানে যেতেই সে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—আমাকে একটা, স্যার!

—এই যে দিচ্ছি। বলেই ধূর্জটি আর একটি পেয়ারা তুলে নিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে সুশান্তর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে,—নাও, খাও।

খেতে খেতে ধূর্জটি প্রশ্ন করে বৃদ্ধাকে,—তোমার গাছে বুঝি অনেক পেয়ারা আছে বুড়ি মা?

—তা' কিছু আছে, বাবা। জবাব দেয় বৃদ্ধা, কিন্তু পাড়ার পাজী ছুঁচোদের জ্বালায় কি কিছু রাখবার জো আছে? বাঁদরগুলো সারাদিন তক্কে-তক্কে থাকে। একমুহূর্ত চোখের আড়াল হয়েছি কি অমনি গাছে চড়ে বসে সব সাবাড় করে দেয়।

ধূর্জটির প্রশ্নের জবাব দিলেও পিনাকীর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে বৃদ্ধা। থানার বাবুরা তার পেয়ারা খেয়েছে, তাতে সে সত্যিই খুশি। কিন্তু যে লোকটি তার অভিযোগ লিখে নিয়ে তার উপকার করলে, সে যে ঐ গোম্‌ড়া মুখে বসে রইল তাতেই একটু অস্বস্তি বোধ করে বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা পিনাকীর দিকে তাকিয়ে বললে,—তুমি বাবা পেয়ারা খাবে না?

বিরক্তকণ্ঠে পিনাকী জবাব দেয়,—না, ওসব আমি খাই না।

একমুহূর্ত চিন্তা করে বৃদ্ধা। তারপর আবার বললে,—আমি তবে এবার যাই, বাবা! আমার কথা যখন তোমরা লিখে নিয়েছো তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। বুড়ি ঠাকুমাকে খেতে না দিয়ে ব্যাটা দিব্বি—

বুড়ির কথা শেষ হবার আগেই পিনাকী বলে ওঠে,—না—না। আর কিছু হবে না এখানে। তোমার কথা লিখে নিলেও আমরা আর কিছু করতে পারব না। পারো তো নাতির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দাও গে।

—সেকি বাবা? যেন আকাশ থেকে পড়ে বৃদ্ধা। তার এতক্ষণ ধারণা ছিল থানার বাবুরা যখন তার কথা লিখে নিয়েছে, তখন তারাই এবার একটা কিছু বিহিত করবে। কিন্তু তার বদলে পিনাকীর কথা শুনে থানার মেঝেতেই সে বসে পড়ে। তারপর আবার কাতরকণ্ঠে বলতে থাকে, এখন তবে আমাকে নাতির বিরুদ্ধে আদালতে দিয়ে মোকর্দমা করতে হবে? আর মোকর্দমার খরচাই বা পাব কোথায়?

একটি পেয়ারা শেষ করে সবে দ্বিতীয়টিতে কামড় দিয়েছে ধূর্জটি। পিনাকীর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,—ঘটনাটা কি, দাদা?

—ওর নাতি নাকি ওকে খেতে দেয় না। সেই অভিযোগ করতেই ও এসেছে।

একটু সময় চিন্তা করে ধূর্জটি একবার বৃদ্ধার দিকে তাকায়। তারপর পেয়ারা চিবোতে চিবোতেই পিনাকীকে বললে,—তা' বুড়ি যখন এত করে বলছে তখন সেই ছেলেটাকে ডেকে আনিয়ে একটু ধমকে দিন না, দাদা।

অকস্মাৎ রেগে ওঠে পিনাকী। উত্তেজিতকণ্ঠে বললে,—আপনারা তো জানেন ওসব ধমকা-ধমকির মধ্যে আমি নেই। আইনমত যতটুকু করার করেছি। তার একচুলও বেশি, আমাকে দিয়ে হবে না।

—আহা, রেগে উঠছেন কেন, দাদা? আমি কি—

—রাগব না তো হাসব নাকি? বুড়ির দেওয়া ঐ পেয়ারা পেটে যেতে না যেতেই ওর প্রতি আপনাদের দরদ উথলে ওঠে তো যান না, আপনারা গিয়েই ওর সেই নাতিকে ধমকে আসুন!

ধূর্জটি বরাবরের রগচটা মানুষ। পিনাকীর কথার খোঁচাটুকু নির্বিবাদে হজম করার লোক সে মোটেই নয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করে মনের ঝাঁজটুকু চেপে গিয়ে মৃদু হেসে বললে,—সারাটা জীবন তো দাদা আইনমাফিক কাজ করেই গেলেন। মাঝে-মধ্যে না হয় একটু-আধটু বে-আইনী কাজ করেই ফেললেন, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আইন তো মানুষের জন্যেই। আইনের জন্যে তো মানুষ নয়।

—দেখুন ধূর্জটিবাবু, আমাকে আর তত্ত্বকথা না-ই বা শোনালেন—

ধূর্জটি বাধা দিয়ে বললে,—না-না, আপনাকে তত্ত্বকথা শোনাতে পারি এমন ক্ষমতা আমার কোথায়? চাকরিতেও আপনি আমার চেয়ে সিনিয়র। আর দারোগাগিরিও আপনি আমার চাইতে বেশিদিন করছেন। কাজেই—

পিনাকী ও ধূর্জটির কথা-কাটাকাটির মধ্যে হাতের কাজ ছেড়ে এ. এস. আই সুশান্তও এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

হঠাৎ সে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,—কি চাই?

সুশান্তর প্রশ্নে পিনাকী ও ধূর্জটি দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকায়।

বাইশ-তেইশ বছরের একটি ছোকরা সেই মুহূর্তে কুণ্ঠিতপদে থানায় প্রবেশ করছিল। সুশান্তর প্রশ্নে দরজার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে একটা ঢোক গিলে সে জবাব দেয়, ঠাকুমা—আমার ঠাকুমা—

মেঘ না চাইতেই জল। ছোকরাটির জবাব কানে যেতেই ধূর্জটি দু'পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে,—তোমার ঠাকুমাকে খুঁজতে এসেছো বুঝি?

সত্যিই তাই। বাড়ি ফিরে প্রতিবেশীদের মুখে ঠাকুরমার থানায় যাবার কথা শুনতে পেয়েই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল রামু। অবশেষে একটা মতলব এঁটে থানায় এসে হাজির হয়েছিল।

রামুর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই বুড়ি উঠে দাঁড়ায়। তারপর ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললে,—একি, তুই এখানে কেন? তোর কীর্তির কথা শোনাতেই তো আমি এখানে এসেছি।

মুহূর্তে রামুর মুখের ভাব পাল্টে যায়। ঝাঁকড়া চুলের বোঝায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটে এসে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিতে চেষ্টা করে। ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসি হেসে বলতে থাকে,—কিছু মনে করবেন না স্যার, ঠাকুমার মাথায় একটু গণ্ডগোল আছে। আজকাল যার-তার কাছে গিয়ে আমার নিন্দে করাটা ওর স্বাভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনাদের এখানে এসেও বোধহয় আমার নিন্দেই করছিল—আমি দেখি না, খেতে দিই না, যত্ন-আত্তি করি না, এসব তো, স্যার? তা' ওকে ক্ষেমা-ঘন্না করে দেবেন, স্যার। পাগলী বুড়ি—

অকস্মাৎ শীর্ণ দেহে অসুরের শক্তি জেগে ওঠে বৃদ্ধার। এক ঝটকায় রামুর সবল বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে,—কি, কি বললি? আমি পাগল? আমার মাথা খারাপ হয়েছে? আমি শুধু শুধু তোর নিন্দে করে বেড়াই?

একটু সময় নিঃশব্দে বুড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সেই শুষ্ক হাসি হেসে রামু বললে, কিছু মনে করবেন না, স্যার। আজকাল—

ধূর্জটি এতক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রামুকে দেখছিল। রামুর কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ সে একটা প্রচণ্ড ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—চুপ করো। ফের বেচাল কিছু বলবে তো পিঠের ছাল খুলে নেব বলে দিচ্ছি। মনে করেছো, বুড়িকে পাগল সাজিয়ে পার পাবে, তাই না? আরে ওস্তাদ, ভুলে যাচ্ছো কেন কোথায় এসেছো? তুমি যতবড় ঘুঘু, তার চাইতেও বড় ঘুঘু আমরা, বুঝলে?

ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে যায় রামু। মতলব হাসিল না হওয়ায় একটু দমে যায় মনে মনে।

কঠিন কণ্ঠে ধূর্জটি আবার প্রশ্ন করে—কোথায় কাজ করো?

—আজ্ঞে, একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়। জবাব দেয় রামু।

—কত করে রোজ পাও?

—সাড়ে চার টাকা, স্যার।

—পয়সা-কড়ি কি করো? সবই বুঝি ওড়াও?

—আজ্ঞে, স্যার—

—ঠাকুমাকে খেতে দাও না কেন?

—আজ্ঞে স্যার, মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে—

ধূর্জটি ধমকে ওঠে,—আবার মিথ্যে কথা বলছো? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

রামু আর কোন জবাব দেয় না।

একটু সময় চিন্তা করে ধূর্জটি আবার বললে,—এই বলে দিচ্ছি, আজ থেকে যদি এই বুড়ি ঠাকুরমাকে খেতে-পরতে না দাও চাকরি করে আর কাপ্তেনী করতে হবে না। কারখানার ম্যানেজারকে বলে কেবল চাকরিই খতম করব না, ধরে নিয়ে এসে চালান দেব, এই স্পষ্ট বলে দিলাম। মাঝে মাঝে গিয়ে আমি খবর নেব। যদি শুনতে পাই কোনদিন কোন অজুহাতে বুড়িকে কষ্ট দিয়েছো তো সারা জীবন জেলে বসে ঘানি ঘোরাতে হবে, বুঝলে?

মুখে আর রা সরে না রামুর। কেবল মুখখানা কাঁচুমাচু করে চুপ করে থাকে। ধূর্জটি এবার বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললে,—এবার নাতির সঙ্গে বাড়ি যাও বুড়িমা। কোন ভয় নেই তোমার। আমরা থাকতে এ ব্যাটা তোমাকে খেতে-পরতে না দিয়ে যাবে কোথায়, শুনি?

বুড়ির মুখে আর একটি কথাও নেই। কেবল রামুর পেছন পেছন বেরিয়ে যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে ধূর্জটির দিকে যে দৃষ্টিতে সে তাকায় সেই দৃষ্টির আবেদন কোনদিনই বোধহয় ভুলতে পারবে না ধূর্জটি।

সারা রাত নাইট-রাউণ্ড করে বাসায় ফিরে মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেয় অমিত। তারপর আবার পোশাক পরে যখন থানায় এসে হাজির হয় তখন থানার ঘড়িতে দশটা বাজতে মিনিট দশেক মাত্র বাকি।

নিজের টেবিলের কাছে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে ছিল অমিত। জেলার কোতোয়ালী থানায় অভিযোগকারী ও অভিযুক্তর অবিরাম আনাগোনা। ডিউটি অফিসারের নির্দেশে কেউ হাজতে ঢুকছে, আবার কেউ বা জামীনদারের কৃপায় ছাড়া পেয়ে ম্লান হাসি ফুটিয়ে তুলে থানা-পুলিশের এই বিশ্রী পরিবেশের বাইরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচছে।

হ্যাঁ, বিশ্রীই বটে! শুধু বিশ্রী নয়, কেমন যেন একটা রুক্ষতা রয়েছে এর চারপাশে। রুক্ষ—কর্কশ—কঠিন। হাসপাতালের আবহাওয়ায় যেমন একটা বিশিষ্ট গন্ধ থাকে, গলায়

টেথিস্কোপ ঝুলানো ডাক্তারদের গম্ভীর মুখ, সাদা পোশাক পরা নার্সদের দ্রুত অথচ নিঃশব্দ আনাগোনার মধ্যে যেমন একটা শঙ্কা-ব্যাকুল অনিশ্চিতের আভাস জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি এই থানা-পুলিশের চৌহদ্দিও অসহ্য ঠেকে অনেকের কাছেই। প্রয়োজনে তারা এখানে আসে। না এসে উপায় নেই বলেই আসে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বাইরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। খাকী পোশাক, লালটুপি, গুলি-বন্দুক, হাজতঘরের শক্ত লোহার দরজা, আর তার ওপর সময় সময় অপরাধীর কান্না—সব মিলিয়ে কেমন যেন এক অমঙ্গ লের ইঙ্গিত। এই অশুভ ইঙ্গিত অনেকেই বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে না। তাই পারতপক্ষে এর ত্রিসীমানায় সহসা আসতে চায় না কেউ। যখন আসে, তখন বাধ্য হয়েই আসে।

গল্প করতে করতে এই প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করছিলাম সেদিন। না, অমিতের সঙ্গে নয়। অমিত তখন থানায় ছিল না। ও. সি. অর্থাৎ বড়বাবু ভবদেব ব্যানার্জির সঙ্গেই আলোচনা করছিলাম।

কথায় কথায় আমি বললাম,—মুখে পুলিশ-পাবলিক সম্বন্ধের কথা আপনারা যতই বলুন না কেন আপনারা যে বাকি জনসাধারণ থেকে একটু স্বতন্ত্র তা' আপনারা সর্বদাই মনে মনে অনুভব করেন। আর তা' করেন বলেই আপনারা সবসময় ঠিক খোলা মনে তাদের সঙ্গে মিশতে পারেন না।

একটা হাসির রেখা দেখা দেয় ভবদেবের ওষ্ঠপ্রান্তে। একটু সময় চুপ করে থেকে সে জবাব দেয়—তোমার কথা শুনে সাবেক কালের দিশী সিভিলিয়ানদের ট্রেনিং সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল, সেটাই মনে পড়ে গেল। ট্রেনিং দেবার সময় তাদের মনে নাকি এই ধারণাটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হত যে, দিশী হলেও তারা একটা ভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তুমিও প্রায় তেমনি একটা কথাই বললে, সংবাদ-প্রভাকর।

জবাবে আমি বলি,—আজকাল পুলিশের ট্রেনিং-এর সময় যে তাদের মনে ঐ জাতীয় কোন ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সেকথা অবশ্য বলছি না আমি। তবে এই ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে করতে অনেকের মনেই তেমনি একটা ধারণা আপনা থেকেই ঢুকে যায়, যা' থেকে সহসা মুক্তি পেতে পারে না তারা। বলুন বড়বাবু, আপনাদের সম্বন্ধে আমার এই স্টাডি কি একেবারেই ভুল?

জবাবে ভবদেব হেসে বললে,—সাইকোলজির প্রফেসার তুমি, তায় আবার সাংবাদিক। তাই তোমার স্টাডিকে ষোল আনা ভুল বলার সাধ্য আমার যেমন নেই, তেমনি আবার ষোল আনা সত্যিও বলতে পারি না। আসল ব্যাপারটা কি জানো ভাই—পুলিশকে বলা যেতে পারে আধা মিলিটারি। মিলিটারির নিয়ম-কানুন যেমন এমন ধরনের যে দেশের অন্য কোন সিভিল ডিপার্টমেন্টের নিয়ম-কানুনের সাথে তার কোন মিল নেই, ঠিক তেমনি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টও অনেকটা তাই। সেই নিয়ম-কানুনের অক্টোপাশে বাঁধা পড়ে তাদের স্বভাবটাও অনেকটা ঐ ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। তা'ছাড়া তাদের কাজের ধরনটাই এমনি যে, যেখানে যখন-তখন যা-খুশি বলার বা করার অধিকার তাদের নেই। এমনিভাবেই বাকি জনসাধারণের সঙ্গে একটি ব্যবধান আপনা থেকেই তৈরি হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে, এই অবশ্যম্ভাবী ব্যবধানকে কখনও কেউ উৎসাহ দেয় না। কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে, পুলিশের চাকরির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে জনসাধারণের সহযোগিতার ওপর। আর সেই সহযোগিতা পেতে হলে তাদের সঙ্গে খোলা মনে মিশতেই হবে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, মাত্রা না ছাড়িয়ে

জনসাধারণের সঙ্গে মেশাটা ঠিক সহজসাধ্য নয়। তার জন্যে জনসাধারণের পরস্পর বিরোধী মনোভাবও অনেকাংশে দায়ী।

—তার মানে? পরস্পর-বিরোধী মনোভাব বলছেন কেন? প্রশ্ন করি আমি।

—দেখ সংবাদ-প্রভাকর, বলতে থাকে ভবদেব, জনসাধারণকে বলা হয় জন-গণেশ। এদের মতি-বুদ্ধি ঠিক ঠিক বুঝে ওঠা-সত্যিই কঠিন ব্যাপার। আমাদের কোন কাজকে একদল লোক যখন হাত তুলে সমর্থন জানাবে, ঠিক তখনই হয়ত আর একদল আমাদের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে চেষ্টা করবে। একদলের কাছে সাধুবাদ পেলে আর একদলের কাছে আমাদের নিন্দা কুড়োতেই হবে—এ অতি সত্যি কথা।

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, সত্যিকারের ভাল কাজকে ভাল বলতে এদেশে লোকের অভাব? ভাল চিরকালই ভাল। তাকে স্বার্থদুষ্ট লোকেরা যতই কেন না খারাপ বলে গালাগাল দিক তাতে কি যায় আসে?

একটু হেসে জবাব দেয় ভবদেব. যায় আসে বৈকি ভাই। ভালকে ভাল বলার মত লোকের সত্যিই অভাব রয়েছে এদেশে। আসলে আজকে দেশের যা' অবস্থা তাতে সেই মুষ্টিমেয় খাঁটি লোকেরা ভালমন্দ কিছুই না বলে ঝঞ্ঝাট এড়াতে গিয়ে চুপ করেই থাকে।

একটু থেমে ভবদেব আবার বললে, এ তো গেল মানুষের বিভিন্ন মতামতের কথা। একই ব্যক্তির পরস্পর-বিরোধী মতামতেরও অভাব নেই আমাদের দেশে। আবার তারা যে সকলেই অশিক্ষিত, তাও নয়। উচ্চশিক্ষিত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও রয়েছেন তাদের মধ্যে।

ভবদেবকে বাধা দিয়ে আমি বললাম, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

জবাব দেয় ভবদেব, বেশ, একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। একথা তুমি নিশ্চয়ই জানো, থানায় কাজ করতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে ঠিক ঠিক আইন মেনে চলা যায় না। আমি নিজেও একবার তেমনি একটা বে-আইনী কাজ করেছিলাম—একটা ক্রিমিন্যালের স্বীকারোক্তি আদায় করতে গিয়ে তাকে বেশ দু'চার ঘা দিয়েছিলাম। লোকটা আদালতে গিয়ে আমার নামে নালিশ করে দিলে। ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক ছিলেন একটু কড়া প্রকৃতির। আমার এই অপরাধ তিনি গ্রাহ্য করে তলব করলেন আমাকে। হাজির হলাম আদালতে। মামলা হল আমার বিরুদ্ধে। বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলেন। আর সেই সঙ্গে পুলিশের এই মানব-বিরোধী বে-আইনী কাজের প্রচণ্ড সমালোচনাও করলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জেলা-জজের আদালতে আপীল করে নির্দোষ প্রতিপন্ন হলাম।

একটু থেমে ভবদেব আবার বলতে থাকে, বছর দু'য়েক কেটে গেল তারপর। একদিন সন্ধ্যার সময় সেই ম্যাজিস্ট্রেট্ ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে হাজির। তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ির চাকরটি বাক্স ভেঙে তাঁর স্ত্রীর প্রায় হাজার দু'য়েক টাকার গহনা নিয়ে পালিয়েছে। লেখাপড়া শেষ করে আমাদের যথাশক্তি তদন্তের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। এর প্রায় দিন দশেক পরে সেই চাকরটা ধরা পড়ল। লোকটাকে থানায় ধরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে খবর দিলাম সেই ম্যাজিস্ট্রেট্ ভদ্রলোককে। ছুটে এলেন তিনি থানায়। আমি অনেক চেষ্টা করলাম, তিনিও চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই চাকরের মুখ থেকে একটি কথাও বের করা গেল না। গহনাপত্রের কোন হদিশই দিলে না সে। ম্যাজিস্ট্রেট্ ভদ্রলোক কিন্তু তখন সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। সোজা কথা তো.নয়,

হাজার দু'য়েক টাকার গহনা। তিনি আমার কাছে সরে এসে আস্তে আস্তে বললেন, বুঝলেন বড়বাবু, ব্যাটা হার্ড ক্রিমিন্যাল, জেরা করে ওর কাছ থেকে একটা কথাও আদায় করতে পারবেন না। পারেন তো দু'চার ঘা দিন। দেখবেন সুড়-সুড় করে সব কথা বলে দেবে। বুঝলে সংবাদ-প্রভাকর, সেই মুহূর্তে আমি হাসব কি কাঁদব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ভবদেব তার কথা শেষ করতেই টেলিফোন বেজে উঠল। আর আমাদের আলোচনাও সেদিনের মত সেখানেই চাপা পড়ল।

কাগজপত্রের মধ্যে মুখ গুঁজে তন্ময় হয়ে ছিল অমিত। বেলা প্রায় এগারোটা। সকালে একবার থানায় এসেই বিশেষ কোন কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল ভবদেব। হঠাৎ সে ঝড়ের বেগে থানায় ঢুকেই অমিতের দিকে তাকিয়ে বললে, অমিত কুইক, রেডি হও। এখনই একটা সার্চে যেতে হবে।

কি সার্চ, কোথায় সার্চ, কিসের জন্যে সার্চ কিছুই বুঝতে না পেরে অমিত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বড়বাবুর মুখের দিকে।

ভবদেব কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করে ডিউটি অফিসার পিনাকীকে হুকুম দেয়, পিনাকীবাবু, আপনি দশজন কনস্টেবল্ ঠিক করুন। তারা আমার সঙ্গে যাবে। আর, থানার গাড়িটাও রেডি করুন।

শহরের বাজার এলাকায় ধনী ব্যবসায়ী যমুনাপ্রসাদ আগরওয়ালার গদির সামনে এসে যখন গাড়িটা দাঁড়ায়, অমিত তখনই আঁচ করতে পারে ব্যাপারটা। শহরে যমুনা প্রসাদের তেমন সুনাম নেই। এককালে চালের মস্তবড় আড়তদার ছিল সে। এখন নেই। চাল এখন রেশনের বস্তু। কিন্তু শহরে তার দুর্নাম—চালের মস্তবড় চোরাকারবারী নাকি সে।

যমুনাপ্রসাদ গদিতেই ছিল। পুলিশের গাড়িতে খোদ বড়বাবুকে দেখে তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বসে হাতজোড় করে নমস্কার করে ভবদেবকে, রাম রাম বড়বাবু! আসুন—আসুন! কী সৌভাগ্য হামার!

ভবদেবের ইঙ্গিতে লাঠিধারী কনস্টেবলরা গুদাম সমেত যমুনাপ্রসাদের গোটা বাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর অমিতকে নিয়ে ভবদেব প্রবেশ করে যমুনাপ্রসাদের দোকানের মধ্যে।

যমুনাপ্রসাদ কিন্তু ততক্ষণে খাট থেকে নেমে এসেছে। সেই মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ শুরু হয়ে গেলেও মুখের সেই অমায়িক হাসিটি কিন্তু একটুও ম্লান হয়নি। আসলে যমুনাপ্রসাদের মত ঝানু ব্যবসায়ীদের মূলধনের মধ্যে ঐ অমায়িক হাসিটির গুরুত্বও কম নয়। বিপদ-আপদে মুখের হাসিটি কি করে বজায় রাখতে হয় সেই দুরূহ আর্টটি বলতে গেলে এদের মত লোকের প্রায় জন্মগত অধিকারে।

যমুনাপ্রসাদ তার একটি চাকরকে ধমক দেয়, এই উল্লু, দেখতা কেয়া? দো কুরসী লে আও—জলদি!

দু'টো চেয়ার এল। ভবদেব ও অমিত চেয়ারে বসতেই যমুনাপ্রসাদ ভবদেবের দিকে তাকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বললে, বাইরে এতো ধুপ, আপনাদের তেষ্টা পেয়েছে নিশ্চয়ই। বলেই তাদের সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে একজন কর্মচারীকে হুকুম দেয়, যাও—তুরন্ত যাও। দো ঠাণ্ডা কোকাকোলা লে আও, ঔর—ঔর দো মিঠা পান।

যমুনাপ্রসাদের আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে এতক্ষণে কথা বলতে ফুরসৎ পায় ভবদেব। বললে, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন শেঠজী? কোকাকোলা কিম্বা পান কিছুরই প্রয়োজন নেই আমাদের।

—তা কি হোয় বাবুজী! হামার গদিতে এলেন। আগে কুছু খেয়ে ঠাণ্ডা তো হোন, পিছে নাহয় কামের কথা হোবে। কাম তো চব্বিশ ঘণ্টাই আছে। বলেই একটু কাষ্ঠহাসি হেসে ওঠে।

ভবদেব কিন্তু একেবারেই কাজের কথায় আসে। শান্তকণ্ঠে বললে, আপনার গুদামটা একবার সার্চ করতে হবে শেঠজী।

—সেকি বাবুজী, হামার গুদামের তো ডাল ঔর তামাক ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি তো জানেন হামি কুনো বুঢ়া কাম করি না!

—তা তো বটেই, মাথা নেড়ে জবাব দেয় ভবদেব, কিন্তু তবুও একবার সার্চ করতে হবে।

ভবদেবের শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে মুখখানা একটু থমথমে হয়ে ওঠে যমুনাপ্রসাদের। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বললে, সার্চ করতে চান, করুন। কিন্তু না করলেই ভাল হতো বড়াবাবু। সবাই জানবে, হামি বোধহয় কুনো বুঢ়া কাম করেছি। তাই পুলিশ এসেছে সার্চ করতে।

ইতিমধ্যে বাইরে কৌতূহলী জনতার একটি ছোটখাট ভিড় জমে গিয়েছিল। সেইদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে ভবদেব বললে, না-না, তা' ভাববে কেন? সার্চ করে চলে যাবার সময়ই এরা বুঝতে পারবে যে, আপনার এখানে কিছুই পাওয়া যায়নি।

—লেকিন—ইতস্ততঃ করতে থাকে যমুনাপ্রসাদ।

ভবদেব কিন্তু আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে বাইরের জনতা থেকে দু'জন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তা'হলে এবাব চলুন শেঠজী, গুদামটা একবার দেখেই চলে আসব।

যমুনাপ্রসাদের মুখে একটা বিব্রত ভাব ফুটে ওঠে। বাইরে জনতার ভিড় আরও বেড়ে উঠেছে ততক্ষণে। সেইদিকে তাকিয়ে পাংশুমুখে সে আবার ভবদেবকে বললে, আপনি যাই হোক একটা উপায় করুন, বাবুজী। গুদাম সার্চ করা হোলে হামার ভারি লজ্জা হোবে। ঈশ্বরের দিব্যি বলছি, গুদামে ডাল ঔর তামাক ছাড়া আর কুছুই নেই।

মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে তির্যকদৃষ্টিতে যমুনাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ভবদেব বললে, দেখুন শেঠজী, আসল কথা লুকিয়ে আর কোন লাভ নেই। আমি খবর পেয়েছি আপনার গুদামে প্রচুর চাল চিনি আছে। কাজেই আপনার ঐ গুদাম ভাল করে সার্চ করতেই হবে। তাই বলছি আর সময় নষ্ট না করে আমার সঙ্গে চলুন।

যমুনাপ্রসাদ দু'পা এগিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ জানালা দিয়ে পেছনের গুদামটা স্পষ্ট নজরে পড়ে।

পুলিশ -কনস্টেবলরা তখন সেই গুদামটিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। সেইদিকে খানিকক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় যমুনাপ্রসাদ। তারপর হাত দু'টো একবার নিজের বুকের কাছে ছুঁয়ে পরক্ষণেই সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটা নিরুপায়ের ভঙ্গিতে বললে, আপনার যা' ইচ্ছা বাবুজী, হামি আর কি বলতে পারি?

খবরটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল গুদামে ঢুকেই। ডাল আর তামাকের বস্তার নিচে সারি সারি চাল ও চিনির বস্তা। সেই প্রায় অন্ধকার গুদামের মধ্যে মানুষের সাড়া পেয়ে গোটাকয়েক ধেড়ে ইঁদুর সর সর শব্দে পালিয়ে গেল। আর অমিত বস্তার পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে বস্তাগুলো গুণতে লাগল।

সাক্ষী ও যমুনাপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে গুদামের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল ভবদেব। যমুনাপ্রসাদের মুখে কথা নেই। চোখদু'টো মেঝেয় নিবদ্ধ।

অমিত একসময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সশব্দে দু'হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভবদেবকে উদ্দেশ করে বললে, মোট তেইশটা বস্তা, বড়বাবু। তার মধ্যে গোটাদশেক বস্তায় আছে চিনি, আর বাকিগুলোতে চাল।

ভবদেব অমিতকে ডেকে বললে, হয়েছে, এবার তুমি এদিকে চলে এসো। কুলী লাগিয়ে প্রত্যেকটি বস্তা চেক করিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। তারপর যমুনাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে আবার বলতে থাকে, কি হল, শেঠজী? মুখে কথা নেই কেন? অনেকদিন ধরেই এই কারবার করে যাচ্ছিলেন। আজ ধরা পড়ে গেলেন।

ছল ছল চোখে যমুনাপ্রসাদ বলে ওঠে, না বাবুজী, আপনি বিশ্বাস করুন—

যমুনাপ্রসাদ কথাটা শেষ করবার আগেই ভবদেব একটু মুখ টিপে হেসে বললে, থাক, শেঠজী। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিন। ওসব বলে এখন আর কি হবে?

পাকা ব্যবসায়ী যমুনাপ্রসাদ। সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে অবিচল ও ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব-নিকেশ করতে এরা বিশেষ পটু। শুধু হিসেব-নিকেশ নয়, নেই সঙ্গে লাভ-লোকসানের অঙ্কটাও এরা মুখে মুখে কষে ফেলে। তাই এদের গদির দেয়ালে দেয়ালে 'শুভ লাভ' লেখার এত ঘটা।

দ্রুত চিন্তা করছিল যমুনাপ্রসাদ। মোক্ষম দাওয়াই প্রয়োগ করবার আগে মনে মনে তার চোরাই চাল-চিনির দামের হিসেব কষছিল। সেই সঙ্গে তার মামলা চালানোর খরচ আর আদালতে জরিমানা হলে জরিমানার অঙ্কটাও মনে মনে আঁচ করে নিচ্ছিল।

যমুনাপ্রসাদ অপাঙ্গে একবার ভবদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাবটি বুঝে নিতে চেষ্টা করে। তারপর ভবদেবের একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, আপনি হামাকে ছেড়ে দিন, বাবুজী। আপনাকে হামি বহুত খুসি করে দেব—

একটু চমকে উঠে যমুনাপ্রসাদের মুখের দিকে তাকায় ভবদেব।

যমুনাপ্রসাদ আবার বললে, সমঝিয়ে বাবুজী, হামার বিপদ হোলে আপনার কি নাফা হোবে? তার চাইতে নগদ তিন হাজার টাকা লিয়ে আপনি চলে যান। হামি আপনাকে কথা দিচ্ছি আজ রাতের মধ্যেই এই মাল এখান থেকে সরিয়ে ফেলব।

ততক্ষণে অমিত বস্তার পাহাড়ের আড়াল থেকে সরে ভবদেবের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অমিতের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে ভবদেব বললে, এই যে অমিত, এসে পড়েছো! এদিকে শেঠজী যে আমার সঙ্গে দরদস্তুর আরম্ভ করে দিয়েছেন। নগদ তিনটি হাজার টাকা দিতে চাইছেন। এখন তুমি কি বলো?

মানুষ কতখানি নির্লজ্জ হলে বাইরের দু'জন ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে ঘুষের টাকা নিয়ে এমনি আলোচনা করতে পারে তাই ভেবে বিস্মিত হয় অমিত। ভবদেব ব্যানার্জির মতো একজন ঝানু অফিসা-ইন-চার্জ ও দক্ষ অফিসার যে হঠাৎ এমনি নির্লজ্জতার পরিচয় দেবে তা' ছিল তার ধারণারই অতীত। এই ব্যক্তিটির ওপর তার এতদিনের শ্রদ্ধা-ভক্তি সেই মুহূর্তেই কর্পূরের মতো উবে যায়। একটা ঘৃণার ভাব ছড়িয়ে পড়ে অমিতের সারা মুখে।

এক মুহূর্ত বিরক্ত দৃষ্টিতে ভবদেবের দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর গলায় সে জবাব দেয়, আমাকে এসব কথা শোনাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

ভবদেবের মুখে হাসির রেখাটি কিন্তু তখনও স্পষ্ট। তেমনি ভঙ্গিতে সে আবার বললে, তাও তো বটে। তোমাকে এসব কথা শুনিয়ে লাভ কি?

তারপর যমুনাপ্রসাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে ভবদেব আবার বলতে থাকে, বুঝলেন শেঠজী, আমি অবশ্য তেমন সৎ অফিসার নই। তবে আমার থানার এই মেজবাবুটি কিন্তু

সত্যিকারের সৎ। আমাকে না হয় তিন হাজারে বশ করতে পারবেন; কিন্তু একে বশ করবেন কি দিয়ে? তিন হাজার তো দূরের কথা, তিনশো হাজারেও যে একে টলাতে পারবেন না। এখন তবে উপায়?

—উপায় হোবে বড়বাবু, উপায় একটা কুছু হোবেই। বলেই গুদামের দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা দোকানের কর্মচারীদের মধ্যে একজনকে কাছে ডেকে তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলতেই কর্মচারীটি ছুটে বাইরে চলে যায়।

যমুনাপ্রসাদ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত লোক দুটির দিকে তাকিয়ে আবার বললে, কিছু মনে করবেন না আপনারা। বিপদে পড়েছি। তাই পরিত্রাণের পথ খুঁজছি। আপনাদেরও হামি সন্তুষ্ট করে দেব। বুঝতেই তো পারছেন, যা' দিনকাল পড়েছে এমন সৎভাবে ব্যওসা-বাণিজ্য কোরে কোন শালাব্যওসা টিকিয়ে রাখতে পারে! বলেই আবার একটু শুষ্ক হাসি হাসে যমুনাপ্রসাদ।

লোক দু'টি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী। থানার বড়বাবুর আহ্বানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা এসেছিল। এখন এমনি একটা অবস্থায় পড়ে বিহ্বলদৃষ্টিতে কেবল পরস্পরের দিকে তারা তাকায়। বে-আইনী অর্থ লেনদেনের এমনি নগ্ন প্রকাশ দেখে সত্যিই তারা খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়েছিল অমিতও। শুধু বিস্ময় নয়, সেই সঙ্গে রাগে তার আপাদমস্তক যেন জ্বলে যাচ্ছিল। একটি কথাও উচ্চারণ না করে সে কেবল কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

একটু পরেই দোকানের সেই কর্মচারীটি ছুটে ভেতরে এসে একগোছা নোটের বাণ্ডিল তুলে দেয় যমুনাপ্রসাদের হাতে।

যমুনাপ্রসাদ নোটগুলো হাতে নিয়ে অমিতের মুখের ওপর একটা আলতো দৃষ্টি বুলিয়ে ভবদেবের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি স্যার, থানার বড়বাবু। আপনি রাজী হলে অন্য কে কি কোরতে পারে? বলেই হাত বাড়িয়ে নোটগুলো এগিয়ে দেয় ভবদেবের দিকে।

ভবদেবের মুখের নির্লিপ্ত হাসিটি মিলিয়ে যায় এতক্ষণে। কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই ভবদেব যমুনাপ্রসাদের নোট সমেত হাতটার ওপর নিজের ডান হাত দিয়ে এমন জোরে ধাক্কা দেয় যে, নোটগুলো যমুনাপ্রসাদের নিজের মুখের ওপর ছিটকে গিয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে।

এমনি একটা ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যমুনাপ্রসাদ।

ভবদেব কিন্তু কণ্ঠস্বর একটুও না চড়িয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলতে থাকে, এতক্ষণ পরীক্ষা করে দেখছিলাম আপনি কতদূর যেতে পারেন, শেঠজী! চোরাকারবারের জালে গোটা দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছেন আপনারা। আর, নিজেদের দুষ্কর্ম ঢাকবার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে আপনাদের এই টাকার টোপ। এ দিয়েই আমাদের মত লোকের কণ্ঠরোধ করে আসছেন বরাবর। কিন্তু আজ হিসেবে একটু ভুল করে ফেলেছেন শেঠজী। ষোল আনা সৎ না হলেও আমি যে অমানুষ নই, এ খবরটি বোধহয় আপনার জানা ছিল না। তাই ভেবেছিলেন, চাল-চিনির ব্ল্যাক-মার্কেট করে গোটা জেলার অধিবাসীদের অশেষ দুর্দশার মধ্যে ফেলে কেবল টাকার সাহায্যেই নিজের পরিত্রাণের পথ তৈরি করবেন।

একটু থেমে ভবদেব সেই লোক দু'টির দিকে তাকিয়ে আবার বলতে থাকে, আপনারা হয়ত জানেন না, আমাদের দেশের আইনে ঘুষ খাওয়া যেমন অপরাধ, ঘুষ দেওয়াও তেমনি

অপরাধ। আপনাদের চোখের সামনে এই মুহূর্তে যা' ঘটল তারও সাক্ষী রইলেন আপনারা। চাল-চিনির চোরা কারবার করে শেঠজী যে অপরাধ করেছে সেই সঙ্গে ঘুষ দিতে চেষ্টা করার অপরাধ যোগ হল এবার। এর অপরাধের গুরুত্বটা বাড়িয়ে তোলবার জন্যেই এতক্ষণ এই ছলনাটুকুর আশ্রয় নিতে হয়েছিল আমাকে।

এতক্ষণে লোক দু'টির চোখে-মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে ওঠে। আর, কেমন যেন একটা লজ্জার ভাব ছড়িয়ে পড়ে অমিতের সারা মুখে।

শ্রদ্ধার পাত্রকে অশ্রদ্ধার গ্লানি থেকে মুক্ত হতে দেখলে মানুষের মনে যে আনন্দের সৃষ্টি হয়, তেমনি একটা আনন্দের জোয়ারে সারাটা দিন অভুক্ত থেকেও ভবদেবের সঙ্গে একটানা কাজ করে যেতে থাকে অমিত। খাওয়ার ফুরসৎ নেই তাদের। অনেক কাজ—অনেক লেখাপড়া।

অবশেষে দিনের শেষে চোরাই চাল-চিনির পরিমাণের হিসেব-নিকেশ শেষ করে সাক্ষী-সাবুদের সই-দস্তখত নিয়ে গুদাম ঘরটায় নতুন তালা লাগিয়ে সীলমোহর করে উঠে দাঁড়ায় তারা। গুদাম ঘরে দু'জন কনস্টেবল্ পাহারায় রেখে যমুনাপ্রসাদ আগরওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে যখন তারা পুলিশ ভ্যানে এসে বসে তখন রাস্তায় লোকে লোকারণ্য।

কৌতূহলী জনতার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ভবদেব পুলিশ ড্রাইভারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে নির্দেশ দেয়।

এগিয়ে চলে পুলিশ-ভ্যান। পেছনে জনতার নানা ধরনের মন্তব্য। কেউ বলে, এতদিনে ঐ লোকটা ধরা পড়লো, এবার বাছাধন টের পাবে। কেউ বা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, আরে ছেড়ে দে ওসব কথা! টাকার জোর থাকলে এ দেশে দিনকে রাত, রাতকে দিন করা যায়, বুঝলি? মনে করেছিস বুঝি ঐ লোকটার শাস্তি হবে? মোটেই না। ওসব লোক-দেখানো ব্যাপার। কিচ্ছু হবে না ওর। পুলিশ ঘুষ খেয়ে আলবৎ ছেড়ে দেবে ওকে।

পুলিশ-ভ্যানে পাশাপাশি বসে একসময় অমিত ভবদেবের হাতে ওপর নিজের হাতটা রেখে অতি মৃদুস্বরে বললে, আমাকে মাপ করুন, বড়বাবু।

সশব্দে হেসে ওঠে ভবদেব। নিজের বাঁ-হাতটা অমিতের কাঁধের ওপর রেখে সস্নেহে শুধু জবাব দেয়, নাঃ, তোমাকে নিয়ে আরর পারা গেল না দেখছি! ভারি সেণ্টিমেণ্টাল তুমি!

॥ পনের ॥

অবশেষে দৌত্যকার্যে সফল হলাম আমি। অজিতেশবাবুর বাড়ি যেতে রাজি করালাম অমিতকে।

ঠাট্টার সুরে বললাম, তা'হলে আমিও সঙ্গ নিই তোমার, কি বলো? মানভঞ্জনের পালাটা নিজের চোখে একবার দেখে আসি, কেমন?

—বেশ তো, চলো না, উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে অমিত, সেদিন তো বললে, ওর সাথে নাকি ভালমত আলাপই করতে পারোনি। আজ চলো, ভালমত আলাপ করিয়ে দেব।

—ওরে বাবা রক্ষে করো! হেসে উঠে আমি বললাম, আলাপ করিয়ে দেবার দিন বুঝি আর পেলে না? একে তো দীর্ঘ অদর্শনে বেচারা শুধু কাহিল হয়েই বসে নেই, তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করতে বসে রয়েছে, তার ওপর আবার আমি গিয়ে পড়লে

যে ধরনের অভ্যর্থনার ঘটা শুরু হবে তা' সহ্য করার মত বুকের পাটা আমার অন্তত নেই, ভাই। তুমি যাও। গিয়ে ঘটি ঘটি ঠাণ্ডা জল ঢেলে আগে শান্ত করে এসো তাকে। তারপর না হয় একদিন দু'জনে মিলে যাওয়া যাবে।

মৃদু হেসে অমিত বললে, সেদিন বুঝি ওর তেমনি মেজাজ দেখে এলে?

সবেগে মাথা নেড়ে আমি বললাম, না—না। তেমন কিছু নয়। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও, বৎস। যতদূর জানি, এসব ব্যাপারে ওদের জয় সুনিশ্চিত। তাই একটু সাবধান করে দিচ্ছি কেবল। ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করো না। নিজের অন্যায় স্বীকার করে নিয়ে সন্ধি করতে চেষ্টা করো, বুঝলে?

—তার মানে? প্রশ্ন করে অমিত।

—মানে অতি সরল। সেই পড়োনি—মেক্ নো ডিপ্ স্ক্রুটিনি, ইনটু হার মিউটিনি...

—তার মানে, অন্যায় না করেও অন্যায় স্বীকার করতে হবে?

—হ্যাঁ, তাই হবে। এটাই নিয়ম। চিরকাল সর্বদেশে সব পুরুষের ক্ষেত্রেই তাই হয়ে এসেছে। তোমার বেলাতেও তাই হবে। লাভ্ এ্যাফেয়ার্সের এটা একটা ট্যাক্‌টিকস্। তা' সে বিয়ের আগেই হোক্ আর পরেই হোক্। এই ট্যাক্‌টিকস্ ফলো করেই সর্বকালে দুনিয়ার সব পুরুষেরা গৃহের শান্তি বজায় রেখেছে, ভাই। এমনিভাবেই ওদের জিতিয়ে দিয়ে নিজেরা জিতে এসেছে, বুঝলে?

অমিত কিন্তু তবুও আমাকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

আমি আবার বলি, কেন, একা যেতে ভয় করছে?

অমিত কোন জবাব না দিয়ে কেবল একটু হাসে।

আমি বললাম, মা ভৈঃ! একাই যাও। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে—। বলেই হো-হো শব্দে হেসে উঠি আমি।

সেদিন জরুরী কাজের ছুতোয় অমিতের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম।

সন্ধ্যার পর অমিত যখন অজিতেশ দত্তর বাড়ি এসে হাজির হয় তখন তাদের বাইরের ঘরে অজিতেশবাবুর ছেলে শংকর টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছিল। ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না।

বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে শংকর। মুখখানা অবিকল তার দিদির মত। মাথায় একমাথা কোঁকড়া চুল। কেবল গায়ের রঙটাই যা দিদির চাইতে কিছু ফর্সা।

শহরের সেরা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর সেরা ছাত্র শংকর। এ পর্যন্ত কোনদিন স্কুলের কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি। অবশ্য তার এই কৃতিত্বের প্রধান অংশটুকু একমাত্র তার দিদি স্মৃতিকণাই দাবী করতে পারে।

অমিত পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় শংকরের পেছনে। তারপর উঁকি দিয়ে শংকরের হাতের বইটা দেখে নিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে, এই বুঝি স্কুলের পড়া তৈরি হচ্ছে? টম্ কাকার কুটীর' বইটা বুঝি তোমাদের ক্লাসের পাঠ্য?

অকস্মাৎ চম্‌কে উঠে পেছনে তাকায় শংকর। অমিতকে দেখেই তার সুন্দর মুখখানা খুশির আলোয় ঝলমল করে ওঠে। অমিতের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে, একি অমিতদা!

—হ্যাঁ ভাই, শংকরের পাশে বসে পড়ে জবাব দেয় অমিত, তা' তুমি একা বসে 'টম্ কাকার কুটীর' পড়ছো?

শংকর জবাব দেয়, কি আর করি অমিতদা! দিদি বলেছে আজ রাতের মধ্যে বইটা শেষ করে তাকে মুখে মুখে গল্পটা শোনাতে হবে।

শংকরের পিঠে একখানা হাত রেখে অমিত বললে, তাই নাকি? তা' কেমন লাগছে বইটা?

—খু-উ-ব ভালো। জবাব দেয় শংকর।

—এ বইটা তো বাংলায় অনুবাদ। এর আসল বইটা আরও চমৎকার। কি নাম সেই বইটার জানো?

—না তো, কৌতূহলী ডাগর চোখদু'টো মেলে অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শংকর।

অমিত বললে, আসল বইটার নাম 'আঙ্কল্ টম্স্ কেবিন'। ইংরেজিতে লেখা। তুমি তো এখন পড়ে বুঝতে পারবে না, আরও বড় হয়ে পড়বে।

অকস্মাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় শংকর। প্রশ্ন করে, আপনি এতদিন আমাদের এখানে আসেন নি কেন, অমিতদা? রাগ করেছিলেন বুঝি?

—কে বললে তোমাকে? প্রশ্ন করে অমিত।

—সবাই তো তাই বলাবলি করে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে অমিত জবাব দেয়, না ভাই, রাগটাগ কিছু নয়। কাজের চাপ এত বেশি ছিল যে, আসতে একদম সময় পাইনি। তা' তোমরাও তো একবার আমার ওখানে গিয়ে খবর নিলে পারতে!

—কি করে যাব, বলুন? স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আপনার বাড়িতে যেতে দু'একদিন খুব ইচ্ছে করছিল। আপনার বাড়িটা তো আমি চিনি। হয়ত একদিন যেতাম। কিন্তু—

—কিন্তু কি? অমিতের কৌতূহলী প্রশ্ন।

—কিন্তু দিদি যে বারণ করে দিয়েছে। এই দেখুন, আপনাকে সত্যি কথাটা বলেই ফেললাম। আপনি যেন দিদিকে আবার একথা বলতে যাবেন না। শুনলে দিদি বকবে আমাকে।

শংকরের কথায় একটু দমে যায় অমিত। একটু সময় চুপ করে থেকে আবার বললে, না—না, একথা তাকে বলতে যাব কেন? তা' ভাই, তোমার দিদি বুঝি আমার ওপর খুব রেগে রয়েছে, তাই না?

—ভীষণ। জবাব দেয় শংকর, শুধু কি আপনার ওপর? বাড়ির সকলকেই দিদি আজকাল ভীষণ বকাঝকা করে।

—কেন?

—কি জানি! হয়ত আপনি আসেন না বলে। অসঙ্কোচে জবাব দেয় শংকর।

—সেকি, একথা কে বললে তোমাকে? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অমিত।

—কেন, বিশুর মা তো তাই বলে।

বিশুর মা এ বাড়ির বহুকালের পুরনো ঝি। অমিত বুঝতে পারে তার এখানে না আসার কারণটি এ বাড়ি ঝি-চাকরদেরও আর অজানা নেই।

ব্যাপারটা সত্যিই লজ্জার। তার এখানে না আসার জন্যে স্মৃতিকণা কেন শুধু শুধু বাড়ির সবাইকে বকাঝকা করে? কিন্তু কথাটা মনে হতেই কেমন যেন এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিও বোধ করে অমিত।

—তোমার বাবা কোথায়?

—তিনি ওপরে শুয়ে আছেন।

—এই সময় শুয়ে আছেন কেন? অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

—না, তেমন কিছু না! এমনি শরীর ভাল নেই বলেই শুয়ে আছেন।

অমিতের খুব ইচ্ছে করছিল স্মৃতিকণার কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু শংকর আবার কি মনে করবে ভেবেই সংবরণ করে নিজেকে।

কি ভেবে শংকর একসময় বললে, জানেন অমিতদা, দিদি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে। আমাকে তেমন ভালও বাসে না, আদরও করে না। দিনরাত বসে বসে কি যেন ভাবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

একটু সময় চিন্তা করে শংকর আবার বললে, আমি আর দিদি তো একই ঘরে শুই। মাঝে মাঝে বেশি রাতে জেগে উঠে দেখি দিদির খাট খালি। তাকিয়ে দেখি, জানালার গরাদ ধরে দিদি বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। এই দেখুন, আপনাকে সব কথা বলে ফেললাম। আপনি যেন এসব কথা আবার দিদিকে বলতে যাবেন না।

—না না, বলতে যাব কেন? শংকরের পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে অভয় দেয় অমিত।

—একদিন কি হয়েছে জানেন অমিতদা, শংকর সরলকণ্ঠে বলতে থাকে, স্কুল থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দেখি দিদি চুপ্‌টি করে বিছানায় শুয়ে আছে। চোখ দুটো লাল, বোধহয় শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। আমাকে কাছে ডেকে বললে—আচ্ছা, স্কুলের যাতায়াতের পথে তোর অমিতদার সঙ্গে দেখা হয় না? আমি বললুম—না। ভাবলাম, এবার বুঝি দিদি আমাকে আপনার বাড়ি যেতে বলবে। তাই আমি বললুম—একবার যাব অমিতদার ওখানে? সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধম্‌কে উঠলে দিদি। বললে—কক্ষণো নয়। আমাকে না জানিয়ে কক্ষণো তুই সেখানে যাবি না, বুঝলি? আচ্ছা বলুন তো অমিতদা, দিদি আপনার ওপর এত চটে আছে কেন?

শংকরের সহজ সরল কথায় মনের মধ্যে একটু শঙ্কামিশ্রিত তৃপ্তিবোধ করে অমিত। শংকরের এই প্রশ্নের জবাব সে জানে, কিন্তু তা' এই ছোট ছেলেটিকে বলা চলে না।

তাই একটু ভেবে সে জবাব দেয়, কি জানি ভাই? হয়ত এমনিই।

এতক্ষণে খেয়াল হয় শংকরের। ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, এই দেখুন, আপনার সঙ্গে কেবল কথাই বলে যাচ্ছি। বাড়ির কেউই এখন পর্যন্ত জানে না যে, আপনি এসেছেন। বলেই শংকর উঠে দাঁড়ায়।

—ওকি, যাচ্ছো কোথায়? প্রশ্ন করে অমিত।

—বাঃ, দিদিকে খবর দিতে হবে না?

অমিত শংকরকে বাধা দিয়ে বললে, থাক, তোমার দিদিকে খবর দিয়ে দরকার নেই। বরঞ্চ তোমার বাবাকে গিয়ে বলো।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে শংকর বললে, বাবাকে খবর দিয়ে নিচে আনাবার দরকার কি? আপনিই বরঞ্চ ওপরে চলুন না!

—বেশ, তাই চলো। অমিতও উঠে দাঁড়ায়।

খুব বেশি না হলেও বেশ কয়েকবার অমিত এ বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করেছে। এমনকি, স্মৃতিকণার ঘরে বসে দু'তিন দিন গল্পও করেছে। তাই এ বাড়ির অন্দর-মহলটা তার অপরিচিত নয়।

অজিতেশ দত্ত শুয়ে ছিলেন। শঙ্কর ঘরে ঢুকেই বলে ওঠে, দেখ বাবা কে এসেছে!

—কে? বলেই ঘাড় তুলে দরজার দিকে তাকান তিনি। তারপর অমিতের দিকে নজর পড়তেই ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো অমিত, এসো!

অমিত অজিতেশবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে একটা চেয়ারে বসতে যেতেই অজিতেশবাবু আবার বলে ওঠেন, না-না, ওখানে নয়, এই বিছানায় এসে বসো।

অমিত সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বিছানার পাশে বসতেই অজিতেশবাবু তার একটা হাত ধরে ছলছল চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, অপরাধ করেছি বলে কি বুড়োর ওপর এমনিভাবে রাগ করে থাকতে হয়?

অমিত হাসবার চেষ্টা করে সঙ্কুচিত কণ্ঠে বললে, না, ঠিক তা' নয়। ভয়ানক কাজের চাপ—

—হ্যাঁ, তাই বটে! বুড়ো হয়েছি বলে কি কিছুই আর বুঝতে পারি না মনে করো? সেদিনকার ঘটনায় সত্যিই আমি লজ্জিত। কিন্তু কি করব বলো? আমার ঐ বোনের কথাবার্তার ধরনই অমনি। ওর মুখের ভালো কথাটাও কর্কশ শোনায়।

বাধা দিয়ে অমিত বলে ওঠে, আপনি ওসব নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। যা' হবার তা' তো হয়েই গেছে। এখন শুধু শুধু মন খারাপ করে কি লাভ?

—কিন্তু বাবা, মন কি আর সব সময় যুক্তিতর্ক মেনে চলে? সেদিনকার অপমানে তুমি যতখানি ব্যথা পেয়েছো, আমি নিজেও তার চাইতে মোটেই কম ব্যথা পাইনি। তার ওপর তুমি এখানে আসা একেবারেই বন্ধ করে দিলে। মেয়েটা রইল মুখ গোমড়া করে। মাঝখান থেকে আমি বেচারা মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে বাড়ির মধ্যে একা পড়ে থাকি। সেই থেকে মেয়েটা তো চণ্ডিকা রূপ নিয়েছে। কাছে বসে যে দু'দণ্ড কথা কইবে, তাও না। দিনরাত কেবল খেটে মরছে, আর একে ধম্‌কাচ্ছে, ওকে চোখ রাঙাচ্ছে।

—কেন, স্মৃতি আর কলেজে যায় না? প্রশ্ন করে অমিত।

—হ্যাঁ যায়, তবে মাঝে মাঝে। প্রায়ই তো শুনি শরীর খারাপ। একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বলতে থাকেন, তোমার সেই বন্ধুটি কিন্তু চমৎকার ছেলে। সেদিন এখানে এসে অনেকক্ষণ গল্প করে গেল আমার সঙ্গে। কি যেন নাম তার?

—তরুণ—তরুণ ঘোষ। জবাব দেয় অমিত।

—হ্যাঁ, তরুণ ঘোষ। বেশ ছেলেটি। এখানকার কলেজের নাকি লেকচারার।

—হ্যাঁ, তা'ছাড়া সাংবাদিকতাও করে।

—ঠিক ঠিক। সেই কথাই বলেছিল বটে।

একটু সময় চুপ করে থেকে অমিত আবার বললে, আপনাদের এই শহরে আমার বন্ধু বলতে ঐ একটি। তা' তরুণও আগামী মাসেই বাইরে চলে যাচ্ছে।

—বাইরে? কোথায়? প্রশ্ন করে অজিতেশবাবু।

—সাংবাদিকতার একটি বৃত্তি নিয়ে লণ্ডন যাচ্ছে। অমিত জবাব দেয়।

—কতদিন থাকবে সেখানে?

—প্রায় মাস ছ'য়েক।

—ভাল ভাল, মন্তব্য করেন অজিতেশবাবু, এমনি বুদ্ধিমান ছেলেরাই জীবনে উন্নতি করে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে অমিত আবার বললে, কিন্তু আমার হয়েছে মুশকিল!

—কিসের মুশকিল? অজিতেশবাবু প্রশ্ন করেন।

—ভাবছি, এই ছ'টা মাস আমার কি করে কাটবে! তরুণ কাছে থাকবে না, একথা যেন আমি ঠিক ভাবতেই পারি না।

অজিতেশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, তোমার তো বদলীর চাকরি—আজ এখানে, কাল ওখানে। এখান থেকে যেদিন বদলী হয়ে যাবে সেদিন কেমন করে থাকবে?

অমিত আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

একটু পরে অজিতেশবাবু আবার বললেন, স্মৃতির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মুখ না তুলে কেবল ঘাড় নাড়ে অমিত।

—তা'হলে মাকে একবার ডেকে দিই। বলেই অজিতেশবাবু স্মৃতিকণাকে ডাকতে গিয়েই কি ভেবে আবার থেমে যান। তারপর বললেন, থাক, ডাকার দরকার নেই। মা বোধহয় তার নিজের ঘরেই রয়েছে। তুমিই বরঞ্চ সেখানে যাও। আমিও এবার উঠি। ঠাকুরঘরের কাজটুকু সেরে আসি।

শংকর অনেক আগেই সেখানে থেকে চলে গিয়ে নিচে বসবার ঘরে তার 'টম কাকার কুটীর'-এর মধ্যে ডুবেছিল। তবে, যাবার আগে দিদিকে অমিতের আসার খবরটা দিতে ভোলেনি।

অমিত নিঃশব্দে স্মৃতিকণার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

বাড়ির পুরনো ঝি বিশুর মা বোধহয় কোন কাজে ওই ঘরের দিকেই আসছিল। দরজার কাছে অমিতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ায়। তারপর মুখ টিপে একটু হেসে ফিরে যায়।

ঘরের মধ্যে দরজার দিকে পেছন ফিরে পড়ার টেবিলের সামনে বসে ছিল স্মৃতিকণা। টেবিলের ওপর একখানা খোলা বই। সে ঝুঁকে বসেছিল সামনের দিকে। তবে, তার চোখদু'টো ঠিক বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ ছিল কিনা বলা কঠিন। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর অমিতের আসার খবর পেয়েও ইকনমিক্সের দুরূহ তত্ত্বের মধ্যে সে ডুবে যেতে পেরেছিল কিনা তা একমাত্র সে নিজেই জানে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্মৃতিকণার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অমিত। তার চুলের খোঁপাটি ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের ওপর। গোটাকয়েক চক্চকে রুপোর চুলের কাঁটা সেই খোঁপার ভাঙনকে ঠেকাতে না পেরে মাথা উঁচু করে অসহায় ভাবে ঝুলে রয়েছে চুলের সঙ্গে। চুলের কালো ফিতের একাংশ বেরিয়ে রয়েছে একপাশে। খয়েরী রঙের শাড়ির আঁচলটা আলতোভাবে পড়ে রয়েছে বাঁ-কাঁধের ওপর। অনাবৃত ঘাড়ের কাছে ডানদিকে একটি চক্চকে কালো তিল। গলার সরু চেনের একাংশ বেরিয়ে রয়েছে ডান কাঁধের কাছে, আর বাকি অংশ হারিয়ে গেছে চুলের রাশির মধ্যে।

স্থির চোখে খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থাকে অমিত। সেই মুহূর্তে তার কালিদাসের তন্বী শ্যামার কথা মনে পড়েছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

স্মৃতিকণা চেয়ারের ওপর একটু নড়েচড়ে বসতেই যেন সম্বিৎ ফিরে পায় অমিত। এমনিভাবে চুরি করে নারীর রূপ-সুধা পান করার মধ্যে তৃপ্তি থাকলেও ব্যাপারটা যে দৃষ্টিকটু সেটা যেন সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে।

এবার কথা বললে অমিত। বললে, ভেতরে আসতে পারি?

এমনি একটি কণ্ঠস্বরের অপেক্ষাতেই যেন স্মৃতিকণা বসে ছিল এতক্ষণ। অমিত লক্ষ্য করে তার কথার সঙ্গেই দেহটা কেঁপে ওঠে একবার। কিন্তু সেটুকু কেবল মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই শাড়ির আচলটা গায়ে জড়িয়ে সামান্য একটু গাড় ফিরিয়ে শীতলকণ্ঠে সে জবাব দেয়, আসুন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে অমিত। স্মৃতিকণার সামনে এসে দাঁড়াতেই সে মুখ তুলে অমিতের দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নিচু করে আবার বইয়ের পাতায় মন দেয়।

একটু সময় চুপ করে থেকে অমিত বললে, বসতে বোধহয় বলবে না? কথাটা বলেই অমিত তার সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে পাশের চেয়ারে বসতে যেতেই স্মৃতিকণা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, বসুন।

চেয়ারে বসে অমিত আবার বললে, আর বোধহয় মাত্র দু'টো কথা তুমি বলবে।

মুখে কোন প্রশ্ন না করে স্মৃতিকণা কেবল আড়চোখে একবার অমিতের দিকে তাকিয়েই চোখদু'টো সরিয়ে নেয়।

বলতে থাকে অমিত, প্রথমে বললে, আসুন, তারপর বললে বসুন। এবার বোধহয় বলবে, চা খান। তারপরই বলবে, বাড়ি ফিরে যান। তাই তো?

বইয়ের পাতার দিকে মুখ রেখে জবাব দেয় স্মৃতিকণা, তা বললেই যদি সন্তুষ্ট হন, তো তাই বলব।

অমিত বুঝতে পারে, আবহাওয়া বিশেষ ভাল নয়। কিন্তু কিভাবে যে কথা শুরু করবে তাই বুঝতে না পেরে চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকে।

স্মৃতিকণাও চুপ করে থাকে। সেই মুহূর্তে নিদারুণ অভিমান জ্বালায় মনটা উদ্বেল হয়ে উঠেছে তার। পুঞ্জীভূত সেই অভিমান-জ্বালা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজলেও পথের হদিশ না পেয়ে মনটাকে কেবল ভারি করে তোলে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকে। স্মৃতিকণার মনে হয়, এমনিভাবে চুপ করে থাকাটা বড়ই বিসদৃশ ব্যাপার। শত হলেও অমিত তাদের বাড়িতে এসেছে। যেচেই এসেছে। এমনিভাবে চুপ করে থেকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়াটা সত্যিই দৃষ্টিকটু।

তাই সে আবার মুখ তুলে তাকায় অমিতের দিকে। তারপর একটু হাসতে চেষ্টা করে শান্তকণ্ঠে বললে, এতদিন পরে পথভুলে এলেন নাকি?

অমিত সহজকণ্ঠে জবাব দেয়, না, পথভুলে নয়। আমরা সহসা পথ ভুল করি না। যখন যেখানেই যাই, পথ চিনেই যাই।

—তা' হয়ত যান, কেবল লোক চিনে মেলামেশাটাই করতে পারেন না। তেমনি শান্তসুরে বললে স্মৃতিকণা।

অমিত জবাব দেয়, না, তাও পারি। তবে তারা যখন অহেতুক আমাদের ভুল বোঝে তখন খুব কষ্ট হয়। দুঃখ হয় তাদের মরে দীনতা দেখে।

কণ্ঠস্বরে শ্লেষের সুর ফুটিয়ে তুলে স্মৃতিকণা বললে, আর সেই দুঃখে আপনারা এতই কাতর হয়ে পড়েন যে, তখন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতেও আপনাদের বিবেকে বাধে না—এটাই বোধহয় আপনাদে পুলিশ-চরিত্রের বিশেষত্ব।

স্মৃতিকণার কথার খোঁচাটুকু কিন্তু নির্ব্বিবাদে হজম করে অমিত। কেবল মৃদু হেসে হাল্কা সুরে সে বললে, বাঃ, এর মধ্যেই যে তুমি পুলিশ-চরিত্র সম্পর্কে রীতিমত একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছো!

একথার কোন জবাব না দিয়ে স্মৃতিকণা বইয়ের খোলা পাতাটা নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করতে থাকে।

অমিত এবার অপেক্ষাকৃত গম্ভীর গলায় বললে, দেখ স্মৃতি, বিচার যখন করবে তখন দু'তরফের কথা চিন্তা করেই করবে। সেদিন রাতে তোমার সেই পিসিমা আমাকে যে অপমান করেছিলেন, তাতে তোমরা তখন আমার কাছ থেকে কি আশা করেছিলে, বলতে পারো?

—হ্যাঁ, পারি। মুখ না তুলেই জবাব দেয় স্মৃতিকণা, তবে কাউকে কিছু না বলে চোরের মত পালিয়ে গিয়ে পিসিমার অভিযোগকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই আশা করিনি।

—তার মানে, তার পরেও তোমাদের এখানে বসে হেসে গল্পগুজব করা উচিত ছিল আমার? গলায় উষ্মার ভাব প্রকাশ পায় অমিতের।

সামান্য একটু মুখ টিপে হেসে স্মৃতিকণা জবাব দেয়, না, অতখানি মনের জোর যে আপনার নেই তা' আমি জানি। মিথ্যাকে হেসে উড়িয়ে দিতে হলে মনের যে শক্তির প্রয়োজন, আপনার মধ্যে সেই শক্তির যে একান্তই অভাব কেবল সেই কথাই সেদিন অমনিভাবে পালিয়ে গিয়ে প্রমাণ করেছিলেন।

—তা'হলে, সেদিন তোমার পিসিমার সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করলেই তুমি খুশি হতে?

স্মৃতিকণা মুখ তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে অমিতের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ, তাই হতাম। তাঁর মনগড়া বানানো অভিযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারলেই খুশি হতাম আমি।

বিস্মিতকণ্ঠে অমিত বললে, সে কি! তোমাদের বাড়িতে বসে তোমাদেরই একজন আত্মীয়র সঙ্গে ঝগড়া? বিশেষত, তিনি যখন একজন স্ত্রীলোক?

—কেন, কি হয়েছে তাতে? অপবাদ যে দেয় সে স্ত্রী হোক আর পুরুষই হোক প্রয়োজনে তার সঙ্গে ঝগড়াও করতে হবে বৈকি! বাবা বরাবরের শান্ত মানুষ। ঝগড়া-তর্ক করত তিনি জানেন না। বাকি রইলাম আমি। আমার পক্ষে ঐ সময় পিসিমার সঙ্গে তর্ক করা কি শোভন হত?

স্মৃতিকণা বরাবরই একটু জেদী প্রকৃতির। কিন্তু সে যে তাকে এতদূর এগিয়ে যেতে বলবে, তা' ঠিক বুঝতে পারেনি অমিত। তা'ছাড়া সেদিন তার ওভাবে এখান থেকে চলে যাবার অর্থ যে স্মৃতির সেই পিসিমার অভিযোগ প্রকারান্তরে সমর্থন করা, তাও সেই মুহূর্তে তার মাথায় আসেনি। তাই স্মৃতিকণা যখন তাকে চোখে আঙুল দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল তখন সে মনে মনে একটু লজ্জিতই হয়।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অমিত বললে, যাক, যা' হবার তা' হয়ে গেছে। ও নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো।

—না, যা' হবার তা' মোটেই হয়নি।

—তার মানে? থতমত খেয়ে প্রশ্ন করে অমিত।

—মানে অতি সহজ। সমস্ত দোষ আমার বাবার ঘাড়ে চাপিয়ে কেন তাঁকে এতদিন কষ্ট দিয়েছেন আপনি? ঘাড় বেঁকিয়ে যেন কৈফিয়ৎ তলব করে স্মৃতিকণা।

—ও, এই কথা? তার এই ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে অমিত। তারপর হাল্কা সুরে জবাব দেয়, তোমার বাবার সঙ্গে আজ কথা বলে আমার তো ধারণা হয়েছে যে, তাঁর ঘাড়ে আমি দোষ চাপিয়েছি কি চাপাইনি, সেটা তাঁর কাছে মোটেই বড় কথা নয়, তোমাদের এখানে আমার এতদিনের অনুপস্থিতিই তাকে কষ্ট দিয়েছে বেশী। কারণ, তিনি আমাকে সত্যিই ভালবাসেন!

তেমনিভাবেই স্মৃতিকণা আবার বললে, ও একই কথা হল। মোট কথা আপনার জন্যেই তিনি কষ্ট পেয়েছেন।

এবার একটু দুষ্টুমি ভরা সুরে অমিত বললে, কষ্ট কি শুধু তিনি একাই পেয়েছেন?

অকস্মাৎ স্মৃতিকণার গালদু'টো লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। একটা ঢোক গিলে সে জবাব দেয়, তা'ছাড়া আর কে কষ্ট পেতে যাবে? তবে হ্যাঁ, খোকাটাও হয়ত কিছু কষ্ট পেয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে সে আপনার ওখানে যেতে চাইত।

—তবে যায়নি কেন?

—আমি যেতে দিইনি। তা'ছাড়া যেচে যাওয়ার প্রয়োজনটাই বা কি ছিল, শুনি?

—কিন্তু, আমি যে আজ যেচে তোমাদের এখানে এসেছি!

—আপনার মহানুভবতা! জবাব দিয়েই একটু অতিরিক্ত গম্ভীর হতে চেষ্টা করে স্মৃতিকণা।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোমার বাবা আর শংকর ছাড়া আর কেউই কষ্ট পায়নি বলতে চাও? কথাটা বলেই মৃদু হাসতে থাকে অমিত।

সরলতার ভান করে স্মৃতিকণা বললে, আর কে কষ্ট পাবে? ও,—আমার কথা বলছেন? বলেই কণ্ঠস্বরে একটা নির্লিপ্ততার সুর ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে আবার বললে, আমি শুধু শুধু কষ্ট পেতে যাব কেন?

—ও, তাই বুঝি? কৌতুকের সুরে বলতে থাকে অমিত, তবে কেন কলেজে যাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়ে রাতদিন বাড়িতে বসে চোখদু'টো কেবল জবাফুলের মত লাল করে রাখতে?

—সে বুঝি আপনার জন্যে? কথাটা বলে ফেলেই কিন্তু একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে স্মৃতিকণা। অমিত এর কি জবাব দেবে তা' তার অজানা নয়।

হলও ঠিক তাই। অমিত সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, তবে কার জন্যে? আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে বলে তো শুনিনি।

—আপনি ভারি অসভ্য হয়ে উঠেছেন। মেয়েদের সঙ্গে কি রকম কথা বলতে হয় তা' আপনি জানেন না।

অমিত হেসে বললে, তা' হয়ত জানি না। তবে তোমার সঙ্গে কিরকম কথা বলতে হয় তা' নিশ্চয়ই জানি। বলেই অমিত তার একটা হাত স্মৃতিকণার প্রসারিত হাতের ওপর রাখে

জীবনে এই প্রথম পুরুষ হাতের স্পর্শ। সমস্ত দেহের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের চমক লাগে। একটা অনাস্বাদিত আনন্দের তীব্র আবেশে দেহমন অসাড় হয়ে ওঠে স্মৃতিকণার কঠিন আত্মশাসনের বাঁধ ভেঙে পড়তে চায় সেই মুহূর্তে।

উঠে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা। পালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পালাবে কেমন করে? অমিত যে তখনও তার হাতটা ধরে রেখেছে!

নিজের হাতটাকে টেনে নিতে চেষ্টা করে স্মৃতিকণা মৃদু কম্পিত গলায় বললে, ছাড়ুন, আপনার চা নিয়ে আসি।

হাতটা ছেড়ে দেবার পরিবর্তে তার হাতে আরও একটু চাপ দিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে অমিত বলে ওঠে, না, কিছুতেই ছাড়ব না। আমার কথার জবাব না দিয়ে কিছুতেই যেতে পারবেনা তুমি

স্মৃতিকণা তার আয়ত চোখদু'টি মেলে তাকিয়ে থাকে অমিতের দিকে। অমিত বললে, যদি তুমি সত্যি সত্যিই আমাকে ভালোবেসে থাকো তবে তোমার মুখে এখনও কেন এ

আপনি? এই শব্দটি কেমন যেন একটু দূরের বলে মনে হয় না? এর চাইতে তুমি শব্দটি কত বেশি মিষ্টি—কত বেশি কাছের!

—দূরের মধ্যে থেকে কাছে পাওয়ার আনন্দ যে আরও বেশি। মৃদুকণ্ঠে কথাটা বলেই কিন্তু আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না স্মৃতিকণা। নিজের হাতটা টেনে নিয়ে ছুটে পালায় সেখান থেকে।

তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে অমিত কেবল বসে বসে শুনতে থাকে উদ্দীপিত হৃদয়াবেগের স্পর্শে বেজে ওঠা হৃদয়-তন্ত্রীর মন মাতানো অনুরাগের সেই সুর, যে সুরের ছন্দ মানুষের মনে সৃষ্টি করে এক ব্যঞ্জনাময় অপার্থিব আত্মসুরভিত অনুভূতি।

কোতোয়ালী থানার ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জির খবর সংগ্রহের সূত্র যে কত বিচিত্র ধরনের তার পুরো হিসেব বোধহয় সে নিজে ছাড়া আর কেউই জানে না। এই থানায় জয়েন্ করার কিছুদিন পরেই কথাটা অমিত একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ধূর্জটিকে। বলেছিল, আচ্ছা ধূর্জটিবাবু, আমাদের বড়বাবু এলাকার এত খবর জোগাড় করেন কি করে?

জবাবে ধূর্জটি বলেছিল, আশ্চর্য ক্ষমতা এই ভদ্রলোকটির। আমরা সারা এলাকাটা চষে বেড়িয়ে যতটুকু খবর জোগাড় করতে পারি, বড়বাবু কোথাও না গিয়ে কেবল থানায় বসে বসেই তার চেয়ে ঢের বেশি খবর জোগাড় করে ফেলেন। এই থানা এলাকার প্রত্যেকটি ক্রিমিন্যাল্ই কেবল নয়, প্রত্যেকটি সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাড়ি-নক্ষত্র পর্যন্ত বড়বাবুর মুখস্ত।

—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি, এ কি করে সম্ভব? প্রশ্ন করেছিল অমিত।

ধূর্জটি জবাব দিয়েছিল, আসলে ওঁর সোর্স প্রকিওর করবার ক্ষমতা অসাধারণ। শুনেছি, উনি যখন যে থানায় চাকরি করেছেন, সেখানেই গুটিকয়েক করে দামী সোর্স তৈরি করেছেন। এই সোর্সের মাধ্যমেই তিনি এলাকার যাবতীয় খবর সংগ্রহ করতেন।

—তা সোর্স তো অনেকেই সংগ্রহ করতে পারে। এই ধরুন না কেন আপনার নিজেরও তো নিশ্চয়ই দু'একটি সোর্স আছে।

—ওখানেই তো মজা, মেজবাবু। জবাব দিয়েছিল ধূর্জটি, সোর্স তো অনেকেই সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু কি ধরনের সোর্সের কাছ থেকে কোন ধরনের খাঁটি খবরটি মিলবে সেটি বুঝে সোর্স তৈরি করাটাই তো বাহাদুরী। পুলিশ সোর্সের মধ্যে এমন ধরনের অনেকে আছে যারা কেবল পয়সার জন্যেই হা-করে বসে থাকে। খবর সংগ্রহের বেলা ঢু-ঢু। আর যা'ও বা খবর দেয় তার অধিকাংশই একেবারেই বাজে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের বড়বাবুর সোর্সগুলোর প্রত্যেকটি খবর অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তাই বলছিলাম, খাঁটি সোর্স প্রকিওর করবার মধ্যেই পুলিশ অফিসারের বাহাদুরী। ওঁর সোর্সের মধ্যে পানের দোকানদার থেকে শুরু করে প্রষ্টিটিউট্, রিক্সাওয়ালা, ঝাঁকামুটে পর্যন্ত রয়েছে। সেদিন শুনে তো আমি অবাক। বাসষ্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন যে বুড়ো লোকটা ভিক্ষে করে সে নাকি বড়বাবুরই একটি দামী সোর্স, ওর মাধ্যমে বড়বাবু নাকি অনেক খবর জোগাড় করেন।

সেদিন থানায় বসে বড়বাবুর তেমনি একটি সোর্সের দেখা পাওয়া গেল। আসলে, স্ত্রীলোকটি যে বড়বাবুর সোর্স তা' অমিত বুঝতেই পারে নি প্রথমে।

ভদ্র চেহারা, গায়ে দামী গহনা, পরনে লাল চওড়াপাড়ের শাড়ি, মুখে একগাল পান। স্ত্রীলোকটি রিক্সা থেকে নেমে সোজা থানায় ঢুকে প্রহরী কনস্টেবলকে বড়বাবুর কথা

জিজ্ঞেস করলে। বড়বাবু তার ঘরে রয়েছে শুনে সে আর কাউকে কিছু না বলে সোজা ঢুকে গেল ভেতরে।

মিনিট দশেক পরে স্ত্রীলোকটি বড়বাবুর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই ওপাশের টেবিলে বসে কাজ করতে করতে ধূর্জটি অমিতকে ডেকে মৃদুকণ্ঠে বললে, ঐ মেয়েছেলেটি কে জানেন, মেজবাবু?

নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিল অমিত। স্ত্রীলোকটির বড়বাবুর ঘরে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়া সে লক্ষ্য করলেও তার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু খুঁজে পায়নি। থানার বড়বাবুর ঘরে এমন কত লোকই তো হামেশা যাতায়াত করছে।

ধূর্জটির কথায় ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে অমিত তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকায়।

ধূর্জটি বললে, এটি এই শহরের একজন বিখ্যাত প্রষ্টিটিউট্—বড়বাবুর সোর্স।

—তাই নাকি! বলেই আবার নিজের কাজে মন দেয় অমিত।

ধূর্জটি কিন্তু আবার বলে ওঠে, নিশ্চয়ই কোন দামী খবর দিয়ে গেল বড়বাবুকে। আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি কোন খবর না থাকলে এই স্ত্রীলোকটি সহসা থানায় আসে না।

ধূর্জটির অনুমান যে মিথ্যে নয় তা' বোঝা গেল ঘণ্টা দু'য়েক পরেই।

থানায় উপস্থিত সমস্ত অফিসারদের ডাক পড়ল বড়বাবুর ঘরে। সবাই এসে উপস্থিত হতেই ভবদেব বললে, আজ রাত একটা নাগাদ একটা রেইডে যেতে হবে। জনাদশেক কনস্টেবল চাই। থানায় বোধহয় এত একষ্ট্রা কনস্টেবল্ পাওয়া যাবে না। একটু থেমে ভবদেব পিনাকীর দিকে তাকিয়ে আবার বললে, আপনি ফাঁড়িতে তেওয়ারী হাবিলদারকে একটা ফোন করে দিন। নাইট-রাউণ্ডের কিছু কনস্টেবল উইথড্র করে রাত বারোটা নাগাদ যেন লাঠিধারী এক-ছয় ফোর্স থানায় পাঠায়। আর থানা থেকে চারজন আর্মড্ কনস্টেবলের ব্যবস্থা করুন।

পুলিশের দৈনন্দিন কাজে এমন কতকগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় যার অর্থ নিজেদের লোক ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। এই যেমন—'এক-ছয়' ফোর্স-এর অর্থ, একজন হাবিলদার আর ছ'জন কনস্টেবল্।

পিনাকী মাথা নেড়ে সায় দিতেই ভবদেব তাকেই আবার প্রশ্ন করে, তা' আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন, পিনাকীবাবু?

সারা মুখে একটা অনিচ্ছার ভাব ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয় পিনাকী, যদি বলেন তো যেতেই হবে।

—থাক, ইচ্ছে না থাকলে যাবার প্রয়োজন নেই। মৃদু হেসে ভবদেব বললে।

ভবদেবের কথা শেষ হতে না হতেই উচিত বক্তা ধূর্জটি হঠাৎ বলে ওঠে, তা' এসব ঝঞ্ঝাটে যেতে আমাদের পিনাকীবাবুর কবেই বা ইচ্ছে হয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে আগুন হয়ে ওঠে পিনাকী। ধূর্জটির দিকে কটমট চোখে তাকিয়ে বললে, আপনার কি মশাই? আমি যাই বা না যাই তাতে আপনার কি? আপনি বলবার কে? সেপাই থেকে ঘষে ঘষে তো দারোগা হয়েছেন, তাতেই এত মাতব্বরি?

—আর আপনি বুঝি সেপাই থেকে দারোগা হননি, পিনাকীবাবু? ডাইরেক্ট দারোগাতে ভর্তি হয়েছিলেন বুঝি? তেমনি শ্লেষের সুরে জবাব দেয় ধূর্জটি।

—তা' হলেও আপনার মত এমন মাতব্বরির স্বভাব নেই আমার, বুঝলেন মশাই?

ভবদেব ও অন্য সকলে এদের বাক্-যুদ্ধ উপভোগ করছিল এতক্ষণ। ধুর্জটির ফোড়ান-কাটা স্বভাবের জন্যে মাঝে মধ্যেই পিনাকীর সঙ্গে তার তর্ক বেধে যেত, আর সকলে তা' উপভোগ করত। থানার নিরস-কঠিন জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ আর কি!

কিন্তু ব্যাপারটাকে আর বেশিদূর গড়াতে দেয় না ভবদেব। ধুর্জটিকে মৃদু ধমক দিয়ে সে বলে ওঠে, আপনিও বা পিনাকীবাবুর সঙ্গে শুধু শুধু লাগতে যান কেন, ধুর্জটিবাবু?

—দেখুন তো স্যর, ওঁর স্বভাবটা একবার দেখুন! আপনার সামনে দাঁড়িয়েই কেমন তড়পাচ্ছেন। উনি যদি কোনদিন আমার ও-সি হন, সেদিন তো হাতে মাথা কাটবেন আমার। অনুযোগের সুরে বললে পিনাকী।

ধুর্জটি আর কিছু না বলে অমিতের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। পিনাকীর অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল অমিতেরও। কিন্তু হাসি সংবরণ করে সে কেবল অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

আবার কাজের কথায় আসে ভবদেব। বললে, আজ রাতে থানায় নাইট ডিউটি কার?

জবাব দেয় ধুর্জটি, আমার।

—তা'হলে তো আপনারও আমার সঙ্গে রেইডে যাওয়া চলবে না।

এসব কাজে ধুর্জটির উৎসাহ প্রচুর। তাই সে আবার বললে, তা' আপনি যদি আজকের নাইট ডিউটি অন্য কাউকে দেবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে—কথাটা অসমাপ্ত রেখেই ধুর্জটি একবার এমনভাবে আড়চোখে পিনাকীর দিকে তাকায়, যাব একমাত্র অর্থ হল, পিনাকীবাবুই তাহলে নাইট ডিউটি করুন।

একটু সময় চিন্তা করে ভবদেব জুনিয়র এ. এস. আই. সুশান্তর দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি তো কাল নাইট ডিউটি করেছো। আবার আজ নাইট ডিউটি দিলে বৌমা তো আমার মুণ্ডুপাত করবে, তাই না সুশান্ত?

লজ্জিত মুখে মৃদু হেসে সুশান্ত মাথা নিচু করে, আর অন্য সকলেই হেসে ওঠে। কেবল হাসতে পারে না বিপত্নীক ধুর্জটি। হাসির বদলে একটা বেদনার ছাড়া পড়ে তার সারা মুখে।

ভবদেব এবার সিনিয়র এ. এস. আই. শ্রীপতির দিকে তাকিয়ে বললে, বুড়ো মানুষ বলে আপনাকে তো নাইট ডিউটি থেকে রেহাই দিয়েছি, শ্রীপতিবাবু। আপনি বরঞ্চ আজ রাতটা একটু কষ্ট করে নাইট ডিউটিটা করে দিন, কেমন? পিনাকীবাবু তো এখনও থানা ডিউটিতে রয়েছেন। ওঁকে দিয়ে আবার নাইট ডিউটি করালে ওঁর খুব কষ্ট হবে।

মাথা নেড়ে সায় দেয় শ্রীপতি মিত্র।

বড়বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায় অমিত। হাতে এখনও প্রচুর কাজ। এর মধ্যেই সময় করে এক ফাঁকে বাসায় গিয়ে দু'টো খেয়ে আসতে হবে। তারপর রাত একটা নাগাদ বেরোতে হবে রেইডে। কিন্তু কিসের রেইড, কোথায় রেইড কিছুই আঁচ করতে পারে না সে। বড়বাবুও কিছু বললে না। আবার নিজে থেকে না বললে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাও চলে না। হয়ত ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।

অমিতের কাছে এগিয়ে এসে ধুর্জটি বললে, কিসের রেইড বুঝতে পেরেছেন, মেজবাবু?

—না তো! জবাব দেয় অমিত, আপনি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?

—নাঃ। তবে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।

—কেন? প্রশ্ন করে অমিত, গ্যাম্বলিং রেইডও তো হতে পারে। হয়ত কোন ইম্পর্টেন্ট জুয়োর আড্ডায় হানা দিতে হবে।

ধুর্জটি আবার বললে, না মেজবাবু, মোটেই তা' নয়। আমার মনে হচ্ছে সেই স্ত্রীলোকটি বোধহয় কোন খবর দিয়ে গেছে। আর সেই খবরের ওপর নির্ভর করেই এই রেইড। ব্যাপারটা সহজ নয় বললাম এই জন্যে যে, সাধারণ গ্যাম্বলিং রেইড হলে বড়বাবু নিজে যেতেন না। তা'ছাড়া সাধারণ গ্যাম্বলিং রেইডে বন্দুকধারী সেপাইয়ের প্রয়োজন কি?

—তা' বটে। মাথা নেড়ে সায় দেয় অমিত। তারপর 'দেখা যাক' বলেই নিজের কাজের মধ্যে আবার ডুবে যায়।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে জনশূন্য রাস্তায় ছুটে চলেছে পুলিশ-ভ্যান। পুলিশ ড্রাইভার ছাড়া মাত্র চৌদ্দজন আরোহী। তিনজন অফিসার, একজন হাবিলদার ও দশজন কনস্টেবল্। অফিসার তিনজনের কোমরে গুলি-ভর্তি রিভলবার।

পুলিশ-ভ্যানে উঠবার আগে ভবদেব অমিত ও ধুর্জটিকে বলেছে সব কথা। বলেছে, একটা বিপজ্জনক কাজে যেতে হচ্ছে আমাদের। বটতলার বস্তি অঞ্চলে একটা বোমা তৈরির আড্ডার খবর পাওয়া গেছে। শহরের কয়েকটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক সেখানে বোমা-পটকা তৈরি করে। একটা ছোটখাটো কারখানা আর কি। শহরের এখানে ওখানে যত বোমা ফাটে, সেগুলো সবই ওখানকার তৈরি। গোটাকয়েক ডাকাতদলের সঙ্গেও নাকি ওদের সংশ্রব রয়েছে। ডাকাতি কবতে গিয়ে তারা যেসব বোমা পটকা ব্যবহার করে সেগুলো নাকি এই কারখানা থেকেই সাপ্লাই হয়। আমি অবশ্য কিছুদিন ধরেই এধরনের একটা ব্যাপার সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু ঠিক জায়গাটা খুঁজে পাইনি। আজই সঠিক খবর পেলাম। বস্তা-ভর্তি প্রচুর তাজা বোমা নাকি মজুত রয়েছে সেখানে।

একটু থেমে ভবদেব আবার সতর্ক করে দিয়েছে তাদের। বলেছে, খুব সাবধানে আমাদের কাজ করতে হবে। যদিও আমাদের সঙ্গে গুলি, বন্দুক রয়েছে, তবুও এগুলো যাতে ব্যবহার করতে না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

—কেন? প্রশ্ন করেছিল অমিত।

জবাবে ভবদেব বলেছিল, বলা তো যায় না, যদি সত্যি সত্যিই সেখানে বস্তা-ভর্তি' তাজা বোমা থাকে, আর কোনক্রমে আমাদের ছোঁড়া গুলি যদি একটি গিয়ে তার ওপর পড়ে, তবে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো? সবগুলো বোমা ফেটে একটা লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে যে! গোটা বস্তিটাই হয়ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

নামে বটতলা হলেও কোন বটগাছের অস্তিত্বই চোখে পড়ে না সেখানে। হয়ত এককালে তেমন একটা কিছু ছিল, তাই ঐ নাম।

বড় রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়ায় পুলিশ-ভ্যান। ইঞ্জিন বন্ধ করে ড্রাইভার। গাড়িটা একবার একটু জোরে শব্দ করে উঠেই থেমে যায়। দপ্ করে নিভে যায় সামনের হেডলাইট। অন্ধকারে আবার ঢেকে যায় চারিদিক। রাস্তার মিটমিটে অল্প পাওয়ারের আলো যেন সেই অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

অন্ধকারে ছায়ার মত পুলিশ-ভ্যান থেকে একে একে নেমে আসে সকলে। বস্তিতে প্রবেশের মুখে ভবদেব চাপাকণ্ঠে সবাইকে শেষ নির্দেশ দেয়। তারপর প্রায় নিঃশব্দে বস্তির গলির মুখে প্রবেশ করে পুলিশ বাহিনী।

রাত প্রায় দেড়টা। নিথর নিস্তব্ধ সারা বস্তি অঞ্চলটা। গোটাকয়েক কুকুর ছাড়া আর কোন প্রাণী জেগে নেই। এত রাতে এতগুলো লোকের পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে তারা ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

এই একটা বিপদ। রাস্তার কুকুর নিয়ে পুলিশের বিপদ বরাবর। এরা যেমন একদিকে চোর তাড়িয়ে গৃহস্থকে সজাগ রেখে পুলিশকে পরোক্ষে সাহায্য করে, তেমনি আবার এদের জ্বালায় গভীর রাতে পুলিশের পক্ষে গোপনে কোন কাজ করার উপায় নেই। তাদের উপস্থিতি সাড়ম্বরে ঘোষণা করবেই এরা। চেন-রিঅ্যাকশানের মত একটা কুকুর ডেকে উঠলেই গোটা অঞ্চলের কুকুরগুলো একই সাথে পরিত্রাহি চিৎকার করতে থাকবে।

তাদের সাড়া পেয়ে একটি একটি করে সেই বস্তির সব কুকুরগুলোই একযোগে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে। আর সেই চিৎকার অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে চলে নিরুপায় পুলিশ বাহিনী।

বস্তির একেবারে শেষপ্রান্তে সেই বাড়িটা। জরাজীর্ণ তার চেহারা। এককালে হযত বস্তির মালিক থাকত এই বাড়িতে একটু স্বতন্ত্রভাবে। গোটা বস্তি এলাকাটাই ছিল তার রাজত্ব। দোর্দণ্ডপ্রতাপে একহাতে হয়ত সে বিলোত দাক্ষিণ্য, আর অন্য হাতে চালাত খেয়ালখুশি মত অত্যাচার সেই বস্তির অসহায় নিঃস্ব মানুষগুলোর ওপর।

কিন্তু দিনকাল পাল্টেছে। খেয়ালমাফিক কাজ করার দিন আর নেই। এখন ইট ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতে হয়। তাই সময়মত অন্যত্র সরে গেছে সে। বস্তির সঙ্গে এখন মাত্র একটি দিনের সম্পর্ক, যেদিন তাকে ভাড়া আদায় করতে আসতে হয়।

কাঁচা নর্দমার তীব্র গন্ধের সাথে ডাস্টবিনের আবর্জনা স্তূপের পচা গন্ধ মিশে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। নারকেল গাছের গুড়ি কেটে কালভার্ট তৈরি হয়েছে নর্দমার ওপর। পুলিশ বাহিনী অতি সন্তর্পণে সেই কালভার্টের ওপর দিয়ে একে একে এসে দাঁড়ায় সেই জীর্ণ বাড়িটার সামনে।

ভবদেবের নির্দেশে কনস্টেবলরা ঘিরে দাঁড়ায় বাড়িটাকে। হাতের লাঠি শক্ত করে চেপে ধরে অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে তারা নাটকের শেষ অঙ্কের অপেক্ষায়। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যে কোন মুহূর্তে একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে যেতে পারে সেই সাংঘাতিক ক্রিমিন্যালদের সাথে। বিপদে পড়ে তারাও নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কইবে না। লড়তে চাইবে তারা—লড়ে জিততে চাইবে। কেবল শক্তির লড়াই-ই নয়, বুদ্ধির লড়াইও বটে।

বাড়িটার বন্ধ দরজা-জানালার ফাঁকে একটু অস্পষ্ট আলোর আভাস। বোধহয় বাসিন্দারা এখনও জেগে আছে। এই গভীর রাতে নিশ্চয়ই কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা জেগে নেই। সম্ভবত কারখানার কাজ এখন পুরোদমে চলছে।

বেড়ালের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে বন্ধ দরজায় উঁকি দেয় ভবদেব। নাঃ, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে তার ইনফর্মেশন্ খাঁটি। নইলে, এ্যাসিড ও বারুদের গন্ধ নাকে লাগবে কেন? ভেতরে কারিগররা বোধহয় তন্ময় হয়ে নিজেদের কাজ করে চলেছে।

ভবদেব ফিসফিস করে অমিতকে বললে, বাড়ির পেছনের দরজায় হাবিলদার রয়েছে, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দেয় অমিত।

ভবদেব আবার বললে, এপাশ থেকে তাড়া খেয়ে ব্যাটারা ঐ দরজা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করতে পারে। তুমিও বরঞ্চ যাও ওপাশে। খুব সতর্ক থেকো। আমি আর ধূর্জটিবাবু এদিকটা সামলাচ্ছি।

অমিত আর কিছু না বলে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারের মধ্যে।

একটি মুহূর্ত। ভবদেব ও ধূর্জটি এগিয়ে যায় বন্ধ দরজার সামনে। তারপর ভবদেব গম্ভীরকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, ভেতরে কে আছো, দরজা খোল।

কোন সাড়াশব্দ নেই।

ভবদেব আবার গলা চড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করে নিজের কথা।

এবারও কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

এবার ধূর্জটি চিৎকার করে ওঠে, দরজা খোল, নইলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবো।

তবুও কোন সাড়াশব্দ নেই ভেতরে। এমনকি কোন লোকের চলাফেরার শব্দ কিম্বা দৌড়ে পালাবার কোন হুটোপুটির শব্দও শোনা যায় না।

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ভবদেবের। একমুহূর্ত চিন্তা করে সে। তারপর বন্ধ দরজার ওপর সামান্য একটু চাপ দিতেই ভেজানো দরজা আপনিই খুলে যায়।

ঘর ফাঁকা। গোটা কয়েক এ্যাসিডের বোতল উল্টে রয়েছে মেঝেয়। সারা ঘরে গন্ধক ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যের পাউডারের সঙ্গে ছেঁড়া কাগজ ও পাটের টুকরো। একখানা ছোট তক্তপোষের এককোণে গোটাতিনেক বলের মত বস্তু পড়ে রয়েছে। ঘরের মেঝেয় প্রচুর কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে একটা পুরানো হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে।

একটা নৈরাশ্যের ছায়া নেমে আসে ভবদেবের মুখের ওপর। ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণকণ্ঠে সে বলে ওঠে, আনসাক্‌সেসফুল রেইড ধূর্জটিবাবু, চিড়িয়া ভাগ গিয়া।

—তাই তো মনে হচ্ছে, বড়বাবু। জবাব দেয় ধূর্জটি, ব্যাটারা আগেভাগেই খবর পেয়ে পালিয়েছে।

—হ্যাঁ, তবে বেশিক্ষণ আগে পালায়নি। মাত্র দু'চার মিনিট আগেই মালপত্তর নিয়ে সরে পড়েছে।

—কি করে বুঝলেন? পেছন থেকে প্রশ্ন করে অমিত। এদের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে সে এসে হাজির হয়েছিল সেখানে।

ঘাড় ফিরিয়ে অমিতের দিকে তাকিয়ে ভবদেব বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, ব্যাটারা যে একটু আগেই পালিয়েছে তা' বুঝতে পারা তেমন কষ্টকর নয়। ঐ দেখ, হ্যারিকেন লণ্ঠনটা কেমন কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। যাবার সময় ওরা আমাদের চোখে ধুলো দিতে ঐটা জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিল। বেশিক্ষণ আগে পালিয়ে গেলে এতক্ষণে কাঁচে প্রচুর কালি জমে যেত।

ধূর্জটির অবস্থা অনেকটা রেসের ঘোড়ার মত। রেসের মাঠে নামিয়ে তাকে দৌড়তে না দিয়ে লাগাম টেনে রাখলে তার যেমন অবস্থা হয়, ধূর্জটির অবস্থাও অনেকটা ঐরকম। বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেই তার আনন্দ। একটা সাংঘাতিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়তেই এতক্ষণ সে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন পানসে হয়ে গেল। পর্বতের মুষিক প্রসবের মত এক মুহূর্তেই জল হয়ে গেল সব। মালপত্রসমেত পালিয়ে গেল লোকগুলো।

মাটিতে জুতো ঠুকে অধৈর্য কণ্ঠে ধূর্জটি বলে ওঠে, বুঝলেন বড়বাবু, আমার মনে হচ্ছে ঐ কুকুরগুলোর জন্যেই ব্যাটারা পালিয়ে যেতে পেরেছে। তারপর ঘরের মধ্যে একবার দৃষ্টিপাত করে আবার বললে, ঐ তক্তপোষের ওপর গোটাকয়েক বোমা পড়ে রয়েছে এখনও। তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে বোধহয়। খুঁজলে হয়ত আরও কিছু পাওয়া যেতে পারে। চলুন একবার ভেতরে যাই। কথাটা শেষ করেই ভবদেবের সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে পা দেয় ধূর্জটি।

পেছন থেকে ভবদেব ধূর্জটিকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই চৌকাঠ ডিঙিয়ে দরজার সামনে পেতে রাখা নোংরা পাপোষটার ওপর ধূর্জটির পায়ের চাপ পড়তেই একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল।

কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই একটা প্রচণ্ড কর্ণ-বিদারী শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল ঠিক দরজার সামনেই। একঝলক তীব্র আলো। তারপরই ঘোর অন্ধকার।

সঙ্গে সঙ্গে ভবদেব একটা হ্যাচকা টানে ধূর্জটিকে পেছন দিকে টেনে এনেই চিৎকার করে ওঠে, বুবি ট্র্যাপ—বুবি ট্র্যাপ!

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় চারিদিক। হতচকিত পুলিশবাহিনী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তীব্র বিস্ফোরণে দরজার পাল্লাসমেত চৌকাঠটা সশব্দে ভেঙে পড়ে মেঝেয়। দপ্ করে নিভে যায় হ্যারিকেন লণ্ঠনটা।

ভবদেব সেই মুহূর্তে ধূর্জটিকে টেনে না নিয়ে এলে এতক্ষণে ঐ ভারী দরজার পাল্লায় চাপা পড়ে দেহটা গুঁড়িয়ে যেত তার। আর বোমার টুকরোগুলো তার দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিত।

বিস্ফোরণের শব্দে গোটা বস্তিটা জেগে উঠেছে ততক্ষণে। লোকজনের হৈ-চৈ, দৌড়াদৌড়ি, চিৎকারে মুখরিত হয়ে ওঠে সমস্ত অঞ্চলটা। বরাত ভাল, পাকাবাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছিল বলে বস্তির অন্য কোন ঘরে আগুন লাগেনি। অবশেষে, দমকলের সহায়তায় যখন সেই আগুন নেবানো হল, তখন সেই আধপোড়া বাড়ির মধ্যে পোড়া জিনিসপত্রের টুকরো ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

জবর খবর! কাকের মুখে সংবাদ পায় সাংবাদিকরা। শেষ রাতেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেই বস্তিতে। গিয়ে দেখি, সব শেষ তখন। দমকল ও পুলিশবাহিনী ফিরে গেছে। কেবল বস্তির মধ্যে এখানে-ওখানে দলে দলে লোক বসে জটলা করছে। যতটুকু সম্ভব খবর সংগ্রহ করে আবার আমি ছুটলাম থানার দিকে।

শেষরাতের থানার সেই শান্ত ভাবটি আজ আর নেই। সেন্ট্রি কনস্টেবল্ তার বন্দুকের ওপর ভর দিয়ে ঝিমানোর পরিবর্তে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে সতেজে দেউড়িতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। ডিউটি অফিসার বৃদ্ধ শ্রীপতিবাবু টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমানোর বদলে বড়বাবুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের আলোচনা শুনছে। এমনকি, শেষ রাতে খবর পেয়ে একটা লুঙ্গির ওপর জামা পরে জুনিয়ার এ. এস. আই. সুশান্তও এসে দাঁড়িয়েছে বড়বাবুর ঘরের সামনে। অফিসারদের মধ্যে একমাত্র অনুপস্থিত পিনাকী।

ঘরের মধ্যে ভবদেব ছাড়া আর ছিল অমিত ও ধূর্জটি। টেলিফোনে জেলার উচ্চপদস্থ অফিসারদের সমস্ত খবর জানিয়ে রিসিভারটা রেখে দিয়ে ভবদেব তাকায় ধূর্জটির দিকে। তারপর তিরস্কারের সুরে বললে, ছি, ধূর্জটিবাবু, এমন গোয়ার্তুমি করতে হয়। ধীরে-সুস্থে ভাবনা-চিন্তা না করে ওসব জায়গায় অমনি হুট্ করে ঢুকে পড়তে আছে? বলুন তো, ঠিক সময় আপনাকে টেনে না নিয়ে এলে কি কাণ্ড আজ ঘটত!

ধূর্জটি মাথা তুলে অমিতের দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হেসে ভবদেবকে বললে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি বড়বাবু। ব্যাটারা যে পালিয়ে যাবার আগে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে ঐরকম ফাঁদ পেতে রেখেছিল তা' ঠিক ধারণা করিনি। তারপর কণ্ঠস্বরে একটু বিষাদের সুর ফুটিয়ে তুলে আবার বললে, তা' ভালই হত। ল্যাঠা চুকে যেত তা'হলে।

শান্তকণ্ঠে এবার অমিত বলে ওঠে, তা' তো বটেই। বেঘোরে প্রাণ দিয়ে আপনি তো পার পেয়ে যেতেন। কেবল যত দায়িত্ব তখন এসে পড়ত আমাদের ওপর। মুশকিলে পড়তে হত বড়বাবুকে।

ভবদেব বললে, অমিত ঠিকই বলেছে। এমন বেঘোরে প্রাণ দিয়ে কি লাভ হত, ধুর্জটিবাবু।

ধুর্জটি আর কোন জবাব দেয় না। কেবল ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। সেই মুহূর্তে হয়ত তার মনে পড়েছিল ছোট্ট টুটুনের কথা। হয়ত সেই সঙ্গে সরমার কথাও মনে পড়েছিল। তার স্ত্রী সরমা, যার স্মৃতি ধুর্জটির বুকের মধ্যে এখনও অম্লান, যার কথা চিন্তা করে এখনও সে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেয়। ছোট্ট টুটুনকে বুকে চেপে ধরে যার স্মৃতি ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারে নি ধুর্জটি।

আমি ঘরে ঢুকতেই ভবদেব আমাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করে বললে, এই যে সংবাদ-প্রভাকর, এসে গেছো। সত্যিই তুমি একজন পাকা সাংবাদিক। তা' সত্যি করে বলো তো, এই শেষরাতে এখানে ছুটে এসেছো খবর সংগ্রহের আশায়, না বন্ধুর কুশল-সংবাদ নেবার জন্যে? কথাটা বলেই অমিতের দিকে তাকিয়ে সে হেসে ওঠে।

একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে আমিও হেসে জবাব দিই, দু'টোর জন্যেই।

—ভাল, ভাল। বলতে থাকে ভবদেব, তোমার বন্ধুটি তো ঐ বহাল তবিয়তেই বসে রয়েছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের মত নির্বান্ধবদের খবরও একটু নিয়ে রাখ। আমি ও ধুর্জটিবাবুও অক্ষতই আছি। কনস্টেবলরাও কেউ আহত হয়নি।

ভবদেবের কথা শেষ হবার আগেই অমিত আমার দিকে তাকিয়ে বললে, তবে আজ বড়বাবু না থাকলে ধুর্জটিবাবুকে এখানে এভাবে দেখতে পেতে না।

—কেন? প্রশ্ন করি আমি।

ভবদেবের মুখে ঘটনার বিবরণ জেনে নিয়ে সাংবাদিক সুলভ কৌতূহলে আমি আবার প্রশ্ন করি, এই বুবি ট্র্যাপ বস্তুটি কি, বড়বাবু?

—সোজা কথায় বলা চলে, আমাদের মারার ফাঁদ বিশেষ। জবাব দেয় ভবদেব। তারপর আবার বলতে থাকে, এসব বোমা-পটকা তৈরির কারখানার কারিগরেরা আমাদের জন্যে এই ধরনের ফাঁদ পেতে রাখে। ওই পাপোষটার নিচেই তারা দু'টো ইংলকট্রিক তার এমনভাবে ব্যাটারীর সাহায্যে লাগিয়ে রেখেছিল যে, পাপোষটার ওপর সামান্য একটু চাপ পড়তেই সেই বোমা বার্স্ট করে। তাই এসব জায়গায় ঢুকতে হলে কিম্বা ঘরের কোন বস্তু নাড়াচাড়া করতে হলে খুব সতর্ক হয়ে করা উচিত, নইলে বিপদ অনিবার্য।

একসময় আমি আবার মন্তব্য করি, সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার! বস্তির মধ্যে এরকম একটা বোমা তৈরির কারখানা চালু রয়েছে, আর বস্তির লোকেরা তা' টের পায়নি এতদিন?

জবাব দেয় ভবদেব, কে বললে টের পায়নি? টের পেয়েছে নিশ্চয়ই। তবে জীবনহানির আশঙ্কায় মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। তা'ছাড়া কিছু লোকের পরোক্ষ সমর্থনও থাকতে পারে।

তারপর একটু থেমে ভবদেব আবার বলতে থাকে, আসল ব্যাপারটা কি জানো, সংবাদ-প্রভাকর। আমাদের দেশের এখন যে হাল হয়েছে তাতে সৎ নাগরিকেরা সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপ মনে মনে পছন্দ না করলেও মুখ ফুটে বলতে পারে না। সে সাহস নেই তাদের। অবশ্য এর জন্যে আমরাও অনেকাংশে দায়ী। সবক্ষেত্রে সময়মত তাদের রক্ষা করতে পারি

না বলেই কথা শুনেও না শোনার ভান করে কানে তুলো গুঁজে রাখে। শুধু এসব ছোটখাটো ব্যাপারে কেন, বড় বড় ব্যাপারেও একথা সমান প্রযোজ্য।

টাটকা খবরের বোঝা নিয়ে যখন কোতোয়ালী থানা থেকে বেরিয়ে আসি তখন থানার পেটা ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে ছ'টা বাজে। এখন আমার অনেক কাজ। এই খবর এখনই পাঠাতে হবে কলকাতার পত্রিকা অফিসে। আগামীকাল কাগজের পাতায় ছাপা হবে এই সংবাদ।

মানুষের নেশা অনেকসময় পেশায় পরিণত হয়। আপনারও কি তাই হবে নাকি, তরুণবাবু? প্রশ্নটা করেছিলেন আমারই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।

জবাবে একটু হেসে বলেছিলাম, তা' তো এখনও বলতে পারছি না, স্যার। তবে হলে অখুশি তো হবোই না, বরঞ্চ খুশিই হবো।

ছ' মাসের ছুটির জন্যে দরবার করতে গিয়েছিলাম প্রিন্সিপ্যালের কাছে। কলেজ কমিটির তিনি একজন মেম্বার। তিনি যাতে একটু চেষ্টা করে কমিটিকে দিয়ে আমার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দেন সেইজন্যেই তাঁর কাছে এই দরবার।

প্রিন্সিপ্যাল ভদ্রলোকটি সত্যিই ভাল। বিদেশী সরকারের বৃত্তি নিয়ে সাংবাদিকতার শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ছ'মাসের জন্যে আমার বিলেত যাবার খবরে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ভবিষ্যতে কলেজের লেক্‌চারারের কাজ ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতাকেই আমি পেশা বলে গ্রহণ করব কিনা।

ভদ্রলোক চেষ্টাও করেছিলেন, এবং প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই কলেজকমিটি বিনে মাইনেতে আমাকে ছ'মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছিল। অবশ্য, ইচ্ছে করলে কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েও আমি চলে যেতে পারতাম। কিন্তু ফিরে এসে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে যাতে না পড়তে হয় সেইজন্যেই এই ছুটির ব্যবস্থা।

সেদিন দমদম বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় জানাতে আমার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকেই এসে হাজির হয়েছিল। এসেছিল অমিতও। সাদা প্যান্টের ওপর হাল্কা রঙের টেরিলিনের হাওয়াই সার্টে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল অমিতকে। আমার পরনে সেদিন নিখুঁত সাহেবী পোশাক।

প্লেনে ওঠার আগে গুরুজনদের প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে অমিতের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমি। ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, চলি তা'হলে।

মনের আসল ভাবটি গোপন করে জোর করে মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে অমিত জবাব দেয়, এস।

তারপর বাঁ হাতে আমার নেক্‌টাইটা একটু নেড়ে দিয়ে আবার বললে, বিদেশে গিয়ে কত বিদেশী বন্ধু জুটে যাবে তোমার, তখন এই স্বদেশী বন্ধুদের কি আর মনে থাকবে?

জবাবে আমি বললাম, বিদেশী বন্ধু জুটে গেলেও তোমাদের কথা নিশ্চয়ই মন থাকবে। কিন্তু তার বদলে বিদেশী বান্ধবী জুটে গেলে তোমাদের কথা মনে থাকবে কিনা, বলতে পারি না ভাই! বলেই হেসে উঠি। অমিতও হাসে।

আমি আবার বললাম, মনে থাকে যেন, মাসে অন্ততঃ দু'টো করে চিঠি চাই। অবশ্য আমার কাছ থেকেও তুমি নিয়মিত চিঠি পাবে। আর তোমার চিঠিতে অন্য খবরের সাথে ঐ

ভদ্রমহিলার খবরও যেন থাকে। দেখো, এর মধ্যে যেন আবার গোঁয়ার্তুমি করে স্মৃতিকে বিস্মৃতির অন্তরালে পাঠাতে চেষ্টা করো না।

কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসে অমিত।

আমি আবার বললাম, অবশ্য সেবারের মত কিছু হবার সম্ভাবনাও আর নেই। একেবারে অক্টোপাশের বাঁধনে বাঁধা পড়েছো তুমি। তবে আমি দেশে ফিরে আসার আগে যে শুভকাজটি হবে না এইটুকুই যা' আমার ভরসা, কি বলো?

অমিত আমাকে একটা মিষ্টি ধমক দিয়ে বলে ওঠে, ওসব বাজে কথা এবার রাখো। যা' বলে দিয়েছি তা' যেন মনে থাকে। বিলেতের বিশেষ করে কণ্টিনেণ্টের পুলিশী-ব্যবস্থার ফার্ষ্ট-হ্যাণ্ড খবর আমি চাই, বুঝলে?

—আচ্ছা, মনে থাকবে।

প্লেনে জানালার কাছেই আমার সীট। সাদা ধব্‌ধবে ঢাকনায় মোড়া গদিআঁটা আসনে বসে আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আমার আত্মীয়স্বজনদের দিকে। গর্জে ওঠে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন। সচল হয়ে ওঠে প্রপেলারগুলো। ধীরে ধীরে সেই অতিকায় হাওয়াই জাহাজ এগিয়ে যেতে থাকে রানওয়ের দিকে।

রুমাল নেড়ে বিদায় সংবর্ধনা জানায় আত্মীয়স্বজনরা। অমিত কিন্তু রুমাল নাড়ে না। স্থির দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়ে থাকে আমার জানালার দিকে।

সেইমুহূর্তে সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে ওঠে আমার। বেদনা অনুভব করি আত্মীয়স্বজনদের জন্যে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে অমিতের জন্যে। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অমিত রায়—পুলিশ সাব্-ইন্সপেক্টর অমিত রায়—খাকি পোশাকের আড়ালে একটি দরদী মনের অধিকারী অমিত রায়। খাঁটি সোনা—খাদহীন এমন সোনা এযুগে তেমন সুলভ নয়।

সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে সেই অতিকায় বায়ুযান আমাকে নিয়ে চলল পশ্চিমদিকে।

॥ ষোল ॥

আমার ছ'মাস প্রবাস জীবনের মধ্যে আমি গোটা দশেক চিঠি দিয়েছিলাম অমিতকে। প্রতি চিঠির মধ্যেই থাকত সে দেশের নাগরিক চরিত্রের কথা, সে দেশের সমাজ জীবনের কথা, সে দেশের পুলিশের কথা।

বিলেতের মেট্রোপলিটান পুলিশের কথা বলতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম—সত্যি ভাই অমিত, একটা দেশের পুলিশ বাহিনী সেই দেশের সমাজ জীবনের কত বড় সম্পদ তা এই মেট্রোপলিটান পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপ না দেখলে হয়ত ঠিক বুঝতে পারতাম না। পুলিশের সম্মান এদেশে প্রচুর। সত্যিকারের সৎ নাগরিকরা এদেশের পুলিশকে তাদের সমাজ জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মনে করে। এদেশের পুলিশের কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বজ্ঞানও খুব বেশি। সোজা কথায়, তাদের কাজকর্ম দেখলে তোমার মনে হবে এরা কেবল নিজেদের দেশকেই ভালবাসে না, দেশের প্রতিটি লোককেও এরা ভালবাসে। তেমনি দেশের লোকেরও অগাধ বিশ্বাস পুলিশের ওপর। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি এদেশের

পুলিশের ধৈর্য দেখে। এদের সহনশীলতা অবিশ্বাস্য। একবার একটি ট্যাক্সিচালক মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। আমাদের দেশের মত এদেশেও মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি চালানো অপরাধ। একজন ট্রাফিক পুলিশ দেখতে পেয়ে ট্যাক্সিশুদ্ধ আটক করে তাকে। ট্যাক্সিচালক খাপ্পা হয়ে ওঠে পুলিশের ওপর। গাড়ি থেকে টলতে টলতে নেমে এসে ট্রাফিক পুলিশটিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে তার মুখের ওপর থুতু ছিটিয়ে দেয়। ভাবতে পারো অমিত ব্যাপারখানা? আমাদের দেশ হলে সেই ট্যাক্সিচালকের পিঠের চামড়া আস্ত থাকত না। ট্র্যাফিক পুলিশটি কিন্তু কিছুই বললে না। পকেট থেকে রুমাল বের করে থুতু মুছে ফেলে গম্ভীরকণ্ঠে শুধু বললে, চল, তোমাকে হেড্-কোয়ার্টারে যেতে হবে। ট্যাক্সিশুদ্ধ চালককে নিয়ে হেড্-কোয়ার্টারে এসে কেস্ লেখায় সে।

পরের দিন কোর্টে দু' পাউণ্ড জরিমানা দিয়ে সেই ট্যাক্সিচালক নিজে থেকেই পুলিশ হেড্-কোয়ার্টারে এসে হাজির হয়। তারপর খোঁজ করে জানতে পারে যে সেই ট্রাফিক পুলিশটি সেদিন অন্য কোথাও ডিউটি করছে। খুঁজে খুঁজে ট্র্যাফিক পুলিশটির কাছে গিয়ে তার মুখে থুতু দেবার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বুঝলে অমিত, একেই বলে ব্রিটিশ চরিত্র। এদের রক্ষণশীল সমাজে মানুষের সম্মানের দাম অনেক। এ ঘটনাটা এখানে আমার একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক বন্ধুর মুখে শুনেছি। হয়ত ঘটনাটা কিছু অতিরঞ্জিত। আমার মত একজন বিদেশীর চোখে জাতীয় চরিত্রকে বড় করে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে হয়ত সে কিছু বাড়িয়েই বলেছে। কিন্তু নিজের চোখে দেখে-শুনে আমার মনে হয়েছে, এমন ঘটনা এদেশে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে মনে করো না, এদেশের পুলিশ খুবই সুখে আছে। স্কুলে থেকে বেরিয়ে এসে দলবদ্ধ ছেলেমেয়েরা শুধু শুধু পুলিশকে টিট্‌কারি দেয়—এ দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা। এদেশেও জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের মারামারি হয়। কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় পুলিশের হাতে নির্দোষ নাগরিক মার খেয়েছে—এ ব্যাপার যেমন এদেশে অসম্ভব নয়, তেমনি ক্রুদ্ধ জনতার হাতে পুলিশের নিগৃহীত হবার ঘটনাও বিরল নয়। তবুও বলব, এদেশের লোকের কাছে পুলিশের সম্মান আমাদের দেশের চাইতে অনেক বেশি। আমার মনে হয়, এর সবচেয়ে বড় কারণ হল এদের জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেখানে জনসাধারণের চরিত্রই শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সেই জনসাধারণেরই একটি বিশেষ অংশ পুলিশ বাহিনীর চরিত্রে শৃঙ্খলাবোধের অভাব ঘটবে কেন?

আবার আর একটা চিঠিতে আমি লিখেছিলাম অমিতকে—বুঝলে অমিত, ছুটি-ছাঁটার সমস্ত কন্টিনেণ্টটা আমি ট্যুর করেছি। ইওরোপের অন্যান্য দেশের পুলিশের হাল কিন্তু লণ্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশের মত নয়। তারা কিন্তু ওদের মত অত সৎ কিম্বা কর্তব্যপরায়ণ নয়। উৎকোচে বশীভূত করতেও বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয় না তাদের। সব দেখে-শুনে আমার কি মনে হয়েছে জানো? মন হয়েছে, একটা দেশের পুলিশের চরিত্র সেই দেশের জাতীয় চরিত্রের একখানি সুন্দর আয়না। জাতীয় চরিত্র যেমনি হবে, পুলিশ চরিত্রও হবে ঠিক সেই অনুপাতে, কারণ গোটা পুলিশ বাহিনী জনসাধারণেরই একটা বিশেষ অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত বিলেতে থাকা কালে ওদেশের পুলিশ সম্পর্কে যতটুকু পেরেছি খবর দিয়েছি অমিতকে।

অমিতও অবশ্য কথা রেখেছিল। নানা কাজের ঝামেলায় ব্যস্ত থেকেও সর্বমোট আট-ন'খানা চিঠি দিয়েছিল আমাকে। সেই চিঠির মধ্যে তার নিজের কথা থাকত কম। স্মৃতিকণার.

কথা তো আরও কম। কেবল তার কাজের কথা, বিভিন্ন কেসের তদন্তের কথা থাকত তার মধ্যে। আর কিছু কিছু থাকত তার নিজের ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণার কথা।

একবার অমিত আমাকে লিখেছিল—জানো তরুণ, মনুষ্য-চরিত্র বিশেষ করে নারী-চরিত্র যে কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে সে সম্পর্কে হয়ত তেমন কোন ধারণাই আমার হত না, যদি না আমি এই ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতে আসতাম। কিছুদিন আগে তেমনি একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। আসল ঘটনার সূত্রপাত এই মহিলাকে কেন্দ্র করেই।

তুমি বোধহয় আমাদের দেশের একটি অদ্ভুত আইনের কথা জানো না। আইনের সেই ধারাটি অদ্ভুত হলেও নিরর্থক নয়। সমাজের মঙ্গলের জন্যেই এই ধারাটির সৃষ্টি। তুমি বোধহয় জানো, কোন দণ্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠিত না হলেও কেবলমাত্র তার চেষ্টা করাও দণ্ডনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন একটি আইনের ধারা রয়েছে যাতে অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে সেটা দণ্ডীয় নয়, কিন্তু তার চেষ্টা করা দণ্ডনীয়। ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। এই ধারাটি হচ্ছে ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো নয় ধারা—অর্থাৎ আত্মহত্যার প্রচেষ্টা।.আমাদের দেশে আত্মহত্যা করা কোন অপরাধ নয়। কিন্তু আত্মহত্যার প্রচেষ্টা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধে মানুষের একবছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের এই তিনশো নয় ধারাটির কথা মনে পড়লেই কেন যেন আমার হাসি পায়। আইন করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার কি হাস্যকর প্রচেষ্টা! এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে সেটা দণ্ডনীয় নয় এই জন্যে যে, তাতে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হয়। তা' যখন সম্ভব নয় তখন অপরাধ অনুষ্ঠিত হলে অর্থাৎ আত্মহত্যা সংঘটিত হলে, তা' দণ্ডনীয় নয়।

একদিন রাতে তেমনি একটি লোককে ধরে এনে থানায় হাজির করলো দু'জন কনস্টেবল্। রাস্তায় ডিউটি ছিল তাদের। গঙ্গার পাড়ে একটা জটলা দেখে এগিয়ে যায় তারা। গিয়ে দেখে এই ব্যক্তিটি নাকি গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গার জলে ডুবে মরতে চেষ্টা করেছিল। কিছু লোক দেখতে পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাঁচিয়েছে। এই নিয়ে তাদের সঙ্গে লোকটির বচসা বেঁধে যায়। লোকটি বলে, আমি আত্মহত্যা করব তো আপনাদের কি? আমার ইচ্ছে আমি মরব, আপনারা আমাকে বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছেন কেন?

যাইহোক্, ভিড় বেড়ে যায় দেখে কনস্টেবলরা তাকে থানায় ধরে নিয়ে আসে। ভদ্রলোকের ছেলে। সুন্দর চেহারা। বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মত। পরনে ভিজে পাজামা-পাঞ্জাবি।

থানা ডিউটি ছিল আমার। নাম জিজ্ঞেস করতেই বললে, সুপ্রকাশ মুখার্জী। প্রথমে ঠিকানা বলতে চায় না। অবশেষে এই শহরেরই একটা ঠিকানা বললে।

প্রশ্ন করলাম, আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন?

মাথা নেড়ে সায় দেয় সুপ্রকাশ।

আবার আমি প্রশ্ন করি, কেন?

সুপ্রকাশ আর কোন জবাব দেয় না। অনেক জেরা করেও তার মুখ থেকে আর একটি কথাও বের করা গেল না। কেবল একবার মাত্র আমার মুখের দিকে বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, জলে ডুবে মরতে চেষ্টা করা কি অপরাধ নাকি?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছিলাম।

—যদি মরে যেতাম তো কি করতেন আপনারা?

—কিছুই না।

সুপ্রকাশকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে ফার্স্ট ইন্‌ফরমেশন রিপোর্টের বইটা টেনে নিয়ে তিনশো নয় ধারায় একটি মামলা রুজু করে দিলাম তার বিরুদ্ধে। তারপর খবর পাঠালাম তার বাড়িতে। সুপ্রকাশ সেই যে মুখ নিচু করে চেয়ারে বসে রইল, আর একবারও মুখ তুলল না।

ঘণ্টাখানেক পরে একজন মহিলা এসে হাজির হল থানায়। বছর আটাশ-উনত্রিশের মত বয়স। সুন্দরী। খুব পরিপাটী সাজগোজ তার। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। বাঁ-হাতের কব্জিতে বাঁধা একটি সুদৃশ্য হাতঘড়ি।

পরিচয় পেলাম মহিলাটির। সে এই সুপ্রকাশের স্ত্রী বন্দনা মুখার্জী। কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নি এই মহিলাটিই এই বিয়োগান্ত নাটকের আসল কারণ।

বন্দনা এগিয়ে এসে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ বেঁকিয়ে বলে ওঠে, ছি—ছি! শেষে তুমি সুইসাইড্ করতে চেষ্টা করেছিলে? শুনে যে লজ্জায় এখনই আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে! এরপর আমি আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? তোমার একটু লজ্জাও হল না? এমনিভাবে সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিয়ে তোমার কি লাভ হল, শুনি?

বন্দনার কথায় এতটুকু সান্ত্বনা কিম্বা সহানুভূতির স্পর্শ নেই। কোন উদ্বেগ কিম্বা উৎকণ্ঠার চিহ্নও নেই তার মুখে। তার যেন সমস্ত দুশ্চিন্তা কেবল নিজেকে নিয়ে। এই ব্যাপারের পর সে তার আত্মীয়স্বজনের কাছে কেমন করে মুখ দেখাবে সেটাই যেন তার একমাত্র চিন্তার বিষয়। স্বামীর মঙ্গল-অমঙ্গল নিয়ে যেন কোন মাথাব্যথাই নেই তার।

সত্যিই ব্যাপারটা খারাপ লাগছিল আমার। নিশ্চয়ই কোন কারণে জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল সুপ্রকাশ। কিন্তু তাই বলে তার স্ত্রীর এ ধরনের সহানুভূতিহীন কথাবার্তা কেন?

মনের বিরক্তি গোপন করে আমি বন্দনাকে জিজ্ঞেস করি, কি কারণে আপনার স্বামী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বলতে পারেন?

হটাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে বন্দনা। সুপ্রকাশের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আর জিজ্ঞেস করবেন না সে-সব কথা। বিয়ের বদলে বাবা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। কি ভাগ্য করেই সংসারে এসেছিলাম! নইলে, এমন লোকের হাতে পড়তে হয়?

বন্দনা থামতেই আমি আবার বললাম, আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও পাইনি।

—কেন, ও আপনাকে কিছু বলেনি? কথাটা বলেই সুপ্রকাশকে দেখিয়ে দেয় সে।

আমি বললাম, না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ স্বামীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে বন্দনা। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, কি করে বলবে, বলুন? কি করে নিজের মুখে নিজের কীর্তি-কাহিনীর কথা প্রকাশ করবে? সত্যি বলতে কি, এক একসময় আমার নিজেরই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। এমনিভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণও অনেক ভাল।

বন্দনা থামে। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

বন্দনা আবার বললে, অফিসের টাকা ভেঙে এতদিন সংসার চালাচ্ছিলেন বাবু। এবার ধরা পড়েছেন। করেন তো কেরানীগিরি। সেটুকুও এবার যাবে। সেই দুঃখেই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, বুঝলেন?

বুঝলাম। খুব ভালমতই বুঝলাম আমি। অফিসের টাকা ভেঙে সংসার চালানোর অপরাধে অপরাধীর স্ত্রীর মুখ থেকে যদি এই ধরনের কথা বেরিয়ে আসে, তবে সেই হতভাগ্য স্বামীর পক্ষে যে আত্মহত্যা করতে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকে না তা' সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

একটু থেমে বন্দনা আবার বললে, ওকে বোধহয় আপনারা আটকে রাখবেন?

আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, তাই রাখব। তবে জামিনে ছেড়ে দিতেও পারি।

—ওরে বাবা, শুনেছি জামিনে ছাড়িয়ে নিতে নাকি উকিল ফি বাবদ অনেক পয়সা লাগে! অত পয়সা এখন খরচ করব কোত্থেকে? ভ্রু-ভঙ্গি করে বলে ওঠে বন্দনা।

বন্দনার কথায় আমি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। কোন স্ত্রী যে এমনি ধরনের কথা উচ্চারণ করতে পারে তা' ছিল আমার ধারণার অতীত। বিরক্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, স্বামীর চাইতে যদি পয়সাটাই আপনার কাছে বড় হয়ে থাকে, তবে ওঁকে ছাড়িয়ে নেবার প্রয়োজন নেই। উনি রাতটা হাজতেই কাটাবেন।

আমার কথায় এবার যেন একটু লজ্জা পায় বন্দনা। মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। বলছিলাম যে, জামিনে ছাড়িয়ে নেবার মত পয়সা যে আমার হাতে এখন নেই!

—ও, তাই নাকি? বলতে থাকি আমি, শুনেছি হিন্দু রমণীরা নাকি স্বামীর জন্যে সবকিছুই করতে পারে। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সামান্য সোনাদানা তাদের কাছে নাকি কিছুই নয়। কথাটা বলেই বন্দনার গলার দিকে আমি তাকাই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আঁৎকে ওঠে বন্দনা। বাঁ-হাতে নিজের গলার চওড়া হারগাছা স্পর্শ করে বলে ওঠে, বলছেন কি? ওর জন্যে আমার বাবার দেওয়া এই হারটা খোয়াব আমি?

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকি আমি। তারপর একসময় বন্দনার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনার কোন ভয় নেই। সোনার হার আপনার গলাতেই থাক। আর, জামিন নিতে গেলে কোন উকিল-মোক্তারও লাগবে না। তাই পয়সা খরচেরও ভয় নেই। আমি সুপ্রকাশবাবুকে তাঁর নিজের মুচলেকায় ছেড়ে দিচ্ছি। মামলার দিন দয়া করে তাঁকে আদালতে হাজির করবেন। কথাটা বলেই আমি একখানা মুচলেকা লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকাতেও ঘেন্না করে আমার।

সামান্য মামলা। সামান্য তদন্ত। তদন্ত করতে গিয়েই কিন্তু আসল খবরটা জানতে পারি। বন্দনার বাবা ধনী ব্যক্তি। তাঁর চারটি কন্যার মধ্যে তিনটিরই বিয়ে হয়েছে বড় ঘরে। তাদের মধ্যে কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার। কেবল বন্দনারই কপাল খারাপ। তাই তার বিয়ে হয়েছে সুপ্রকাশের সঙ্গে। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার সুপ্রকাশ কিন্তু এমনিতে খুবই সৎ ও ভদ্র। ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারাও তার কাজে ও ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট।

কিন্তু বাড়িতে একদণ্ড শান্তি নেই সুপ্রকাশের। দিনরাত বন্দনার গঞ্জনা শুনতে হয় তাকে। বন্দনাকে তার বাবা সুপ্রকাশের হাতে তুলে দিয়ে কি নিদারুণ ভুল করেছেন সেই একই কথা প্রতিনিয়ত শুনতে হয়।

এদিকে আবার বন্দনার নিত্য-নতুন বায়না। এটা চাই, ওটা চাই। অন্য ধনী বোনেদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার জিনিস কেনার শখ। বাপের বাড়ির দিকে কোন শুভকাজে যৌতুক দেবার বেলায়ও বোনেদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে চায় সে। সুপ্রকাশ কিন্তু বোকা নয়।

বোঝে সে। কিন্তু বুঝেও সে না বোঝার ভান করে চুপ করে থেকে কেবল স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করে। অবশেষে নিরুপায় সুপ্রকাশ একদিন ব্যাঙ্কের তহবিলে হাত দেয়। একবছরের মধ্যেই ব্যাঙ্কের হাজার ছ'য়েক টাকা সে খরচ করে ফেলে। অবশেষে একদিন ধরাও পড়ে।

ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা খুবই সদাশয়। তারা তার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস না করে তাকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে বদলি করে দিয়ে টাকাটা ফেরত দেবার সুযোগ দেয়। খবরটা কিন্তু চাপা থাকে না। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও শুনতে পায় এই তহবিল তছরুপের খবর। খাপ্পা হয়ে ওঠে বন্দনা। সুপ্রকাশকে দিনরাত বাক্যবাণে জর্জরিত করতে থাকে। অবশেষে নিরুপায় সুপ্রকাশ আত্মহত্যার পথ খোঁজে।

মামলায় চার্জসীট দিয়েছিলাম আমি। চার্জসীট না দিয়ে উপায়ও ছিল না, কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব ছিল না মোটেই।

আদালতে দোষী সাব্যস্ত হল সুপ্রকাশ। একশো টাকা অর্থদণ্ড হল তার। অনাদায়ে সাতদিন জেল।

মামলার রায়ের দিন আদালতে হাজির হয়েছিল বন্দনা। একশো টাকা অর্থদণ্ডের কথা শুনে মুখ বেঁকিয়ে সে বলেছিল, পাগল নাকি, এই সময় একশো টাকা কোত্থেকে দেব? তার চাইতে বরঞ্চ সাতদিন জেলেই থাক্। বলেই একটা রিক্সা ডেকে সে বাড়ি ফিরে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে আমি খানিকক্ষণ সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটি কথাও না বলে মাথা নিচু করে সুপ্রকাশ চলে গেল কোর্ট-হাজতের দিকে।

চিঠির শেষে অমিত মন্তব্য করে লিখেছিল, বলো তো তরুণ, এমন চরিত্রের কোন স্ত্রীলোকের কথা কোনদিন শুনেছ কি?

মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, সত্যিই এমন একটি স্ত্রী-চরিত্রের কথা কোনদিন আমি শুনিনি। স্ত্রীর অর্থের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে স্বামীকে অফিসের ক্যাশ ভাঙতে হয়েছে—এমন ঘটনা সংসারে আখছারই ঘটে থাকে। এর মধ্যে কোনই নতুনত্ব নেই। কিন্তু সেই স্ত্রীই সামান্য একশো টাকার জন্যে স্বামীকে জেলে পাঠাতেও কুণ্ঠিত হয় না—এমন ঘটনা সত্যিই বিরল। মানুষের অর্থলিপ্সা কোথায় গিয়ে পৌছলে এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারে, তা' ভেবে সত্যিই বিস্মিত হই।

অমিতের কাছ থেকে এর পরের চিঠিখানা প্রায় মাসখানেক পরে পেয়েছিলাম। সেই চিঠিতে স্মৃতিকণা সম্বন্ধে একটি খবর ছিল। অমিত লিখেছিল—এখানে ইতিমধ্যে একটি সাংঘাতিক শিভ্যাল্‌রির কাজ করে ফেলেছি আমি। আর সেই কাজের ফলে স্মৃতিকণার পক্ষে এখন নিয়মিত কলেজে যাওয়াই দায় হয়ে উঠেছে।

এই পর্যন্ত লিখে ঘটনাটায় সাস্‌পেন্স টানতে গিয়ে অন্য কথার অবতারণা করছিল অমিত। তারপর আবার স্মৃতিকণার কথায় ফিরে এসে লিখেছিল—ইদানীং পাড়ার গোটাকতক বখাটে ছেলে ভারি বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছিল স্মৃতিকে। কলেজে যাবার সময় তাকে নানারকম টিট্‌কিরি দিত, তার পিছু পিছু যেতে যেতে গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিত। স্মৃতিও শক্ত মেয়ে। একদিন ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিল তাদের। কিন্তু তাতে ফল হল না কিছুই। অবশেষে একদিন যখন একটা ছেলে তার গায়ের ওপর একখানা ভাঁজ করা অশ্লীল চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করে হাসতে হাসতে চলে গেল সেদিন আর নিজেকে সামলাতে পারে নি স্মৃতি। কলেজে যাওয়া আর হল না তার। চোখ-মুখ লাল করে বই-খাতা নিয়ে ফিরে

এল বাড়ি। অজিতেশবাবুকে কিছুই বলল না। আর বলে লাভও কিছু হত না। তিনি বৃদ্ধ, নির্বিরোধী মানুষ। শুনে হয়ত বিব্রত বোধ করতেন। প্রতিকার করতে পারতেন না কিছুই।

সারাটা দিন স্মৃতি গুম্ হয়ে বসে রইল আমার অপেক্ষায়। সেদিন ওদের বাড়ি যাবার কথা ছিল আমার।

সন্ধ্যাবেলা ওদের বাড়ি যেতেই স্মৃতি গম্ভীর মুখে আমাকে সোজা তার ঘরে নিয়ে গেল। তখনও আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। তবে, ওর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখে কিছু একটা আশঙ্কা করেছিলাম।

আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় স্মৃতিকণা। আমি কেবল বিস্মিত ভঙ্গিতে তার সেই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করতে থাকি।

অকস্মাৎ স্মৃতিকণা তার বইয়ের মধ্য থেকে সেই চিঠিখানা টেনে বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই চোখ পাকিয়ে আগুন হয়ে বলে ওঠে, কি করেন—কি করেন আপনারা? রাস্তাঘাটে মেয়েদের মান-সম্ভ্রম যখন রক্ষা করতে পারেন না, তখন।কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকার কেন আপনাদের পুষছে, বলতে পারেন?

সত্যি কথা বলতে কি ভাই তরুণ, আমার এতদিনের চাকরিতে কোন ওপরওয়ালার কাছ থেকেও এমনি মেজাজে এই ধরনের কোন কথা আজ পর্যন্ত শুনতে হয়নি। তাই স্মৃতির কথায় প্রথমটায় ভড়কে গেলাম একটু।

অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করি, কি হল, হঠাৎ এত খাপ্পা হয়ে উঠলে কেন?

—নিন, ঐ চিঠিটা খুলে পড়েই দেখুন না! বলেই গুম্ হয়ে বসে থাকে স্মৃতি।

চিঠিখানা খুলেই কিন্তু আমার চক্ষুস্থির। চিঠির প্রতি ছত্রে অশ্লীলতা জীবন্ত হয়ে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে যেন আমাকে ব্যঙ্গ করছে। সম্পূর্ণ চিঠিটা পড়ার মত ধৈর্যও আর রইল না।

চিঠিখানা মুঠো করে বাইরে ফেলে দিতে গিয়েই কিন্তু সতর্ক হয়ে উঠি। সেখানা ভাঁজ করে জামার পকেটে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করি স্মৃতিকে, এই কুকুরগুলো কবে থেকে তোমার পেছনে লেগেছে?

—তা' প্রায় মাসখানেক হবে।

—এতদিন একথা বলো নি কেন আমাকে?

—প্রয়োজন মনে করি নি। ভেবেছিলাম, দু'চার দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি।

স্মৃতির কথায় হঠাৎ রেগে উঠি আমি। স্মৃতি এখনও আমাকে দূরের লোক বলে ভাবে? আমি বিব্রত বোধ করব, তাই সে এই কথাটা এতদিন মুখ ফুটে বলতেও পারেনি আমাকে?

একটু শ্লেষ-মিশ্রিত সুরে আবার বললাম, তবে আজ হঠাৎ আমাকে বিব্রত করতে চাইছো কেন?

স্থির অপলক চোখে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে স্মৃতিকণা জবাব দেয়, আমার ভুল হয়েছে। আপনাকে বিব্রত হতে হবে না। কিছু করতেও হবে না আমার জন্যে। চিঠিটা ফেরত দিন। বলেই চিঠিটা নেবার জন্যে সে হাত বাড়ায়।

নিজেকে সামলে নিয়ে সহজকণ্ঠে আমি জবাব দিই, তুমি যে এতদিনেও আমাকে আপন করে নিতে পারলে না সেটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। যাক্, ওসব কথা। এখন বলো, যে ছেলেটা তোমাকে এই চিঠি দিয়েছে তাকে চেন?

একটু সময় চুপ করে থেকে স্মৃতিকণা জবাব দেয়, হ্যাঁ, চিনি। আমাদের পাড়ারই ছেলে।'

—কি করে?

—কিছুই না। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন ঘুরে বেড়ায়।

—রক্‌বাজি করে, তাই তো?

মুখে জবাব না দিয়ে কেবল মাথা নেড়ে সায় দেয় সে।

স্মৃতিকণার কাছ থেকে সেই ছেলেটার নাম-ধাম জেনে নিয়ে ওদের ওখান থেকে উঠে পড়ি। সত্যি বলতে কি, রাগে আমার আপাদ-মস্তক যেন জ্বলে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে সেই ছেলেটাকে কাছে পেলে হয়ত তার টুঁটি চেপে ধরতাম। পকেটের মধ্যে সেই অশ্লীল চিঠিটা যেন আমার গায়ের জ্বালা সহস্র গুণ বাড়িয়ে তুলছিল।

বাসায় ফিরে এসে সেই রাতেই ছেলেটার বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, রাতে হয়ত তার দেখা নাও পেতে পারি। এ ধরনের ছেলেরা রাতে কখন বাড়ি ফেরে তার ঠিক নেই। আবার সকালে ঘুম ভাঙতেও তাদের বেলা আটটা।

পরের দিন সকালেই থানা থেকে একজন কনস্টেবল্ নিয়ে এসে উপস্থিত হলাম সেই বাড়িতে। বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেটার নাম ধরে ডাকতেই বাইশ তেইশ বছরের পাজামা-গেঞ্জি পরা একটি ছেলে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

আমাকে দেখেই কিন্তু মুখখানা শুকিয়ে ওঠে ছেলেটির। একটা ঢোক গিলে মৃদুকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, কাকে চাই?

তার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে উল্টে তাকেই প্রশ্ন করি, আপনার নাম কি?

ছেলেটি তার নিজের নাম বলতেই আবার বললাম, আপনাকেই আমার প্রয়োজন।

—আমাকে প্রয়োজন? স্খলিতকণ্ঠে ছেলেটি বললে।

—হ্যাঁ, আপনাকেই। একটু থেমে আমি আবার বললাম, আপনি এ পাড়ার অজিতেশ দত্তকে চেনেন?

নামটা শুনেই কিন্তু ছেলেটির চোখে-মুখে একটা ভীতির ভাব জেগে ওঠে।

কণ্ঠস্বর আর একপর্দা চড়িয়ে আবার বললাম, কি, চুপ করে রইলেন কেন? চেনেন অজিতেশ দত্তকে?

—হ্যাঁ, চিনি। অতি মৃদুকণ্ঠে প্রায় স্বগতোক্তির মত জবাব দেয় সে।

—তার মেয়ে স্মৃতিকণাকেও বোধহয় চেনেন, কি বলেন?

স্মৃতিকণার নামটা শুনেই মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ছেলেটার। কিছু একটা জবাব দিতে গিয়ে এক পা দু'পা করে সে পেছনে সরতে থাকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অতর্কিতে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধের কাছে গেঞ্জিটা চেপে ধরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম, পালাচ্ছেন কোথায়? কথার জবাব দিন। রাস্তাঘাটে স্মৃতিকণাকে আপনি টিট্‌কিরি দেন?

—আমি—আমি—না—না তো। ভড়কে গিয়ে তোতলাতে শুরু করে ছেলেটা।

তার কাঁধে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার বললাম, কাল কলেজে যাবার সময় স্মৃতিকণার দিকে আপনি একটা চিঠি ছুঁড়ে মারেননি?

—কে—কে বললে?—কই—আমি তো—আমি তো কিছুই জানি না!

—ঠিক আছে। জানেন কিনা দেখা যাবে। এবার থানায় চলুন।

ইতিমধ্যে ছেলেটির বাবাও এসে হাজির হয়েছে সেখানে। পাড়ার আরও পাঁচ-সাতজন লোক আর ছেলে-ছোকরা এসে ভিড় করেছে। সকলের মুখে চোখেই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

আমি তাদের সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলতেই ছেলেটির বাবা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে বললে, না—না। এ হতেই পারে না। আমার ছেলে—

—থামুন আপনি। সারাদিন তো অফিসে থাকেন। ছেলে এদিকে কি করে বেড়াচ্ছে তার কতটুকু খবর রাখেন? ধম্‌কে উঠি ভদ্রলোককে।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আমাকে সমর্থন করে বললে, বটেই তো, কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে এত সকালে উনি এখানে আসবেন কেন?

ইতিমধ্যে ভিড়ের মধ্য থেকে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি তো এই থানার মেজ দারোগা, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দিই।

ভদ্রলোক এবার শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে বললে, তা' আপনাকে তো মাঝে মাঝেই অজিতেশবাবুর বাড়ি দেখতে পাই। শুনতে পাই তাঁর মেয়ের সঙ্গে নাকি আপনার—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই ভদ্রলোক একটা চোখের ইঙ্গিত করে।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ, ঐ বাড়িতে যাতায়াত আছে আমার।

পানের ছোপ লাগানো দাঁতগুলো বের করে হেসে ভদ্রলোক আবার বললে, নিজের আঁতে ঘা লেগেছে বলেই বুঝি এত গরজ?

নিজেকে আর সামলাতে পারি না আমি। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিই, হ্যাঁ, ঠিক তাই। তবে এটা যদি আপনার কোন আত্মীয়ের ব্যাপার হত তা'হলেও ঠিক এমনিই গরজ দেখাতাম। নিজের বেলা বলেই এখনও সামলে রয়েছি, অন্যের বেলা হলে এখানে দাঁড়িয়ে এসব নয়া রোমিওদের চাবকে শায়েস্তা করতাম। কথাটা বলেই আমার পেছনে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে বললাম, রামসিং, দড়ি লাগাও।

দীর্ঘ বপু নিয়ে হেলতে-দুলতে পালোয়ান রামসিং এগিয়ে এসে সেই ছেলেটার কোমরে দড়ি পরাতেই বাড়ির অন্দরমহলে মেয়েদের কান্নার শব্দ ভেসে ওঠে। এবারে ছেলেটির বাবা একেবারে ভেঙে পড়ে। আমার হাতদু'টো চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বললে, বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, আমার ছেলে ওসব চিঠি লেখালেখির মধ্যে নেই। সে সম্পূর্ণ—

তার কথার মাঝখানেই পকেট থেকে সেই চিঠিখানা বের করে বললাম, এই দেখুন সেই চিঠি। সরকারী হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট-ই বলতে পারবে এ চিঠি আপনার ছেলে লিখেছে কিনা!

ছেলেটা কিন্তু বিমর্ষমুখে কেবল জুল জুল করে তাকাতে থাকে চিঠিটার দিকে।

অবশেষে পাড়ার লোকের অনুরোধে সেখানেই ছেলেটাকে জামিনে ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। কেবল শাসিয়ে এলাম, এর পরে এ ধরনের কোন ঘটনার সাথে ছেলেটি জড়িত হয়ে পড়লে তার আর নিস্তার নেই।

থানায় ফিরে এসে বড়বাবুকে ব্যাপারটা বলতেই সে হো-হো শব্দে হেসে উঠে বললে, বেশ হয়েছে! এবার দেখছি তোমাকে ডুয়েল লড়তে হবে।

আমি আর কিছু না বলে লজ্জিত মুখে মাথা নিচু করে থাকি।

হাসি থামিয়ে ভবদেব আবার বললে, এ ব্যাপারে আর বেশিদূর এগিয়ে যেও না। তাতে তোমার সেই মানসীকেও কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। তার চাইতে এখানেই থেমে যাওয়া ভালো। মনে হচ্ছে, এরপর পাড়ার ছোকরাগুলো আর সহসা তার পিছনে লাগতে সাহস করবে না।

বড়বাবুর অনুমান সত্যি। পাড়ার ছোকরাদের ঝঞ্ঝাট সেই থেকে থেমে গেল। এখন রাস্তায় স্মৃতিকে দেখলেই তারা উল্টো পথ ধরে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে তার কলেজে। খবরটা কি করে যেন কলেজের মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তারই জবাবদিহি করতে করতে স্মৃতিকণা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের আলোচনা এড়াতে গিয়ে তাকে কিছুদিনের মত কলেজে যাওয়াই ছেড়ে দিতে হয়েছে। এবার বুঝলে তো তরুণ, আমার সেই শিভ্যাল্‌রির পরিণাম?

চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে অমিত আরও একটু লিখেছিল। লিখেছিল—হ্যাঁ ভালো কথা, আগের চিঠিতে সেই ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার সুপ্রকাশ মুখার্জী ও তার স্ত্রী বন্দনার কথা লিখেছিলাম, মনে আছে তো? সাতদিন পরে জেল থেকে ছাড়া পায় সুপ্রকাশ, আর তার পরের দিনই গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করে। না—এবার আর কেউ তাকে দেখতে পায় নি। আত্মহত্যা করতে সমর্থ হয়ে এবার কিন্তু সে ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো নয় ধারাকে ফাঁকি দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে মুক্তি দিয়েছে বন্দনাকেও।

সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো, তরুণ? সুপ্রকাশের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্যে মর্গে পাঠিয়ে দিয়ে সবে থানায় এসে বসেছি, ঠিক এমনি সময় বন্দনা এসে হাজির। বন্দনার মুখে-চোখে বিষাদের চিহ্নমাত্র না থাকলেও সেই মুহূর্তে তার প্রতি সমবেদনায় মনটা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল আমার। নিজের মনেই বলেছিলাম—মানুষের মুখের ওপর শোকের অভিব্যক্তি সকলের বেলায় তো এক নয়। বন্দনা সত্যিই শক্ত মেয়ে। তাই সে এতবড় শোকেও মুহ্যমান হয়ে পড়েনি। মনে মনে ভাবলাম, পোষ্টমর্টেমের পরে স্বামীর মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যেই বোধহয় এই সদ্য-বিধবা আমার লিখিত অনুমতিপত্র নিতে এসেছে। তাই বন্দনা কিছু বলবার আগেই একখানা অনুমতি পত্র লিখে থানার সীলমোহর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। বন্দনার ভাব-ভঙ্গিতে কিন্তু অনুমতিপত্র নেবার তেমন একটা গরজ দেখা গেল না। তার বদলে সে আমার কাছে সরে এসে বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, দারোগাবাবু?

—বলুন! বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাই তার দিকে।

বন্দনা বললে, আমার স্বামী তো মারা গেছে। তার প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের টাকা থেকে সেই অনাদায়ী টাকা কেটে রাখার এক্তিয়ার কি ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের আছে?

প্রশ্নটা শুনে সেই মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সমবেদনার ছায়াটুকুও আর রইল না আমার মনের মধ্যে। যার স্বামীর মৃতদেহটার ওপর ডাক্তার এখনও ছুরি চালাচ্ছে, সেই স্ত্রীর মুখে এসময় এমনি একটা প্রশ্ন আমাকে বিস্ময়ের চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। একমুহূর্ত স্থির চোখে বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমি 'জানি না' বলেই সেখান থেকে উঠে গিয়েছিলাম।

।। সতের ।।

বেলা প্রায় তিনটা।

কোতোয়ালী থানার ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জি এখনও বাড়ি ফেরেনি। স্ত্রী কমলা ঝিকে দিয়ে দু'তিনবার থানায় খবর পাঠিয়েছে। প্রতিবারই ভবদেব বলে পাঠিয়েছে, একটু পরেই সে ফিরছে। কিন্তু এই করে তিনটে বাজতে চলল প্রায়। তবুও দেখা নেই ভবদেবের। স্বামীকে অভুক্ত রেখে নিজেও খেতে পারেনি কমলা। তাই সেও উপোস করেই রয়েছে।

আগে এমনি ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে উঠত কমলা। কিন্তু এখন আর হয় না, গা-সহা হয়ে গেছে। অথবা বিরক্ত বোধ করলেও সেই বিরক্তি মনের মধ্যে চেপে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এমনি সময়ে ঘরে এসে প্রবেশ করেছিল অমল। এইমাত্র সে কলেজ থেকে ফিরল। অমল সচরাচর এই সময় কলেজ থেকে ফেরে না। প্রায়ই তার বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। ভবদেবের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে না বললেই চলে। কমলা কিছু জিজ্ঞেস করলে এটা-ওটা উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

কমলা কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সে বেশ বুঝতে পারছে অমল অসৎ সঙ্গে ভিড়েছে। কিন্তু সে নিরুপায়। শাসনে রাখবার বয়স আর অমলের নেই। সে এখন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তা'ছাড়া সে নিজে স্ত্রীলোক। অমলের বয়সের ছেলেকে শাসনে রাখবার তার ক্ষমতা কোথায়? বাপ ভবদেব দিনরাত নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ছেলেমেয়ের দিকে নজর দেবার মত তার সময় কই? যতদিন এরা ছোট ছিল ততদিন তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে কমলা। কিন্তু এখন আর সে ক্ষমতা তার নেই। মেয়ে অমিয়া শান্ত প্রকৃতির। স্কুলের পর সোজা বাড়ি চলে আসে। এমনকি কোন সহপাঠিনীর বাড়িতেও যায় না। তাকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই কমলার। যত দুশ্চিন্তা ঐ অমলকে নিয়ে।

কমলার নিজের ধারণা, পুলিশের চাকরী করতে গিয়ে ভবদেবকে যত অন্যায় করতে হয়েছে তারই ফলে আজ তাদের একমাত্র পুত্র অমলের এই অবস্থা।

অমল কিন্তু বরাবরই এমন ছিল না। ছেলেবেলায় খুবই শান্ত প্রকৃতির ছিল। একটু গোবেচারা ধরনের। কিন্তু বয়স যতই বাড়তে লাগল তার স্বভাবটাও পাল্টে যেতে শুরু করল সেই সঙ্গে। এখন আর কমলাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কমলা একটা কথা বললে মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দেয়।

ঘরে ঢুকে হাতের খাতাটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা ড্রেসিং টেবিলের সামনে চলে যায় অমল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে নিজের চুলের পরিপাটিতে ব্যস্ত হয়ে থাকে।

কমলা একবার আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হাতের উলের কাঁটায় মন দেয়।

পরনে টেরিলিনের ড্রেন-পাইপ্ প্যান্ট, গাঁয়ে টেরিকটের টি-সার্ট, মাথায় একরাশ চুলের বোঝা নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনেই একটা ট্যুইস্ট্ নাচের ভঙ্গি করে অমল কমলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, অমি এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, মা?

মুখ তুলে ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে উল বুনতে বুনতে কমলা জবাব দেয়, না। কেন, তাকে কি দরকার?

—না, এমনি। বলেই অমল খাবার ঘরে গিয়ে ঘুর-ঘুর করতে করতে একটা চটুল হিন্দী গানের কলি ভাঁজতে থাকে।

কমলা বুঝতে পারে অমল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ি এসেছে, নইলে বাড়ি বসে থেকে সময় নষ্ট করার মত ছেলে সে নয়।

একসময় অমল কমলার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, বাবা বুঝি ও-ঘরে ঘুমুচ্ছেন?

কমলা এবার চোখ না তুলেই জবাব দেয়, আজ হঠাৎ তাঁর খবরের প্রয়োজন হল কেন? কখনও তো তোকে তাঁর খবর নিতে দেখি না!

—বাঃ, আমি বুঝি এবাড়ির একটা লোক নই! তাঁর খবর নেওয়াটাও বুঝি দোষের?

—না, দোষগুণের কথা নয়। কখনও তাঁর খবর নিতে চেষ্টা করিস না বলেই বলছি।

উদাসকণ্ঠে অমল বললে, বাবার আর কি খবর নেব, বলো? তিনি তো তাঁর থানা নিয়েই আছেন।

—আর তুই আছিস কি নিয়ে? বন্ধু-বান্ধব নিয়ে, তাই না?

এবার অনুযোগের সুর ফুটে ওঠে অমলের কণ্ঠে। সে বললে, তুমি বুঝি মনে কর আমি দিনরাত আমার বন্ধুদের সঙ্গেই আড্ডা দিয়ে কাটাই?

জবাব দেয় কমলা, শুধু মনে করি না। সেইটাই খাঁটি সত্যি কথা।

—কিন্তু প্রতিদিন কলেজের পর যে প্রফেসারদের বাড়ি যেতে হয়, তা' তো তুমি জানো না!

—কেন, সেখানে কি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর কমলার।

—বাঃ, স্পেশাল কোচিং নিতে রোজ যেতে হয় যে।

একটু সময় থেমে কমলা মুখ তুলে আবার বললে, দেখ্ অমল, বাজে কথা বলিস না। কলেজে এককালে আমিও পড়েছিলাম। তুই এমন কি ব্রিলিয়াল্ট্ ছাত্র যে প্রফেসারেরা তোকে বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে স্পেশাল কোচিং দেবে? আর, শুধু শুধু তারা তোর পেছনে খাটতে যাবেই বা কেন?

অমল আর কোন জবাব দেয় না। পাছে কথার সূত্র ধরে মা আরও অনেকদূর এগিয়ে যায় সেই ভয়েই চুপ করে থাকে। কেবল ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আবার ড্রেসিং-টেবিলের সামনে এসে দু'হাতে চুলটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে, তুমি তো বরাবর আমার দোষটাই দেখলে।

—গুণ কিছু থাকলে তাও দেখতে পেতাম বৈকি! উল বুনতে বুনতেই জবাব দেয় কমলা।

খানিকক্ষণ উস্‌খুস্ করে অমল কমলার সামনে এসে হঠাৎ বললে, গোটা তিরিশেক টাকা দেবে, মা?

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে কমলার। ছেলের চোখের দিকে নজর রেখে কাঁটাশুদ্ধ উলের গোছাটা পাশে নামিয়ে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কেন, হঠাৎ তোর তিরিশ টাকার কি প্রয়োজন হয়ে পড়ল?

—একটু দরকার আছে, মা।

—কি দরকার, আগে শুনি!

—কলেজের দু'চারজন বন্ধু নিয়ে একটু কলকাতায় বেড়াতে যাবো। যাতায়াতের খরচটা আমায় দিতে হবে।

—যাতায়াতে তিরিশ টাকা লাগবে কেন?

—বাঃ, এর কমে হবে নাকি? বেড়াতে যখন যাচ্ছি তখন তো আর বাসে কিম্বা ট্রেনে যেতে পারি না। ভেবেছি, ট্যাক্সি করে যাবো।

—তারপর, গভীর রাতে সেই ছাই-পাঁশগুলো গিলে বন্ধুদের সাথে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে বাড়ি ফিরবি, তাই তো? কথাটা বলতে গিয়েও বেদনায় মনটা টন্‌টন্ করে ওঠে কমলার। চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে।

—চুপ-চুপ। অত জোরে বল না, মা। বাবা শুনতে পাবেন। পাংশু মুখে বলে উঠল অমল।

কমলা বললে, না,—তিনি এখনও থানা থেকে ফেরেননি।

—আচ্ছা, বল তো মা, তুমি রোজ রোজ ঐ কথা আমাকে শোনাও কেন? সেদিন তো তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি ঐ জিনিস আর কোনদিন ছোঁব না। সেদিন কেবল বন্ধুদের পাল্লায় পড়েই খেতে হয়েছিল।

আবার কবে সেই পাল্লায় পড়বি, কে জানে? বলেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কমলা।

সেদিনের কথাটা মনে হলেই গাটা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে কমলার। সেদিন গভীর রাতে সেই মুহূর্তে নিজের মৃত্যুকামনা করেছিল সে। মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকে বলেছিল, ঠাকুর, এবার তুমি আমাকে নাও। জীবনে যে এমন একটা দৃশ্য কোনদিন দেখতে হবে তা' যে কোনদিন কল্পনাই করিনি।

সেদিনও গভীর রাতেই বাড়ি ফিরেছিল অমল। কমলা নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে। ভবদেব তখনও থানা থেকে ফেরেনি।

অমলের মুখের দিকে তাকিয়েই কেন যেন একটু চম্‌কে উঠেছিল কমলা। মায়ের দৃষ্টির কাছে সন্তান সেদিন নিজের অস্বাভাবিকত্বটুকু কিছুতেই লুকোতে পারে নি।

প্রশ্ন করেছিল কমলা, কি হয়েছে তোর? এত রাতে কোত্থেকে ফিরলি?

কোন জবাব না দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে যায় অমল। তারপর জামা-প্যাণ্ট পরেই নিজের বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে।

অকস্মাৎ বুকটা কেঁপে ওঠে কমলার। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত কমলা অমলের পিছু পিছু প্রবেশ করে তার ঘরে। তারপর তার কপালে হাত রাখতেই জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলতে চেষ্টা করে অমল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে প্রবেশ করে কমলার।

গন্ধটা অপরিচিত হলেও তাকে চিনে নিতে তেমন কোন অসুবিধা হয় না কমলার। সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের মাথাটা ঘুরে ওঠে। এ কি করে এসেছে অমল? কোত্থেকে খেয়ে এসেছে এসব?

কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সুযোগ পায় না কমলা। তার আগেই অমল হঠাৎ উবু হয়ে উঠে বসে বমি করতে আরম্ভ করে।

বমি করছে অমল। ছেলের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে রেখেছে কমলা। আর তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

অবশেষে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সেই বমি পরিষ্কার করেছে কমলা। ভবদেব ফেরার আগেই সব পরিষ্কার করে ফেলতে হয়েছে তাকে। সে জানতে পারলে সাংঘাতিক বিপদ।

স্বামীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই গোপন করেছিল কমলা। তাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পেতে দেয়নি। কিন্তু মনের মধ্যে সেই অস্বস্তি থেকেই গিয়েছিল। পরের দিন অমল তার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেও কমলার মনের সেই অস্বস্তি মুছে যায়নি।

কমলাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমল বললে, দাও না মা, গোটা তিরিশেক টাকা। নইলে যে আমি বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

একমুহূর্ত থেমে কমলা বললে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তোকে যেন আর কোনদিন তোর ঐ বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে না হয়। সে যাই হোক্, আমার কাছে টাকা নেই। তোকে টাকা দিতে পারব না।

—সেকি মা? তোমার কাছে টাকা নেই? জেলার কোতোয়ালী থানার অফিসার-ইন্-চার্জের পত্নী বলছে যে তার কাছে টাকা নেই—এক কথা কি এই দুনিয়ায় কেউ বিশ্বাস করবে, মা? নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা বলেই হেসে ওঠে অমল।

কমলা গম্ভীরকণ্ঠে বললে, কেন, তোর বাবার কি প্রমোশন হয়েছে নাকি যে হঠাৎ তাঁর মাইনে খুব বেড়ে গেছে?

—মিথ্যে কথা বাড়াচ্ছো কেন মা? মুখ টিপে হেসে বলতে থাকে অমল, বাবার কি টাকার অভাব? মাইনের টাকার ওপর ভরসা করে থাকলে যে পুলিশ অফিসারের চলে না, তা' বুঝি জানতে এখনও বাকি আছে আমার?

অমলের কথার ধরনটা অসহ্য লাগছিল কমলার। হঠাৎ সে ধমকে ওঠে অমলকে। বললে, চুপ কর হতভাগা! বড় হয়ে দিন দিন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে তোর! কার সম্বন্ধে কি কথা কইতে হয় সে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছিস্, হতচ্ছাড়া!

এবার তেড়ে ওঠে অমল। বললে, শুধু শুধু আমায় বকছো কেন? এর মধ্যে মিথ্যের কি আছে, শুনি? সহজ সরল সত্যি কথাটা তোমরা সইতে পারো না বলেই শুধু শুধু বকাঝকা করছো আমায়।

—হয়েছে—হয়েছে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এসেছেন সত্যিকথা বলতে! মোটকথা, আমার কাছে টাকা নেই। তোকে টাকা দিতে পারব না। বলেই আবার গুম্ হয়ে বসে থাকে কমলা।

—বেশ, না দিতে পারবে দিও না। মনে করেছো, ঐ তিরিশটা টাকার জন্যে আমাদের বেড়াতে যাওয়াটা আটকে থাকবে? বলেই অমল দুম্ দুম্ করে পা ফেলে নিজের ঘরে চলে যায়।

বসে বসে ভাবতে থাকে কমলা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমনিভাবেই হয়। পুত্রের মুখ থেকেই পিতামাতার নিজেদের দুষ্কর্মের কথা শুনতে হয়। তবুও তো ভবদেব বলে, সে নাকি কখনও অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করে না। তাতেই এই। সত্যি সত্যি যদি কিছু অন্যায় করে সে পয়সা আয় করতো তা'হলে না জানি আরও কি হত!

শ্রান্ত-ক্লান্ত ভবদেব বাসায় ফিরে এসে কোমরের বেল্ট খুলতে খুলতে কমলার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, এত গম্ভীর কেন আজ? এখনও আমার জন্যে বসে রয়েছো নাকি?

স্বামীকে দেখেই কমলার সমস্ত অভিযোগ, অভিমান একসাথে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয়, সেই মুহূর্তে তাকে দু'কথা শুনিয়ে দেয়। মনে হয়, তার জীবনের সব অমঙ্গলের জন্যে এই লোকটিই দায়ী।

নিজেকে সংযত করে অস্ফুট ঝঙ্কারে কমলা বলে ওঠে, বাড়ি ফিরে এসে কবে আমার হাসিমুখ দেখতে পেয়েছো তুমি? আমার মুখে কি হাসি আছে? হাসি শুকিয়ে গেছে। আর তার জন্যে দায়ী একমাত্র তুমি। বলেই কমলা ভবদেবের সামনে লুঙ্গি গামছা রেখে দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে প্রবেশ করে।

ভবদেব মনে মনে ভাবে, থানার কাজ সেরে বাসায় ফিরতে তার রোজ দেরি হয় বলেই বুঝি আজ কমলা এত রুষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এরপর থেকে সে রোজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। অবশ্য এই প্রতিজ্ঞা তার নতুন নয়। চাকরি জীবনে এমন প্রতিজ্ঞা সে বহুবার করেছে, আবার সময়মত ভুলেও গেছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে নিজের বিছানায় এসে বসেছে ভবদেব। এবার একটু বিশ্রাম। তারপর আবার কাজ আরম্ভ হবে। আর তা' চলবে রাত দেড়টা-দু'টো পর্যন্ত। এমন সময় কুণ্ঠিত পায়ে সামনে এসে দাঁড়ায় অমল।

ভবদেব জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে অমলের দিকে তাকাতেই অমল বললে, কলকাতায় বেড়াতে যাবো বলে মার কাছে তিরিশটা টাকা চেয়েছিলাম। মা দিলে না। বললে, টাকা নাকি নেই।

সেদিনের সংবাদপত্রের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে মাথা না তুলেই গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় ভবদেব, টাকা না থাকলে দেবে কোত্থেকে?

অমল খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে আবার বললে, ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে টাকা চেয়েছিলাম। তা' টাকা না হলেও চলবে, যদি তুমি—

—আমি কি? এবার মাথা তুলে অমলের দিকে তাকায় ভবদেব।

একটা ঢোক গিলে অমল বললে, তেমন কিছু না। তুমি যদি একবার টেলিফোনে হীরা সিংকে একটু বলে দাও। ওর তো অনেকগুলো গাড়ি ভাড়া খাটে। তাই বলছিলাম—

সংবাদপত্রখানা ভাঁজ করে পাশে রাখতে রাখতে তেমনি গম্ভীরকণ্ঠে ভবদেব আবার বললে, আমার কথায় হীরা সিং গাড়ি দেবে কেন? আর দিলেও আমি তা' নেব কেন? তার এই লোকসানটা তুমি পুষিয়ে দেবে কেমন করে?

কথা বাড়াতে অমলের আর ভরসা হয় না। কি জানি, এরপর যদি ভবদেব আরও কিছু জানতে চায়? কোথায় যাবে, কেন যাবে, কাদের সঙ্গে যাবে—এসব কথা যদি ভবদেব জিজ্ঞাসা করে বসে তা'হলেই মুশকিল। তার চাইতে আর কিছু না বলে এখন মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

—থাক্ তবে, দরকার নেই। বলেই অমল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ভবদেব আবার বলে ওঠে, বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয়েছে তো ট্রেনে কিম্বা বাসে যাও। মনে রেখো তিরিশ টাকা খরচ করে ট্যাক্সিতে কলকাতা যাতায়াতের মত বড়লোক তোমার বাবা নয়, বুঝলে?

একমুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়ায় অমল। তারপর অন্তরে ক্ষুব্ধ কিন্তু বাইরে শান্ত ভাব নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

অমল চলে যেতেই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে ভবদেবের। সঙ্গে সঙ্গে সে অমলকে আবার ডাকে।

কিন্তু অমলের বদলে শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে প্রবেশ করে কমলা। খেয়ে উঠে এইমাত্র মুখ ধুয়ে এল সে। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, অমলকে ডাকছো কেন? সে তো এইমাত্র মুখখানা হাঁড়ির মত করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

—ও—বেরিয়ে গেছে বুঝি?

কমলা আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

ভবদেব আবার বললে, একটা কথা মনে পড়তেই অমলকে ডাকছিলাম। ভেবেছিলাম কথাটা জিজ্ঞেস করব ওকে।

—কি কথা? প্রশ্ন করে কমলা।

—সেদিন তুমি বলেছিলে না, অমল নাকি আজকাল কি রকম হয়ে উঠেছে। বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে। পড়াশোনায় তেমন—

ভবদেবের কথার মধ্যেই প্রশ্ন করে কমলা, ডেকে কি বলতে তাকে?

—কথাটা একবার জিজ্ঞেস করতাম। গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দেয় ভবদেব।

চোখে-মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে কমলা বললে, যাক, তবুও ভালো। এতদিন পরে কথাটা তোমার মনে পড়ল।

স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার মনটা বুঝে নিতে চেষ্টা করে একটু ম্লান হেসে শান্তকণ্ঠে ভবদেব বললে, জানি কমল, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো। আমি ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দিতে পারি না, তোমার দিকেও নজর দেবার সময় নেই—এই তো তোমার সেই পুরাতন অভিযোগ? কিন্তু কি করব বলো? যে চাকরি করছি তাতে সত্যিই অন্য দিকে নজর দেবার সময় নেই আমাদের। আর, এই বয়সে এই চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু করবারও উপায় নেই। কাজেই—

—থাক্—থাক্, তোমাকে এখন আর চাকরি খুইয়ে সংসারের দিকে নজর দিতে বলছি না। আমার কথা ছেড়ে দাও। বুড়ি হতে চললাম। স্বাদ-আহ্লাদের কিই বা আর অবশিষ্ট আছে? আমি কেবল ভাবছি ঐ ছেলেমেয়ে দু'টোর কথা। মেয়েটাকে না হয় আর দু'এক বছর পর বিয়ে দিয়ে দায় সারতে পারবে। কিন্তু ঐ ছেলেটা? ওর কি হবে?

—কেন, কি হয়েছে ওর? সত্যি কথা বলো তো, কি করেছে সে? ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞেস করে ভবদেব।

নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে কমলা। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—না, কি আর করবে? বলছিলাম যে, উঠতি বয়সের ছেলে একটু নজরে না রাখলে ভবিষ্যতে যদি—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই থেমে যায় কমলা। মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ নিজের বাঁ-হাতের চুড়ি ক'গাছা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তারপর মাথা তুলে একটু হাসতে চেষ্টা করে আবার বললে, তোমার সঙ্গে তো অনেক জায়গায় ঘুরলাম, অনেক অফিসারও দেখলাম। আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়, চাকরির ওজুহাতে সংসারের দিকে নজর না দেওয়াটা তেমন কোন কাজের কথা নয়। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। আসল কথাটা হচ্ছে ইচ্ছে। সে ইচ্ছে থাকলে তুমিও একটু নজর দিতে পারতে। ছেলেটা এমনিভাবে ভেসে যেত না। এই ধরো না কেন, তোমাদের পিনাকীবাবুর কথা। তিনিও তো তোমার মত একজন অফিসার। থানার ও. সি. না হলেও তিনিও তো চাকরি করছেন। কিন্তু দেখ, প্রতিদিন নিজের হাতে বাজারটি করছেন। বাড়িতে বসেই সংসারের এটা-ওটা করে স্ত্রীকে সাহায্য করছেন। কই, তাতে তার চাকরির কোন হানি হয়েছে বলে তো শুনি নি? বরঞ্চ কনস্টেবলের চাকরিতে ঢুকে আজ সে দারোগা। আর তুমি? সারাটা জীবন কারুর দিকে নজর না দিয়ে কেবল চাকরিই করে গেলে। তাতে হবার মধ্যে হল এই, যে দারোগার চাকরিতে ঢুকেছিলে সেই দরোগাই রয়ে গেলে। কি লাভ হল তাতে, বলতে পারো?

পিনাকীর কথা উঠতেই ভদেবের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়ে পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। কোন রকম মন্তব্য না করে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললে, থাক্, ঐ পিনাকী সরকারের কথা না তোলাই ভালো। ওরকম ফাঁকিবাজ অফিসারের পক্ষেই রাতদিন বাড়িতে বসে বৌয়ের সঙ্গে খিচিমিচি করা মানায়।

আবার একটু ম্লান হেসে কমলা বললে, তোমাদের অর্থাৎ পুরুষদের দেখবার চোখই আলাদা। তোমরা কেবল বাইরের চেহারাটাই দেখতে পাও। দু'জনে মাঝে মাঝে খিচিমিচি করে বলে তোমরা বুঝি মনে করো ওদের ভেতর মিল নেই? আসলে ওখানেই তোমাদের

ভুল। অবশ্য ছেলেপুলে নেই বলে একটা দুঃখ ওদের আছে। কিন্তু কি আর করবে? ও ব্যাপারে তো মানুষের কোন হাত নেই। বেশ আছে দু'টিতে। ভদ্রলোক উপরি পয়সার ধান্ধাতেও থাকেন না, আর চাকরিতে ঢুকে একটা কেষ্টবিষ্টু হবার আশাও করেন না। কাজেই ওদের চিন্তাও নেই, ভাবনাও নেই।

পিনাকী সরকারের মত একজন অফিসারকে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছা ছিল না ভবদেবের। তাই, কমলার শুকনো মুখখানার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে পাশ ফিরে শোয়। কমলার মুখখানাই ভাসতে থাকে তার চোখের সামনে। ভবদেবের মনে হয়, কমলাকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। নিজের অতৃপ্ত বাসনাকে মনের মধ্যে চেপে রেখে জীবনটাকে কোনক্রমে ঠেলে নিতে গিয়ে সত্যিই সে বুড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু সে নিজে তার কি করতে পারে? যে সুখী হতে জানে না, তাকে সুখী করবার মন্ত্র তো তার জানা নেই। নিজেদের বয়সকে বিশ বছর পিছিয়ে নেবার উপায়ও তো আর নেই। কমলা অসুখী, কমলা অতৃপ্ত। আর এই অতৃপ্তি নিয়েই তাকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে।

ভবদেব নিজেও যে নিজের জীবনের ওপর খুশি তা' অবশ্য নয়। এক এক সময় তার মনে হয়, জীবনটা যেন নষ্ট হয়ে গেছে। আর তার জন্যে দায়ী এই চাকরি। কিন্তু তাই বলে দিনরাত হা-হুতাশ করে জীবনটাকে কোনক্রমে কাটিয়ে দিতে হবে, তেমন বোকাও সে নয়। উন্নতিহীন চাকরি জীবনে সে নিঃসন্দেহে ব্যর্থ। সেই ব্যর্থতার গ্লানি মাঝে মাঝে তার মনটাকে চঞ্চল করে তোলে বৈকি। কিন্তু সময় সময় আবার মনে হয়, ব্যর্থতা কোথায় না আছে? পুলিশের দারোগা না হয়ে সে যদি উকিল, মোক্তার কিম্বা ডাক্তার হত, তবে কে বলতে পারে ব্যর্থতা সেখানেও তার জন্যে লুকিয়ে বসে থাকত না?

ভবদেবের পাশ ফিরে শোবার পরেও খানিকক্ষণ সেখানেই চুপ করে বসে থাকে কমলা। তারপর একসময় পাশের ঘরে চলে এসে একখানা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। আর কতক্ষণই বা শুয়ে থাকতে পারবে! এখনই তো ঠিকে ঝি এসে কেরোসিন স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে তাকে ডাকবে।

সবে চোখের পাতাদু'টো এক হয়ে এসেছে কমলার, হঠাৎ দরজার কাছে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর, এই অবেলায় এখনও ঘুমুচ্ছেন, দিদি?

ধড়মড় করে মাদুরের ওপর উঠে বসে কমলা। ছড়িয়ে পড়া মাথার চুলগুলো একত্র করে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পিনাকী সরকারের স্ত্রী বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে বললে, এসো ভাই, এসো।

তারপর গায়ের আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে আবার বললে, না ভাই, অবেলায় ঘুমুচ্ছি না। এইমাত্রই খেয়ে দেয়ে এসে একটু শুয়েছি।

—সেকি, খেয়ে উঠতে আজ এত দেরি?

—হ্যাঁ ভাই, জবাব দেয় কমলা, কর্তা এই মাত্র ফিরলেন।

—ওমা, বলেই জিভে একটা কামড় দিয়ে মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টেনে দেয় বাসন্তী। তারপর কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আবার বললে, ছি ছি, আমার গলার স্বর বোধহয় শুনতে পেয়েছেন উনি। আমি দিদি পালাই। বলেই ফিরে যাবার জন্যে বাসন্তী পা বাড়াতেই কমলা হেসে বাধা দেয়, না-না, চলে যাবে কেন? এসো, বসো। উনি খেয়েদেয়ে উঠে পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। ভয় নেই তোমার। বসো। বলেই মাদুরের একটা প্রান্ত দেখিয়ে দেয়।

থানার চৌহদ্দির মধ্যেই অফিসারদের পাশাপাশি কোয়ার্টার। মধ্যের বড় ফ্ল্যাটটা ও. সি. অর্থাৎ ভবদেবের। তার দু'পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট দু'টোর একটায় থাকে ধূর্জটি গাঙ্গুলী আর অন্যটায় জুনিয়র এ. এস্. আই. সুশান্ত দস্তিদার। তারপরের ফ্ল্যাটটা পিনাকী সরকারের। আর সবশেষের ফ্ল্যাটে থাকে সিনিয়র এ. এস্. আই. বৃদ্ধ শ্রীপতি মিত্র।

ভবদেব ব্যানার্জি যেমন কোতোয়ালী থানার অফিসার-ইন্-চার্জ অর্থাৎ সব চাইতে বড় অফিসার, সেই নিয়মে অন্দরমহলে তার স্ত্রী কমলার সম্মানটাই বেশি। কর্তাদের পজিসনের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের পদগৌরবও একই সূত্রে গাঁথা। আসলে কিন্তু এই অন্দররাজ্যে পিনাকী সরকারের স্ত্রী বাসন্তীর দাপটই একটু বেশি। কমলা সাধারণতঃ অন্য কারুর ফ্ল্যাটে যায় না। নিজের পদগৌরবের মর্যাদা রাখতে গিয়েই যে সে যায় না, তা' নয়। আসলে এটা তার স্বভাব। কখনও কেউ বিশেষ করে বললে তবেই যায়। কিন্তু বাসন্তী অন্য ধরনের স্ত্রীলোক, নিজের পদগৌরব সম্পর্কে সে সবিশেষ সচেতন। যেহেতু ধূর্জটির স্ত্রী নেই, সেইহেতু কমলার পরে সে নিজেকেই অন্দরমহলের নেত্রী বলে মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা করে। তা'ছাড়া কমলার মত শামুকের খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখার স্বভাব তার নয়। তাই সব ফ্ল্যাটের অন্দরেই তার অবাধ যাতায়াত। সকলের হাঁড়ির খবরই তার নখদর্পণে। শুধু তাই নয়, পদাধিকারবলে সুশান্তর কচি বৌ রেখাকে যেমন সে যখন তখন যেচে উপদেশ শোনায়, তেমনি আবার তার চাইতে বয়সে অনেক বড় শ্রীপতি মিত্রের স্ত্রী মহামায়াকেও উপদেশ দিতে ছাড়ে না। কেবল কমলার বেলাতেই যা' একটু ব্যতিক্রম। শত হলেও ও. সি.-র স্ত্রী তো বটে। তবুও মুখ ফস্কে মাঝে মাঝে কমলার সামনেও দু'চারটে বিজ্ঞজনোচিত কথা বেরিয়ে পড়ে। মিতভাষিণী শিক্ষিতা কমলা বাসন্তীর কথায় মনে মনে হাসলেও মুখে কিছু বলে না।

মাদুরের একপাশে বেশ জাঁকিয়ে বসে একথা সেকথার পরে ঘরের মধ্যে আলনায় একখানা পাটকরা শাড়ির দিকে নজর পড়তেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে বাসন্তী। সপ্রশংস দৃষ্টিতে শাড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ওটা কার শাড়ি, দিদি? আপনার?

—কি যে বলো ভাই, জবাব দেয় কমলা, এই বুড়ো বয়সে ঐসব রঙ-চঙে শাড়ি আমাকে মানায় নাকি? ওটা অমিয়ার।

—বাঃ দিদি, এ আবার কি কথা হল? এর মধ্যেই আপনি বুড়ি হয়ে গেলেন? আয়নার সামনে গিয়ে বুঝি অনেকদিন দাঁড়াননি। তাহলে দেখতে পেতেন ঐ শাড়ি তো কোন্ ছাড়, এই চেহারায় আপনাকে আবার নতুন করে চেলিও কত সুন্দর মানায়। বলেই হেসে ওঠে বাসন্তী।

ভদ্রতার খাতিরে হাসতে হয় বলেই কমলাও হাসে, যদিও সে জানে বাসন্তীর এই কথাগুলো অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত বা সে একটু খোসামোদই করছে থানার বড়বাবুর গৃহিণীকে।

—তা, শাড়িটা অমিয়া কবে কিনলো?

—এই তো দিন তিনেক আগে। মেয়ে নিজে দোকানে গিয়ে দেখে শুনে কিনে আনলে, এখন নিজেই আবার খুঁতখুঁত করছে। আজকালকার মেয়ে, ওদের কি মতি স্থির আছে?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাসন্তী আবার জিজ্ঞেস করে, কত দাম নিলে?

—ছাপান্ন টাকা। জবাব দেয় কমলা।

—সত্যিই সুন্দর শাড়িটা। বলেই লুব্ধ দৃষ্টিতে শাড়িটার দিকে আবার তাকায় বাসন্তী।

—শাড়িটা বুঝি তোমার খুবই পছন্দ? কমলা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, দিদি। এমনি একখানা শাড়ির কথা কতদিন ওকে বলেছি। কিন্তু—। কথাটা অসমাপ্ত রেখেই থেমে যায় বাসন্তী।

—তা' কিনে নিলেই তো পারো। সংসারে তো কেবল দু'টো মাত্র প্রাণী।

—আর বলবেন না, দিদি। এই দু'জনের সংসার চালতেই ওকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আসলে তো কুড়ের রাজা। থানায় কাজকর্ম যতটুকু না করলে নয় ঠিক ততটুকুই করে। বাকি সময়টা তো বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়, না হয় আমার সাথে ঝগড়া করেই কাটিয়ে দেয়।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে কমলা অনুযোগের সুরে বললে, এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায় ভাই। পিনাকীবাবুর মত লোককে নিয়েও তোমার খুঁতখুঁতির শেষ নেই। থানার হাঙ্গামা-হুজ্জতের মধ্যে থাকেন না তিনি। পয়সাকড়ির দিকেও লোভ নেই। নিজের কাজটুকু করেন কেবল। আর বাকি সময়টা তোমরা কাছে কাছেই থাকেন। এতেও দেখছি তোমার মন ওঠে না।

পিনাকীর কথায় একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে বাসন্তী। সারা মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে ওঠে, আহা, গুণের একেবারে কার্তিক আর কি! অমন মেয়েমুখো পুরুষগুলোকে আমি একেবারেই সইতে পারি না। পুরুষ পুরুষের মতই থাকবে। ঘরে বাইরে ঘুরবে, কাজকর্ম করবে, পয়সা কড়ি আনবে। তা নয়, দিনরাত কেবল বাড়ির মধ্যে ঘুর ঘুর করা। নাম-যশ পয়সা-কড়িতে এতই যদি নিরাসক্ত তো চাকরি-বাকরি করা কিম্বা বিয়ে-সাদি করার প্রয়োজনটা কি ছিল, শুনি? তার চাইতে নেংটি পরে পাহাড়ে গিয়ে জপতপ করলেই তো হত। কথাটা বলেই গোমড়া মুখে বসে থাকে বাসন্তী।

সেই মুহূর্তে কমলা ঠিক বুঝতে পারে না, এটা বাসন্তীর সত্যিকারের মনের কথা, না স্বামী-গর্ব প্রকাশের কোন কৌশল। পিনাকী সরকারের মত স্বামীকে নিয়েও যে বাসন্তী সন্তুষ্ট নয়, একথা যেন সে সত্যিই বিশ্বাস করতে পারে না।

সংসারে এমনিই হয়। নিজের অবস্থায় কেউই সন্তুষ্ট নয়। নদীর এপার চিরদিনই নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবে যে, যত সুখ বোধহয় নদীর ওপারেই রয়েছে। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না—এই মনোবৃত্তির অনুগত হয়েই গোটা মনুষ্যজাতটা দিনরাত হাহাকার করে মরছে।

একটু সময় চুপ করে থেকে বাসন্তী আবার বললে, একটা খবর শুনেছেন দিদি?

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে কমলা তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

বাসন্তী বললে, শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী মহামায়ার নাকি আবার ছেলেপুলে হবে!

—তাই নাকি? এই বয়সে আবার?

—হ্যাঁ, দিদি। কথাটা সেদিন বলতেই মাথা নিচু করে এমনভাবে একটু হাসলে যেন লজ্জাবতী লতাটি। ধন্যি মেয়েছেলে! এদিকে তো একপাল রয়েছে যাদের দু'বেলা পেটপুরে খেতেও দিতে পারে না। তার ওপর আবার বছর বছর এই কীর্তি। তা, বলিহারি ঐ শ্রীপতিবাবুকেও। এই বয়সেও নিশ্চিন্ত মনে একটির পর একটির জন্ম দিয়ে চলেছেন। এতটুকু চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত নেই। আজ বাদে কাল তো রিটায়ার করবেন ভদ্রলোক। এর পরে, এই একপাল নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবনে সেদিকেও হুঁস নেই। বড় মেয়েটাকে তো আজ পর্যন্ত পার করতে পারলেন না। ঠিক সময়ে বিয়ে দিলে এতদিনে তিন ছেলের মা হয়ে যেত। এদিকে নিজেরা—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে চোখ-মুখের ইঙ্গিতে সেটা প্রকাশ করে বাসন্তী। তারপর আবার বলতে থাকে, বেহায়ার হদ্দ। এদিকে কিছু বললেই বলে—এতে কি মানুষের কোন হাত আছে, ভাই। শুনুন একবার কথার ছিরি। কোথায় এই বয়সে একটু সামলে সুমলে চলবি, তা নয় তো ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কেবল বসে থাকা।

বাসন্তী থামতেই মৃদুকণ্ঠে কমলা বললে, সত্যি ভাই। মহামায়া না হয় মেয়েছেলে। কিন্তু শ্রীপতিবাবুর তো বোঝা উচিত!

—মেয়েছেলে তো হয়েছে কি? চোখ পাকিয়ে বলতে থাকে বাসন্তী, ও নিজেই কি কম যায় নাকি? এদিকে কথাবার্তায় দেখুন যেন ভাজামাছটি উল্টে খেতে জানে না।

কমলা বললে, তা' যাই হোক, মহামায়ার স্বভাবটি কিন্তু বেশ। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও কিন্তু মুখের হাসিটি সবসময় লেগেই রয়েছে। ও বোধহয় রাগতেও জানে না। ওর মুখ থেকে ভুলেও কিন্তু নিজের সংসার কিম্বা নিজের স্বামী সম্পর্কে কোন অনুযোগ কোনদিন শুনতে পাইনি। রাতদিন হাসিমুখে যন্ত্রের মত কেবল সংসারে খেটে চলেছে।

—আর বছরের এমাথায় ওমাথায় দু'বার করে রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর করছে। শ্লেষের সুরে কথাটা বলে নিজের মনের উষ্মা প্রকাশ করে বাসন্তী।

আসলে, কমলার মুখে মহামায়ার এই প্রশংসা ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না বাসন্তী। অন্য কেউ হলে হয়ত মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দিত। নেহাত বড়বাবুর গিন্নী বলেই কিছু বলতে পারে না তাকে।

আপাতদৃষ্টিতে মহামায়ার ওপর বাসন্তীর এই মনোভাবের কোন কারণ না থাকলেও বিচিত্র মনুষ্য-মনের গহন প্রদেশে নিশ্চয়ই কোন কারণ লুকিয়ে আছে। আর সেই কারণটি সম্ভবতঃ সন্তানহীনা নারীর সন্তানবতীর ওপর একটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। তাই সে মহামায়ার এই ঘন ঘন আঁতুড়ঘরে যাওয়াটাকে বোধহয় কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। হয়ত এই কারণটি বাসন্তীর নিজের কাছেও অজ্ঞাত।

—আবার দেখুন দিদি, বলতে থাকে বাসন্তী, স্বামীর প্রশংসায় সর্বদাই যেন ও পঞ্চমুখ। ছিল তো কনস্টেবল্। হয়েছে এ. এস্. আই.। দারোগাগিরিও আর জুটলো না কপালে। তাতেই মহামায়ার কথায় মনে হয় যেন তার স্বামী একটা রাজ্যজয় করে ফেলেছেন। আরে বাপু, এতেই এই! দারোগা কিম্বা ইন্‌সপেক্টর হলে না জানি কি হত!

বাসন্তীর কথায় কিন্তু কমলা সায় দিতে পারে না। তাই সে চুপ করেই থাকে।

একসময় কমলা জিজ্ঞেস করে, সুশান্তবাবুর বাড়িতে যে ভদ্রলোক এসেছেন উনি কে?

—ও, তা' বুঝি জানেন না? উনি তো রেখার দাদা। রেখাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে।

—কেন?

—রেখার মা'র নাকি অসুখ, জবাব দেয় বাসন্তী, এদিকে রেখা বেচারী পড়েছে ভীষণ মুশকিলে। একদিকে নিজের মা আর অন্যদিকে স্বামী। শ্যাম রাখি না কুল রাখি, কিছুই বুঝতে পারছে না বেচারী। বলেই বাসন্তী একটু হাসে।

—তার মানে?

হাসতে হাসতেই জবাব দেয় বাসন্তী, মা'র ওখানে না গেলেও চলে না, আবার সুশান্তবাবুকে একা ফেলে রেখে যেতেও মন চায় না।

—বাব্বাঃ, বিয়ে হয়েছে এখনও একবছর পূর্ণ হয় নি, এর মধ্যেই এত টান? কমলাও হেসে বললে।

—না দিদি, ঠিক তা নয়। আসলে ঐ সুশান্তবাবুকে সামলাতেই বেচারী সদাসর্বদা ব্যস্ত।

—কেন, বেহাত হবার সম্ভাবনা আছে নাকি? তেমনি হাল্কা সুরে প্রশ্ন করে কমলা।

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই বলতে পারেন। বেচারী তাই সবসময় ভয়েই অস্থির।

—কেন, সুশান্তবাবুকে তো তেমন লোক বলে মনে হয় না!

—না—না, তা' নয়। সুশান্তবাবু সত্যিই ভাল লোক। কিন্তু রেখার কেন যেন একটা ধারণা হয়েছে এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে মানুষের পদস্খলনের সুযোগ যেমন অনেক, সম্ভাবনাও তেমনি প্রচুর। তাই বেচারী সর্বদা ভয়ে ভয়ে থেকে স্বামীকে আগলে রেখে চলে।

—তা' হলে তো খুবই মুশকিল। মন্তব্য করে কমলা।

—কি আর এমন মুশকিল, দিদি? এখনও তো নতুন। গা থেকে বিয়ের গন্ধ এখনও যায় নি, তাই ঐ রকম। দু'চার বছর যেতে দিন, দেখবেন তখন সবই গা-সহা হয়ে গেছে। তখন একসঙ্গে সাত দিন মফঃস্বলে পড়ে থাকলেও আর চিন্তা হবে না।

এমনি সময়ে ঠিকে ঝি এসে কমলাকে বললে, স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছি, মা।

—ও, তাই নাকি? বলেই উঠে দাঁড়ায় কমলা। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তীও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা দিদি, আজ তবে যাই

—সে কি? চা না খেয়ে যাবে কোথায়? বসো, চা নিয়ে আসছি। বলেই কমলা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বাসন্তী কিন্তু বসে থাকে না সেখানে। সেও কমলার পিছু পিছু গিয়ে হাজির হয় রান্নাঘরে।

চা তৈরি করতে করতে কমলা কথা বলতে থাকে বাসন্তীর সঙ্গে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতেই বাসন্তী বললে, এই দেখুন আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি।

—কি কথা? মুখ তুলে প্রশ্ন করে কমলা।

—আমাদের থানার সেই ছোক্‌রা মেজবাবুটির কথা।

—কেন, তার আবার কি হল? ওঁর মুখে তো শুনতে পাই অমিতের মত ছেলে নাকি আর হয় না। তার সুখ্যাতি তো ওঁর মুখে সর্বদাই লেগে রয়েছে।

—তা' হয়ত মিথ্যে নয়। জবাব দেয় বাসন্তী, তবে পাথরেরও যে রস আছে। সেখানেও যে ফুল ফোটানো যায়, সেকথা ঐ মেজবাবুটি প্রমাণ করেছে। কথায় কথায় এমন একটি বিজ্ঞজনোচিত চমৎকার উপমা দিতে পেরেছে মনে করে নিজের মনেই খুশি হয়ে ওঠে বাসন্তী।

—সে আবার কি? আশ্চর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করে কমলা।

বলতে থাকে বাসন্তী, থানার ঐ মেজবাবুটি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি নাকি খুবই সুন্দরী। আবার শিক্ষিতাও। বাপের প্রচুর সম্পত্তি।

—তা' ব্যাপারটা তো ভালই। অমিত ছেলেটি যখন খুব চমৎকার তখন মেয়েটি সুখীই হবে। কমলা চায়ের কাপে চিনি ঢালতে ঢালতে অনেকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে।

—ওকথা আর বলবেন না, দিদি। দারোগার স্ত্রী হয়ে কে কতটা সুখী হতে পেরেছে তা' তো আমার অজানা নেই। তাই বলছিলাম, মেয়েটি সুখী হবে কি হবে না তা' এখনই জোর করে কিছু বলা যায় না।

মনে মনে সতর্ক হয়ে ওঠে কমলা। তার মনের কথা কিছু টের পেয়েছে নাকি বাসন্তী? তাই কি সে এমনি সুরে কথাটা বললে?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাসন্তী একটু হেসে আবার বললে, তা' যা-ই বলুন দিদি, থানা পুলিশের ব্যাপারে এই প্রেম-ট্রেমের কথা শুনলেই কেন যেন আমার ভারি হাসি পায়। এ যেন সেই পাথরে ফুট ফোটার মত একটা ব্যাপার।

কমলা কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে কন্যা অমিয়া। তারপর কমলার সামনে উবু হয়ে বসে পড়ে বলে ওঠে, শিগ্‌গীর কিছু খেতে দাও মা। ভারি খিদে পেয়েছে।

—এই যে মা, দিচ্ছি। বলেই কমলা উঠে দাঁড়ায়।

॥ আঠারো ॥

সাহেবদের দেশে ছ'টি মাস কাটিয়ে পুজোর মাস খানেক আগে ফিরে এলাম। গোটা কণ্টিনেন্টটা এই সুযোগে ট্যুর করে এসেছি। সঞ্চয় করেছি কিছু অভিজ্ঞতাও। সেই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। যাদের কাছে ইউরোপের সবকিছুই ভাল, তাদের দলে ভিড়তে আমি রাজি নই মোটেই। সুন্দর দেশ, মোটামুটি সচ্ছল তাদের জীবনযাত্রা। জীবনধারণের মানও উন্নত। কিন্তু ওদের সমাজ-ব্যবস্থায় কোথাও বোধহয় কিছু খুঁত আছে। তাই এত পেয়েও ওদের মনে তেমন শান্তি নেই। যেন একটা অতৃপ্তিতে অহরহ দগ্ধ হচ্ছে ওরা। বিশেষ করে ওদের তরুণ সমাজে এই আপাত অহেতুক অতৃপ্তি খুবই প্রকট। হাতে কলমে সাংবাদিকতা শিক্ষা করতে গিয়ে ওদেশের সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে আমাকে। অনেক বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। চোখ চেয়ে সেই সব ঘটনার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছি আর মনে মনে সমস্যাজর্জরিত নিজের দেশের সঙ্গে তুলনা করেছি। অবশেষে বুঝতে পেরেছি, চাঁদকে দূর থেকে যতটা সুন্দর মনে হয়, আসলে সে হয়ত ততটা সুন্দর নয়। আর আবছা কলঙ্কটুকু দূর থেকে যতই অকিঞ্চিৎকর মনে হোক না কেন, কাছে গেলে সেটাই তখন প্রকট হয়ে চোখে ধরা দেবে। তার শুষ্ক কর্কশ প্রান্তর মানুষের চোখে পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে।

বিদেশ থেকে ফেরার সময় আমার খবরের ঝুলির মধ্যে অমিতের জন্যেও কিছু খবর ছিল। তার নির্দেশ মত গোটা কণ্টিনেন্টের পুলিশী-ব্যবস্থার একটা মোটামুটি চিত্র মনের মধ্যে গেঁথে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। সেই চিত্রের মধ্যে তেমন বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না। পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে কম বেশি ব্যবধান প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি। পুলিশ বাহিনীকে প্রীতির চোখে দেখে তাদের আপনজন মনে করে লোকে তাদের কাছে টেনে নেয়, এমন দেশের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। প্রায় সবদেশেই যেন এই অতি প্রয়োজনীয় মানুষগুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলবার আছে। মুখ ফুটে কেউ তা' বলে, কেউ বলে না। কোথাও তা' সাড়ম্বরে প্রচারিত হয়, কোথাও হয় না। জন-চরিত্রের এই বিশেষ দিক্‌টি মানুষের নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ চিরকালের বিদ্রোহী মন থেকেই সঞ্জাত কিনা তা' হয়ত গবেষণা সাপেক্ষ। আপাত

দৃষ্টিতে পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণের যতটুকু অভিযোগ তার সবটুকুই যে কেবল মাত্র সেই অভিযোগের মধ্যেই লুকিয়ে নেই, তার মূল যে মানুষের মনের অন্য কোথাও নিহিত আছে, সে সম্পর্কে একজন সাইকোলজির ছাত্র হিসেবে আমি নিশ্চিত। পুলিশ অসৎ, পুলিশ অত্যাচারী, পুলিশ কোথাও কোথাও নির্দয় নির্মম—অপ্রিয় হলেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের এইটুকুই বোধহয় সব নয়। আরও কিছু আছে। গণতন্ত্রে জনসাধারণের হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। কিন্তু তাই বলে এককভাবে ব্যক্তিগত কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নয় তারা। সেই অধিকার রয়েছে পুলিশের। জনসাধারণের সেই ক্ষমতা প্রয়োগের হাতিয়ার হচ্ছে পুলিশ। তাই বোধহয় প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী একদল মানবগোষ্ঠীর প্রতি এককভাবে ব্যক্তিগত ক্ষমতাহীন মানুষের মনোভাবের উৎস কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যেই লুকিয়ে নেই। তার খোঁজ করতে হলে মানুষের মনের অতল জলে ডুব দিতে হয়।

ছ'টা মাস সাহেবদের দেশে সাংবাদিকতার শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে এসেও আমার দর কিম্বা কদর তেমন কিছুই বাড়েনি। তাই অনন্যোপায় হয়ে আমার পুরানো কলেজের মাস্টারীতেই আবার যোগ দিতে হল আমাকে। আর সেই সঙ্গে সাংবাদিকতাকেও নেশা হিসেবে ধরে রাখলাম। এককথায় পুনর্মূষিক হলাম আমি। সেই কলেজ, সেই থানা, সেই অমিত। কোতোয়ালী থানার ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জির মুখে আমার সেই পুরানো নাম 'সংবাদপ্রভাকর' আবার নতুন করে শুনলাম। বিলেত ঘুরে এসেছি বলে এবার তিনি সেই নামের আগে একটি 'মিস্টার' শব্দ বসিয়ে নামটিকে বিলিতিকরণ করতে চাইলেন। আমিও তা' মেনে নিলাম।

দীর্ঘ ছ'টা মাস অদর্শনের পর আমাকে কাছে পেয়ে অমিত যেন হাতে স্বর্গ পেল। দু'তিন দিন তো থানাতেই গেল না। ওর ঘরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পের মধ্যে কেটে গেল আমাদের। ছ'মাসের জমানো কথার বিনিময় হল। ভবদেব ধুর্জটি গাঙ্গুলীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, বুঝতে পারছি, এখন দু'তিন দিন আর আপনাদের মেজবাবুর টিকিটি দেখা যাবে না। ওর কাজটা আপনারাই একটু কষ্ট করে চালিয়ে নিন। কম সময় তো নয়, ছ'টি মাস পরে দুই কর্সিকান্ ব্রাদার্সের আবার দেখা হয়েছে!

একদিন গল্প করতে করতে অমিতকে বলেছিলাম, বাব্বাঃ, তুমি দেখছি আমার জন্যে শবরীর প্রতীক্ষায় বসেছিলে। তা' আমার ফিরে আসার মধ্যে তুমি যদি অন্য কোন থানায় বদলি হয়ে যেতে তো কি করতে?

জবাবে অমিত হেসে বলেছিল, যেতাম নাকি তা'হলে? লম্বা ছুটি নিয়ে এখানেই বসে থাকতাম।

বন্ধুগর্বে মনটা সেদিন আমার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঠাট্টার সুরে বলেছিলাম অমিতকে, যাই বলো না কেন, বন্ধুর প্রতি এত টান কিন্তু ভাল নয়। তোমার স্মৃতিকণার কানে খবরটা পৌঁছলে সে কিন্তু মনে মনে কষ্ট পাবে।

—তাই মনে করেছো নাকি? জবাব দিয়েছিল অমিত, তার বুঝি জানতে বাকি আছে? একটু থেমে অমিত আবার বলেছিল, জানো ভাই, একদিন কথায় কথায় স্মৃতিকে বলেই ফেলেছিলাম—দরকার হলে তোমাকেও ছাড়তে পারি, কিন্তু তরুণকে নয়।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে আমি বলেছিলাম, সর্বনাশ! করেছো কি? জবাবে স্মৃতিকণা কি বললে?

—না, সাংঘাতিক কিছু বলেনি। কেবল হেসে বলেছিল—একবার চেষ্টা করেই দেখুন না। দেখবেন আপনার সেই বন্ধুটিই তখন আপনাকে ত্যাগ করবে। শ্যাম ও কুল আপনার দু'টোই যাবে।

বাঃ, চমৎকার! খুব ভাল কথাই বলেছে স্মৃতিকণা। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠি আমি। তারপর একটু গম্ভীরকণ্ঠে আবার বললাম, কিন্তু ভাই, এটা তো ভালো লক্ষণ নয়! তুমি এতদিনেও তাকে 'আপনি'র গণ্ডি ছাড়িয়ে 'তুমি'তে নিয়ে আসতে পারলে না?

জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে কেবল একটু হেসেছিল অমিত।

আমার বৃদ্ধা দিদিমার অনুরোধে পুজোর দিন ক'টা আমাকে দেওঘরে তাঁর সঙ্গে কাটাতে হয়েছিল। পুজোর সময় ঘরছাড়া হতে চাইছিলাম না। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়। বৃদ্ধা দিদিমা তাঁর এই বিলেত ফেরত নাতিকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সবুর আর সইছিল না তাঁর। তা'ছাড়া বাড়িতে মা'র ক্রমাগত তাগাদা। তাই পুজোর দিন সকালেই বেরিয়ে পড়লাম।

বেচারা অমিত, ওর জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয়। আমি কাছে নেই। তার ওপর স্মৃতিকণাও তার ছোট ভাই শঙ্করকে নিয়ে কলকাতায় মামার বাড়ি চলে গেছে। এবার তারা পুজোটা কলকাতাতেই কাটাবে।

পুজোর ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিল অমিত। ইচ্ছে ছিল দেশে অর্থাৎ শিলিগুড়ি যাবে। অনেকদিন মা-বাবাকে দেখেনি। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়নি তার। এই সময় সাধারণতঃ পুলিশের ছুটি মঞ্জুর হয় না। জনসাধারণ যখন কোন আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে, পুলিশের কাজ তখন বেড়ে যায়।

এ যেন ঠিক সেই উল্টোপুরাণ, জনসাধারণ যখন ঘুমোয়, পুলিশ তখন জেগে থাকে। জনসাধারণ যখন উৎসব আনন্দে মেতে ওঠে, পুলিশকে তখন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

আমাদের দেশে আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও দলাদলি-হানাহানির বিরাম নেই। একই পাড়ায় দু'টো সার্বজনীন দুর্গোৎসব। দু'টো দলের রেষারেষি থেকেই এই দু'টো পুজোর সৃষ্টি। এই নিয়ে গতবছরও এখানে দু'দলে মারামারি হয়ে গেছে। পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে তার বিবরণ। মারামারি হলেও দু'দলের সদস্যরা প্রায় সকলেই অক্ষতদেহে রয়ে গিয়েছিল। মাঝখান থেকে ইটের ঘায়ে এক দর্শনার্থিণী মহিলার মাথা ফেটে গিয়ে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, এবং যথানিয়মে সমস্ত দোষ এসে পড়েছিল পুলিশের ঘাড়ে। তাদের বিরুদ্ধে ছিল নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ।

অবশ্য অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল না। দু'জন কনস্টেবল্ ডিউটিতে ছিল সেখানে। কিন্তু লাঠি, ইট, সোডার বোতল হাতে বিবাদমান দু'টো দলের কাছে লাঠিধারী দু'জন কনস্টেবলের শক্তি কতটুকু?. তাই নাটক জমে উঠতেই তারা থানায় খবর পাঠায়। থানা থেকে গাড়ি বোঝাই পুলিশ বাহিনী এসে পৌঁছবার আগেই নাটকের যবনিকা পতন। কেবল সেই ভদ্রমহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল পুজোমণ্ডপের সামনে। আর তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল দু'চারজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

তারপর একটি বছর কেটে গেছে। এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই হয়ত সেদিনের কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ভুলতে পারেনি। সেই কথা মনে রেখেই ভবদেব

ব্যানার্জি এবার একটি শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করেছে সেখানে। আর সেই বাহিনীর নেতৃত্বে প্রথমদিন নিয়োগ করেছে কোতোয়ালী থানার মেজবাবু অমিত রায়কে।

মহাসপ্তমীর সন্ধ্যা। প্রায় পাশাপাশি দু'টো পুজোমণ্ডপের মাঝামাঝি জায়গায় দু'খানা লম্বা বেঞ্চের ওপর বসে আছে লাঠি ও বন্দুকধারী কনস্টেবল্ বাহিনী, একপাশে একখানা চেয়ারে পোশাক পরা অমিত। মাথার টুপিটা খুলে রেখেছে হাঁটুর কাছে। কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর। এবছর আবার গতবারের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সম্পূর্ণ দায়ী হতে হবে তাকেই।

চারিদিকে আলোর রোশনাই। একটি মণ্ডপে মাইকের গলা ফাটানো চিৎকার। অন্যটিতে ঢাকের আওয়াজ। দর্শনার্থীর ভিড় কিন্তু এবারেও কম নয়, বরঞ্চ বেশি। কারণ রেষারেষির পরিণতিতে সারা শহরে এই দু'টো পুজোমণ্ডপই সবচাইতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অলসভাবে চেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে অমিত। এলোমেলো নানা কথা ভাবতে থাকে সে। দেশের কথা মনে হয়। মনে পড়ে তার ছোট ভাই-বোনদের কথা, তার মা-বাবার কথা। তারাও হয়ত এখন মণ্ডপে প্রতিমা দেখে বেড়াচ্ছে। হাসি-আনন্দে ভরপুর তাদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার ছুটি না পাওয়ার চিঠিখানা পেয়ে তার মায়ের মুখখানা কেমন হয়ে উঠেছিল? হয়ত তিনি কেঁদেই ফেলেছিলেন। হয়ত আজও তিনি নিভৃতে সকলের অগোচরে তার জন্যে চোখের জল ফেলছেন। আনন্দের দিনগুলোয় তাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ তার মার চাইতে বেশি আর কার বুকে বাজবে? কিন্তু অমিত নিরুপায়। সে শুধুমাত্র চাকরির বাঁধনেই বাঁধা নয়, কর্তব্যের বাঁধনেও সে বাঁধা। জনসেবার যে মহান আদর্শ নিয়ে সে এই চাকরিতে এসেছিল, তাতে নিজেকে যে অনেক দিক্ থেকেই বঞ্চিত রাখতে হবে এটা তো অজানা ছিল না তার। তবে কেন তার এই চিত্তচাঞ্চল্য? কেন তার এই ভারাক্রান্ত মন?

জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন যেন তাদের সঙ্গে মিশে যায় অমিত। পুলিশের পোশক ছেড়ে সেও যেন নতুন জামা-কাপড় পরেছে। একটু আগেই যেন সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে। মা'র উৎকণ্ঠিত মুখখানা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তিনি যেন বললেন, বেশি ঘোরাঘুরি করিস্ না যেন, বাইরে কিন্তু হিম পড়তে আরম্ভ করেছে। অসুখ-বিসুখ করতে পারে। বাবাও যেন তাঁর পুরু লেন্সের চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, বেশি ঘোরাঘুরি না করাই ভাল। রাস্তায় এসেই কিন্তু ভাই-বোনেরা যেন কলরব করে ওঠে—না দাদা, তা' হবে না। অনেকদূর যাব আমরা। অনেক জায়গায় ঘুরব, অনেক প্রতিমা দেখব। শুধু কি ভাই-বোনেরা? ওদের দলে আর একজন রয়েছে না? ঐ তো স্মৃতিকণাও তো রয়েছে ওদের মধ্যে। নতুন জামা কাপড়ে কেমন সুন্দর মানিয়েছে তাকে। মিষ্টি লাজুক হাসি হেসে সেও যেন ওদের কথায় সম্মতি দিয়ে বলছে, হ্যাঁ, তাই হবে। অনেক প্রতিমা দেখব আমরা। সবাইকে নিয়ে ভিড় ঠেলে যেন মণ্ডপের দিকে এগিয়ে চলেছে অমিত। খুশির আমেজে সে ভরপুর।

—এই ছোক্‌রা, উধার যাও। উধার যাও। একজন কনস্টেবলের কর্কশকণ্ঠে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে অমিতের। মুহূর্তে সেই সুন্দর ছবিখানি সরে যায় চোখের সামনে থেকে।

একটি বারো-তেরো বছরের ছোক্‌রা পুলিশ বাহিনীর প্রায় গায়ের কাছেই একটি তুবড়িতে আগুন দেবার তোড়জোড় করছিল। কনস্টেবলটি তাকেই সরে যেতে বলছিল।

কনস্টেবলটির কথা যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না সেই ছোক্‌রাটি। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পুলিশ বাহিনীর দিকে তাকিয়েই আবার নিজের কাজে মন দিলে।

অমিতে দেখলে বিপদ। ঐ তুবড়ির আগুন পুলিশ বাহিনীর গায়ে পড়ার সম্ভাবনা। তাই সে এবার চেয়ারের ওপর নড়ে-চড়ে বসে ছোক্‌রাটিকে বললে, খোকা, একটু ঐদিকে সরে গিয়ে আগুন দাও।

—কেন, এখানে আগুন দিলে কি হবে? ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে অমিতের দিকে তাকিয়ে ছোক্‌রাটি বলে ওঠে, আপনাদের যদি ভয় থাকে তো সরে বসুন না।

ছেলেটির কথার ভঙ্গিতে অমিতের মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে জ্বলে যায়। অতটুকু ছেলে, তার কথার বলার ঢং কি রকম! ভয়ডর বলে কিছু নেই, দারোগা পুলিশকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না! মিষ্টিসুরে কথা বললেও কানে তোলে না। একটা বিশ্রী বেপরোয়া ভাব যেন।

অমিত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একটি যুবক এসে ছোকরাটিকে মৃদু ধমক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। নিজের চেয়ারে এসে আবার বসে পড়ে অমিত।

বসে বসে ঐ ছেলেটির কথাই অমিত ভাবতে থাকে। এরাই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। গোটা দেশটাকে এরাই একদিন পরিচালনা করবে। কিন্তু কি বিশ্রীভাবে ওদের মনের কাঠামোটা তৈরী হচ্ছে। সভ্যতা-ভব্যতা প্রভৃতি শব্দগুলো এদের একেবারেই অজানা। নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রভৃতি কথাগুলো এদের অভিধানের বাইরে। বাড়িতে এরা শাসন মানে না, স্কুলের শাসনকে এরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে উড়িয়ে দেয়। দেশের আইন-কানুনের প্রতি কোন শ্রদ্ধাই নেই এদের। আইন ভঙ্গ করতে অফুরন্ত উৎসাহ। দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের এরা পরোয়াই করে না।

ভাবতে ভাবতে সিনিয়র এ. এস. আই শ্রীপতি মিত্রের একটা কথা মনে পড়ে অমিতের। বৃদ্ধ শ্রীপতির কাছে অতীতের সবকিছুই ভালো। সেই ব্রিটিশ যুগে পুলিশের দাপটের কথা বলতে বলতে এখনও সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তেমন শ্রোতা পেলে সে এখনও পঞ্চমুখে সেই সব কাহিনী বিবৃত করে।

সেকালে পুলিশের দাপটের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ শ্রীপতি একদিন অমিতকে সরলভাবেই বলেছিল, বুঝলেন মেজবাবু, আপনারা তো হলেন একালের দারোগা। পেটে বিদ্যে আছে, মগজে বুদ্ধিও আছে কিন্তু, সেকালের অল্পশিক্ষিত দারোগাদের ক্ষমতার শতাংশের একাংশও আপনাদের নেই। জানেন, সেকালে তাদের কিরকম দাপট ছিল?

মনে মনে একটু হেসে অমিত কেবল তাকিয়েছিল শ্রীপতির মুখের দিকে।

—তবে শুনুন! বলেই বলতে আরম্ভ করেছিল শ্রীপতি, একবার হয়েছে কি, কোন এক জেলার এক সাহেব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ কোন কাজে মোটর গাড়ি করে সদলবলে কোথাও চলেছেন মেঠো গ্রাম্যপথ ধরে। যেতে যেতে তাঁর গাড়িটা গেল হঠাৎ খারাপ হয়ে। অনেক চেষ্টা করেও সেই অচল গাড়িকে আর সচল করা গেল না। এখন উপায়? বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন সাহেব। তারপর সদলবলে পায়ে হেঁটেই চললেন গন্তব্যস্থলের দিকে। গ্রাম্যপথ ধরে চলেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। হঠাৎ তার নজর পড়ল একটি গ্রাম্য বৃদ্ধার ওপর। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধা একবোঝা কাঠ নিজের মাথায় তুলতে অনেক চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। সে শক্তি তার নেই। সাহেবের দয়া হল। বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপর নিজের আর্দালিকে নির্দেশ দিলেন কাঠের বোঝাটি বৃদ্ধার মাথায় তুলে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে আর্দালী তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করলে। বৃদ্ধা খুব খুশি,

সাহেবের এত দয়া! ফোক্‌লা মুখে হাসি ফুটিয়ে বৃদ্ধা সাহেবের পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই দলের একজন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—ইনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এই জেলার শাসনকর্তা। শুনে বৃদ্ধা তো আরও খুশি। সোজা কথা তো নয়, স্বয়ং জেলাশাসক তার এই উপকারটুকু করলেন। তাই কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে নিজের পথে যাবার আগে বৃদ্ধা সাহেবের দিকে একটা হাত প্রসারিত করে তাকে আশীর্বাদ করে বললে, তোমার এত দয়া সাহেব। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি দারোগা হও।

শুনে দলের সকলের তো চক্ষুস্থির! সাহেব বাংলা বোঝেন না, তাই একজন অনুচরের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধা কি বলে গেল তা' জানতে চাইলেন। স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মুখের ওপর কি করে অনুচরটি মিথ্যা কথা বলে? তাই একটা ঢোক গিলে সে শুধু জবাব দিলে—যাবার আগে বৃদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেল।

সাহেবও নাছোড়বান্দা। আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি বলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে?

অনুচরটি এবার আর কিছু না লুকিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেললে। বললে—বৃদ্ধা আপনাকে আশীর্বাদ করে গেল যেন আপনি দারোগা হতে পারেন।

—হোয়াট! চমকে উঠলেন সাহেব। গম্ভীরমুখে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বললেন, আই সি! এ সাব-ইন্সপেক্টর ইজ দি বস্ অব এ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট!

কাহিনীটা শেষ করে শ্রীপতি একটু হেসে অমিতকে আবার বলেছিল, বুঝলেন মেজবাবু, সেকালে এইরকম ছিল দারোগার প্রতাপ।

অমিত কিন্তু এ ধরনের একটা অবস্থার মোটেই পক্ষপাতি নয়। একথা মনে হলেই তার মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কোন্ অধিকারে পুলিশ জনসাধারণের প্রভু হয়ে বসবে? কে তাদের সেই ক্ষমতা দিয়েছে? তাদের সেবা করবার জন্যেই এই বাহিনীর সৃষ্টি। বিপদে-আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোই তাদের কর্তব্য। এর মধ্যে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নেই। আছে কেবল একটি সম্পর্ক। সেটা হচ্ছে বন্ধুত্বের। দেহের ওপর থেকে মাছি তাড়িয়ে দেয় বলে হাত কি দেহের উপর কর্তৃত্ব করে নাকি? ওটা যে গোটা দেহেরই একটি অংশ। বাইরের বিপদ-আপদ থেকে দেহটাকে রক্ষা করাই যে ওর কাজ।

পুলিশের কাছে কোন মামলা দায়ের হলে পুলিশ অফিসাররা যে বস্তুটির ওপর সবচাইতে বেশি নজর দেয় তার নাম ফার্স্ট ইন্‌ফরর্মেশন রিপোর্ট—সংক্ষেপে এফ্ . আই. আর। সাবেকী লোকেরা বলত, প্রথম এত্তেলা। কোন অভিযোগকারিণীর কাছ থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নিতে গিয়ে থানার অফিসারকে সবচাইতে বিব্রত হতে হয় যে ধরনের মামলায়, তার নাম নারীধর্ষণ। একটি অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা যুবতীর মুখ থেকে তার চরমতম অপমানের কাহিনী বের করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না। কেবল মোটামুটি কাহিনীটা জেনে নিলেই চলবে না, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে হবে এই রিপোর্টের মধ্যে। নইলে দুষ্কৃতকারী হয়ত শাস্তি এড়িয়ে যাবে। ব্যর্থ হয়ে যাবে মামলার উদ্দেশ্য।

এ তো গেল এধরনের ঘটনার একটিমাত্র দিক। থানায় গিয়ে না হয় চোখ-নাক বুজে একজন পুলিশ অফিসারের কাছে সেই লাঞ্ছনার কাহিনী নিজের মুখে বিবৃত করা গেল। কিন্তু এটাই তো সব নয়। আসল কাজ হচ্ছে আদালতে। সেখানে সর্বসমক্ষে সেই লজ্জার কাহিনী

বর্ণনা করতে হবে। পাব্লিক প্রসিকিউটর অভিযোগকারিণীকে প্রশ্ন করতে গিয়ে হয়ত কিছুটা দয়াদাক্ষিণ্য দেখাতে পারেন। জবাব দিতে গিয়ে যতটা সম্ভব কম লজ্জিত হতে হয় তেমন ধরনের প্রশ্ন হয়ত তিনি করতে পারেন। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর পক্ষের উকিলের কোনই দয়ামায়া নেই। অভিযোগকারিণীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে নিজের মক্কেলের খালাসের পথ সুগম করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

সেদিন ভবদেব ব্যানার্জিকেও বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল যোল-সতের বছরের যুবতী পার্বতীর কাছ থেকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জোগাড় করতে।

রাত তখন প্রায় আটটা। পৌঢ়া বিধবা সুলোচনা তার কন্যা পার্বতীকে নিয়ে এসে থানায় হাজির। শহরতলী সংলগ্ন একটি গ্রাম থেকে সাইকেল-রিক্সায় সোজা থানায় এসে হাজির হয়েছে তারা। ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক সন্ধ্যায়। তাদের সঙ্গে সাইকেলে চেপে গাঁয়ের আরও দু'তিন ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছে।

তখন অন্য কোন অফিসার উপস্থিত ছিল না থানায়। থানা-ডিউটি ছিল জুনিয়র এ. এস. আই. সুশান্তর। আর নিজের কক্ষে বসে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবেছিল ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জি।

সুশান্তর প্রশ্নের জবাবে মা ও মেয়ে দু'জনেই কাঁদতে থাকে। কিন্তু ঘটনার কথা কেউই মুখ ফুটে বলে না। সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সুশান্ত শুধুমাত্র এইটুকু বুঝতে পারে যে, রমানাথ সাহা নামে গাঁয়ের একজন অবস্থাপন্ন প্রৌঢ় ব্যক্তি পার্বতীর অবমাননা করেছে। গাঁয়ের লোকেরা রমানাথের নাগাল পায়নি। সে নাকি বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে বসে রয়েছে। সে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই গাঁয়ের লোকেরা ঘিরে রেখেছে তার বাড়িটা।

জেরা করেও পার্বতীর কাছ থেকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ বের করতে না পেরে অবশেষে ভবদেবের শরণাপন্ন হতে হল সুশান্তকে। বললে, একটা রেপ্ কেস্ এসেছে বড়বাবু। কিন্তু এজাহার নিতে পারছি না। মেয়েটা কিছুই বলতে চাইছে না।

কাগজপত্র থেকে মাথা তোলে ভবদেব। এক মুহূর্ত চিন্তা করে। একটা মৃদু হাসির রেখা তার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। তারপর সুশান্তর দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বললে, তোমার পক্ষে এজাহার না নেওয়াই ভালো। এজাহার বইটা ও মেয়েটাকে আমার কাছেই পাঠিয়ে দাও।

একটু যেন বিমর্ষ দেখায় সুশান্তকে। ভবদেবের কথার দুটো অর্থই হয়। একটি হচ্ছে, এই কেসের মত একটি জটিল ব্যাপারের এজাহার তোমার মত অল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে না নেওয়াই ভালো। অন্যটি হচ্ছে, তুমি অল্পবয়সী অফিসার। তোমার কাছে মেয়েটা মুখ খুলতে লজ্জা পাচ্ছে। তাই তুমি এজাহার নিও না।

অর্থ যা'-ই হোক না কেন, বড়বাবুর কথায় একটু যেন আশাহত হয় সুশান্ত। গায়নোকোলজির নতুন ছাত্ররা রোগিনীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে মনে মনে যে কৌতূহল অনুভব করে, তার মত একজন অল্পবয়সী অফিসারও ঠিক তেমনি কৌতূহল বোধ করে একটি তরুণীর নিজের মুখে তার লাঞ্ছনারর কাহিনী শুতে গিয়ে। সে কাহিনী যতই মর্মস্পর্শী, যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, ঘৃণায় মনটা যতই কেন না রি-রি করে উঠুক, তা' শোনার কৌতূহল কিন্তু নিবৃত্ত হয় না। অনেকটা গভীর রাতে ভূতের গল্প শোনার মত।

বহুদর্শী ভবদেব কিন্তু পার্বতীকে 'মা' বলে সম্বোধন করে কথার মায়াজালে অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে বশীভূত করে ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে লিপিবদ্ধ করে। তারপর তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

হাসপাতালের নাম শুনে প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল পার্বতী। বলেছিল, কেন, আবার হাসপাতালে কেন?

জবাবে দরদভরা কণ্ঠে তাকে আশ্বাস দিয়ে ভবদেব বলেছিল, কিছু ভয় নেই মা। ডাক্তার তোমাকে একবার পরীক্ষা করবে শুধু। বড় জোর একটা দিন তোমাকে সেখানে থাকতেও হতে পারে। তারপর সেখান থেকেই তুমি সোজা বাড়ি চলে যাবে।

—কিন্তু—! ভীত চোখজোড়া মেলে ভবদেবের মুখের দিকে তাকিয়েছিল পার্বতী।

ভবদেব বলেছিল, তোমার কোন চিন্তা নেই, মা। কোন অসুবিধা হবে না তোমার।

পার্বতীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে অন্য সবাইকে বিদায় দিয়ে সুশান্তকে ডাকে ভবদেব। তারপর বললে, দু'জন কনস্টেবল্ রেডি করো। মামলার তদন্তে এখনই বেরোতে হবে। বলা তো যায় না, গাঁয়ের লোক যেভাবে ক্ষেপে গিয়ে আসামীর বাড়ি ঘিরে রয়েছে তাতে শেষপর্যন্ত একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। আর, লোকটাকে এ্যারেস্ট করাও প্রয়োজন।

কনস্টেবল্ রামলক্ষণ চৌবে ও অভয়পদ হালদারকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালী থানার ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জি যখন সেই গ্রামে এসে হাজির হয় তখনও গাঁয়ের লোকেরা ঘিরে রেখেছিল রমানাথ সাহার পুরনো পাকা বাড়িটা।

না, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তারা কিছুই করে নি। জনাকয়েক কেবল বসেছিল বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে, আর কয়েকজন বাড়িটার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল যাতে সেই পাষণ্ড লোকটা পালিয়ে যেতে না পারে। রমানাথকে হাতের কাছে পেলে তারা নিঃসন্দেহে তাকে আধমরা করে ছাড়ত। কিন্তু তাই বলে তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে কোন হাঙ্গামা বাধায়নি তারা।

মনে মনে একটু আশ্বস্ত হয় ভবদেব। যাক, গাঁয়ের লোকগুলোকে ভালই বলতে হবে। নইলে হয়ত আবার রায়টিং কিম্বা ট্রেস্পাসের কোন মামলা দায়ের করতে হত।

ভীত-সন্ত্রস্ত রমানাথ সাহা লুকিয়ে ছিল বাড়ির মধ্যে। স্ত্রী দময়ন্তী ম্লানমুখে বসেছিল বারান্দায় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের সামনে। ব্যাপারটা যে এমন ঘোরালো হয়ে উঠবে তা' ঠিক বুঝতে পারেনি তারা।

পুলিশের আগমনের খবরে প্রৌঢ় রমানাথ একটু আশ্বস্ত হয়। যাক্, তা'হলে প্রাণের আশঙ্কা নেই আর।

রমানাথকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি ভবদেবের। বরঞ্চ, গাঁয়ের ক্রুদ্ধ লোকের হাত এড়িয়ে সে যে সোজাসুজি পুলিশের হাতে পড়েছে তাতে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে রমানাথ। কেবল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় রমানাথ যে অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্ত্রী দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেই দৃষ্টির অর্থ সেই মুহূর্তে ভবদেব বুঝতে না পারলেও তিন-চারদিন পরে তদন্তশেষে সমস্ত ব্যাপারটাই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। শুধু তাই নয়, অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষের কামনা-বাসনা সময় সময় কি ভয়ঙ্কর বীভৎস রূপ নিতে পারে তার প্রমাণ পেয়ে মনে মনে সেদিন ভবদেবের মত ঝানু অফিসারও শিউরে উঠেছিল।

প্রৌঢ় রমানাথ সাহা লোকটা কিন্তু খারাপ ছিল না মোটেই। তিনপুরুষ ব্যবসাদার ওরা, গ্রামের বাড়িখানাও পৈতৃক। ইদানীং ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা পড়ায় শহরে তেলের কারবারটা দেখাশোনা করত তার ছোট ভাই বামাচরণ। রমানাথ মাঝে-মধ্যে সেখানে যেত। বাকি

সময়টা বাড়িতেই কাটাত। বামাচরণ শহরেই তাদের আর একটা পৈতৃক বাড়িতে সপরিবারে বাস করত।

ছেলেপুলে ছিল না রমানাথের। সংসারে একমাত্র স্ত্রী দময়ন্তী। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কোনই অভাব ছিল না দময়ন্তীর। কিন্তু কিছুদিন থেকে দময়ন্তীর মনে হচ্ছিল তার স্বামী রমানাথ যেন ক্রমশই নিস্তেজ নির্জীব হয়ে পড়ছে। তার নিজের উপস্থিতি রমানাথের মনে তেমন করে যেন আর সাড়া জাগায় না। তাদের স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান মাত্র ন'দশ বছর। দময়ন্তী মনে মনে হিসেব করে, রমানাথ প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করলেও এই বয়সেই তার স্ত্রীর প্রতি নিস্পৃহতা আসার কথা নয়। মনে মনে শংকা বোধ করে দময়ন্তী। তার নিজের বয়সও কম নয়। মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে অনেক। তবুও সে অনুভব করে তার নিজের দৈহিক চাহিদার তেমন কোন ঘাটতিই হয়নি। রমানাথকে সে চায়। তাকে একান্তভাবে চায়, যেমনি করে সে চাইত আজ থেকে আট-দশ বছর আগে। দময়ন্তীর চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান যতই বাড়তে লাগল ততই সে শংকিত হয়ে উঠল। রমানাথ কিন্তু নির্বিকার। স্ত্রীর অনুযোগের জবাবে মৃদু হেসে বলত, আর কেন, অনেক তো হল! বয়সটা তো আর কম হল না!

স্বামীর কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠত দময়ন্তী। বলত, এই করেই তুমি বুড়িয়ে যাচ্ছো!

অশিক্ষিত গ্রাম্য স্ত্রীলোক দময়ন্তী। সচ্ছল আয়েসী জীবনে এই ব্যাপারটাই তার জীবনের প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে উঠলো। রাতদিন কেবল ঐ এক চিন্তা, এক ভাবনা।

পাশের বাড়ির বিধবার একমাত্র মেয়ে পার্বতী দময়ন্তীকে বৌদি বলে ডাকত। সন্তানহীনা দময়ন্তীর নিঃসঙ্গ জীবনে এই পার্বতীই যখন-তখন তাদের বাড়ি এসে গল্পগুজব করত। ধীরে ধীরে এই অসমবয়সী দু'টি নারীর মধ্যে গড়ে উঠল এক সখ্যতা। দিনের অধিকাংশ সময়ই পার্বতীর কাটত দময়ন্তীর সান্নিধ্যে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দময়ন্তী গোপনে এক গ্রাম্য কবিরাজের শরণাপন্ন হল প্রথমে। কবিরাজ সুযোগ পেয়ে বেশ কিছুদিন দু'পয়সা রোজগার করে নিল তার কাছ থেকে। কিন্তু ফল কিছুই হল না। অবশ্য কিছুই যে ফল হবে না তা' সেই কবিরাজ নিজেও জানত। নদীতে যখন ভাটা শুরু হয় তখন শত চেষ্টা করেও কি তাতে জোয়ারের স্রোত জাগিয়ে তোলা সম্ভব?

অবশেষে নিরুপায় দময়ন্তী কালিদাসীর দ্বারস্থ হল। এই স্ত্রীলোকটি ছিল গাঁয়ের সকলের দু'চোখের বিষ। কেউ তাকে দেখতে পারত না কেবল তার ধারালো জিভখানার জন্যে। সত্যি-মিথ্যা বানাতে সে ওস্তাদ। ঝগড়া-বিবাদে সে সিদ্ধহস্ত। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেহে তার এঁয়োতির চিহ্ন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন তার স্বামীকে দেখতে পায়নি। এমনকি তার পরিচয় পর্যন্ত জানে না কেউ। বছর পনের আগে এই স্ত্রীলোকটি সেই যে গাঁয়ে এসে জাঁকিয়ে বসেছিল, আজও ঠিক তেমনি রয়েছে। সহসা কেউ তার কাছে ঘেঁষতে চায় না। লোকে বলে, এককালে নাকি সে শহরে গণিকাবৃত্তি করত। সেই সময় নাকি একটি লোকের সঙ্গে বিয়েও হয়েছিল তার। সেই লোকটি আজ বেঁচে আছে কি মরেছে তা' বোধহয় আজ কালিদাসী নিজেও জানে না। কিন্তু এয়োতির চিহ্ন আজও তার অঙ্গে।

কালিদাসীকে সকলেই এড়িয়ে চলতে চাইলেও প্রয়োজনে কিন্তু কেউ কেউ আসত তার কাছে। ঝাড়ফুক্ জানত কালিদাসী। টোট্‌কা চিকিৎসাতেও সে ছিল পারদর্শিণী।

লোক মারফত গোপনে কালিদাসীকে ডাকিয়ে এনে দময়ন্তী কথাটা পাড়তেই কালিদাসী তো প্রথমটায় হেসেই খুন। পানদোক্তা-ভরা মুখে প্রায় বিষম খাওয়ার মত অবস্থা তার।

অবশেষে নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললে, এ রোগের ওষুধ তো আমার জানা নেই। আর রোগই বা বলি কি করে? এই বয়সে এটাই তো স্বাভাবিক।

ভুরু কুঁচকে জবাব দেয় দময়ন্তী, না, তা' নয়। এ একটা রোগ। নইলে ওর এমন বয়স হয় নি যে—

দময়ন্তীর অবস্থা দেখে এবার মনে মনে হাসে কালিদাসী। কিন্তু নিজের কালো কুচ্‌কুচে হাঁড়ির মত মুখখানায় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে বললে, মরণ আর কি! এই বয়সে তোমাকে ছোকরা-রোগে ধরেছে। তা' এতই যদি জ্বালা তো দেখেশুনে গাব্‌দা-গোব্‌দা একটা ছোকরা যোগাড় করে নিলেই তো পারো!

—কালিদাসী! প্রায় চিৎকার করে ওঠে দময়ন্তী, এসব কি বলছো তুমি? তোমার সাহায্য চেয়েছি বলে কি এমনি যা-তা কথা বলবে?

নিজেকে সামলে নেয় কালিদাসী। বুঝতে পারে, দময়ন্তীর মুখের ওপর দুম্‌ করে এমনি একটা কথা বলা ঠিক হয়নি তার। যতই হোক, গেরস্থ ঘরের বৌ তো বটে!

তাই সে ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করে দিতে গিয়ে হেসে উঠে আবার বললে, ঠাট্টাও বোঝ না, সা'গিন্নী? তারপর মাথা নেড়ে আবার বললে, সত্যি বলছি এসব রোগের ওষুধ আমার জানা নেই। তবে—

কালিদাসীর কথায় প্রায় মুষ্‌ড়ে পড়েছিল দময়ন্তী। কিন্তু তার শেষের কথায় হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠে প্রশ্ন করে, তবে কি? আছে নাকি কোন ওষুধপত্তর?

—না—না। জবাব দেয় কালিদাসী, ওষুধপত্তর সত্যিই নেই। তবে শুনতে পাই যে— বলেই একটু থেমে পরক্ষণেই সবেগে মাথা নেড়ে আবার বলে ওঠে, না—না, তা'সম্ভব নয়। তাতে বিপদ অনেক। ওসব কথা চিন্তা করে কোন লাভ নেই।

দয়মন্তী ততক্ষণে প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। উপায় একটা বের করতেই হবে। তাই সে চেপে ধরে কালিদাসীকে। বললে, না, তা' হবে না। বিপদ যা-ই থাক না কেন, কথাটা তোমাকে খুলে বলতেই হবে।

কালিদাসী এবার মুখ বেঁকিয়ে বললে, না, তা' হয় না। তোমরা যে ভদ্রলোক, তোমাদের ভদ্রসমাজে সে-সব অচল।

পীড়াপীড়ি করতে থাকে দময়ন্তী। অবশেষে একসময় চোখ দুটো কুচ্‌কে মুখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করে মৃদুকণ্ঠে মাথা দুলিয়ে কালিদাসী বলে ওঠে, কথায় আছে—পাকা হরিতকীর আঁশ, কালো গোলাপের বাস আর কুমারী মেয়ের মাস, এই তিনটের যে কোন একটিতেই নাকি আশি বছরের বুড়োকেও আঠারো বছরের ছোকরা বানিয়ে দেওয়া যায়। তা, পাকা হরিতকীও পাওয়া যায় না, আর কালো গোলাপও ফোটে না, তাই একমাত্র কুমারী মেয়ের মাংস জোগাড় করতে পারলেই তা' সম্ভব।

কুমারী মেয়ের মাংস বলতে কালিদাসী কি বলতে চাইছে তা' ব্যাখ্যা করে না বোঝালেও বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না দময়ন্তীর। তাই সে কেবল একটু চম্‌কে উঠেই হা-করে তাকিয়ে থাকে কালিদাসীর দিকে।

কালিদাসী একসময় চলে যায়। কিন্তু যে কথা সে দময়ন্তীর কানে পৌঁছে দিয়ে গেল তা' যেন অহরহই তার কানের কাছে বাজতে থাকে। অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত স্ত্রীলোক দময়ন্তী। তার মনের আনাচে-কানাচে কেবল গাঁয়ের কুমারী মেয়েদের মুখগুলি ঘোরাফেরা করতে থাকে। কুমারী মেয়ে—একটি কুমারী মেয়ে চাই তার। সে-ই হতে পারে তার মুস্কিল আসান।

কিন্তু কি করে, কেমন করে যোগাড় করবে একটি সত্যিকারের কুমারী মেয়ে? তা'ছাড়া রমানাথই বা এমন নোংরা কাজে রাজি হবে কেন?

অবশেষে দময়ন্তীর চোখ পড়ল পার্বতীর ওপর। মেয়েটা ভীরু স্বভাবের। ওকে কায়দা করা হয়ত তেমন কঠিন হবে না। কিন্তু রমানাথ? তাকে কি বলে রাজি করাবে সে? তা'ছাড়া এমন একটা ব্যাপারে কি স্ত্রী হয়ে সে নিজে সায় দিতে পারবে?

মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় দময়ন্তী। মনকে বোঝায়, এতে তার দুঃখিত হবার কি আছে? মাত্র তো একটিবার। আর, তাতেই যদি রমানাথ রোগমুক্ত হয় তো ক্ষতি কি? তারপর থেকে মেয়েটাকে না হয় এই বাড়ির ত্রিসীমানায়ও আর আসতে দেবে না।

মনস্থির করে ফেলে দময়ন্তী। ঐ পার্বতীকে দিয়েই সে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাবে।

কথাটা সে আস্তে আস্তে পাড়ে রমানাথের কাছে। একদিন বললে, আচ্ছা বলো তো ঐ পার্বতী মেয়েটা কেমন?

—মন্দ কি? ভালই। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয় রমানাথ।

—ওকে কেমন লাগে তোমার?

—এর মধ্যে আবার লাগালাগির কি আছে? একটা ছোট মেয়ে—স্ত্রীর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে সরল মনে জবাব দেয় রমানাথ।

—ছোট? একটু হাসে দয়মন্তী। তারপর আবার বললে, বিয়ে হলে এতদিনে ছেলের মা হতে পারত, জানো?

রমানাথ আর কোন জবাব দেয় না।

এরপরে ধীরে ধীরে আরম্ভ হল স্লো-পয়জনিং। শুরু হল সুপ্ত দানবকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার পালা। আর সেই কাজের হোতা হল সেই পুরুষটির বিবাহিতা স্ত্রী স্বয়ং।

এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ঘটনা। পুরুষের সুপ্ত লালসাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে একটি নারী। নিজের বিকৃত বাসনার তৃপ্তির চেষ্টায় সে-ই অপর একটি তরুণীকে নিজের স্বামীর চোখে লোভনীয় করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

প্রথমটায় বাধা দিয়েছিল রমানাথ। যুক্তির সাহয্যে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল দময়ন্তীকে। খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিল আত্মরক্ষার পথ। কিন্তু কতটুকু শক্তি তার? নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে কতক্ষণ সে পালিয়ে বাঁচবে? পাপের পথে চলার গতি যে স্বভাবতঃই একটু দ্রুত! আকর্ষণ যে সেদিকেই বেশি।

তাই, যে রমানাথ এতদিন সেই তরুণী মেয়েটাকে স্নেহের চোখে দেখে এসেছে, তার দিকে তাকিয়ে আজকাল সে প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করতে শুরু করলে। পাপের দায়ভাগ স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের কাছে নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে লালসার লাগাম আলগা করে দিলে সেই হতভাগ্য পার্বতীর দিকে। সফল হল দময়ন্তীর প্রচেষ্টা।

অবশেষে এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায়, দুঃখে সেই হতভাগ্য মেয়েটা যেন পাথরে রূপান্তরিত হল। আর সেই সুযোগে তার ওপর নিজের লালসা চরিতার্থ করলে প্রৌঢ় রমানাথ সাহা। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়ে স্বামীকে সাহায্য করলে তারই বিবাহিতা স্ত্রী দময়ন্তী।

সত্যিই বিচিত্র এই পৃথিবী! বিচিত্রতর এই সৃষ্টি! আর বিচিত্রতম এর নারী-চরিত্র।

সংঘশক্তি কলৌ যুগে—কথাটা যে কত বড় সত্যি সেদিন কলেজ প্রাঙ্গনে তার প্রমাণ পেলাম। শুধু প্রমাণ পেলাম বললেই সবটা বলা হয় না। সেদিন ঐ কলেজ প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে অতি মর্মান্তিকভাবে তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি।

কলেজের লেকচারার মহলে বয়সের দিক থেকে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তা'ছাড়া ছাত্রমহলে আমার মেলামেশাটাও ছিল একটু বেশি। তাই আমার কেমন যেন একটা ধারণা জন্মেছিল যে, কলেজের ছাত্রদের ওপর অন্য অনেকের চাইতেই আমার প্রভাব একটু বেশী।

কিন্তু সেদিন সেই কলেজ-প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল, ওসব প্রভাব-ট্রভাব কিছু নয়। ওরা যখন ক্ষেপে ওঠে তখন ওদের শান্ত করবার ক্ষমতা বোধহয় স্বয়ং বিধাতারও নেই। নইলে সেদিন আমার সেই কাতর অনুরোধের জবাবে তারা বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি করে উঠত না। কলেজ-প্রাঙ্গনে আমার ওপর দোতলা থেকে চেয়ার ছুঁড়ে মারত না। অবশ্য সেদিন আমি আহত হইনি। তবে চেয়ারটা যদি সত্যি সত্যিই আমার গায়ে লাগত তো সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হত।

ছাত্রদের সেদিন ক্রোধ কিন্তু ঠিক আমার ওপর ছিল না। এমনকি কোন বিশেষ ব্যক্তির ওপরও ছিল না বোধহয়। ছিল কর্তৃপক্ষের ওপর। আর তারই ফলে সেদিন সেই লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল। ন্যায়ের জন্যে হোক, আর অন্যায়ের জন্যেই হোক কলিযুগে সংঘশক্তির কি প্রচণ্ড দাপট তা' সেদিন অনুভব করতে পেরেছিলাম।

ঘটনাটা এমন কিছু নয়, অতি সামান্য থেকে তার শুরু। তবে পৃথিবীর অনেক সাংঘাতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা যেমন শুরুতে সামান্য থেকে শেষে গিয়ে অসামান্য হয়ে দাঁড়ায় ঠিক তেমনি একটি ছাত্রকে কেন্দ্র করেই সেদিন কলেজের ছাত্রমহল ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষার হলে অসাধু উপায় অবলম্বন করায় ইনভিজিলেটর ভদ্রলোক একটি ছাত্রকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেন। হয়ত ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত। ইনভিজিলেটর ভদ্রলোক হয়ত তাকে সাবধান করেই ছেড়ে দিতেন। কিন্তু সেই ছাত্রটির জন্যেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল।

ছাত্রটি ছিল একটু মস্তান গোছের। ধরা পড়ে লজ্জিত হবার পরিবর্তে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চোখ-মুখ লাল করে ইনভিজিলেটরকে বললে, আপনি স্যার আমাকে ধরলেন কেন?

ইনভিজিলেটর ভদ্রলোক ছিলেন কলেজেরই একজন প্রবীণ লেকচারার। ছাত্রটির সেই কৈফিয়ৎ তলব করার ভঙ্গিতে কথা বলায় চটে উঠলেন তিনি। তাই তিনিও সমান জোরে জবাব দিলেন, তোমাকে কেন ধরেছি তা' তুমি জানো না?

—জানলে কি আপনার সঙ্গে রসালাপ করবার জন্যে জিজ্ঞেস করছি? ছাত্রটি ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলে ওঠে।

ভদ্রলোক আরও চটে ওঠেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুমি বই দেখে নকল করেছো বলেই তোমাকে ধরেছি।

ছাত্রটি খানিকক্ষণ লেকচারার ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভঙ্গিতে সামনের উত্তরপত্রটা টেনে নিয়ে আবার লেখার উদ্যোগ করে বললে, যান স্যার, নিজের কাজে যান, সব ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবেন না। আমি নকল করিনি, আপনি ভুল দেখেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে উঠে বললেন, না, আমি মোটেই ভুল দেখিনি, তুমি বই দেখে নকল করছিলে। বইটা এখনও তোমার পকেটেই রয়েছে।

—না, আমার পকেটে বই নেই। চিৎকার করে ছাত্রটি কথাটা বলতেই লেকচারার ভদ্রলোক তার প্যান্টের পকেটের ওপর হাত দিয়ে কিছু বলতে যান। কিন্তু তার আগেই সেই মস্তান ছাত্রটি একটা কাণ্ড করে বসে। হঠাৎ এক পা পেঠনে সরে গিয়েই ধাঁ করে সেই প্রবীণ লেকচারার ভদ্রলোকটির চোয়ালে একটি ঘুষি বসিয়ে দেয়।

মৃদু আর্তনাদ করে মেঝেয় বসে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে ছুটে আসে বেয়ারা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন প্রিন্সিপ্যাল। আমরা কয়েকজনও গিয়ে হাজির হই সেখানে।

ছাত্রটি কিন্তু কিছুতেই নিজের দোষ কবুল করবে না। আবার নিজের পকেট সার্চ করতে দিতেও নারাজ। প্রিন্সিপ্যালের রক্তচক্ষুও সে ভয় করে না। ছুটে আসে কলেজের দু'তিনজন ভোজপুরী দারোয়ান।

অবশেষে তাদের সহায়তার সেই মস্তান ছাত্রটিকে যখন হলের বাইরে নিয়ে আসা হল তখন পরীক্ষার্থী অন্য ছাত্রদের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। তারই মধ্যে আবার প্রচার হয়ে গেল যে, সেই ছাত্রটির পকেট সার্চ করে নাকি কিছুই পাওয়া যায়নি।

আর যায় কোথায়! প্রথমে মৃদু প্রতিবাদ—কি এতবড় সাহস, তাদের একজন সহপাঠীকে বিনাদোষে দারোয়ান দিয়ে হল থেকে বের করে দিলে? এ অপমান তো শুধু সেই ছাত্রটির নয়, এ যে গোটা ছাত্র-সমাজের অপমান!

মৃদু প্রতিবাদ অচিরেই বিক্ষোভের আকার ধারণ করে। পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সেই মস্তান গোছের ছাত্রটির আচরণকে সমর্থন করতে পারেনি। পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দিতেও হয়ত তেমন ইচ্ছা ছিলনা তাদের। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাদের সেকথা উচ্চারণ করবার ক্ষমতা ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু উগ্র প্রকৃতির ছাত্রের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। গোটা কলেজেরর ছাত্ররা এসে ভিড় করলে পরীক্ষার হলের মধ্যে। আর তারপরই শুরু হল সেই দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড।

দুম্‌দাম্ শব্দে চেয়ার ভাঙছে, উল্টে পড়ছে বেঞ্চিগুলো, হলের মেঝেয় কালির ছড়াছড়ি। কালির দোয়াতগুলো দেয়ালে ছুঁড়ে মেরে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ঘরময় কাঁচের টুকরো ও ছেঁড়া উত্তরপত্র! ভাঙছে ব্ল্যাকবোর্ড, ভাঙছে জানালার কাঁচের সার্শি।

সেই মস্তান ছাত্রটিকে প্রিন্সিপ্যালের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেও একদল ছাত্র এসে হানা দিলে।

ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে আর দু'তিনজন লেকচারারকে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম সেই হলঘরের দিকে। সেখানে তখনও ভাঙচুরের পালা চলছে। ভাঙার আনন্দে মেতে উঠেছে ছাত্ররা। চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাদের দেহের নওজোয়ানী রক্ত।

ছাত্রদের শান্ত করতে চেষ্টা করি আমি। উচ্চকণ্ঠে বললাম, এসব কি করছো তোমরা? নিজেদের জিনিস নিজেরা এমনিভাবে নষ্ট করছো কেন? এই কি তোমাদের প্রতিবাদ জানাবার পন্থা? তোমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তো শান্ত মেজাজে প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে বলো. তার বদলে এমনিভাবে কলেজের সম্পত্তি নষ্ট করে তোমাদের কি লাভ হচ্ছে?

আমার কথা শেষ হতে না হতেই ছাত্রদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে ওঠে, ওরে, জ্ঞান দিতে এসেছে রে! মার—মার! পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দে!

ভাঙ্গা কাঠের টুকরো হাতে জনাকয়েক আমাদের দিকে ছুটে আসতেই বেগতিক দেখে আমরা সরে পড়ি। কিন্তু যাব কোথায়? হামলা চলছে লেকচারারদের কক্ষে, হামলা চলছে প্রিন্সিপ্যালের রুমে।

বাধ্য হয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম আমরা। প্রাঙ্গণের অন্যপ্রান্তে একপাশে দাঁড়িয়ে জটলা করছে ছাত্রীরা। তারাও উত্তেজিত, কিন্তু ছেলেদের মত উগ্র নয়। সেই মুহূর্তে গোটা কলেজ সেই উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের কর্তৃত্বাধীনে। প্রিন্সিপ্যাল নিজেও ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছনা এড়াতে কলেজ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন। অকস্মাৎ আমাদের লক্ষ্য করে খানকয়েক ভাঙা চেয়ার এসে পড়ল কলেজের দোতলা থেকে। একটুর জন্যে রক্ষা পেলাম আমরা।

প্রিন্সিপ্যাল এক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে কিছু চিন্তা করলেন। মাথা তুলে একবার কলেজের বাড়িটার দিকে তাকালেন। তারপরেই দৃঢ় পায়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে চলে এসে পাশের একটা বড় দোকান থেকে থানায় টেলিফোন করলেন।

কলেজের মেন গেটের সামনেও তখন ভিড়। তবে তার অধিকাংশই কৌতূহলী জনতা।

টেলিফোন ধরেছিল ভবদেব নিজেই। বেলা তখন প্রায় একটা। থানা ডিউটি ছিল সিনিয়র এ. এস্. আই, শ্রীপতিবাবুর। হাতের কাজ শেষ করে পিনাকী তখন কোয়ার্টারে যাবার জন্যে উঠি উঠি করছিল।

অমিত ও ধূর্জটি থানায় উপস্থিত ছিল না। ছিল না সুশান্তও।

টেলিফোনের রিসিভারটা সশব্দে নামিয়ে রেখে নিজের কক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে আসে ভবদেব। তারপর শ্রীপতির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, সেন্ট্রি-কনস্টেবল্ ছাড়া থানার বাকি সব কনস্টেবলকে এখনই রেডি হতে বলুন। আর ড্রাইভার কনস্টেবলকেও ডাকুন।

তারপর পিনাকীর দিকে তাকিয়ে আবার বললে, আর, হ্যাঁ পিনাকীবাবু, আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়, বড়বাবু? কণ্ঠে অসন্তোষের সুর পিনাকীর।

—কলেজে ছেলেরা কি সব হাঙ্গামা আরম্ভ করছে। সেখানেই যেতে হবে। বলেই সেখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে ভবদেব। তারপর টেলিফোন তুলে উর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে কথা বলতে থাকে।

নিজের আপত্তির কথাটা বড়বাবুকে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পর্যন্ত না পেয়ে বেজার মুখে সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পিনাকী। নিজের ওপরই রাগ হয় তার। একটা বিশেষ কাজে একটু বাইরে যাবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্রেফ্ আলস্য করেই সেদিনের মত কাজটা মুলতুবী রেখেছিল সে। এখন মনে হচ্ছে, চলে গেলেই ভাল করত, তা'হলে হয়ত এমনি ঝঞ্ঝাটে পড়তে হত না।

কিন্তু উপায় নেই। বড়বাবু যখন এবার বলেছে তখন সঙ্গে না গিয়ে নিস্তার নেই।

পুলিশের গাড়িটা কলেজ কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করতেই ছাত্রমহলে একটা সাড়া জেগে ওঠে।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আসে ভবদেব। হাতে একখানা লাঠি। সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে পিনাকীও। আর সব শেষে একে একে নেমে আসে লাঠিধারী কনস্টেবলরা।

কলেজ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলে ভবদেব। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই তার মুখে একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। কিন্তু সে কোন কথা বলে না আমার সঙ্গে। তারপর সেই পুলিশ বাহিনী নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যায়।

হলঘরটা প্রায় ফাঁকা। পুলিশের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছাত্ররা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে শুরু করেছিল। মাত্র তিনজন ছাত্রকে সেখানে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়

ভবদেব। তারপর প্রিন্সিপ্যাল ও লেক্‌চারারদের কক্ষ থেকে আরও ছ'সাতজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

বিপদ বেড়ে ওঠার সম্ভাবনায় ছাত্ররা আগেই যে যার বাড়ির পথে পা বড়িয়েছিল। কলেজ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্ররা জমায়েত হয় কলেজ প্রাঙ্গণের ওপাশে। সেখানে মিটিং করবে তারা। শিক্ষায়নে পুলিশ প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে।

বাইরে তখন কৌতূহলী জনতার ভিড়। তারা বোধহয় ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ কিম্বা ঐ ধরনের সাংঘাতিক একটা কিছু আশা করেছিল। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটতে না দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল অনেকেই।

তালা পড়ল কলেজ বিল্ডিংয়ে। ছাত্রদের নিয়ে পুলিশ-ভ্যান্ বেরিয়ে গেল থানার দিকে। কেবল যাবার আগে কয়েকজন কনস্টেবল্ ও পিনাকী সরকারকে কলেজ কম্পাউণ্ডের বাইরে ডিউটিতে রেখে গেল ভবদেব। অস্নাত, অভুক্ত পিনাকী মুখখানা হাঁড়ির মত করে দাঁড়িয়ে রইল কেবল।

একখানা রিক্সা ডেকে প্রিন্সিপ্যাল নিজেও চলে গেলেন কলেজ সেক্রেটারীর বাড়ির দিকে। টিচাররাও চলে গেল।

কিন্তু যেতে পারলাম না কেবল আমি। ততক্ষণে আমার সাংবাদিক জীবন শুরু হয়ে গেছে। ছাত্ররা মিটিং করবে। সেই মিটিংয়ের খবর জোগাড় করতে হবে আমাকে। অন্য সময় হলে পেন্সিল ও নোটবুক হাতে আমি গিয়ে দাঁড়াতাম ওদের মধ্যে। খাতির করে ওরা চেয়ার এগিয়ে দিত আমাকে। সাংবাদিক হিসেবেই পেতাম ওদের কাছ থেকে অভ্যর্থনা।

আজ কিন্তু অবস্থাটা একটু অন্যরকম। কলেজের টিচার হিসেবে ওদের নিবৃত্ত করতে গিয়ে ওদের কাছে অপমানিত হয়েছি। তাই সাংবাদিক হিসেবে খবর জোগাড় করতে প্রকাশ্যে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হল না। কি জানি, যদি আবার অপমান করে? তাই একপাশে জনতার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম।

বক্তৃতা তো নয়, যেন আগুনের ফুলঝুরি। অভিযোগের পালা পরিবর্তন। যে অভিযোগ এতক্ষণ ছিল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তা'-ই এবার পালা পরিবর্তন করে গিয়ে পড়ল পুলিশের ওপর। বর্বর পুলিশ শিক্ষায়তনে প্রবেশ করে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। তারা ছাত্রদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে তাদের দশজন সহপাঠীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। এমন জুলুমবাজী তারা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। পুলিশকে এর কৈফিয়ত দিতেই হবে। অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে ছাত্রদের। নইলে, সারা শহরে আগুন জ্বলে উঠবে।

ভোজবাজির মত আবির্ভাব ঘটল জনাকয়েক ছাত্র নেতার যারা নাকি হাঙ্গামার সময় কলেজে উপস্থিতই ছিল না। আবির্ভাব ঘটল শহরের একজন নামী রাজনৈতিক নেতার।

কলেজের ভেতর পুলিশ ছাত্রদের ওপর কি-রকম অত্যাচার করেছে জানি না। কারণ, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না সেখানে। তবে, ছাত্রদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ-ভ্যানে তোলার সময় তাদের ভেতর দু'তিনজনের গায়ের ছিন্ন ভিন্ন জামা লক্ষ্য করেছিলাম।

সভাশেষে ছাত্ররা সারিবদ্ধ হয়ে চলল থানার দিকে। কণ্ঠে তাদের জ্বালাময়ী ধ্বনি। মুষ্টিবদ্ধ হাতে তাদের প্রতিবাদের ভঙ্গি। ধৃত ছাত্রদের মুক্তি দিতেই হবে। শাস্তি দিতে হবে অপরাধী পুলিশ বাহিনীকে। একটু দূরে থেকে আমিও অনুসরণ করি তাদের।

- সাংবাদিকের কাজ কঠিন। কিন্তু কলেজের লেক্‌চারারের পক্ষে সেই কলেজেরই ছাত্র হাঙ্গামার পূর্ণ বিবরণ জোগাড় করা শুধুমাত্র কঠিনই নয়, বিপজ্জনকও বটে। খবরের এতটুকু

হেরফের ঘটলে সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়বে তার ওপর। পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী হতে হবে তাকে। আর, সাংবাদিকের জীবনে পক্ষপাতিত্বের মত দোষ আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। তাকে হতে হবে নিরপেক্ষ ও সত্যাশ্রয়ী।

যুগে যুগে মানুষের প্রতিবাদের ভাষা পাল্টায়। পাল্টে যায় প্রতিবাদের রীতি-নীতিও। কিন্তু থানার সামনে দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় শ্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের রীতি সম্পূর্ণ হালফিলের ব্যাপার। থানা ঘেরাও করে বন্দী মুক্তির দাবী আর সেই সঙ্গে পুলিশকে দিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাবার দাবীও সম্পূর্ণ আধুনিক। হাওয়া পাল্টেছে দেশের, হাওয়া পাল্টেছে জন-মনেরও। এগিয়ে এসেছে দেশের তরুণ সমাজ। তবে তা' দেশ গড়ার কাজে কি দেশ ভাঙার কাজে তা' নিয়ে বয়স্কদের মধ্যে মত বিরোধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যে নিঃসন্দেহে এগিয়ে এসেছে তার প্রমাণ ফ্রান্স, জার্মানী এবং ঘরের কাছে ইন্দোনেশিয়া।

ধৃত ছাত্রদের হাজতে পাঠানো হয়নি। তাদের বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

গোটা থানাটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। মুহুর্মুহু শ্লোগানের মাধ্যমে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে তারা। আবার তাদের ঘিরে কৌতূহলী জনতা। থানার সামনে দাঁড়িয়ে এমনি বিক্ষোভ প্রদর্শন তাদের কাছে সত্যিই অভিনব।

থানার হলঘরে জেনারেল ডাইরী বইটা সামনে রেখে নিজের মনেই বক বক করছিল বৃদ্ধ শ্রীপতি মিত্র। থানার সামনে এমনি বিক্ষোভ বরদাস্ত করতে পারছিল না সে। বিরক্তকণ্ঠে সে বলছিল, হুঁ, যেমনি হয়েছে দেশের লোক, আর তেমনি হয়েছে দেশের এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্! তুতুপুতু করেই দেশটা রসাতলে গেল। নইলে একদল ছোকরার এতবড় সাহস যে থানার সামনে দাঁড়িয়ে এমনি হল্লা করে? হত সেই সাহেবী আমল, ডাণ্ডার চোটে ঠাণ্ডা হয়ে যেত সব। তা' তো নয়, কেবল মিষ্টি কথা আর মণি-সোনা বলে সম্বোধন। আরে বাপু, এসবে কি আর চিড়ে ভেজে? এই করেই তো ওদের সাহস বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। থাকবে না, এই বলে দিলুম, এ এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন কিছুতেই থাকবে না। এমনিভাবে পুলিশের কাজ চলে না। কড়া হতে হবে। শক্ত হাতে এসব উট্‌কো ঝামেলা সামলাতে হবে। নরম হলেই ওরা প্রথমে চেপে বসবে ঘাড়ে, তারপর একেবারে মাথায়।

বড়বাবু ভবদেবের ঘরে গম্ভীর মুখে বসেছিল অমিত। থানার সামনে ছাত্র হাঙ্গামা শুরু হবার আগেই বাইরের কাজ সেরে থানায় এসে পৌঁছেছিল সে।

ভবদেব অমিতের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হে, চুপ করে রইলে কেন? এখন কি করা উচিত, বলো? থানার সামনে এমনি হুল্লোড় চলতেই থাকবে, না কোন ব্যবস্থা নিতে হবে? প্রশ্ন করেই মৃদু মৃদু হাসতে থাকে ভবদেব।

অমিত মনে মনে সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। এমনি একটা পরিস্থিতি তার জীবনে এই প্রথম। কিন্তু ভবদেবের নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সে বিস্মিত না হয়ে পারে না। সত্যিই আশ্চর্য! লোকটির মনটা কোন্ ধাতুতে গড়া? নইলে, এমনি একটা অবস্থায় কারুর মুখে হাসি ফুটে উঠতে পারে?

একটা ঢোক গিলে অমিত জবাব দেয়, আমার মনে হয় সুপিরিয়র অফিসারদের কাছে এখনই খবর পাঠানো উচিত। তাঁরা এসে যা' হয় করবেন।

—খবর কি পাঠাই নি মনে করেছো? কিন্তু তাঁদের এখানে আসতে বারণ করেছি। বলেছি, তাঁদের এখন কোন প্রয়োজন নেই। সিচুয়েশান্ আমরাই ট্যাক্‌ল্ করতে পারব।

—সেকি? বিস্মিত কণ্ঠস্বর অমিতের, আপনি তাঁদের আসতে বারণ করে দিলেন? তাঁরা এলেই তো ভালো হত। যা' হয় ভালো মন্দ তাঁরাই করতেন।

—ওটা তো নিজেদের ওপর থেকে দায়িত্ব স্খালনেরর মত কথা হল। তা' হবে কেন? আমরা যেখানে অপারগ হব কেবলমাত্র সেখানেই তাঁদের ডাকব। তোমার কি মনে হচ্ছে আমরা নিজেরা কিছুই করতে পারব না?

অমিত কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। এমন একটা পরিস্থিতিতে নিজেদের ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না তার। বলা তো যায় না, সিচুয়েশান্ খারাপ হতে কতক্ষণ? তখন তো ঐ সুপিরিয়র অফিসারেরাই আমাদের ট্যাক্টলেস্ বলবে।

ভবদেব যেন টের পায় অমিতের মনের কথা। তেমনি নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে হেসে বললে, বুঝলে অমিত, সিচুয়েশান্ যতই খারাপ হোক্ না কেন, নিজের ওপর বিশ্বাস কখনও হারাতে নেই। একবার পরনির্ভরতার স্বভাব তৈরি হলে ভবিষ্যতে একটা সাধারণ ব্যাপারেও দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। কে কি বলবে ভেবে কাজ করতে গেলে কোনদিনই কোন ট্রাবল্ ফেস্ করতে পারবে না। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে স্থির শান্ত মস্তিষ্কে সিচুয়েশান্ বুঝে কাজ করতে হবে। তাতে যদি বিফল হও তবুও ক্ষতি নেই। এমনি বিফলতার মাঝেই একদিন সার্থকতার মুখ দেখতে পাবে। এটা কেবল নীতিকথা নয় অমিত, এ আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।

—তা' হলে, আপনি এখন কি করবেন? প্রশ্ন করে অমিত।

অমিতের প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে ভবদেব বলতে থাকে, এসব ব্যাপারে মাস্-সাইকোলজি বুঝে কাজ করতে হবে। জনতা কি চায়, তা' বুঝতে হবে আগে। ভালো করে ভেবে দেখ, বাইরে ঐ যে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, এদের দাবী অনেক। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান দাবী হচ্ছে তাদের সহপাঠীদের মুক্তি। ধৃত ছাত্রদের জামিনে মুক্তি দিয়ে তাদের সেই দাবীটি আপাতত আমরা পূরণ করতে পারি। কিন্তু সরাসরি তা' করতে গেলে ওরা ওদের অন্য দাবীগুলোর ওপর এখনই খুব জোর দেবে। তাই ওদের সঙ্গে একটা মৌখিক দর-কষাকষি করে তবেই তাদের জামিনে ছেড়ে দেব। কথাটা বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ভবদেব। তারপর অমিতকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ায় বাইরে ছাত্রদের মাঝখানে।

থানার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেও তারা এতক্ষণ পর্যন্ত কোন পুলিশ অফিসারকে দেখতে পায়নি। এবার দু'জন পুলিশ অফিসার তাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই তারা আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে।

চতুর অভিনেতার মত দু'হাত ওপরে তুলে তাদের থামতে অনুরোধ করে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকে ভবদেব, দেখুন, আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে সরকারি কাজে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। আপনাদের সব দাবীর কথাই আমি শুনেছি, কিন্তু আমি দুঃখিত আপনাদের কোন দাবীই পূরণ করার ক্ষমতা আমার নেই।

ভবদেবের কথা শেষ হবার আগেই ছাত্ররা আবার চিৎকার করে তাদের দাবী জানাতে থাকে। ওদের মধ্য থেকে দু'চারজন আবার কুৎসিত ভাষায় তাদের গালাগাল দিয়ে ওঠে।

ভবদেব আবার হাত তুলে তাদের থামতে অনুরোধ করে বলতে থাকে, শুনুন, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের যা'-তা গালাগাল দিচ্ছেন। তা' যত ইচ্ছে গালাগাল দিন,

আপনাদের মুখ বন্ধ করতে পারি না আমরা। তবে, আপনারা সবাই ভদ্রলোকের ছেলে। রাস্তার কুলী-মজুররা যে ভাষায় গালাগাল দিতে পারে আপনাদের মুখে সেই ভাষা কি মানায়? হ্যাঁ, আরও শুনুন, আপনারা বলছেন যে, আমরা নাকি অন্যায় করেছি, তাই আমাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। খুবই সত্যি কথা! অন্যায় যদি করেই থাকি তো ক্ষমা চাইতে আমাদের একটুও আপত্তি নেই। আপনারা বলছেন আমরা অন্যায় করেছি। কিন্তু আমরা তা' মনে করি না। কাজেই .কোন তৃতীয়পক্ষের কাছে আগে প্রমাণ হোক্ যে, আমরা সত্যিই অন্যায় করেছি। তার আগে কি ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে? আমাদের অন্যায় প্রতিপন্ন হলে শুধু ক্ষমা চাওয়া কেন, আপনারা যে শাস্তি আমাদের দেবেন তা'-ই নেব।

ছাত্রদের মধ্যে একজন এইসময় তারস্বরে চিৎকার করে বলে ওঠে, আপনি মিথ্যেবাদী। যাদের আপনি গ্রেপ্তার করেছেন তাদের মারধোর করেননি?

—হ্যাঁ, একটু করেছি বৈকি, তবে সবাইকে নয়। মাত্র তিন-চারজনকে গ্রেপ্তারের সময় সত্যিই একটু মারধোর করতে হয়েছিল। তারা গ্রেপ্তারে বাধা দিতে চেয়েছিল। তারা আমাদের সাথে ধস্তাধস্তি করেছিল। তা'ছাড়া, আর কাউকে আমরা ছুঁই নি পর্যন্ত।

একটু থেমে ভবদেব আবার বলতে থাকে, আপনারা আমাদের বিচার চেয়েছেন। ভালো কথা, কিন্তু নিজেদের বিচার নিশ্চয়ই আমরা নিজেরা করব না। তাই আশ্চর্য লাগছে, আপনাদের বিচারের দাবী এই থানার সামনে কেন? আপনারা বলছেন, আপনাদের সহপাঠীদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে হবে। আপনারা তো আইনের ছাত্র নন্। তাই, আপনারা জানেন না, থানার অফিসাররা মামলা রুজু করতে পারে কিন্তু তা' তুলে নেবার ক্ষমতা তাদের নেই। সেই ক্ষমতা জেলার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের রয়েছে। আপনারা হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু দয়া করে আপনারা যে কোন একজন উকিলকে জিজ্ঞেস করুন। দেখবেন, আমি মিথ্যে বলিনি। আর, আপনাদের আর একটি দাবী হল, আপনাদের সহপাঠীদের এখনই ছেড়ে দিতে হবে। তা' কি করে হয়? পুলিশ যাদের একবার গ্রেপ্তার করে তাদের তো মুখের কথায় ছেড়ে দেওয়া যায় না।

ভবদেবের কথা শেষ হতেই ছাত্ররা আবার সমস্বরে চিৎকার করে উঠে বলতে থাকে, ওসব কথা শুনতে চাই না আমরা। ওদের এখনই ছেড়ে দিতে হবে।

এই সময় একটি ছাত্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে বললে, নইলে এখনই আমরা থানা আক্রমণ করে ধূলোয় মিশিয়ে দেব। মনে রাখবেন আমাদের সেই শক্তি আছে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় ভবদেব, নিশ্চয়ই আছে। শুধু এই থানার বাড়িটা কেন, ইচ্ছে করলে আপনারা আমাদেরও এই মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। আমাদের কাছে কতগুলি বন্দুক আছে যে আপনাদের ঠেকাব? কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, আজ তো আমরা না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম, কিন্তু কালই যখন শহরের গুণ্ডা-বদমাস, চোর-ডাকাতেরা সক্রিয় হয়ে উঠে আপনাদের ওপর রাস্তাঘাটে হামলা চালাবে তখন তাদের ঠেকাবেন কি দিয়ে?

—ওসব নীতিকথা শুনতে চাই না, ওদের ছেড়ে দিতেই হবে। আর তা' এখনই। একটি মাতব্বর গোছের ছাত্র বলে ওঠে।

একমুহূর্ত চিন্তার ভান করে ভবদেব। তারপর বললে, আপনাদের আমি কথা দিচ্ছি, কাল সকালেই আপনাদের বন্ধুদের আমি কোর্টে পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকেই আপনারা তাদরে জামিনে ছাড়িয়ে নেবেন।

—না—না, তা' হবে না। এখনই ওদের ছেড়ে দিতে হবে। সমস্বরে আবার চেঁচিয়ে ওঠে তারা।

মুখ নিচু করে খানিকক্ষণ চিন্তা করে ভবদেব। তারপর মুখ তুলে বললে, আচ্ছা, ভেবে দেখি বলেই অমিতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যায় থানার মধ্যে।

নিজের ঘরে বসে অমিতের দিকে তাকিয়ে ভবদেব বললে, কি, কেমন হল? এবার মনে হচ্ছে না যে সিচুয়েশান্ ট্যাক্‌ল্ করতে পারব?

মুগ্ধ চোখে অমিত কেবল তাকিয়ে থাকে ভবদেবের মুখের দিকে।

ভবদেব বলতে থাকে, ওদের সবগুলো দাবী এই মুহূর্তে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ঐ একটিমাত্র দাবীর মধ্যে। এইটিই আমি চেয়েছিলাম। এখন তাদের ছেড়ে দিলেই ওরা মনে করবে ওদের মস্তবড় জিৎ হয়েছে। দেখবে, ওরা নিজেরাই এখান থেকে চলে যাবে।

ভবদেবের অনুমানই ঠিক। মুচলেকায় সই করে ধৃত ছাত্রদের ছেড়ে দিতেই তারা হাসিমুখে বাইরে এসে দাঁড়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ কাঁপানো চিৎকারে তাদের অভ্যর্থনা করে বাইরের ছাত্ররা। কিছুক্ষণ ধরে সেই মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিয়ে চলে প্রচণ্ড হৈ-হুল্লোড়, আনন্দের আতিশয্যে দু'চারটে ঢিলও এসে পড়ে থানার ছাদের ওপর। ভবদেবের হুকুমে উপস্থিত থানার কর্মচারীরা কেউই কোন কথা বলে না।

অবশেষে একসময় মিছিল করে সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিয়ে চলে যায় সেই ছাত্রবাহিনী।

মৃদু হেসে ভবদেব অমিতকে বললে, যাক, আপাতত একটা ঝঞ্ঝাট মিটল। এবার বাসায় ফিরে বিশ্রাম করো গিয়ে। টেলিফোনে কর্তাদের খবরটা দিয়ে আমিও এবার উঠব।

বাসায় ফেরার পথে ভবদেবের কথাই চিন্তা করছিল অমিত। সত্যিই, ভবদেবের বুদ্ধি-বিবেচনার তুলনা হয় না। পুলিশ অফিসার হিসেবে সত্যিই সে আদর্শ।

বিকেলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে অমিত যখন অজিতেশ দত্তর বাড়ির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল তখন হঠাৎ কে যেন পেছনে ডেকে ওঠে, অমিতদা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় অমিত। তারপর একটু হেসে বললে, একি, শঙ্কর যে! খেলাধুলো সেরে ফিরলে বুঝি?

শঙ্কর এগিয়ে আসে। তারপর অমিতের পাশাপাশি চলতে চলতে ভারিক্কি চালে জবাব দেয়, না অমিতদা। এখন কি খেলাধুলোর সময় আছে আমাদের? স্কুলে একটা মিটিং ছিল। সেখান থেকেই ফিরছি।

শঙ্করের কথার ধরনে কৌতুক বোধ করে অমিত। মুখ টিপে হেসে ঠাট্টার সুরে বললে, ও তাই বুঝি? আমাদের শঙ্করবাবু তা'হলে মিটিং সেরে ফিরছেন! তা' কিসের মিটিং ছিল, শঙ্করবাবু?

অমিতের ঠাট্টায় কর্ণপাত না করে তেমনি ভারিক্কি চালে জবাব দেয় শঙ্কর, আপনাদের লোকেরা আজ কলেজে ঢুকে ছাত্রদের ওপর অত্যাচার করেছে বলে কাল স্কুলে আমরা স্ট্রাইক করব। শুধু আমরাই নয়, শহরের সমস্ত স্কুলে কাল স্ট্রাইক হবে। বিরাট মিছিল হবে। ক্লাশ টেনের অনিলদা, সুনীলদা আজকের মিটিংয়ে সেই কথাই বললে। আমি ভাবছি—

কথাটা অর্ধ-সমাপ্ত রেখে হঠাৎ থেমে যায় শঙ্কর। এতক্ষণে তার খেয়াল হয় যে, তার শ্রোতা নিজেই একজন পুলিশ অফিসার। তাই সে জিভ কামড় দিয়ে আবার বলে ওঠে, এই দেখুন, আপনাকে সব কথা বলে ফেললাম!

—কেন, তাতে কি হয়েছে? প্রশ্ন করে অমিত।

—বাঃ, আপনারা তো আমাদের শত্রুপক্ষ। অনিলদা যে আজ বললে, আপনাদের বিরুদ্ধেই আমাদের—আমাদের—মানে, যুদ্ধ—মানে, ফাইট—মানে—

অমিত বুঝতে পারে শঙ্কর আসলে শব্দটি ভুলে গেছে। তাই সে তাকে মনে করিয়ে দেয়, অর্থাৎ সংগ্রাম, তাই তো?

হেসে শঙ্কর জবাব দেয়, ঠিক বলেছেন অমিতদা। হ্যাঁ, সংগ্রাম শব্দটা কিছুতেই আমার মনে থাকে না। অনিলদা এই সংগ্রাম কথাটাই বলেছিল বটে।

এবার আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হেসে ওঠে অমিত। তারপর হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করে শঙ্করকে, তা' আমাদের বিরুদ্ধে ফাইট করতে বুঝি তোমাদের খুব ভালো লাগে?

—বাঃ, তা' লাগবে না? আপনারা শুধু শুধু আমাদের মারধোর করবেন, আর আমরা বুঝি চুপ করে থাকব?

—সেই যুদ্ধে পুলিশ হেরে গিয়ে যদি মরে যায় তো খুব ভালো হয়, তাই না?

মাথা নেড়ে সায় দেয় শঙ্কর।

একমুহূর্ত থেমে অমিত আবার জিজ্ঞেস করে, আমি যদি মরে যাই তো খুব ভালো হয়, কেমন?

—ধেৎ, তা' কেন? আপনার কথা তো হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নেয় শঙ্কর।

—কেন নয়? আমিও তো পুলিশ।

—না-না, তা' নয়। আপনার কথা বলছি না, আপনি তো আমাদের মারধোর করেননি। যারা করেছে, তাদের কথাই বলছি।

কথা বলতে বলতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে তারা।

শঙ্কর অমিতের হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে খাবার ঘরে গিয়ে স্মৃতিকণাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে এসে অমিতকে বললে, চলুন অমিতদা, ওপরে চলুন। দিদি বোধহয় বাবার কাছে রয়েছে।

অজিতেশ দত্তর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে অমিত এসে প্রবেশ করে স্মৃতিকণার ঘরে। একটু পরেই ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে স্মৃতিকণা।

চায়ের কাপটা অমিতের সামনে নামিয়ে রেখে একটু স্মিত হেসে স্মৃতিকণা বললে, নিন, চা খান। সাংঘাতিক পরিশ্রম করেছেন আজ। স্মৃতির কথায় শ্লেষের সুর।

—তার মানে? বিস্ময় প্রকাশ করে অমিত।

—বাঃ, আপনারা আজ ভীষণ পরিশ্রম করেননি? সম্ভব হলে আপনাদের থানার সবাইকে আজ চা খাওয়াতাম।

—কি বলতে চাইছো তুমি। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে অমিত।

অমিতের পাশে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে চায়ের কাপটা তার দিকে আর একটু ঠেলে দিয়ে স্মৃতিকণা বলে ওঠে, আগে চা'টা খেয়ে নিন, তারপর বলছি।

এতক্ষণে খেয়াল হল অমিতের। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে একটু হেসে বললে, ও বুঝেছি। আজকের কলেজের ঘটনার কথা বলছো? তা' তুমি নিজে আজ কলেজে গিয়েছিলে?

—না, যাইনি। তাই তো আফশোষ হচ্ছে, নিজের চোখে আপনাদের বীরত্ব দেখতে পেলাম না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অমিত আবার বললে, তুমি কি শুনেছো জানি না। আমি নিজেও অবশ্য সেখানে যাইনি। তবে বড়বাবুর কাছে শুনেছি, পুলিশ কলেজে ঢুকে কোন অত্যাচার করেনি। দশজন ছাত্রকে কেবল গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে তিন-চারজনকে এ্যারেস্ট করার সময় তারা বাধা দিয়ে ধস্তাধস্তি করেছে বলে তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে।

—সেকি? এদিকে আমরা যে শুনলাম, চার-পাঁচজন ছাত্রকে মেরে একেবারে আধমরা করেছেন আপনারা। তাদের নাকি হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে।

একটু ম্লান হেসে অমিত বললে, গুজব, সম্পূর্ণ গুজব। আমাদের বিরুদ্ধে তো গুজব ছড়াবার লোকের অভাব নেই। আমাদের কাজকর্মের ভেতর লোকে সামান্য তিলকে প্রকাণ্ড তাল করে দেখে।

একটু সময় চিন্তা করে স্মৃতিকণা বললে, আর আপনারাও আপনাদের নিজেদের দোষের বেলায়, সেই সামান্য তিলকে অতি সামান্য সরষে বলে দেখাতে চেষ্টা করেন।

স্মৃতিকণার উপমায় অমিত হেসে উঠে বললে, তা' হয়ত খানিকটা সত্যি। তবে আজকের কলেজের ঘটনা সম্বন্ধে তুমি যা শুনেছো তা' সত্যিই অতিরঞ্জিত। কেউ আহত হয় নি, কেউই হাসপাতালে যায়নি। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদেরও ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

—বলুন, ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাই না?

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই।

স্মৃতিকণা আবার বললে, তা' আপনি যা'ই বলুন না কেন, আপনাদের পক্ষে কলেজের মধ্যে ঢোকা ঠিক হয়নি।

চায়ের কাপটা শেষ করে একটু দূরে ঠেলে দিয়ে অমিত জবাব দেয়, হ্যাঁ, তা তো বলবেই। একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র কলেজের মধ্যে বসে তাণ্ডব নৃত্য করবে, আর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাদের সাহায্য চাইলেও আমরা কিছু না করে কেবল নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা' দেখবো, এই বুঝি তোমরা চেয়েছিলে?

—না, তা' কেন? তবে—

—তবে কি?

—তবে আপনারা আরও একটু ধৈর্য ধরতে পারতেন।

একটু সময় চুপ করে থেকে অমিত শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, দেখ স্মৃতি, আমর ধারণা, আমাদের ডিপার্টমেণ্টে ভবদেব ব্যানার্জির মত ব্যক্তির যদি ধৈর্য না থাকে তবে আর কারুরই তা নেই। তা' যাক ওসব কথা। তুমি আজ কলেজ যাও নি কেন? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

—হ্যাঁ, কাল রাতে সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল।

—ও, তাই নাকি? তবে থাক, ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে একটু সিনেমায় যাবো। একটা ভালো ইংরেজি ছবি ছিল আজ।

একটু ভেবে জবাব দেয় স্মৃতিকণা, তা' চলুন না। এমন বেশী জ্বর তো হয়নি।

—না-না, আজ থাক। খারাপ শরীর নিয়ে বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। সিনেমা তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আর একদিন গেলেই চলবে। তার চাইতে বরঞ্চ তোমার সাথে একটু গল্পই করি বসে বসে। কি, আপত্তি নেই তো?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেয় স্মৃতিকণা, থাকলেই বা শুনছে কে? বলেই একটু মিষ্টি হেসে বাইরে যেতে যেতে আবার বললে, আপনি একটু বসুন, রান্নার ঠাকুরের ওপর একটু খবরদারী করে আমি এখনই আসছি। নইলে হয়ত লোকটা তরকারীর মধ্যে নুনের বদলে চিনিই দিয়ে বসে থাকবে।

মৃদু হেসে টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই টেনে নেয় অমিত।

॥ উনিশ ॥

মন-মেজাজ মোটেই ভাল নেই ধূর্জটির। গত তিনদিন ধরে টুটুনের জ্বর। তার ওপর কিছুই খেতে পারে না। এই তিনদিনেই কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটা। ধূর্জটির বৃদ্ধা পিসি ছলছল চোখে শংঙ্কিতকণ্ঠে বলেছিল তাকে, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। তুই একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়।

শহরের একজন সেরা ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছিল ধূর্জটি। তিনি টুটুনকে পরীক্ষা করে গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিলেন, ব্লাড একজামিন করানো দরকার।

সেই ব্লাড একজামিনের রিপোর্ট আজ পাওয়া যাবে। বেলা দশটা-সাড়ে দশটায় ডাক্তার তাঁর চেম্বারে যেতে বলেছিলেন তাকে।

কিন্তু সময়মত সেখানে যেতে পারেনি ধূর্জটি। কাল রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। সারারাত জেগে থাকতে হয়েছিল মেয়ের শিয়রে। ক্লান্ত বৃদ্ধা পিসি গভীর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বড়বাবুর স্ত্রী কমলা ও পিনাকীবাবুর স্ত্রী বাসন্তীও অনেক রাত পর্যন্ত ছিল তার কোয়ার্টারে। খবর পেয়ে কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে শ্রীপতিবাবুর স্ত্রী মহামায়াও এসে একবার ঘুরে গিয়েছিল। খবর নিতে এসেছিল সুশান্তর স্ত্রী রেখাও।

কিন্তু তারা সকলেই প্রতিবেশী। সময়ে-অসময়ে তারা এটা ওটা করে তার সাহায্য করতে পারে মাত্র। সারারাত মেয়ের শিয়রে বসে থাকার জন্যে তো তাদের ডাকা চলে না। তাই, ধূর্জটি নিজেই সারারাত বসেছিল মেয়ের মাথার কাছে।

টুটুনের অসুখের খবর শুনে বড়বাবু ধূর্জটিকে থানা ডিউটি থেকে রেহাই দিয়েছিল। কিন্তু একজন দারোগার কাছে তো থানা ডিউটিই সব নয়। তার চাইতেও অনেক জরুরী কাজ থাক তার হাতে। মামলার তদন্ত, জরুরী এনকোয়ারী প্রভৃতি অনেক কাজেই তাকে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতে হয়।

তেমনি একটা বিশেষ কাজে সকালেই বেরিয়ে যেতে হয়েছিল ধূর্জটিকে। ভেবেছিল, কাজটুকু শেষ করে সেখান থেকে সোজা চলে যাবে ডাক্তারের চেম্বারে। কিন্তু কাজ শেষ হতে দেরি হয়ে গেল অনেক।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। বাইরে কাঠফাটা রোদ। সেই রোদের ভেতরই সাইকেল চেপে ঘামতে ঘামতে ডাক্তারের চেম্বারে এসে হাজির হয়েছিল ধূর্জটি। একে অনিদ্রার অবসাদ, তার ওপর মাথায় দুশ্চিন্তার বোঝা—কি জানি, ব্লাড একজামিনে কি ধরা পড়বে, কে জানে? সারা দেহমন এমনি ক্লান্ত যে, কোমরে বেল্টের সঙ্গে ঝুলানো রিভলবারটা পর্যন্ত অতিরিক্ত ভারি লাগছিল তার।

ব্লাড একজামিনে তেমন কিছুই ধরা পড়েনি। আর, তাতেই যেন আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তার।

গম্ভীরমুখে একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখে ধূর্জটির হাতে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, আজ সারাদিন এই ওষুধ চলবে। কাল আবার ব্লাড একজামিন করতে হবে।

চিন্তিতমুখে ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এল ধূর্জটি। অতটুকু মেয়ে, তার আবার রক্ত নিতে হবে। রক্ত নেবার সময় আবার তার সেই চিৎকার।

রাগ হয় ধূর্জটির। রাগ হয় সরমার ওপর। মনে মনে বলে, বেশ নিশ্চিন্ত মনে তুমি তো ওপারে বসে রয়েছো। আর আমি এদিকে সংসারের পাকে কেমন জড়িয়ে পড়েছি তাই বসে বসে দেখছো। স্বার্থপর কোথাকার! এই যদি তোমার মনে ছিল তো এই ছোট মেয়েটাকে আমার কাছে ফেলে গেলে কেন? তাকেও তো নিয়ে গেলে পারতে। আমার ওপর না হয় তোমার কোন দরদ ছিল না, কিন্তু টুটুন তো তোমার নিজেরই সন্তান। ওর এত কষ্ট কি করে দেখছো তুমি?

কিন্তু জন্মাবার পরের মুহূর্তে টুটুনও যদি তার মা'র সঙ্গে চলে যেতো, তাহলে কি সত্যিই ভাল হত? কথাটা মনে হতেই দারুণ চমকে ওঠে ধূর্জটি। এ কি সব ভাবছে সে? এতে যে টুটুনের অমঙ্গল হবে। বাপ হয়ে সে তার টুটুনের অমঙ্গল কামনা করে?

সাইকেলটা পাশে রেখে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে ধূর্জটি। একদিন নিজের হাতে সে খেলাঘরখানি সাজিয়ে-গুছিয়ে বসেছিল। অতর্কিতে একটা দমকা হাওয়ায় সেই ঘরখানি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার দুঃখ যেন নতুন করে আবার বেজে ওঠে তার বুকে। চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। ভয়-ডরহীন ডানপিটে স্বভাবের ধূর্জটি গাঙ্গুলী যেন একমুহূর্তে একটি অসহায় শিশুর মত হয়ে ওঠে। বাইরে পুলিশের পোশাক, কিন্তু ভেতরে যেন একাকী এক অসহায় শিশু।

একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে ডাক্তারের ব্যবস্থামত প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনে ধূর্জটি। একবার নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। তারপরই সেই প্রখর রোদের মধ্যে সাইকেলে চেপে রওনা হয় থানার দিকে। বাড়ি ফিরে টুটুনকে কি অবস্থায় দেখবে, কে জানে?

রাস্তার মোড় ঘুরতেই তে-মাথার মোড়ে একটা বিরাট কোলাহল। লাল শালুর ফেস্টুন হাতে বিরাট ছাত্র-মিছিল। মিছিলটা কিন্তু এগোচ্ছে না। তে-মাথার মোড়ে কেমন যেন এক জটলা, কিছু একটা হয়েছে বোধহয় ওখানে।

সাইকেলের গতি মন্থর করে দিয়ে একটু সময় চিন্তা করে ধূর্জটি। ওই ছাত্র মিছিলের পাশ দিয়েই তার থানায় যাবার পথ। কিন্তু ইচ্ছা করলে সে অন্য পথে ঘুরেও যেতে পারে।

একবার মনে হয়, না, যা হচ্ছে হোক, ও-পথে না যাওয়াই ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে সে। কাল কলেজে তাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেই এই ছাত্র-মিছিল। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট করে ছাত্ররা তাদের প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমেছে। কিন্তু মিছিল এগোচ্ছে না কেন? ঐ তে-মাথার মোড়ে কিসের ভিড়?

মোড়ের কাছাকাছি এসেই কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় ধূর্জটির কাছে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যে ট্র্যাফিক কনস্টেবলটি ডিউটি করছিল তাকে ঘিরেই প্রচণ্ড কোলাহল। কনস্টেবলটি হাত নেড়ে কি যেন বোঝাতে চাইছে তাদের। প্রত্যুত্তরে উত্তেজিত ছাত্ররা মুষ্টিবদ্ধ হাতে চিৎকার করে আস্ফালন করছে তার চারিপাশে।

রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম। সারি সারি মোটর, ট্রাক, রিক্সা দাঁড়িয়ে পড়েছে দু'দিকে। সারা রাস্তা জুড়ে ছাত্রদের কোলাহল। দোকানের মালিকরা বেচাকেনা ভুলে গিয়ে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে সেই ভিড়ের দিকে। দু'চারজন অতি সাবধানী দোকানদার ইতিমধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দোকানের ঝাঁপ ফেলতে। কি জানি, বলা তো যায় না, হুড়োহুড়ির মধ্যে দোকান লুট হতে কতক্ষণ?

দোষ অবশ্য সেই কনস্টেবলেরও কম নয়। কি প্রয়োজন ছিল সেই উত্তেজিত ছাত্রদের সঙ্গে তর্ক করার?

ব্যাপারটা অবশ্য তেমন কিছুই নয়। তবে, অতি সাধারণ ব্যাপারও অনেক সময় অসাধারণ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে হয়েছিল ঠিক তাই।

ট্র্যাফিক ডিউটি করছিল কনস্টেবলটি। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেই ছাত্র মিছিল।

উত্তেজিত ছাত্রদের মধ্যে দু'চারজন যেতে যেতে সেই কনস্টেবলটির দিকে তাকিয়ে কিছু খারাপ মন্তব্য করতেই সেই হিন্দুস্থানী কনস্টেবলের আত্মাভিমানে ঘা লাগে। প্রত্যুত্তরে সেও তেমনি ভাষায় কিছু মন্তব্য করে।

আর যায় কোথায়! দাঁড়িয়ে পড়ে মিছিল। মারমুখী হয়ে ওঠে ছাত্ররা। বেগতিক দেখে কনস্টেবলটি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ফল হয় না কিছুই।

হঠাৎ পেছন থেকে দু'টি ছাত্র ফেস্টুনের লাঠি দিয়ে কনস্টেবলটির পিঠে আঘাত করতেই কনস্টেবলটি ঘুরে দাঁড়িয়ে একজনকে বুটের লাথি মারে। পড়ে যায় ছাত্রটি। সঙ্গে সঙ্গে সেই কনস্টেবলটির ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ছাত্র-বাহিনী।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে এসে উপস্থিত হয় ধুর্জটি। ক্রুদ্ধ ছাত্রদের হাত থেকে কনস্টেবলটিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। নইলে, তাকে হয়ত মেরেই ফেলবে তারা। এদিকে সে একা কি করে এই বিরাট ছাত্র-বাহিনীর মহড়া নেবে?

কিন্তু ভাবনা-চিন্তার অবসর নেই। নিজের কথা ভুলে যায় ধুর্জটি। ভুলে যায় টুটুনের কথা। ভুলে যায় যে, কঠিন রোগে আক্রান্ত তার কন্যার ওষুধ রয়েছে তার প্যাণ্টের পকেটে।

সাইকেলটাকে একটা দোকানের সামনে ফেলে রেখে ভিড়ের মধ্যে ছুটে যায় ধুর্জটি। চিৎকার করে ছাত্রদের শান্ত হতে অনুরোধ করতে করতে সে দু'হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে সেই আক্রান্ত কনস্টেবলটির দিকে।

একজন পুলিশ অফিসারের আগমনে ছাত্রদের উত্তেজনা প্রশমিত হবার পরিবর্তে আরও বেড়ে ওঠে। মার—মার শব্দে তেড়ে আসে তারা। কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করেই ভিড়ের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করে সে।

হঠাৎ গোটাকয়েক ইট এসে পড়ে তার পায়ের কাছে। ধুর্জটি একমুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়ায়। সাহয্যের আশায় চারিদিকে তাকায় একবার। অদূরে সেই কনস্টেবলটি ভূমিশয্যা গ্রহণ করে গোঙাচ্ছে। তার নাক দিয়ে দর দর করে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ওদিকে বুটের লাথিতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে সেই ছাত্রটি। তাকে ধরাধরি করে রাস্তার একপাশে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন তার শুশ্রূষায় লেগে গেছে। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে ছাত্ররা। দ্রুত ছন্দে দোকানের ঝাঁপ পড়ছে একের পর এক।

হঠাৎ, একটা বড় ইট এসে পড়ে ধুর্জটির পায়ের ওপর। সামান্য আর্তনাদ করে সেখানেই বসে পড়ে ধুর্জটি। উত্তেজনায় সেও তখন থর থর করে কাঁপছে। পরমুহূর্তেই আরও একখানা

বড় সাইজের ইটের টুকরো। ইটখানা এসে পড়ে ঠিক্ তার বাঁ হাতের উপর। থেঁত্লে যায় খানিকটা মাংস। আঘাতের তীব্রতায় অসাড় হয়ে ওঠে হাতখানা।

মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে ধূর্জটির। ধক্ করে জ্বলে ওঠে চোখ দু'টো। দেহ-মনের অপরিসীম ক্লান্তি ও আঘাতের ব্যথা ভুলে গিয়ে অকস্মাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পরমুহূর্তেই ক্ষিপ্র হাতে কোমর থেকে রিভলবারটা টেনে বের করে ছাত্রদের দিকে তাক্ করে এক রাউণ্ড্ গুলি ছোঁড়ে।

গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় সেই ছাত্র মিছিল। কেবল একটি বালকের অন্তিম চিৎকার আকাশে-বাতাসে মাথা খুঁড়ে মুক্তির পথ না পেয়ে একসময় মিলিয়ে যায় সেই জন কোলাহলের মধ্যে।

মাত্র পাঁচ-ছ' মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। খবর পেয়ে বিরাট পুলিশ ফোর্স যখন এসে পৌঁছোয়, তখনও ছত্রভঙ্গ ছাত্ররা এদিক-ওদিক ছুটে পালাচ্ছে। সারা রাস্তায় ফেস্টুন্-প্ল্যাকার্ডের ছড়া-ছড়ি। যানবাহন স্তব্ধ। দু'জন বয়স্ক ছাত্র গুলির আঘাতে আহত সেই ছেলেটিকে একটা রিক্সায় তুলে নিয়ে চলে গেছে হাসপাতালের দিকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তারা জানত না যে, তাদের সেই চেষ্টা একান্তই নিরর্থক? সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে আগেই।

রিভলভারটি হাতে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে তেমনি স্থির হয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে ধূর্জটি। দেহে যেন এতটুকু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। চিন্তা-ভাবনা শোক-দুঃখের বাইরে একটা অদ্ভুত অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে যেন একটা জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে ধূর্জটি। চোখদু'টো খোলা রয়েছে কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পারছে না, কানদু'টো খোলা রয়েছে কিন্তু কিছুই যেন শুনতে পারছে না, মস্তিষ্ক এখনও অটুট রয়েছে কিন্তু কিছুই যেন ভাবতে পাবছে না, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা এখনও সচল রয়েছে কিন্তু কিছুই যেন অনুভব করতে পারছে না। এ কি হল তার? এ কি করে ফেলল সে?

সেদিন কলেজের সামনেই গণ্ডগোল আশঙ্কা করেছিল ভবদেব। তাই কলেজ ও শহরের কয়েকটি প্রধান স্কুলের সামনে পুলিশ পিকেট বসেছিল। কিন্তু সেই শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিল যে শহরের কেন্দ্রস্থলে বড় রাস্তায় এমনি একটা ব্যাপার ঘটাবে তা' শুধু ভবদেব কেন, জেলার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও ধারণা করতে পারেনি। সেই মুহূর্তে ধূর্জটি যদি সেখানে না যেত তো এতবড় ব্যাপারটা কিছুতেই ঘটত না। সেই পুলিশ কনস্টেবলটি হয়ত ছাত্রদের হাতে নির্যাতিত হত, কিন্তু গুলি ছোঁড়বার মত কোন পরিস্থিতি হয়ত সৃষ্টি হত না সেখানে।

তাই ধূর্জটির গুলি চালাবার ও একটি ছেলে নিহত হবার খবরে বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল ভবদেব।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল অমিতও। কলেজ গেটের সামনে ডিউটি ছিল তার। সঙ্গে ছিল পিনাকী সরকার। খবরটা তাকে দিয়েছিল পিনাকী। কলেজ গেটের সামনে একটা চা-দোকানে চা খেতে গিয়ে খবরটা শুনে এসেছিল সে। বলেছিল, শুনেছেন মেজবাবু, বাজারের কাছে ছাত্র-মিছিলের ওপর নাকি গুলি চলেছে।

কথাটা শুনেই চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল অমিত। উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, গুলি চলেছে? বলছেন কি? কে গুলি ছুঁড়েছে? যতদূর জানি, ওখানে তো কোন পুলিশ পিকেট ছিল না। তবে গুলি ছুঁড়ল কে?

—তা' জানি না মেজবাবু, জবাব দিয়েছিল পিনাকী, তবে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। আর একটি ছেলে নাকি মারাও গেছে।

—সেকি একটি ছাত্র নিহত হয়েছে? সারা মুখখানা থম্‌থমে হয়ে উঠেছিল অমিতের।

বিকেলে ডিউটির পরে থানায় ফিরে এসেই সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল অমিত। খবরের আশায় আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম সেখানে।

থানায় তখন দারুণ ভিড়। জেলার সমস্ত হোমরা-চোমরা অফিসাররা উপস্থিত। বিষণ্ণ মুখে একখানা চেয়ারে বসে রয়েছে ধুর্জটি। উর্ধ্বতন অফিসারের আদেশে সেই মুহূর্তেই চাকরি থেকে সাস্‌পেণ্ড্ করা হয়েছে তাকে। তার আচরণের এন্‌কোয়ারী হবে। হয়ত জনমতের চাপে জুডিসিয়াল্ এন্‌কোয়ারীও হবে। আর তাতে দোষী প্রতিপন্ন হলে তাকে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে শাস্তি।

আমি দূর থেকে খানিকক্ষণ স্থিরচোখে তাকিয়ে থাকি ধুর্জটির দিকে। ওর সাথে কথা বলতেই ইচ্ছা হয় না আমার। এই সেই নর-হত্যাকারী। একটি মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে সে। অপ্রয়োজনীয় এই নরহত্যা। অমানুষিক এই আচরণ।

এতদিন আমি এই ধুর্জটি গাঙ্গুলীকে মনে মনে একটু পছন্দই করতাম। ভয়-ডরহীন গোঁয়ার প্রকৃতির হলেও মনটা তার সত্যিই সরল। কোন প্যাঁচ নেই সেখানে। স্বার্থপরতাও নেই। কাজে নিষ্ঠা আছে। তবে, সেই নিষ্ঠা মাঝে-মধ্যে একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তখন আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করবার শক্তি থাকে না তার। নিজের বিপদের চিন্তাও মনে আসে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে ধুর্জটির প্রতি আমার মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। একটি অসহায় তরুণকে সে অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় হত্যা করেছে। একটি সম্ভাবনাময় জীবনের ওপর অকস্মাৎ সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছে। ভালই হয়েছে। উর্ধ্বতন অফিসাররা তাকে চাকরি থেকে সাস্‌পেণ্ড্ করে উচিত কাজই করেছেন। ধুর্জটি ট্যাক্টলেস। আর, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে এই 'ট্যাক্টলেস' বিশেষণটি একজন পুলিস অফিসারের চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় ছাড়া যে আর কিছুই নয়, সেকথা এতদিন এদের সঙ্গে মিশে আমার অজানা ছিল না।

ধুর্জটির চিন্তা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না আমার মনে। সেই মুহূর্তে তার চাইতেও একটি বড় চিন্তা আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। একটি প্রয়োজনীয় খবর। আর, সেই খবরটা দিতে হবে অমিতকে। কিন্তু কিভাবে কথাটা অমিতের সামনে পাড়ব সেই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম আমি।

ডিউটি শেষে অমিত থানায় ফিরে আসার পর থেকে ওর সঙ্গে বাক্যালাপের তেমন কোন সুযোগই পাইনি আমি। ভীষণ ব্যস্ত সে, ব্যস্ত ভবদেব ব্যানার্জি নিজেও।

একসময় একজন উর্ধ্বতন অফিসার আমার পরিচয় পেয়ে হেসে আমাকে বললেন, দেখবেন মশাই, পুলিশ গুলি ছুঁড়ে একটি ছাত্রকে হত্যা করেছে—এই খবরের সঙ্গে যেন সেই অফিসারটির সাস্‌পেণ্ডের খবরটিও থাকে।

আমিও মৃদু হেসে তাকে আশ্বস্ত করে জবাব দিই, আপনি স্যার নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সব খবরই থাকবে।

—হ্যাঁ তাই থাকে যেন, অফিসারটি বলতে থাকেন, আজকাল আপনারা তো হচ্ছেন পাব্‌লিক্ ওপিনিয়ন্ তৈরির প্রধান স্তম্ভ। তাই আপনাদের সমীহ না করে আমাদের উপায় নেই। বলেই তিনি হেসে ওঠেন।

আমিও আর কিছু না বলে কেবল সৌজন্যের খাতিরে একটু হাসি।

থানার ভিড় কমে আসে। হোম্‌রা-চোম্‌রা অফিসাররা থানা ছেড়ে চলে যেতেই ভবদেব একবার অমিতকে দেখিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করে। আমিও চোখের ইশারায় তার জবাব দিই।

একসময় ভবদেব অমিতকে বললে, তুমি এবার বাসায় যাও, অমিত। সারাদিন পরিশ্রম করেছো। এবার বিশ্রাম করো গিয়ে।

—হ্যাঁ, যাই বড়বাবু। বলেই চেয়ার ছেড়ে অমিত উঠে দাঁড়ায়।

অমিত রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই আমিও অনুসরণ করি তাকে। অমিত আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কি, তুমিও এবার বাড়ি ফিরবে নাকি?

—কি যে বলো, জবাব দিই আমি, আমার কাজ কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে? এখন পত্রিকা অফিসে টেলিফোনে সমস্ত খবরাখবর দিতে হবে। তারপর আমার ছুটি।

কথা বলতে বলতে পাশাপাশি চলতে থাকি আমরা। একসময় আমি বলি, দেখ ভাই অমিত, তোমাদের ধুর্জটি গাঙ্গুলী কিন্তু সত্যিই একটা কাঁচা কাজ করেছেন। তার মত মাথাগরম লোকের পক্ষে এই ডিপার্টমেন্ট ঠিক উপযুক্ত নয় বলেই আমার ধারণা। যে লোক হাতে রিভলবার পেয়ে কথায় কথায় গুলি ছুঁড়তে পারে তার চাকরি খতম হওয়াই উচিত।

অমিত কোন জবাব না দিয়ে কেবল নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে।

আমি আবার বললাম, ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আমি যোগাড় করেছি। সেই মুহূর্তে ছাত্র-মিছিলের মাঝখানে গিয়ে বীরত্ব ফলানোর কোনই প্রয়োজন ছিল না তার। সেই নিগৃহীত ট্রাফিক কনস্টেবলের জন্যে সত্যিই যদি তার দরদ উথ্‌লে উঠেছিল তো একা সেই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে গোঁয়ার্তুমি না করে তাড়াতাড়ি থানায় ছুটে এসে খবর দিলেই তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হত।

মৃদুকণ্ঠে এবার জবাব দেয় অমিত, সকলের বিচারবুদ্ধি একরকম হয় না, তরুণ। অন্য কেউ যেখানে কনস্টেবলটিকে বাঁচাতে আর সেই সঙ্গে নিজের জীবন বাঁচাতে থানায় পালিয়ে এসে খবর দিত, সেখানে ধুর্জটিবাবুর পক্ষে নিজের জীবন বিপন্ন করে একটি মানুষকে বাঁচাতে যাওয়া নিশ্চয়ই নির্বুদ্ধিতার কাজ ছিল না।

শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে আমি বলে উঠি, তা' যা বলেছো। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আর একজনের প্রাণ নিয়েছে সে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলতে থাকে অমিত। তারপর একসময় একটু ম্লান হেসে বললে, দেখ তরুণ, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, পুলিশের পক্ষে জনসাধারণের প্রিয় হয়ে ওঠা সত্যিই অসম্ভব। পুলিশের হাতে আছে গুলি বন্দুক, আর জনতার হাতে একখানা লাঠিও নেই। কর্তব্যের খাতিরে গুলি-বন্দুক নিয়ে সেই পুলিশ যখন নিরস্ত্র জনতার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে, তখন মানুষের স্বাভাবিক সহানুভূতি গিয়ে পড়ে সেই জনতার ওপর। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তখন সাময়িকভাবে মুলতুবী থাকে। কি অবস্থায়, কি পরিবেশে মুষ্টিমেয় পুলিশকে গুলি-বন্দুক নিয়ে ক্রুদ্ধ জনতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল সেই বিচারও সেই মুহূর্তে করে না কেউ। তারপর, যখন সব স্থির হয়ে আসে, শান্ত পরিবেশে যখন তার বিচার হয়, ততদিনে সেই ঘটনার গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। তখন পুলিশের সেই গুলি-চালনা জাস্‌টিফায়েড্ হোক কিম্বা আন্‌জাস্‌টিফায়েড্ হোক, তা' নিয়ে জনসাধারণ ঠিক ততটা মাথা ঘামায় না। কেবল পুলিশের বিরুদ্ধে সেই অসন্তোষটুকু থেকে যায় তাদের মনে।

জনসাধারণের মনে এমনি অসন্তোষ জমে জমেই সৃষ্টি হয় একটা বিদ্বেষ—পুলিশ বিদ্বেষ। পুলিশ হয়ে ওঠে ঘৃণার পাত্র। পুলিশের সত্যিকারের কোন ভাল কাজও তখন তারা বাঁকা চোখে দেখে।

অমিত থামতেই আমি একটু ঠাট্টার সুরে বললাম, বাঃ!, চমৎকার! তোমার এবার চাকরি ছেড়ে সাইকোলজির প্রফেসারী করা উচিত। তা' এই মুহূর্তে তুমি এতো কথা বলতে পারছো এই জন্যে যে, যে ছেলেটি মরেছে সে তোমার কেউ নয় বলে। ঈশ্বর না করুন, সত্যিই যদি তোমাদের পরিবারে কোনদিম তেমন কিছু ঘটে তো সেদিন এতসব যুক্তিতর্ক তোমার মনে আসবে না।

জবাব দেয় অমিত, তা' হয়ত আসবে না। যে পরিবারের আজ এতবড় ক্ষতি হল তারা হয়ত কোনদিনই পুলিশকে ক্ষমা করতে পারবে না। কিন্তু ভাই তরুণ, মানুষের মনের গতি যেমনি সবসময় যুক্তি-তর্কের পরোয়া করে না, ঠিক তেমনি যুক্তি-তর্কও সবসময় মানুষের সেন্টিমেন্টের তোয়াক্কা রাখে না।

—তা' হলে, তুমি বলতে চাইছো, ধূর্জটিবাবু যা' করেছেন তা' ভালই হয়েছে?

—না ভাই, ভালমন্দের কথা কিছুই বলছি না আমি। তবে বিচার করবার আগে সমস্ত পরিস্থিতিটা একটু ভালমত বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি কেবল।

কথা বলতে বলতে ততক্ষণে অমিতের বাসার কাছে এসে পড়েছি আমরা। অমিতের মুখের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে বললাম, আজ যে ছেলেটি দুর্ঘটনায় মারা গেছে তার পরিচয় জানো?

—না, ঠিক জানি না। ম্লানকণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, এই শহরেরই কোন দুর্ভাগ্য বাপের হতভাগ্য ছেলে হবে হয়তো।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই, একটা ঢোক গিলে বললাম, রিটায়ার্ড এ্যাডভোকেট অজিতেশ দত্তর একমাত্র ছেলে শঙ্কর।

—কি—কি নাম বললে? শঙ্কর? স্মৃতির ভাই শঙ্কর? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অমিত।

অমিতকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াই। ভবদেব বাবুর নির্দেশমত অমিতকে এই দুঃসংবাদটি জানাতে হল আমাকেই।

বাসায় পৌঁছে অমিত কিন্তু আর একটি কথাও বলেনি। আমার ফিরে আসার সময় শুষ্কমুখে ভারিকণ্ঠে কেবল বলেছিল, কাল একবার এসো।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

॥ কুড়ি ॥

শঙ্কর—অজিতেশ দত্তর একমাত্র বংশধর শঙ্কর। স্মৃতিকণার একমাত্র ভাই শঙ্কর। সেই শান্ত ছোট ছেলেটি মারা গেল। একটি সুন্দর ফুলের কলি ভাল করে ফুটবার আগেই অকালে ঝরে পড়ল, রেখে গেল কেবল তার স্মৃতি তার বৃদ্ধ পিতার মনে, তার দিদি স্মৃতিকণার মনে। আর সর্বোপরি কোতোয়ালী থানার মেজোদারোগা অমিত রায়ের মনে।

অমিতের খুব ভালো লাগত এই সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে। পঞ্চম শ্রেণীর স্কুলের ছাত্র শঙ্কর। দিদি স্মৃতিকণার শাসনে ও যত্নে হয়ে উঠেছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। অমিত যখনই ওদের বাড়ি যেত তখনই শঙ্কর তাকে ধরে পাড়ত গল্প বলার জন্যে। না, বানানো গল্প নয়, সত্যিকারের কাহিনী। অমিতের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। চোখদু'টো বড় করে একাগ্র মনে সেই কাহিনী শুনত শঙ্কর।

অল্পদিনের চাকরি অমিতের। অভিজ্ঞতাও কম, বাধ্য হয়েই অমিতকে তাই বানিয়ে বানিয়ে কাহিনী বলতে হত। আর সেই কাহিনী শুনতে শুনতে কখনও বা রোমাঞ্চিত, কখনও বা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত শঙ্কর। বলত, এসব ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল অমিতদা?

—সত্যি না তো মিথ্যে বলছি নাকি তোমাকে? জবাব দিত অমিত।

মাঝে মাঝে দিদিকেও সেই সব কাহিনী শোনাত শঙ্কর। স্মৃতিকণা বলত, রেখে দে তোর অমিতদার সে সব আষাঢ়ে গল্প।

—তার মানে? অভিযোগের সুর বেজে উঠত শঙ্করের কণ্ঠে, তুমি বলতে চাইছো এসব সত্যি নয়?

—একবর্ণও সত্যি নয়। মুখ টিপে হেসে স্মৃতিকণা জবাব দিত।

—বারে, অমিত দা যে নিজে সেদিন বললেন, এ সমস্তই সত্যি!

—সত্যি তো সত্যি, তুই বিশ্বাস করগে, আমি এর একবর্ণও বিশ্বাস করি না।

—বেশ, এরপর অমিতদা এলে তাকে বলে দেব। বলব, দিদি বলেছে আপনি নাকি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেন।

—বেশ তো বল্ না! তোর অমিতদাকে আমি ভয় করি নাকি?

—না, ভয় করবে কেন? সরলকণ্ঠে জবাব দিত শঙ্কর, তাকে যে তুমি ভালোবাসো।

—শঙ্কব! চোখ-মুখ লাল করে তীব্রকণ্ঠে তাকে ধমক দিত স্মৃতিকণা।

দিদির ধমকে থতমত খেয়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত শঙ্কর। সে বুঝতে পারত না, এ কথার মধ্যে অন্যায় কি আছে? বাস্তবিকই তাই। স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসার যে অন্য একটা অর্থ আছে সে কথা বোঝবার মত বয়স তার তখনও হয়নি।

তাই সে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলত, বারে, তুমি অমিতদাকে ভালোবাসো না? তবে তার জন্যে বসে বসে খাবার তৈরি কর কেন?

—তার জন্যে খাবার তৈরি করি নাকি? করি তো তোর জন্যে, বাবার জন্যে।

—না, অমিতদার জন্যেও কর। তুমি যা-ই বলো না কেন, আমি জানি অমিতদাকে তুমিও ভালোবাসো, বাবাও ভালোবাসেন।

—তুই ভালোবাসিস না?

—খু-উ-ব। জবাব দিত শঙ্কর।

অন্যদিনেরর মত সেদিনও ঠিক সময় খেয়েদেয়ে স্কুলে গিয়েছিল শঙ্কর। যাবার আগে স্মৃতিকণা জিজ্ঞেস করেছিল, কিরে, আজ তোদের স্ট্রাইক হবে না?

—হ্যাঁ, হবে।

—তবে যাচ্ছিস কেন?

—যেতে হবে। সবাইকে ঠিক সময়ে যেতে বলেছে।

—এই রোদে রাস্তায় টো-টো করে ঘুরবি নাকি? জ্বর হয়ে পড়বে যে! থাক, গিয়ে কাজ নেই।

—বারে, সবাইকে যে যেতে বলে দিয়েছে।

—তা বলুক, তোকে যেতে হবে না। গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিল স্মৃতিকণা।

মা মরা ছেলে শঙ্কর। দিদির আদর-যত্নেই এতটা বড় হয়েছে। জ্ঞান হবার পর থেকে এই দিদিটাই তার মায়ের স্থান পূর্ণ করে রেখেছিল। তাই এই দিদির ওপরই ছিল তার যত অভিমান, যত আবদার।

স্মৃতিকণাকে সে যেমনি ভালোবাসত, ভয়ও করত ঠিক তেমনি। দিদির হুকুম অমান্য করবার সাহস কিম্বা সাধ্য তার ছিল না। তাই স্মৃতিকণার কথায় খানিকক্ষণ মুখখানা কালো করে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে স্মৃতিকণার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, তুমি অমত করো না, দিদি। একটিবার যেতে দাও কেবল। বেশি দেরি করব না। একটু ঘুরেই চলে আসব।

ভাইকে আর ফেরাতে পারেনি স্মৃতিকণা। তার গায়ে-মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে অবশেষে বলেছিল, বেশ যাও, তবে বেশি দেরি করবে না কিন্তু। একটু ঘুরেই বাড়ি ফিরে আসবে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গিয়েছিল শঙ্কর। আর সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া।

শঙ্করের মৃত্যুর খবর কিন্তু অজিতেশ দত্তর বাড়িতে বুক ফাটা চিৎকার করে কেউ কাঁদে নি। কেবল খবরটা শুনে বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত সেই যে চেয়ারের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, একবারও নড়াচড়া করেননি। একটি কথাও বলেননি কারুর সঙ্গে। আর স্মৃতিকণা একবার মাত্র 'শঙ্কর' নামটা উচ্চারণ করেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছিল। কেবল একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল সেই বাড়িটার ওপর।

শঙ্করের মৃত্যু কিন্তু অমিতের দৈনন্দিন কাজকর্মে তেমন কোনও ব্যাঘাত ঘটায় নি। বাইরে সে যতই স্থির অচঞ্চল থাকুক না কেন, আমার কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে, ভেতরে ভেতরে অমিত অস্থির হয়ে উঠেছে—একটা সাংঘাতিক অস্বস্তিতে ভুগছে।

একদিন সে আমাকে বললে, আজ তিনদিন হয়ে গেল। ভাবছি, এবার একদিন ওদের বাড়ি যাব।

আমি বললাম, হ্যাঁ, 'তাই যাও। যা' হবার তা' তো হয়েই গেছে, এই সময় তোমার একবার সেখানে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন। পারো তো অজিতেশবাবু আর তাঁর মেয়েকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে যতটা সম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে এসো। এর বেশি তুমি আর কি-ই বা করতে পার?

—হ্যাঁ, তাই যাব। গম্ভীরকণ্ঠে কথাটা বলে অমিত মাথা নিচু করে কাজের মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করলেও আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, পাছে তার মুখের ভাবটি আমি দেখে ফেলি সেই ভয়েই সে নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করছিল।

সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই অমিত এসে হাজির হল অজিতেশ দত্তর বাড়িতে।

কেমন যেন একটা প্রেতপুরীর মত লাগছিল বাড়িটা। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। একটা মৃত্যুর শীতলতা যেন ঘিরে রেখেছিল সেই বাড়িটাকে।

বাইরের ঘরে জ্বলছিল একটা অল্প পাওয়ারের আলো। আর দরজার সামনে ম্লানমুখে বসে ছিল বাড়ির একটি চাকর।

অমিতকে দেখে চাকরটি কেবল মুখ তুলে তাকায় একবার, কোন কথা বলে না। একমুহূর্ত ইতস্তত করে অমিত তাকে জিজ্ঞেস করে, বুড়োবাবু কোথায়?

—ওপরের ঘরে। সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু দিয়েই আবার অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে চাকরটি।

অমিতের মনে হয় এই মুহূর্তে তার নিজের উপস্থিতি যেন এই বাড়ির কারুর, এমনকি চাকর-বাকরদেরও কাম্য নয়। কেউ চায় না তাকে। ফিরেও কেউ তাকাবে না তার দিকে।

অমিতের একবার মনে হল যে ফিরে যায়। পরমুহূর্তেই কি মনে করে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে।

শঙ্করের পড়ার টেবিলটি ঠিক তেমনি সাজানো-গোছানো রয়েছে। টেবিলের ওপর সেই ঝালরকাটা টেবিল-ল্যাম্প। একপাশে তার পেন্সিল-কলম রাখার সেই সুদৃশ্য প্ল্যাস্টিকের বাক্সটি। টেবিলের ঠিক সামনে দেয়ালে ঝুলছে কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে আটকানো বাংলার দুই সুসন্তানের মাটির মূর্তি—স্বামীজি ও নেতাজী। কৃষ্ণনগরের তৈরি এই মূর্তি দু'টি অমিতই তাকে উপহার দিয়েছিল তার জন্মদিনে।

সবই আছে, নেই কেবল সেই ছেলেটি যে নাকি অমিতকে দেখামাত্রই হাসিমুখে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে অনুযোগের সুরে বলত, কতদিন আসেননি বলুন তো, অমিতদা?

চোখদু'টো কেমন যেন জ্বালা করে ওঠে অমিতের। সেই মুহূর্তে কবির সেই লাইনটা মনে পড়ে—'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, যে নদী মরুপথে হারালো ধারা...।'

শঙ্করের টেবিলের সামনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অমিত। তারপর একসময় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে যায়।

ঘরের মধ্যে বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত খোলা জানালাপথে বাইরে অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিলেন। দরজার কাছে পায়ের শব্দে ফিরে তাকান তিনি। স্থির চোখে একমুহূর্ত অমিতের দিকে তাকিয়ে থেকে দরজার দিকে এগিয়ে যান। তারপর অমিতের একটা হাত ধরে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, এসেছো—এসেছো বাবা, এসো—এসো। কাল থেকে কেবল তোমার কথাই মনে হচ্ছিল। এই বয়সে যার চলে যাবার কথা সে এখানে পড়ে রইল, আর ছেলেটা দিব্যি চলে গেল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে। সবই ভবিতব্য, বুঝলে, সবই আমার কর্মফল!

বৃদ্ধ অজিতেশের কণ্ঠে কোন অনুযোগের সুর নেই। নেই কোন অভিমানের চিহ্ন। কেবল পুত্রহারা এক বৃদ্ধ পিতার হাহাকার ধ্বনি ভেসে ওঠে মাত্র।

স্তব্ধ হয়ে থাকে অমিত। সেই মুহূর্তে সন্তান-হারা এই বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষাও সে খুঁজে পায় না। নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়। মনে হয় শঙ্করের এই অকাল মৃত্যুর জন্যে যেন সে নিজেই দায়ী।

পাশের ঘরে ছিল স্মৃতিকণা। শঙ্করের মৃত্যুর পর এই তিন-চারদিন কাছের দূরের অনেক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরাই এ বাড়িতে এসেছিল তাদের সান্ত্বনা দিতে। তেমনি কোন আত্মীয়ের সাথেই তার বাবা কথা বলছেন মনে করে স্মৃতিকণা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কার সাথে কথা বলছো বাবা?

কিন্তু অমিতের দিকে নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সারা দেহটা থর থর করে কেঁপে ওঠে একবার। অতিকষ্টে দরজার চৌকাঠ ধরে নিজেকে সামলে নেয়। পরমুহূর্তেই ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জে ওঠে, আমাদের বাড়িতে এই লোকটি কেন এসেছে, বাবা? কে ওকে এখানে আসতে বলেছে? কি প্রয়োজন ওর এখানে?

—কি বলছিস্ তুই মা? বৃদ্ধ অজিতেশ হা-হা করে ওঠেন, তুই কাকে কি বলছিস? এ যে আমাদের অমিত!

—না—না বাবা, ও আমাদের কেউ নয়। ও পুলিশ। এছাড়া আর কোন পরিচয় নেই ওর। ওরা সবাই মিলে আমার ভাইকে খুন করেছে। নির্মমভাবে হত্যা করেছে শঙ্করকে, ওদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত নেই। ওরা মানুষ নয়—ওরা অমানুষ। ওকে যেতে বলে দাও, বাবা। এখনই ওকে এবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলো। তুমি কি বুঝতে পারছো না বাবা, শঙ্করের আত্মা এখনও এবাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে? এই লোকটির উপস্থিতি যে তার আত্মাকে কষ্ট দেবে, এর উষ্ণ নিঃশ্বাস যে শঙ্করের আত্মাকেও রেহাই দেবে না। সেই আত্মাকেও পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। ওকে যেতে বলো, বাবা। শিগগির ওকে এখান থেকে চলে যেতে বলো। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে স্মৃতিকণা। আর পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অমিত।

স্মৃতিকণা থামতেই বৃদ্ধ অজিতেশ অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠেন, এ তোর কি হল, মা? তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি?

সবেগে মাথা নেড়ে তেমনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে স্মৃতিকণা বলে ওঠে, না—না বাবা, আমি এখনও পাগল হইনি। তবে এই লোকটিকে চোখের সামনে বেশিক্ষণ দেখলে হয়ত পাগলই হয়ে যাব।

—কিন্তু এ তোর কেমন ধারা বিচার, মা? একজনের দোষে তুই সবাইকে শাস্তি দিতে চাস্?

—না বাবা, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় স্মৃতিকণা, এটা একজনের দোষের কথা নয়। ওরা একটা আলাদা জাত। ওদের সবাই একরকম। প্রয়োজন হলে এই লোকটিও আমার ভাইকে এমনি নৃশংসভাবে হত্যা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হত না। ভগবান ওদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এমনি পাথরের মত মন দিয়ে। দয়া-মায়া-মনুষ্যত্ব কোন কিছু স্থান পায় না ওদের মনে। ওদের দেহে আছে পশুর শক্তি, আর দেশের সরকার ওদের হাতে তুলে দিয়েছে ভয়ঙ্কর অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়েই ওরা এই দেশটাকে নরকে পরিণত করতে চেষ্টা করছে। নির্বিচারে নরহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে শৃঙ্খলার নাম করে।

—কিন্তু—কিন্তু মা—

অজিতেশ দত্ত আবার কিছু বলতে যেতেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তেমনি কঠিন স্বরে স্মৃতিকণা বলতে থাকে, তুমি এখনও কেন ওদের চিনতে পারছো না, বাবা? তুমি কি বুঝতে পারছো না, ওদের মধ্যে একজন আজ আমার ভাইকে হত্যা করেছে। কাল হয়ত এই লোকটিই অন্য কারুর ভাইকে হত্যা করবে। তাই ওদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। ওদের বিশ্বাস করতে নেই, বাবা। ওরা পুলিশ। ওরা অমানুষ।

বলতে বলতে স্মৃতিকণার সুন্দর মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। উত্তেজনার তীব্রতায় ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে থাকে। বিস্ফারিত হয়ে ওঠে তার পটলচেরা চোখ দু'টো। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে তার নিটোল কপালে। তার রুক্ষ চুলের বোঝা মৃদু হাওয়ায় উড়তে থাকে।

অমিত সেই মুহূর্তে এক ভয়ঙ্করী নারী-মূর্তিকে দেখতে পায় স্মৃতিকণার মধ্যে। যেন এক প্রলয়ঙ্করী নারী-মূর্তি সব হারানোর ব্যথায় উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। তার নিঃশ্বাসে যেন বেরিয়ে আসছে আগুনের হল্কা, চোখের তারায় যেন আগুনের জ্যোতি, মুখনিঃসৃত বাক্যবাণে যেন শঙ্খবিষের তীব্রতা। বহুকাল আগে এমনি এক ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরেই বোধহয়

স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষ রাজার সভায় এসে হাজির হয়েছিলেন। এমনি এক ভয়ানক মূর্তি নিয়েই বোধহয় মৃত পার্বতীকে কাঁধে ফেলে উন্মাদ নৃত্যে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন, এমনি এক রূপেই সম্ভবত দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞান হারিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিলেন দক্ষ রাজার যজ্ঞস্থল।

অমিত এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। বলার কোন সুযোগই পায়নি। নত মস্তকে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল স্মৃতিকণার কথা। শুনে দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয় নি। স্মৃতিকণা যা' বলছিল তা' অসত্য হলেও অসঙ্গত নয়। পুলিশের গুলিতে যার একমাত্র নিরপরাধ ভাই নিহত হয়েছে তার পক্ষে এ ধরনের বাক্যবাণ প্রয়োগ করা অস্বাভাবিক নয় মোটেই।

অমিত একসময় ধীরে ধীরে মাথা তোলে। শান্ত সংযত দৃষ্টিতে একবার তাকায় স্মৃতিকণার মুখের দিকে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে কিছু বলতে যায়।

কিন্তু তার আগেই আবার তেমনি উত্তপ্ত কণ্ঠে স্মৃতিকণা বলে উঠে, না—না, কোন কথা বলো না তুমি, কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না তোমার। এতদিনে তোমাদের হাড়ে হাড়ে চিনতে পেরেছি আমি। সেদিন পিসির কথায় রাগ করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, তিনি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন। বিষধর সাপকেও বোধহয় বিশ্বাস করা চলে, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস করা চলে না। তোমরা কেউটের চেয়েও ক্রুর, নিষ্ঠুর। নইলে—নইলে শঙ্করের মত একটা ছোট ছেলে এমন কি অন্যায় করেছিল তোমাদের কাছে যে, তাকে গুলি করে মেরে ফেললে? বলো—বলো কি দোষ করেছিল সে? কি অপরাধ ছিল তার? তার মত একটা ছোট ছেলেকে এমনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তোমরা কার মুখ উজ্জ্বল করলে? দেশের সরকারের মুখ—দেশের আইনের মুখ—না, তোমাদের নিজেদের মুখ? বলো—বলো, জবাব দাও!

একমুহূর্ত থেমে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে স্মৃতিকণা। একটা প্রচণ্ড কান্নার বেগ এতক্ষণে হু-হু করে নেমে এসে তার কণ্ঠদেশকে যেন চেপে ধরে। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বলতে থাকে, জানো, এখনও প্রতি রাতে আমি শঙ্করকে দেখতে পাই। ব্যথায় কাতর তার মুখখানা। দু'হাতে চেপে ধরেছে নিজের বুকটা। তাজা রক্তস্রোত তার গায়ের সাদা জামাটা লাল হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে সে ডাকছে আমাকে। কিন্তু—কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে না তার সেই ডাক। এমনকি আমিও না। ঠিক সেই অবস্থায় মাটিতে আছড়ে পড়ে ছেলেটা। চারিদিকে—। আর বলতে পারে না স্মৃতিকণা। ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। কান্নার ভারে ভেঙে পড়ে দরজার চৌকাঠের ওপর। দেহভার তার ওপর ন্যস্ত করে খানিকক্ষণ ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। অবশেষে এক সময় কান্না জড়িত কণ্ঠে আবার বলে ওঠে, না—না, তোমার এখানে কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও—চলে যাও এখান থেকে। বলতে বলতে স্মৃতিকণা স্খলিত চরণে ছুটে যায় নিজের ঘরের দিকে।

চিত্রার্পিতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অমিত। আর জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত।

বেচারী স্মৃতিকণা! দীর্ঘদিনের অনুরোধ উপরোধেও অমিত যাকে দিয়ে 'তুমি' সম্বোধন করাতে পারেনি, আজ এই দুঃখের দিনে অকস্মাৎ সে-ই তাকে অবলীলায় তুমি বলে সম্বোধন করে ফেললে। নিজের পিতার উপস্থিতিও তাকে এতটুকু লজ্জিত করতে পারল না।

অজিতেশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্মৃতিকণার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় অমিত। একটু সময় কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে। ভেতরে স্মৃতিকণা তখনও

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার এ ক'দিনের চোখের জল যেন সে এই দিনটির জন্যেই জমিয়ে রেখেছিল।

মৃদুকণ্ঠে অমিত ডাকে, স্মৃতি—স্মৃতিকণা। দরজা খোল।

চোখের জল মুছতে মুছতে খাট থেকে নেমে আসে স্মৃতিকণা। তারপর দরজা খুলে দিয়ে পাল্লার ওপর আড়াআড়িভাবে হাত দু'খানা রেখে অপেক্ষাকৃত শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলতে থাকে, তুমি এখনই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। তোমার উপস্থিতি আর একমুহূর্ত সইতে পারছি না আমি। তোমাকে দেখলেই আমার শঙ্করের ওপর সেই নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়ে। আমি কিছুতেই তা' সহ্য করতে পারছি না। তুমি যাও—তোমার দু'টি পায়ে পড়ছি, তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

স্মৃতিকণার কান্নাভরা মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই মুখ নিচু করে অমিত। নিজেকে সামলে নিতে একমুহূর্ত সময় নেয়। তারপর ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি, স্মৃতি। তোমাকে কষ্ট দিতে আর কোনদিন এখানে আসব না। যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি, আমার ওপর—আমাদের ওপর তোমার মনের যদি কোনদিন পরিবর্তন হয় তো সেদিন আমাকে ডেকে পাঠিও। সেদিন যেখানেই থাকি না কেন, আমি তোমার কাছে আসব। নইলে, এই আমাদের শেষ দেখা।

কথার শেষে আর একমুহূর্তও দেরি না করে ঘুরে দাঁড়ায় অমিত। তারপর ধীর পদক্ষেপে লম্বা বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে। দরজার পাল্লার ওপর মাথা রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিকণা। তার দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে অশ্রুধারা।

৷৷ একুশ ৷৷

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত।

সেই মাঝরাতেই ভারত ভূখণ্ডের আকাশে উদিত হল স্বাধীনতার সূর্য। তাই বোধকরি সেই সূর্য ছিল একটু ম্লান, একটু বা নিষ্প্রভ।

রাজধানী দিল্লির দরবার কক্ষে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলেন ভারতের ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। সামান্য কিছুক্ষণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই শেষ হল পাওয়ার ট্রান্স্ফার। ভারত ইতিহাসের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে শুরু হল আর একটা নতুন অধ্যায়। খণ্ডিত ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনিই হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। 'স্বরাষ্ট্র' শব্দটি বলতে প্রথমেই মনে আসে দেশের প্রশাসন-ব্যবস্থার কথা। আর প্রশাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের পুলিশ-বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের পুলিশ বাহিনীর প্রতি তাঁর ভাষণে কত কথাই না বললেন। বললেন, আপনারা মনে রাখবেন আপনারা আর ব্রিটিশ শক্তির হাতিয়ার নন। আপনাদের এখন প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল জনগণের সেবা করা। সেবাব্রতীর মনোভাব

নিয়েই আপনাদের এখন থেকে কাজে নামতে হবে। এখন থেকে জনগণের সহযোগিতাই হবে আপনাদের প্রধান ভরসা।

সর্দার বল্লভভাইয়ের পরে দিল্লির স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর আসনে কত নামী দামী ব্যক্তিই না এলেন গেলেন। এলেন কৈলাসনাথ কাটজু। এলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং আরও কত কে। সকলের মুখেই কিন্তু সেই একই বাণী—পুলিশকে তার অতীতের কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। জন-শাসনের পরিবর্তে জনসেবার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

কথাগুলি ভাল, শুনতেও খুবই চমৎকার। কিন্তু অতীতের কার্যকলাপকে ভুলে যেতে বললেই কি সহজে ভোলা যায়? তার জন্যে চাই নতুন ব্যবস্থা, নতুন পরিবেশ, নতুন নিয়ম-কানুন। পুলিশকে তার অতীত কার্যকলাপ ভুলিয়ে নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ করে দিতে হলে প্রথমেই চাই আন্তরিকতা। একান্তভাবে মিশতে হবে তাদের সঙ্গে, বুঝতে হবে তাদের অভাব-অভিযোগ, ভাবতে হবে তাদের দুঃখ-কষ্ট সুবিধা-অসুবিধার কথা।

কিন্তু কোথায় সে-সব? কোথায় সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা? কোথায় সেই কল্যাণ-কামনার ব্যাকুলতা? পতিতকে উদ্ধার করা কি এতই সহজসাধ্য ব্যাপার? জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে গিয়ে মহাপ্রভুকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল, সহ্য করতে হয়েছিল অনেক নির্যাতন। একটা পুরোন ধারা, তা' সে যতই খারাপ, যতই অকল্যাণকর হোক না কেন, তাকে ভেঙে চুরমার করে সেখানে নতুনের জোয়ার জাগিয়ে তোলা কি এতই সহজ? সারাটা জীবন দেশের হরিজনদের মধ্যে কাটিয়ে তাদের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেও মহাত্মার মত ব্যক্তি কতটা সফল হতে পেরেছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে কোন দিনের একখানা প্রভাতী দৈনিক খুললেই পাওয়া যায়। এখনও দেশের কোন কোন অংশে হরিজনদের ওপর চলে দলবদ্ধ আক্রমণ। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে ভিটেছাড়া করা হয়। এখনও দেশের আনাচে-কানাচে হরিজন বালক বলি দিয়ে সরকারী কনট্রাক্টর সরকারী বাঁধের কাজ শুরু করে। যে দেশে মহাত্মার মত ব্যক্তি তাঁর সারা জীবনের চেষ্টায়ও হরিজন উদ্ধার করতে পারেননি সেখানে দেশের নেতারা কি মনে করেছিলেন যে, কেবল কিছু নীতিবাক্যের মাধ্যমেই তাঁরা পুলিশ-উদ্ধার করে তাদের শুধু কল্যাণই করবেন না, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্বে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সেই শাসক-শাসিত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে সেখানে সৃষ্টি করবেন এক নতুন সম্পর্কের সেতু বন্ধন? সত্যিই কি ব্যাপারটা জলের মত সহজ?

প্রশ্নটা একদিন করেছিল কোতোয়ালী থানার ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জি। তার কক্ষে বসেই কথা বলছিলাম। আলোচনা চলছিল সেই ছাত্র-হত্যার ঘটনা নিয়ে।

ভবদেবের সেই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে আমি বলেছিলাম, তা' আপনি যা'-ই বলুম বড়বাবু, শান্তি রক্ষার নামে যে পুলিশ এক্সেস্ হয় আপনি নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করেন না।

—না, তা' করি না। জবাবে বলেছিল ভবদেব, কোথাও কোথাও সত্যিই এক্সেস্ হয়। ধরে নিয়ে আসার হুকুম হলে কোথাও কোথাও হয়ত পুলিশ বেঁধেই নিয়ে আসে। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো সংবাদ-প্রভাকর, কোন সাংঘাতিক ঝঞ্ঝাটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব সময় কি চুলচেরা হিসেব করে মেপে কাজ করা সম্ভব? একটু এদিক-ওদিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাবেই। তার ওপর, আবার যিনি গণ্ডগোল ফেস্ করছেন তার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশ্নও রয়েছে।

—তা'হলে কি আপনি বলতে চাইছেন ধূর্জটিবাবুর সেই গুলি করে ছাত্র হত্যা মোটেই এক্সেস্ হয়নি?

—না, তাকে এক্সেস্ বলে মেনে নিতে পারি না আমি। যেহেতু তার গুলিতে একটি নির্দোষ ছোট ছেলে নিহত হয়েছে সেইহেতুই তাকে পুলিশী এক্সেস্ আখ্যা দিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই। যে অবস্থায় ধূর্জটি পড়েছিল তাতে তার গুলি ছোঁড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নইলে নিজের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল। তবে ধূর্জটিকে আমি ট্যাক্ট্লেস বলতে রাজি আছি। চোখের সামনে সেই ট্র্যাফিক্ কনস্টেবলটির নির্যাতন দেখেই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে তাকে বাঁচাতে সেই ছাত্র-মিছিলের মধ্যে প্রবেশ করা মানবতার দিক থেকে বিচার করলে হয়ত ঠিক হয়েছিল, কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্বের দিক থেকে বিচার করলে সেটা তার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা হয়েছিল বলেই মনে করি।

আমি সুযোগ পেয়ে বললাম, একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে কেবল মানবতার দিকটি বিচার করে প্রশাসনিক দায়িত্ব ও অগ্রপশ্চাৎ কিছু বিবেচনা না করাটা তা'হলে নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি তার পক্ষে?

জবাব দেয় ভবদেব, না, তা' ঠিক হয় নি। তবে সব মানুষের মানবতা বোধ ও কর্তব্য জ্ঞান তো ঠিক একরকম হয় না। তার ভেতর কিছু হেরফের থাকবেই। অন্য একজন অফিসার হয়ত ঐ অবস্থায় মনে করত, একজন কনস্টেবল্ মরছে তো মরুক। আমি শুধু শুধু ঐ ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে যাই কেন? এই ভেবে সে হয়ত তার ত্রিসীমানায় না গিয়ে সোজা অন্য পথ ধরত। সেক্ষেত্রে হয়ত তাকেই আমরা ভীরু অপবাদ দিতাম।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করে চুপ করে থাকি। মনে মনে ভাবি, এ আলোচনার শেষ নাই। আরগুমেণ্ট ও কাউণ্টার-আরগুমেট চলতেই থাকবে। নিষ্পত্তি কোনকালেই হবে না। ক্ষেত্রবিশেষে ন্যায় ও অন্যায়ের সীমারেখা এত সূক্ষ্ম যে, তা' নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। তবে মোদ্দা কথা হল এই যে, বৃদ্ধ অজিতেশ দত্তর একমাত্র ছেলে নিহত হয়েছে। তাঁর সেই ক্ষতিপূরণ করবার ক্ষমতা এই বিশ্ব সংসারে কারুরই নেই।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভবদেব বললে, এদিকে তোমার কর্সিক্ ব্রাদারটির কোন খবর রাখ?

চম্কে উঠি আমি। বলি, কেন, অমিতের আবার কি হল?

—সে যে এদিকে এই থানা থেকে বদলির চেষ্টা করছে।

—তাই নাকি? কই, অমিত তো সেকথা আমাকে বলে নি?

—আমাকেও কি বলেছে নাকি? আমাদের রিজার্ভ অফিস থেকে খবর পেলাম, সে নাকি এই থানা, এমনকি সম্ভব হলে এই জেলা থেকেই বদলি হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি আমি। তারপর জবাব দিই, অসম্ভব নয়। যে আঘাত সে পেয়েছে তাতে তার মত ছেলের পক্ষে এ ছাড়া বুঝি আর গত্যন্তর নেই।

গম্ভীর হয়ে ওঠে ভবদেবও। বললে, হ্যাঁ, যে ব্যাপারটা ঘটে গেল তাতে তার আর ঐ বাড়িতে মুখ দেখাবারও উপায় নেই। সত্যি সংবাদপ্রভাকর, ভারি খারাপ লাগছে। ওদের সম্পর্কের ব্যাপারে একটা সুন্দর পরিণতি হলে আমরা সবাই খুশি হতাম। মেয়েটি নাকি সত্যিই ভালো। কিন্তু তার পরিবর্তে—

ভবদেব না জানলেও আমি জানতাম যে, অমিত একদিন অজিতেশ দত্তর বাড়ি গিয়েছিল এবং সেখান থেকে সে চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে ফিরেও এসেছিল। অমিত নিজেই আমাকে বলেছিল সেকথা। বলতে বলতে অমিতের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছিল। ওর কথার ধরনে সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, সে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে। সেই

মানসিক আঘাত কাটিয়ে উঠে তার পক্ষে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম, দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে এতটুকু গাফিলতি হচ্ছিল না তার। নিজের কাজকর্ম ঠিকমতই করে যাচ্ছিল সে। কেবল তার গাম্ভীর্যের মাত্রা আর একটু বেড়ে উঠেছিল। একমাত্র আমি আর ভবদেব ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই তেমন একটা কথা বলত না। তার মুখে লেগে থাকা সেই হাসিটিও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

কাজের মধ্যে ডুবে থেকে মানসিক আঘাতটা ভুলতে চেষ্টা করছিল অমিত। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়ার পরম মুহূর্তে এমনি একটা কঠিন আঘাত তার মনকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিলেও বাইরে তেমন একটা অভিব্যক্তি ছিল না তার। চিরকালের চাপা স্বভাবের ছেলে অমিত। কেবল আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি মোটেই। ওর মনের সেই ঝড় অন্য কেউ টের না পেলেও আমি পেয়েছিলাম।

একদিন ওর বাসায় বসেই ওকে প্রশ্ন করি, শুনলাম নাকি তুমি এখান থেকে বদলি চেষ্টা করছো? সত্যি?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে ঘাড় নাড়ে সে।

ভবদেবের কাছে সেদিন অমিতের এই বদলি হবার চেষ্টার খবর শোনা অবধি মনটা আমার বাস্তবিকই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অমিত এখান থেকে চলে যাবে—একথা যেন আমি ভাবতেও পারি না, যদিও বেশ ভালমতই জানি যে, তার বদলির চাকরি। একদিন না একদিন তাকে চলে যেতে হবেই।

একটু সময় চুপ করে থাকি। তারপর বললাম, তোমাকে আর অজিতেশ দত্তর বাড়ি যেতে অনুরোধ করব না। আর করলেও যে তুমি যাবে না তা' আমি জানি। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে স্মৃতিকণা সেদিন তোমাকে যা' বলেছে তা' হয়ত ঠিক তার মনের কথা নয়। শঙ্করের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তার পক্ষে উত্তেজিত হয়ে ঐ ধরনের কথা বলাটা বোধহয় অস্বাভাবিক ছিল না। কেবল—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই গম্ভীরকণ্ঠে অমিত বললে, ভাই তরুণ, তোমার কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ, এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যাই বা না যাই ও বাড়ির কথা নিয়ে আর কখনও আলোচনা করতে চেও না আমার সঙ্গে। যা' হবার তা' হয়ে গিয়েছে। আমি এখন ভুলতে চাই। ভুলে যেতে চাই যে, আমার জীবনে কোনদিন এমনি কোন ঘটনা ঘটেছিল। ওটা কেবল একটা দুঃস্বপ্ন হয়েই থাক্ আমার জীবনে।

মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করি। বলি, কেন, দুঃস্বপ্ন বলছ কেন? সুখস্বপ্ন নয় কেন? স্মৃতিকণার কাছ থেকে তুমি যা পেয়েছিলে তার মধ্যে তো কোন খাদ ছিল না!

—হ্যাঁ, আমারও একদিন তেমনি একটা ধারনাই ছিল। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি তা নয়। তাই যদি হত তো কোন মানুষ মানুষকে এমনি ভাবে আঘাত করতে পারত না।

একটু হেসে আমি আবার বললাম, এখানেই ভুল করলে তুমি। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা যেখানে যত বেশি, আঘাত করার অধিকারও সেখানে ততই প্রবল। যে বেশি ভালোবাসতে পারে সেই বেশি আঘাত করতে পারে।

তেমনি শান্তকণ্ঠে অমিত জবাব দেয়, ওসব ভাই কাব্যে-সাহিত্যেই মানায় ভালো। বাস্তব জীবনে ওর কোন দাম নেই।

—কে বললে ওকথা? প্রশ্ন করি আমি, কাব্য-সাহিত্য বুঝি বাস্তব জীবনের বাইরে

অমিত আর কোন জবাব দেয় না।

একটু সময় ভেবে নিয়ে আবার বললাম, তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে নাকি একটা কথা প্রচলিত আছে যে, পুলিশের চাকরীতে পোস্টিং ও বদলি নিজে যেচে নিতে নেই। তাই বলছিলাম, চেষ্টা-তদ্বির করার প্রয়োজন কি? স্বাভাবিকভাবে যেদিন বদলি হবে তো হবে। এখন বরঞ্চ মাসখানেকের ছুটি নিয়ে একবার বাড়ি ঘুরে এসো। মনটাও ভাল হবে, আর—

আমরা কথার মাঝখানেই অমিত বলে ওঠে, মনটা আমার এখনও খুব একটা খারাপ নেই।

হেসে আমি বললাম, মন তোমার কতখানি ভালো আছে তা' তো আমার অজানা নেই।

অমিত আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর একসময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে আবার বললে, আমি যে পুলিশ, আমি যে একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীব মানুষ, একথা বার বার ভুলে যাই বলেই বোধহয় এত কষ্ট পাই। তেল আর জল যে কোনকালেই মেশে না একথা বিশ্বাস করি নি বলেই বোধহয় আজ আমার এই দুর্গতি।

কথার শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চুপ করে অমিত। আমিও চুপ করেই থাকি। মনে হয়, অমিতের কথার রেশ সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে ঘরের আবহাওয়াকে যেন ভারি করে তুলেছে। একটা ব্যথিত মনেব করুণ সুর যেন হাহাকার করে ওঠে। ঘোর তমসার মধ্যে জ্যোতির সন্ধানে গিয়ে যেন এক নবীন যুবাপুরুষ নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে। তার সেই অতৃপ্ত বাসনার আক্ষেপ যেন গুম্‌রে গুম্‌রে ফিরতে থাকে ঘরের চারিদিকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আসেনি। ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠেছে রাস্তার আলো। হাতের খৈনি মুখে ফেলে বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে সুইচ্ টিপে থানার বাইরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয় হিন্দুস্থানী সেণ্ট্রি কনস্টেবল্। তারপর নাল্ লাগানো জুতোর শব্দ তুলে হলঘরের মধ্যে ঢুকে ডান হাতে কাঁধে বন্দুকের বাটের ওপর একটা শব্দ করে ডিউটি অফিসারকে অভিবাদন করে বললে, সেণ্ট্রি বদলি হুয়া, হুজুর।

ডিউটি অফিসার সুশান্তকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সাত-আটজন লোক। তাদের মধ্যে একজনের গায়ের জামায় চাপ চাপ রক্ত, মাথায় একটা ন্যাক্‌ড়ার পট্টি বাঁধা। সেই পট্টিটাও কালো হয়ে উঠেছে রক্তে। রায়টিং কেস্। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে গোলমাল। অপরপক্ষ লাঠি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তার। বিরসমুখে সে এজাহার দিচ্ছিল সুশান্তর কাছে। ক্লান্ত ভঙ্গিমায় সে সুশান্তর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছিল।

সেণ্ট্রি কনস্টেবলের কথায় মুখ তুলে সুশান্ত জবাব দেয়, ঠিক আছে। তারপরই আবার সেই আহত লোকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তা' হলে তোমাদের জমিতেই আসামীরা দল বেঁধে এসে হামলা করেছিল?

—হ্যাঁ, স্যার। জবাব দেয় লোকটি, আমাকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মারতেই আমি পড়ে যাই, আর সেই সুযোগে ঐ দু' নম্বর আসামী আমাকে চেপে ধরে আমার কোমরে গুঁজে রাখা পঞ্চাশটি টাকা ছিনিয়ে নেয়।

হাতের পেন্সিলটি টেবিলের ওপর রেখে সুশান্ত লোকটির মুখের দিকে কট্‌মট্ করে তাকায়। তারপর একটা প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে বলে ওঠে, সত্যি কথা বলো। তোমার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, মিথ্যে বলবো কেন?

—আবার মিথ্যে কথা? তোমাকেই কিন্তু হাজতে পুরবো আমি। সত্যি কথা বলো। তোমাদের আর চিনতে আমার বাকি নেই। রায়টিং কেস্ হলেই তোমরা টাকা ছিনিয়ে নেবার গল্প জুড়ে দিয়ে মামলা শক্ত করতে চেষ্টা করো। এটা তোমাদের ঐ এলাকার লোকদের স্বভাব—

সুশান্তর কথার মাঝখানেই ভিড়ের মধ্য থেকে আর একটি লোক বলে ওঠে, হ্যাঁ স্যার। টাকা ছিনিয়ে না নিলে ও সেকথা বলবে কেন?

—চুপ করো, সেই লোকটিকেও ধম্‌কে ওঠে সুশান্ত, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! উনি আবার এসেছেন সাক্ষী দিতে! বলি, তুমি টাকা ছিনিয়ে নিতে দেখেছো?

—না, আমি অবশ্য ঠিক নিজের চোখে—। লোকটি আমতা আমতা করতে থাকে।

—তা'হলে তুমি চুপ করে থাকো। বলেই সুশান্ত আবার সেই আহত লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, আরে উজবুক, মিথ্যে কথা বলে কি মামলা শক্ত করা যায়? আর সেই মামলা কি আদালতে গিয়ে টেঁকে? সত্যি যা' ঘটেছে তাই বলো। নইলে নিজের মামলাই খারাপ হবে, এই বলে রাখলুম।

আহত লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর জবাব দেয়, টাকাটা তো কোমরেই গোঁজা ছিল, স্যার।

সুশান্ত আবার ধম্‌কে ওঠে। একটু বিকৃতকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে কথাটা, কোমরে গোঁজা ছিল স্যার! বলি কোমরে গোঁজা ছিল কেন রে উজবুক? গিয়েছিলে তো মাঠে চাষ করতে। তা' বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছিলে কেন? তা'ও দু'এক টাকা নয়, পঞ্চাশ টাকা। হাতে বুঝি অনেক পয়সা হয়েছে। তাই ওমনি দু'একশ টাকা সবসময়ই গোঁজা থাকে কোমরে, কেমন?

লোকটি আর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে।

সুশান্ত আবার বলতে থাকে, না হয় মানলুম তোমার কোমরে পঞ্চাশ টাকা ছিল। কিন্তু আসামীরা তো লাঠিসোটা নিয়ে তোমার টাকা ছিনিয়ে নিতে আসেনি। এসেছিল জোর করে জমি দখল করতে। দু'নম্বর আসামী টের পেল কি করে যে, তোমার কোমরে টাকা গোঁজা ছিল?

আহত লোকটি এবার আর জবাব দিতে পারে না।

এমনিই হয়। গ্রামে-শহরে এমন অনেক লোক আছে যারা ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে খুবই ঝানু। পুলিশের কাছে কতটুকু চেপে যেতে হবে সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান খুব টনটনে। এই ধরনের লোক যখন থানায় মামলা দায়ের করতে আসে তখন তাদের নিয়েই পুলিশকে মুশকিলে পড়তে হয়। এরা অভিযোগকারী। এদের ধম্‌কে বিদায় করাও চলে না। আবার নিয়মমত এদের কথা হুবহু লিখে নেওয়াও যায় না। তাতে আদালতে গিয়ে মামলা না টেঁকারই সম্ভাবনা, কারণ এদের অভিযোগে থাকে সত্যি-মিথ্যার সংমিশ্রণ। কাজেই নরম-গরম নানারকম পদ্ধতিতে এদের কাছ থেকে সত্যি কথা আদায় করতে হয়।

সুশান্ত এবার অন্য পথ ধরে। বলে, আরে বাপু ধরে নিলাম যে তোমার কোমরে টাকা ছিল। সে টাকা তো পড়েও যেতে পারে?

ভিড়ের মধ্যে থেকে আর একটি লোক তখন সমর্থন করে সুশান্তকে, হ্যাঁ স্যার, ধস্তাধস্তির সময় পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

—আর তুমি তো সঠিক বলতে পারছো না যে, দু'নম্বর আসামীই সেই টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে? সে তোমাকে মেরেছে, সত্যি কথা। কিন্তু মেরেছে বলেই যে টাকাও ছিনিয়ে নিতে হবে তার তো কোন মানে নেই।

—ঠিক্—ঠিক্। বাবু ঠিক্ কথাই বলেছেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে আরও দু'তিনজন সমর্থন করে সুশান্তকে।

এবার সেই আহত লোকটি যেন একটু নরম হয়। আমতা আমতা করে বলে, তা' অবশ্য বাবু ঠিক্ কথাই বলেছেন। তবে—

এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সুশান্ত। রায়টিং সাধারণ মামলা। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেবার ঘটনা ঘটলে তা' সত্যিই অসাধারণ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে ওঠে।

আহত লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে সুশান্ত বললে, থাক—থাক, আর বলতে হবে না। আমি বরঞ্চ লিখে নিচ্ছি যে, তোমার কাছে টাকা ছিল। কিন্তু সেই টাকা আসামীদের কেউ ছিনিয়ে নিয়েছে কি কোথাও পড়ে গেছে তা তুমি সঠিক বলতে পারছো না, কেমন?

এতক্ষণে মাথা নেড়ে সায় দেয় লোকটি।

রায়টিং মামলায় সাধারণতঃ কাউণ্টার কেস্ হয়। দু'পক্ষই দু'পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। সুশান্তও তাই অনুমান করেছিল এবং একটু পরেই তার সেই অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হল।

প্রথম মামলার সেই অভিযোগকারীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তার সঙ্গের লোকজনদের বিদায় দিতেই অন্য দল থানায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে দু'জনের জামা-কাপড়ে রক্তের ছাপ।

তারা সদলে সামনে এসে দাঁড়াতেই বলে ওঠে সুশান্ত, রায়টিং মামলা করতে এসেছো, করে যাও। কিন্তু তার মধ্যে যদি টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেবার গল্প ঢোকাতে চেষ্টা করো তা' হলে মামলা তো আমি নেবই না, দুর করে থানা থেকে তাড়িয়ে দেব, এই আগে থেকে বলে রাখলুম।

দলের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, না স্যার। মিথ্যে বলবো না আমরা, আমাদের টাকা-পয়সা কিছুই খোয়া যায়নি, তবে ওরাই আমাদের জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছিল স্যার।

—আচ্ছা—আচ্ছা, সে পরে তদন্তের সময় বোঝা যাবে কে কার জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছিল। বলেই আবার ফার্স্ট ইন্‌ফরমেশন্ বইটা কাছে টেনে নেয় সুশান্ত।

সুশান্ত যখন এজাহার নিচ্ছিল তখন দলের মধ্যের একটি লোক থানার বারান্দায় গিয়ে সিণ্ট্রি কনস্টেবল্ জনকরামের সঙ্গে জমিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল। উদ্দেশ্য, থানার দারোগাবাবুর সম্বন্ধে কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করা। তাদের এই মামলা কে তদন্ত করতে পারেন, তিনি কেমন ব্যক্তি, তাঁকে দিয়ে তাদের ইচ্ছামত কাজ করানো যাবে কিনা ইত্যাদির খবর সংগ্রহের চেষ্টায় ছিল সেই লোকটি।

কনস্টেবল্ জনকরামও সুযোগ পেয়ে হিন্দি-বাংলার জগাখিচুড়ি ভাষায় তাকে কিছু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, আর সেই সঙ্গে থানার দারোগাবাবুরা যে তার কথায় প্রায় ওঠেন-বসেন, সেই কথাটাই সাড়ম্বরে প্রচার করতে চেষ্টা করছিল। উদ্দেশ্য, লোকটিকে সন্তুষ্ট করে যৎকিঞ্চিৎ আহরণ। তাই সে বলছিল, কুছ্ ডর নেই ভাই। হামি তো আছে। পঁচিশ বরষ নোক্‌রী হোয়ে গেল। কত থানা ঘুরলাম। কত অফ্‌সার দেখলাম। অফ্‌সারদের কায়দা

করবার তারিফ হামার খুব জানা আছে। এই রায়টিং কেস্ খুব বড়িয়া কেস্, হয় খোদ্ বড়াবাবু নয় তো মেজবাবু তদন্ত্ কোরবেন। বড়াবাবু তদন্তে গেলে তো হামাকে ছাড়া তার চলেই না। বলেন, জনকরাম, তোমার মত এমন ওস্তাদ সিপাহী হামি হামার চাক্‌রিতে আর পাই নাই। কিছু লেখাপড়া জানলে তুমি ঠিক্ দারোগা বনে যেতে। বলেই জনকরাম তার লম্বা গোঁফ জোড়ায় তা দিয়ে চোখ দুটো কুঁচকে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে।

লোকটি জনকরামের কাছে সরে এসে কণ্ঠস্বর আরও এক ধাপ নামিয়ে বললে, বড়বাবুকে দিয়ে আমাদের মামলাটা ভালমত তদন্ত করিয়ে দিতে পারবেন, সিপাইজী?

—আলবৎ, জবাব দেয় জনকরাম, কুছ ডর নেহি। হামি সব ঠিক্ করিয়ে দেবে। লেকিন কুছ্ খর্‌চা-উর্‌চা—

—কিছু ভাববেন না সিপাইজী। আপনাকে আমি সন্তুষ্ট করে দেব।

একটু থেমে লোকটি আবার আশংকা প্রকাশ করে, কিন্তু যদি মামলাটা আপনাদের মেজবাবু তদন্ত করেন?

লম্বা গোঁফের ফাঁকে জনকরামের নিমের দাঁতন-করা চক্‌চকে দাঁতগুলো ঝল্‌কে ওঠে। হেসে জবাব দেয় সে, আরে ছোর, মেজবাবু তো একদম ছোক্‌রা। সবে তো নোক্‌রীতে ঢুকেছেন। ওর সঙ্গে তদন্তে গেলে তো হামার কথামতই তাকে চলতে হোবে। আর আদ্‌মীও খুব ভালো মেজবাবু। কোন চিন্তা নেই। হামি সব ঠিক্ করিয়ে দেবে।

সন্তুষ্ট হয় লোকটি। পকেট থেকে একখানা একটাকার নোট বের করে বকশিশ দেয় জনকরামকে।

নির্বিকার মুখে নোটখানা ভাঁজ করে প্যাণ্টের পকেটে রাখতে রাখতে জনকরাম আর একদফা অভয় দেয় সেই লোকটিকে। মনে মনে হয়ত ভাবে, যা পাওয়া গেছে তা'ই লাভ। ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জির কাছে ঘেঁষবারও তো ক্ষমতা নেই তার। আর মেজবাবু অমিত যদিও বিলকুল নয়া আদমী এবং শান্ত প্রকৃতির, তবুও মামলার তদন্তের ব্যাপারে তার কাছে গিয়ে তদ্বির করবার সাহস নেই জনকরামের। কাজেই নগদলাভ হিসেবে এই একটা টাকাই বা মন্দ কি?

জনকরামের দেশ বিহারের চাপরা জেলায়। পঁচিশ বরষ নোক্‌রী হয়ে গেছে তার এই বঙ্গাল মুলুকে। এই সিপাইর চাকরি করেই তো মুলুক্‌মে দু'তিন বিঘে ক্ষেতি-উতির ব্যবস্থা করেছে জনকরাম। কতই বা মাইনে পেত সেকালে? আজকাল বরঞ্চ কিছু বেশি পায়। কিন্তু তাতেই বা কি? জিনিসপত্র যেরকম আক্রা তাতে একবেলা সজনে চচ্চড়ি ভাত আর একবেলা অরহর ডাল রুটি খেয়ে আর ক'টা পয়সাই বা দেশে পাঠাতে পারে? তবুও যা এদিক-ওদিক করে দু'চার পয়সা বাড়তি রোজগার করে কিছু জমিজমার ব্যবস্থা করেছিল। নইলে তো গুষ্ঠীশুদ্ধ না খেয়েই মরতে হত। পরিবারে লোকের সংখ্যা তো কম নয়। নিজের তিনটে লেড়কা আর দু'টো লেড়কি আর আছে বিধবা ভাইয়ের বৌ। তারও তো তিন-চারটে ছেলেমেয়ে। নিজের বড় ছেলেটাকে পুলিশে ঢোকাতে চেষ্টা করেছিল জনকরাম, কিন্তু পারেনি। তা'ছাড়া দু'সাল আগে মুলুকে যে খরা হয়ে গেল তার জের মেটেনি এখনও।

এক-এক সময় ব্যারাকে নিজের খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে নিজের কথাই ভাবে জনকরাম। বলতে গেলে জীবনটাই তো কেটে গেল এই চাকরিতে। পারিবারিক জীবনের স্বাদ তো কোনদিনই পেল না। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন সব থেকেও তো জীবনটা এমনি একাই কেটে গেল তার। দু'বেলাই নিজেকে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেয়ে যেতে হয়। অসুখ-বিসুখ হলে

যেতে হয় সেই সরকারী হাসপাতালে অথবা পড়ে থাকতে হয় ব্যারাকের এই খাটিয়ায়। রোগতপ্ত ললাটে কোনও নিকট আত্মীয়ার হাতের স্পর্শ সে পেল না কোনদিন। তার ওপর পুলিশের এই অমানুষিক খাটুনি। দিন নেই, রাত নেই কেবল কাজ আর কাজ। অফ্ ডিউটিতে ব্যারাক ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। যেতে হলে থানা বাবুদের জানিয়ে যেতে হবে। কখন কোন্ ইমারজেন্সিতে কোথায় ডাক পড়বে তার ঠিক কি?

এতেও কোন দুঃখ ছিল না জনকরামের, যদি তার দেশের সংসারের চাকাটি একটু ভালমত চলত। কিন্তু তাও তো চলে না। প্রতি মাসেই মুলুক থেকে ছেলের চিঠি আসে। তাতে থাকে টাকা পাঠাবার তাগিদ। কিন্তু কি করবে জনকরাম? নিজে উপোস করে থাকবে নাকি? অথবা চুরি করবে? রাগ করে সেকথা একবার লিখেও ছিল ছেলেকে। তারপর পুরো দু'মাস দেশ থেকে কোন চিঠি আসেনি। অবশেষে নিজেকেই চিঠি লিখে দেশের খবরাখবর নিতে হয়েছিল।

মাঝে মাঝে জনকরামের মনটা পরশ্রীকাতর হয়ে ওঠে ঐ চৌবেজীর হালচাল দেখে। রামলক্ষ্মণ চৌবে। প্রায় তিরিশ বছর চাকরি হল তার। দেশের অবস্থাও ভাল। তিরিশ-পঁয়তিরিশ বিঘের মত ক্ষেতি আছে। চারটি উপযুক্ত ছেলে। একজন গাঁয়ে থেকে চাষবাস দেখাশোনা করে। বাকি তিনজন বাইরে চাকরি করে। ওদের মধ্যে একজন তো এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টেই চাকরি নিয়েছে। সিপাইয়ের চাকরী। চৌবেজীকে তাই টাকার চিন্তা করতে হয় না। তবে লোকটা একেবারে হাড়কৃপণ। একটা পয়সা বাজে খরচ করে না। থানার বাবুরা দরকার মত এই চৌবেজীর কাছেই হাত পাতে। থানার বাবুদের ধার দিতে চৌবেজীর আপত্তি নেই, কিন্তু অন্য কোন কনস্টেবল্ তার কাছে হাত পাতলেই শত-সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাকে। কবে পরিশোধ করবে, আজ-না-কাল বলে তাকে ঘোরাবে নাকি ইত্যাদি।

জনকরাম পারতপক্ষে চৌবেজীর কাছে হাত পাতে না। আসলে সে এই লোকটাকে ঘৃণা করে। সেই সঙ্গে বোধহয় একটু ঈর্ষাও। আবার লোকটার বরাতও তেমনি। সেবার একটা দুর্ধর্ষ ডাকাতকে এ্যারেস্ট্ করে পুরো দেড়শো টাকা রিওয়ার্ড পেয়েছিল রামলক্ষ্মণ চৌবে। এই গ্রেপ্তারে কিন্তু একটুও কৃতিত্ব ছিল না তার। বলতে গেলে ডাকাতটা নিজে থেকেই ধরা দিয়েছিল। মাঝখান থেকে দাঁও মারল রামলক্ষ্মণ চৌবে।

খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে নিজেকে চৌবেজীর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বাঙালী সেপাই অভয়পদর কথাও মনে পড়ে জনকরামের। অভয়পদ হালদার। বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। একপাল পোষ্য তার। একটা বস্তিতে বাড়ি ভাড়া করে থাকে। সরকারের কাছ থেকে যা' বাড়ি ভাড়া পায় তা'তে একটা গোয়াল ঘরের ভাড়াও হয় না। তবুও বাধ্য হয়েই বাড়তি ভাড়ায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হয় তাকে। সারাটা মাস একরকম উঞ্ছবৃত্তি করেই কাটায় অভয়প্রদ। ভাগ্যিস, সরকার সস্তাদরে কিছু রেশনের ব্যবস্থা করেছিল! নইলে তার পরিবারবর্গকে উপোস করেই মরতে হত।

একখানা পা নেই, এমন একটি লোকের সান্নিধ্যে এসে একদা এক ব্যক্তি নাকি তার একপাটি জুতো হারিয়ে যাবার দুঃখ ভুলে গিয়েছিল। তেমনি জনকরামও তার আর্থিক অসচ্ছলতার দুঃখ ভুলে যায় অভয়পদর কথা চিন্তা করে। তার নিজের তো তবু বাড়ি ঘর আছে, দু'তিন বিঘে জমিজমাও আছে, কিন্তু এই অভয়পদর কি আছে? পুলিশের চাকরি, বলা যায় না কিছু। লোকটা যদি কোন কারণে আজ চোখ বোজে তো ওর পরিবার-পরিজনের নিশ্চিত মৃত্যু কেউই রোধ করতে পারবে না।

জনকরাম একদিন গিয়েছিল অভয়পদর আস্তানায়। নোংরা বস্তিব মধ্যে মাত্র দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকে অভয়পদ। এই ঘরের ভাড়াই নাকি মাসে পনের টাকা। কি একটা উপলক্ষ্যে উভয়পদই নিয়ে গিয়েছিল জনকরামকে। শতছিন্ন জামাকাপড় পরা একপাল ছেলে-মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে। ওদের তৈলহীন রুক্ষ চুল ও মলিন মুখ দেখে নিজের ছেলে-মেয়েদের কথাই মনে পড়েছিল তার। চেয়ে চেয়ে সে এক দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরকন্নার চেহারা দেখছিল। আসবাবের মধ্যে একখানা নড়বড়ে তক্তপোষ। তার ওপর একটা মলিন ছিন্ন বিছানা। কেবল মশারিটাই যা একটু নতুন। ওখানা যে সরকারি মশারি। সেই ব্রিটিশ যুগ থেকে পোশাকের সাথে কনস্টেবলরা একখানা করে মশারি ও একটা কালো বাক্স পেয়ে আসছে। সেই ব্যবস্থা অব্যাহত আছে আজও।

অভয়পদর নিজের চেহারায় স্পষ্ট দারিদ্র্যের ছাপ। কিন্তু তার কথাবার্তার সেকথা বুঝবার উপায় নেই। মুখে কেবল বোলচাল। সেই পূর্ববঙ্গে সে কত হাজার টাকার সম্পত্তি ফেলে এসেছিল তার ফিরিস্তি শোনায় মুখে মুখে। সেই ফিরিস্তি শুনলে মনে হয় সেখানে অভয়পদর একটি ছোটখাটো জমিদারী ছিল। এমনি অনেকেই বলে। যার সত্যিই ছিল সেও বলে, আর যার কিছুই ছিল না সেও বলে। এমনি বলে-কয়েই বোধহয় তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কিছু সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়।

থানা এখন ফাঁকা। সবাইকে বিদায় দিয়ে চেয়ারে দেহভার এলিয়ে একটা হাই তোলে সুশান্ত। বিকেল থেকে এতটা রাত অবধি একটানা পরিশ্রম করতে হয়েছে। একটা সিগ্রেট খাবারও অবসর পায়নি। সেই সন্ধ্যা থেকে বাসার ছোকরা চাকরটিকে দিয়ে তিন-চারবার খবর পাঠিয়েছে রেখা। কিন্তু মাথা তুলতেই সময় পায় নি সুশান্ত। এতক্ষণে বোধহয় বাসায় তার চা জল-খাবার জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। নয়তো, ঠাণ্ডা চা নর্দমায় ঢেলে ফেলে দিয়ে মুখ গোমড়া করে বসে আছে রেখা। কিন্তু উপায কি? এবার একবার উঠতে হবে তাকে। গিয়ে মান ভাঙাতে হবে তার। বড়বাবু ও মেজবাবু দু'জনেই এখন থানায়। এই ফাঁকে সেণ্ট্রি ডিউটিকে বলে সে একবার ঘুরে আসতে পারে।

সুশান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হাতদু'টো আড়াআড়িভাবে মাথার পেছনে রেখে একবার আড়মোড়া ভাঙে। তারপর সেণ্ট্রি কনস্টেবলকে ডাকে, পাহারা—পাহারা।

সেণ্ট্রি কনস্টেবলের বুটের শব্দের সঙ্গে আরও অনেকগুলো বুটের শব্দ জেগে ওঠে। দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় জনকরাম। আর, সেই সঙ্গে আরও দু'জন কনস্টেবল্ একটা লোককে জোর করে ধরে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সুশান্তর সামনে। দু'তিনজন বাইরের লোকও অনুসরণ করে তাদের।

মুখখানা বিরক্তিতে ভরে ওঠে সুশান্তর। এ কি আরম্ভ হল আজ? একমুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলতেও দেবে না এরা?

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করে সুশান্ত তাকায় সেই কনস্টেবলের দিকে। তারপর প্রশ্ন করে, কি হল? ব্যাপার কি?

ওদের সঙ্গে বাঙালী কনস্টেবলটি বলে ওঠে, এই লোকটা বাজারের মধ্যে একটা অচল আধুলি চালাতে চেষ্টা করেছিল, স্যার। আরও দু'তিনটা দোকানে এমনি অচল আধুলি চালিয়েছে। ধরা পড়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করতেই দু'তিন জন দোকানদার ধরে ফেলে ওকে। আমরা ফাঁড়ির সেপাই। ওখানেই ডিউটি করছিলাম। ওর জামার পকেটে এমনি আরও সাত-আটখানা অচল আধুলি পাওয়া গেছে, স্যার। বলেই সেপাইটি টেবিলের

ওপর কতগুলো চক্‌চকে আধুলি রেখে আবার বললে, এগুলোই এর পকেটে পাওয়া গেছে, স্যার।

সুশান্ত প্রশ্ন করে, এই লোকটার পকেট সার্চ করবার সময় কোন সাক্ষী উপস্থিত ছিল সেখানে?

—হ্যাঁ স্যার, এরাই উপস্থিত ছিল। বলেই কনস্টেবলটি সঙ্গের লোকদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই তারা মাথা নেড়ে সমর্থন করে তাকে।

টেবিলের ওপর থেকে একখানা আধুলি তুলে নেয় সুশান্ত। তারপর সেখানা আলোয় ভালোমত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিয়ে হাতের চেটোয় ঘষে ঘষে পরীক্ষা করে।

আরও দু'তিনখানা আধুলি পরীক্ষা করেই কিন্তু সুশান্ত গম্ভীর মুখে আবার চেয়ারে বসে পড়ে। তারপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে সেই লোকটাকে, এই পয়সাগুলো কোথায় পেয়েছো?

লোকটি অবাঙ্গালী। প্রায় তিরিশের কাছাকাছি বয়স। মাথায় একটা নোংরা কাপড়ের পাগড়ী যার একপ্রান্ত ঘাড়ের ওপর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। গায়ের লম্বা ফতুয়াটা প্রায় হাঁটুর কাছ পর্যন্ত নামানো। পরনে ছোট ধুতি। ধূলি-ধূসরিত পায়ের কড়ে আঙ্গুলে একটা করে রূপোর আংটি। দু'গাছা পেতলের বালা দু' হাতে। কানে দু'টো সোনার রিং। গোঁফ-দাড়ি নিপুণভাবে কামানো। পিঠে একটা মাঝারি আকারের ঝুলি। লোকটাকে বেদে শ্রেণীর বলেই মনে হয়।

সুশান্তর প্রশ্নে লোকটা খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। তারপর ভালোমানুষের মত মুখ করে হাতের চেটো ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাতে চায় যে, সে তার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না।

ধমকে ওঠে সুশান্ত। বললে, ইস্, এখন কিছুই বুঝতে পারছো না, তাই না চাঁদ? বাংলাদেশ চষে বেড়াচ্ছো আর বাংলা কথা বুঝতে পারছো না! পিঠের ওপর দু'চার ঘা পড়লেই সব বুঝতে পারবে, কেমন বাছাধন।

সুশান্তর কথায় ও ভঙ্গিতে যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে লোকটা। মৃদুকণ্ঠে বলে, ম্যাঁয় কুছ্ সমঝ্‌তা নেহী, জী।

—দাঁড়াও চাঁদ, সমঝাচ্ছি তোমায়। বলেই সুশান্ত আঙ্গুল দিয়ে আধুলিগুলো দেখিয়ে আবার বললে, এ চীজ্ কাঁহাসে মিলা?

যেন বুঝতে পারছে না এমনি একটা মুখের ভঙ্গি করে লোকটি জবাব দেয়, মুঝে কুছ্ মালুম নেহী জী।

—মালুম নেহী? বলেই অকস্মাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুশান্ত। তারপর টেবিলের ওপর থেকে কাঠের মোটা রুলারটা তুলে নিয়ে কয়েকবার শূন্যে আস্ফালন করে বললে, কেয়া উল্লুক, মালুম নেহী? হিন্দি বাত্ ভি মালুম নেহী?

একটু যেন ভয় পায় লোকটা। রুলারটার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলে জবাব দেয়, এক আদমী সে মিলা, জী।

—কৌন আদমী?

—সচ্ কহ্‌তা হ্যাঁ জী, উস্‌কো ম্যাঁয় পহ্‌চন্তা নেহী।

একমুহূর্ত চিন্তা করে সুশান্ত। তারপর আবার প্রশ্ন করে, তুম্‌কো পাস্ আউর আঠ্ আনি হ্যাঁয়?

—নেহী, জী।

—সচ?

—হাঁ জী, সচ্।

—ঝুট বল্‌নেসে হাড্ডি তোড়েঙ্গে। হাতের রুলারটা শূন্যে ঝাঁকিয়ে সুশান্ত বললে।

লোকটা আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

সুশান্ত লোকটার পিঠের ঝুলিটা দেখিয়ে আবার প্রশ্ন করে, ঐ পেটিমে কেয়া চীজ্ হ্যায়?

একটা ঢোক গেলে লোকটা। তারপর জবাব দেয়, ছুরি, কাঁচি, জড়িবুটি হ্যায় জী। ঔর আচ্ছা দাওয়াই ভি হ্যায়। শিরদা দরদ্, পেটকা দরদ্, আঁখো কি দরদ্ ঔর—

লোকটাকে কথার মাঝখানেই থামিয়ে দিয়ে ধম্‌কে ওঠে সুশান্ত। বললে, থাম্ ব্যাটা উল্লুক। তোর দরদের ফিরিস্তি দিতে হবে না এখানে। বলেই সুশান্ত কনস্টেবলদের ইঙ্গিত করতেই তারা একরকম জোর করেই লোকটির পিঠ থেকে টেনে নামায় সেই ঝোলাটা।

লোকটা মিথ্যে বলে নি। ঝোলাটা উপুড় করতেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়ে কতগুলো ছুরি, কাঁচি, গাছের কিছু শিকড়, বাকল, আর সেই সঙ্গে এক বাণ্ডিল জাল আধুলি।

সুশান্ত মুহূর্তকাল লোকটির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, তুম্ ছুরি, কাঁচি আর দাওয়াই বেচতা?

—জী, হ্যাঁ। নতমস্তকে জবাব দেয় লোকটা।

—ঔর, সাথ্ সাথ এ কাম ভি করতা। বলেই সেই আধুলিগুলো দেখিয়ে দেয় সুশান্ত।

এবার কিন্তু কোন জবাব দেয় না লোকটা।

—আচ্ছা, ঠায়রো। বলেই সুশান্ত চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ও. সি.'র ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

একরাশ জরুরী কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে ছিল ভবদেব। সুশান্ত সামনে এসে দাঁড়াতেই মুখ তুলে তার দিকে তাকায়।

সুশান্ত বললে, একটা কয়েনিং কেস্ এসেছে, বড়বাবু। অনেকগুলো জাল আধুলি রয়েছে লোকটার সঙ্গে।

—ও, আচ্ছা। বলে ঘাড় নাড়ে ভবদেব। তারপর আবার বললে, বেদে ক্লাসের লোক বুঝি?

বিস্মিতকণ্ঠে জবাব দেয় সুশান্ত, হ্যাঁ। আপনি আগেই খবর পেয়েছেন নাকি?

—না—না। খবর কিছুই পাই নি। অনুমান করেছিলাম মাত্র। সেদিন কে যেন বললে, জোড়াপুকুরের মাঠে রাস্তার পাশে নাকি একদল বেদে এসে আস্তানা গেড়েছে। তখনই অনুমান করেছিলাম, এবার শহরে ছিঁচকে চুরি আরম্ভ হবে। তোমার কথা শুনে মনে হল তাদের ভেতরই কেউ হয়ত ধরা পড়েছে। বেদেদের মধ্যে একটা দল টাকা-পয়সা জাল করতে ভারি ওস্তাদ।

সুশান্ত কেবল সপ্রশংস মুখে তাকিয়ে থাকে ভবদেবের দিকে। সত্যিই, আশ্চর্য বিবেচনা শক্তি এই লোকটির। প্রখর বুদ্ধি আর সেই সঙ্গে কর্তব্য পরায়ণতা মিলে এই লোকটিকে একজন সার্থক পুলিশ অফিসার করে তুলেছে।

ভবদেব সুশান্তকে বললে, তুমি একটা কয়েনিং কেস্ রুজু করে দিয়ে লোকটাকে হাজতে পুরে দাও। আর দেখ তো, থানায় কে কে আছে?

—আজ্ঞে, মেজবাবু আছেন।

—পিনাকীবাবু?

—না, তিনি একটা তদন্তে বেরিয়েছেন। আর শ্রীপতিবাবু তো অসুস্থ।

—বেশ, তুমি একবার অমিতকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। বলেই আবার কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে মাথা নিচু করে ভবদেব।

অমিত এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই ভবদেব মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, ডাইরী লিখছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় অমিত।

—সত্যিই তো, অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট্ কেসের তদন্ত রয়েছে তোমার হাতে। এই সময় তোমাকে বিরক্ত না করলেই ভাল হত। কিন্তু ভাবছি, এই রাতে আমার পক্ষে একা যাওয়াটা কি ভাল হবে?

—কি ব্যাপার, বড়বাবু? কোথায় যাবেন?

মুহূর্তকাল থেমে ভবদেব আবার বললে, এইমাত্র একটা কয়েনিং কেস্ এসেছে থানায়। লোকটা বেদে। অনেকগুলি জাল আধুলি পাওয়া গেছে তার কাছে। জোড়াপুকুরের মাঠের কাছে যে বেদের দল আস্তানা গেড়েছে এই লোকটা সম্ভবত সেই দলের। ভাবছি, এখনই যদি ঐ ব্যাটাদের ডেরায় একবার হানা দিতে পারি তো আরও কিছু জাল কয়েন্ হয়ত উদ্ধার করতে পারবো। ব্যাটারা নিজেদের ডেরায় বসে জাল টাকা-পয়সা তৈরি করে, আর ওষুধপত্র বিক্রির নাম করে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সেগুলো চালায়।

—বেশ, তো। চলুন না! রাতের বেলা সার্চ করতে হবে ওদের আস্তানা। আপনি একা যাবেন কেন? আমিও যাচ্ছি। উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে অমিত।

একটু থেমে ভবদেব আবার বললে, এই বেদে ক্লাশের লোকগুলো সাধারণত একটু হিংস্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই ভাবছি সঙ্গে আর্মড্-ফোর্স নেব কিনা।

—এখনই ঘটা করে আর্মড্-ফোর্স নিয়ে যাবার দরকার কি? তেমন দরকার বুঝলে পুলিশ লাইনে ফোন করে ফোর্স নিয়ে যাবো। এখন বরঞ্চ আমরা লাঠিধারী কনস্টেবল্ নিয়েই যাই, কি বলেন?

একটু সময় চিন্তা করে ভবদেব। বুঝতে পারে, সঙ্গে গুলি-বন্দুক নিয়ে যেতে অমিতের বিশেষ অনিচ্ছা। হয়ত ধূর্জটির সেই ব্যাপারটাই এর জন্য দায়ী। মনে মনে একটু হাসে ভবদেব। অমিত এখনও নতুন। অভিজ্ঞতাও কম। তাই সহসা গুলি-বন্দুকের ধারে-কাছে ঘেঁষতে চায় না। কিন্তু যেদিন সে অভিজ্ঞ হবে, সেদিন বুঝতে পারবে পুলিশের চাকরিতে গুলি-বন্দুক কতটা প্রয়োজনীয়। নিজেদের জীবন রক্ষার জন্যেও এসব দরকার। তা'ছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে আর্মস্-এ্যামুনিশান্ কেবলমাত্র দেখাবারও একটা এফেক্ট আছে।

ভবদেব মুখে বললে, বেশ, লাঠিধারী কনস্টেবল্ নিয়েই চল তা'হলে। তবে নিজে একটা রিভলবার নিয়ে যেতে ভুলো না। আমিও সঙ্গে রিভলভার নেব।

একটু সময় ইতস্ততঃ করে অমিত। তারপর বললে, আপনি নিতে চান তো নিন। আমার রিভলভারের দরকার নেই। আমি সঙ্গে একখানা লাঠি নেব। দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলি বলে ভবদেবকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় অমিত। একটু ম্লান হাসি ভেসে ওঠে ভবদেবের ওষ্ঠপ্রান্তে।

জোড়াপুকুরের মাঠ। কোনকালে হয়ত পাশাপাশি দু'টো পুকুর ছিল ওখানে। তাই ঐ নাম।

এখন কিন্তু পুকুরের চিহ্নমাত্র নেই। বেশ প্রশস্ত মাঠ। চারিদিকে ঝাউ ও দেবদারু গাছের প্রাচীর। একপাশে শহরের ছেলেদের ফুটবল গ্রাউণ্ড, অন্য পাশটা খোলা। ভোরে শহরের পেন্সনভোগী বৃদ্ধেরা মুক্তবায়ু সেবন করেন এখানে। বিকেলে আশেপাশের পাড়ার ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে। সন্ধ্যায় দু'এক জোড়া যুবক যুবতীকেও দেখা যায় এই মাঠে।

অমিতও এর আগে এখানে এসেছে। একা আসেনি। এসেছে স্মৃতিকণাকে সঙ্গে নিয়ে। একটা নির্দিষ্ট ঝাউগাছের নিচে বসে গল্প করেছে তারা। পুলিশী জীবনের কঠোর-কঠিন বাঁধনের মধ্যে এই সময়টুকুই ছিল অমিতের আনন্দ। ইচ্ছে করত রোজ আসতে। কিন্তু সময় কোথায়? তা'ছাড়া স্মৃতির কথাও ভাবতে হত তাকে। সে কলেজের ছাত্রী। পড়াশোনা আছে তার।

মাঠের পাশেই পিচ্‌ বাঁধানো বড় রাস্তা। তারপরেই ছাড়া ছাড়া কিছু বস্তিবাড়ি। মাঝে মাঝে পাকাবাড়ি দু'চারখানা।

এমন সুন্দর এলাকায় ঐ বস্তিবাড়িগুলোই একমাত্র কলঙ্ক। শোনা যাচ্ছিল সরকারের হাউজিং ডিপার্টমেণ্ট্‌ নাকি এই এলাকাটা কিনে নিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করে এখানে সরকারি বাড়ি তৈরি করবে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি এখনও।

রাস্তাটা নির্জন নয় মোটেই। জোড়াপুকুরের মাঠটা ছাড়িয়ে আর একটু এগোলেই শহরের একটি প্রধান সিনেমা হল। ঐ সিনেমা হলের দৌলতেই রাস্তায় অনেক রাত পর্যন্ত ভিড় থাকে। দু'একটা চিনেবাদামওয়ালা ও আলুকাবলী বিক্রেতাও চোখে পড়ে রাস্তার পাশে। সিনেমার দর্শক ছাড়াও জোড়াপুকুরের মাঠে ক্রীড়ামোদী ও ভ্রমণেচ্ছু খদ্দেরের আশাতেই তারা সওদা নিয়ে বসে থাকে। দু'চারটা অস্থায়ী পানের দোকানও রয়েছে রাস্তার এপাশে ওপাশে। তারই মধ্যে গোটাকয়েক দেবদারু গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে কয়েকটা তাঁবু। শুধু তাঁবু বললে ঠিক বলা হয় না। এককালে অবশ্য আস্ত তাঁবুই ছিল। এখন তার সামান্য অংশই টিকে আছে। বাকিটা ছেঁড়া কাপড়, চটের থলি, ভাঙা ক্যানেস্তারা ও ফলের ঝুড়ির সাহায্যে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে। এই অদ্ভুত দর্শন আচ্ছাদনগুলিই বেদেদের আস্তানা। তাঁবুর সামনেই সারি সারি তিন-চারটা ইটের উনুনে বেদে রমণীরা রাতের আহার্য প্রস্তুতে ব্যস্ত। তাদের পরনে রং-বেরংয়ের ঘাঘরা। গায়ে ছোট হাতার ব্লাউজ, ওড়নাহীন মাথায় লম্বা বিনুনী পিঠের ওপর লুটোপাটি খাচ্ছে। একপাশে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে কয়েকটা অস্থিচর্মসার ঘোড়া। লম্বা কানওয়ালা কয়েকটা রামছাগলও রয়েছে একদিকে।

বেদের দল বোধহয় তখনও তাদের দলের একজনের গ্রেপ্তার-বৃত্তান্ত টের পায় নি। নইলে, পুলিশভ্যানটা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই তারা এমন চম্‌কে উঠতো না।

ভবদেব কিন্তু একমুহূর্তও সময় নষ্ট করে না। অমিতকে সঙ্গে নিয়ে সোজা বড় তাঁবুটার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার ইঙ্গিতে লাঠিধারী কনস্টেবলরা ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে জায়গাটা। ভবদেবের কড়া হুকুম, স্ত্রী হোক্‌ আর পুরুষই হোক্‌ একটি বেদেকেও যেন সেই চৌহদ্দির বাইরে যেতে দেওয়া না হয়।

কাকের বাসায় যেন বাজপাখীর উৎপাত। অকস্মাৎ ছন্দপতন ঘটে চারিদিকে। রান্না ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বেদে-রমণীরা। পুরুষগুলো তাঁবুর বাইরে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। ভয় পেয়ে একটা ঘোড়া চিৎকার করে ওঠে। অস্থির হয়ে ওঠে ছাগলগুলো। বেদেশিশুরা তাঁবুর ভেতর থেকেই সভয়ে উঁকি দিতে থাকে পুলিশ বাহিনীর দিকে।

বেদের আড্ডায় পুলিশের হানা। একজন দু'জন করে কৌতূহলী দর্শক এসে রাস্তার পাশে ভিড় করে দাঁড়ায়। দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে সেই ভিড়। এমনি সময় সিনেমার সান্ধ্য-শো ভাঙতেই কৌতূহলী দর্শকের ভিড় আরও বেড়ে ওঠে। রাস্তার আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে থাকে সেই পুলিশী নাটক।

ভবদেব ও অমিত আরও দু'পা এগিয়ে যায়। তারপর ভবদেব গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, তোমাদের সর্দার কে আছো, এগিয়ে এসো।

পুরুষদের মধ্যে একটা মৃদু চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। একটি বয়স্ক বেদে আরও দু'তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই ভবদেব বললে, তোমাদের এই ডেরা তল্লাশি করবো।

—তল্লাশি? কেনো সাহাব? হামরা কি করেছে? চুরি-ডাকাইতি হামরা করে না। তবে কেনো হামাদের উপর হামলা কোরছেন? ভাঙা বাঙলায় জবাব দেয় সেই সর্দার।

ভবদেব কিন্তু তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে যায় জনতার ভেতর থেকে দু'জন সাক্ষী বেছে নিয়ে। অমিতও অনুসরণ করে তাকে।

একে একে তল্লাশি করা হয় সব ক'টি তাঁবুই। মুখখানা ম্লান হয়ে ওঠে ভবদেবের। কোনটাতেই কিছু পাওয়া যায়নি। কোথাও সার্চ করতে গিয়ে ঈপ্সিত বস্তু না পাওয়া গেলে নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা মনে হয় অমিতের।

অমিত ফিস্ ফিস্ করে ভবদেবকে বললে, লোকগুলো বোধহয় টের পেয়ে আগে থেকেই মালপত্র সরিয়ে ফেলেছে।

—হবেও বা, জবাব দিয়েই ভবদেব সর্বশেষ তাঁবুটার দিকে এগিয়ে যায়। অমিতও অনুসরণ করে তাকে।

সার্চ করতে করতে সহসা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল অমিতের। উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলে ওঠে, পেয়েছি—পেয়েছি, বড়বাবু। এই দেখুন!

একটা ভাঙা ক্যানেস্তারার মধ্য থেকে বের হয় গোটাকয়েক সীসার তাল। সেই সঙ্গে দু'টো এ্যাসিডের বোতল ও তিন-চারখানা ধাতু নির্মিত জাল আধুলি ও সিকির ডাইস্। কিছু জাল আধুলি ও সিকিও পাওয়া যায় বাণ্ডিলের মধ্যে।

বেদে সর্দারকে কাছে ডেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভবদেব প্রশ্ন করে, এই তাঁবুতে কে থাকে?

একটু সময় মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে বেদে সর্দার। তারপর মাথা তুলে জবাব দেয়, রাতে ঐ বক্‌রীগুলো থাকে, সাহাব।

—আর, দিনের বেলা?

—দিনের বেলা হামরা সবাই থাকি।

—হুঁ! মুখে একটা শব্দ করে ভবদেব একবার তাকায় অমিতের দিকে। তারপর বললে, এরা আইন-কানুনও জানে, বুঝলে? ভেবেছে, সবাই থাকি বললে এই ইন্‌ক্রিমিনেটিং জিনিসপত্রের পজেশান্ প্রমাণ হবে না। আচ্ছা!

মুহূর্তকাল থেমে ভবদেব আবার প্রশ্ন করে, জাল আধুলি-সিকি কে তৈরি করে?

—হামি জানে না। জবাব দিয়ে গুম্ হয়ে থাকে বেদে সর্দার।

—তবে তাই হোক্। সব পুরুষগুলোকেই চালান দেব।

বেদে পুরুষের চাইতে বেদে-রণীকুলই যে স্বভাবে অনেক হিংস্র তা' জানা ছিল না অমিতের। শুধু তাই নয়, হাস্যে-লাস্যেও এরা বিশেষ পটু। পয়সার জন্যে যুবতীরা অম্লান বদনে দেহের ব্যবসাও করে।

পুরুষগুলোকে এ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলতে যেতেই শুরু হয় ঝঞ্ঝাট্। বৃদ্ধা, যুবতী নির্বিশেষে বেদে-রমণীরা অকস্মাৎ লাঠি, কাটারি নিয়ে আক্রমণ করে পুলিশ বাহিনীকে।

হঠাৎ এমনি এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে বিব্রত বোধ করে পুলিশ বাহিনী। বেদে হলেও স্ত্রীলোক তো বটে!

সোরগোল ওঠে কৌতূহলী জনতার মধ্যে। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় পালিয়ে যায় কিছু লোক্। বাকি জনতার কণ্ঠে জেগে ওঠে বিদ্রূপের সুর। পুলিশ বাহিনীকে ঠাট্টা করে তারা। পুলিশকে বেকায়দায় পড়তে দেখে তারা উল্লসিত হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে অমিত ও ভবদেব। অল্পশিক্ষিত পুলিশ কনস্টেবল্ এরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকের হাতে মার খাবে না নিশ্চয়ই। স্ত্রীলোক বলে ছেড়েও দেবে না। আর, কৌতূহলী জনতার যে ধরনের মনোভাব তাতে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে দেখলে তারা নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দ্রুত চিন্তা করে ভবদেব। পুলিশ বাহিনীকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিয়ে রিভলবার হাতে সামনে এগিয়ে যায় সে। পেছনে অমিত।

রিভলভারটা শূন্যে আস্ফালন করে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সে বেদে-রমণীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ওঠে, আর এক-পা এগুতে চেষ্টা করেছো কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

ইতিমধ্যে বেদে-রমণীদের মধ্য থেকে একজন একখানা ধারালো কাটারি ছুঁড়ে মারে অমিতকে লক্ষ্য করে।

ভবদেব একটা হ্যাঁচ্কা টানে সেই মুহূর্তে অমিতকে সরিয়ে না দিলে একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে যেত।

অমিতকে সরিয়ে দিলেও কিন্তু ভবদেব নিজে টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। উৎসাহিত হয়ে ওঠে বেদে-রমণীরা। উল্লাসে ফেটে পড়ে সেই কৌতূহলী জনতা। স্ত্রীলোকের হাতে পুলিশের এই নাকাল হওয়াটাই তাদের উল্লাসের কারণ।

অমিত ত্রস্তকণ্ঠে ভবদেবকে বললে, বড়বাবু, আর দেরি করা ঠিক হবে না, আমাদের কাজ তো হয়ে গেছে। পুরুষগুলোকে গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েছে কনস্টেবলরা। এবার এখানে দাঁড়িয়ে অযথা ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে না তুলে চলুন আমরা ফিরে যাই।

—বেশ, তাই কর। বলেই ভবদেব বিকৃতমুখে নিজের বাঁ দিকের পাঁজরের ওপর হাত রেখে আবার বললে, ইটের ওপর পড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে এখানটায়। সাংঘাতিক যন্ত্রণা!

ভবদেবকে নিয়ে অমিত গাড়িতে লাফিয়ে উঠতেই পুলিশ ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেয়। মুহূর্তে জনতার পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে পুলিশ-ভ্যান্।

জনতা এবার আরও জোরে হৈ-হৈ করে ওঠে পুলিশকে এমনিভাবে পালিয়ে যেতে দেখে।

তিনদিন বুকের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে কষ্ট পেতে হয়েছিল ভবদেবকে। •

চতুর্থদিন সন্ধ্যায় থানায় ভবদেবের ঘরে বসে সেই কথাই হচ্ছিল। মৃদু হেসে অমিতকে লক্ষ্য করে ভবদেব আমাকে বললে, বুঝলে সংবাদ-প্রভাকর, সেদিন অমিত ঠিক ডিসিশান্ই নিয়েছিল। নইলে, নির্ঘাৎ একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যেত। স্ত্রীলোক হত্যা নিয়ে পুলিশের নামে আবার ঢি-ঢি পড়ে যেত। সেই মুহূর্তে বুকের ব্যথায় আমি এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে, কিছুই চিন্তা করবার শক্তি ছিল না আমার।

অমিত কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। আমি বললাম, তা' যা'-ই বলুন না কেন বড়বাবু, শহরময় আপনাদের নামে ঢি-ঢি পড়তে কিন্তু বাকি নেই।

—কেন—কেন? আবার কি কুকর্ম করে বসলাম আমরা? প্রশ্ন করে ভবদেব।

জবাবে আমি বললাম, স্ত্রীলোকের হাতে মার খেয়ে পুলিশ বাহিনী পালিয়ে এসেছে, এই কথাই প্রচার হয়ে গেছে শহরময়।

গম্ভীর হয়ে ওঠে ভবদেব। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, দুর্নাম রটে তো রটুক, আমরা তো দুর্নামের জন্যেই রয়েছি। কিন্তু সেদিন সেই দুর্নাম ঘাড়ে নিয়েও যে সিচুয়েশান্ সেভ্ড্ হয়েছে এটাই বড় কথা। মারধোর করে লাঠি বন্দুক চালিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গেলেও আমাদের দুর্নাম। আবার সে সব কিছুই না করে সেখান থেকে চলে এসে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করলেও আমাদের দুর্নাম। কাজেই ওরকম দুর্নামকে পরোয়া করতে গেলে আমাদের ভাই চলে না। এদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যে, শাঁখের করাতের মত যেতে-আসতে যে কোন অবস্থায় আমরা কাটা পড়বই। তাই, ওসব ব্যাপার নিয়ে বেশি চিন্তা না করাই ভালো।

অমিত কিন্তু তখনও কোন মন্তব্য না করে কেবল চুপ করে থাকে।

আমি আবার প্রশ্ন করি তাকে, কি হে অমিত, কিছু বলছো না যে?

—কি আর বলব? বলার কি-ই বা আছে? বলেই স্বপ্নোত্থিত অমিত হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠে আবার গম্ভীর মুখে বসে থাকে।

আমি কিন্তু ওর কথায় কেমন যেন এক আশাহত বেদনার সুর শুনতে পাই। এতক্ষণে আমাদের এই কথাবার্তায় কান ছিল না ওর। বসে বসে কি যেন চিন্তা করছিল আপন মনে। মনের মধ্যে এক ভীষণ দ্বন্দ্বে যেন ব্যাপৃত ছিল এতক্ষণ।

অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ওর মনের নাগাল পেতে চাই আমি, কিন্তু পাই না। বুঝতে পারি না, এর সঙ্গে স্মৃতিকণার সেই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। না, অন্য কোন ব্যাপারে ওর মনের এই উদ্বেগ?

সেই মুহূর্তে কথাটা জিজ্ঞেস করাও তেমন সমীচীন মনে করি না আমি। তাই, আর কিছু না বলে চুপ করে থাকি।

কি একটা বিশেষ কাজে ভবদেব এই সময় বাইরে চলে যেতেই অমিত আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে মৃদুকণ্ঠে বললে, বুঝলে তরুণ, যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন নিরাশ হয়ে পড়ছি।

ভ্রূ-কুঁচকে প্রশ্ন করি, কিসের কথা বলছো?

—বলছি তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা. সেদিন বেদের আস্তানা সার্চ করতে গিয়ে যা' দেখেছি তাতে অতিবড় আশাবাদীরাও আশাভঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক।

একটু থেমে অমিত আবার বলতে থাকে, দুষ্টের দমনে শিষ্টরা সুখীই হয়। কেবল অসুখী হয় দুষ্টরাই। কিন্তু ভাই, একথা কি করে স্বীকার করব যে, দেশের অধিকাংশ লোকই দুষ্ট প্রকৃতির? কিন্তু সেদিন নিজের চোখে তাই দেখেছিলাম। একদল সমাজবিরোধী জালিয়াতকে গ্রেপ্তার করেছিলাম আমরা। কিন্তু আমাদের একটু বেকায়দায় পড়তে দেখে জনতার সেকি উল্লাস! সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, সেই বেদেগুলোকে ছেড়ে দিলেই কি জনতা খুশি হত? একটি লোক তো পুলিশের সাহায্যে এলোই না, উপরন্তু, আমরা নাজেহাল হচ্ছি দেখে আনন্দে ফেটে পড়ল তারা। কেন—কেন এমন হয়? আমরা তো কোন অন্যায় করছিলাম না। তবে কেন জনতার এই রোষ?

অমিত থামে। এতক্ষণে যেন তার মনের নাগাল পাই আমি। জবাবে বললাম, দেখ অমিত, তুমি ঠিকই বলেছো। দেশের অধিকাংশ লোকই সত্যি সত্যি দুষ্ট-প্রকৃতির নয়। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে তারাও চায় না। দুষ্টের দমনে তারা সত্যিই খুশি। কিন্তু তোমরা তো সব সময় শিষ্টকে পালন কর না। তাই তোমাদের বিপদে পড়তে দেখলে তারা কৌতুক বোধ করে।

আমি থামতেই অমিত বলে ওঠে, কিন্তু ভাই, এমনিভাবেই কি চিরদিন চলবে? এর শেষ কোথায়?

—শেষ কোথায় তা' জানি না। আদৌ কোনদিন শেষ হবে, না চিরকাল এমনি তিক্ততাই থেকে যাবে তাও বলতে পারি না, ভাই। তবে, এটুকু বুঝতে পারি. এমনিভাবে চললে কারুরই মঙ্গল হবে না।

অমিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলতে থাকে, অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলাম এই ডিপার্টমেন্টে। একটা আদর্শ সামনে রেখেই চলব বলে স্থির করেছিলাম। ভেবেছিলাম, মানুষকে ভালবাসব, মানুষের ভালবাসা পাব। ভেবেছিলাম দুঃখের দিনে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব, সুখের দিনে তাদের সঙ্গে হাসব। কিন্তু কিছুতেই যেন তা' পারছি না, বারে বারে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা যেন অচলায়তনের মত খাড়া হয়ে রয়েছে। যতবার এগুতে যাই ততবারই মাথা ঠুকে যায় দেয়ালে। নিজের উপর আস্থাও যেন হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে অমিত। আমার অস্তিত্বও যেন ভুলে যায় সে।

অমিতের মুখের দিকে তাকাই। সেই মুহূর্তে ওর চোখে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম ব্যর্থতার বিষণ্ণতা, ওর কণ্ঠস্বরে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম আশাভঙ্গের হাহাকার।

॥ বাইশ ॥

খ্রীষ্ট-ধর্মী লুক ও যোহন লিখিত সুসমাচারে আছে—পাপের বেতন মৃত্যু।

অনেকেই সেকথা বলে। মুখে না বললেও মনে মনে ভাবে নিশ্চয়ই। ধূর্জটি নিজেও সেকথা ভাবে। মনে মনে বলে—হ্যাঁ, পাপের দণ্ড মৃত্যু। একটি নিরপরাধ কিশোরের জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন বাঁচিয়েছি। যে হাত আমার টুটুনের জ্বরতপ্ত ললাটে বুলিয়ে দিয়েছি, সেই হাতেই একটা কিশোরের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছি। ভগবান তাই কঠিন শাস্তি দিলেন। ছিনিয়ে নিলেন আমার টুটুনকে। আগে নিয়েছেন সরমাকে, এবার টুটুনকে।

চাকুরি থেকে সাস্‌পেণ্ড্ হলেও নিজের কোয়ার্টার ছেড়ে দেয়নি ধূর্জটি, কর্তৃপক্ষও পীড়াপীড়ি করেনি। বৃদ্ধা পিসিও আর থাকতে চাইলেন না এখানে। কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, আমি তো আর এখানে থাকতে পারছি না, ধূর্জটি। এখানে যে প্রতি মুহূর্তেই সেই হতভাগী মেয়েটার কথা মনে পড়ে। তুই বরঞ্চ এখান থেকে বদলী হবার চেষ্টা কর। না হয়, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে। সেখানে বাবা বিশ্বনাথের চরণেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

একটু ম্লান হাসি জেগে উঠেছিল ধূর্জটির মুখে। বলেছিল, বদলী? এখান থেকে বদলীর কথা বলছো, পিসি? তা' বদলী হতে পারি বৈকি। অবস্থা যা' দাঁড়িয়েছে তাতে এই চাকরি থেকে চিরকালের মতই বদলী হয়ে যেতে পারি। চাই কি, জেলে গিয়েও নতুন কাজ নিতে পারি।

ধূর্জটির বৃদ্ধা পিসি সেকেলে মানুষ। কথার মারপ্যাঁচটুকু ধরতে না পেরে তিনি বলেছিলেন, সে আবার কি কথা? এ চাকরি ছেড়ে আবার জেলের চাকরি করতে যাবি কেন?

—চাকরি নয় পিসি, জবাবে বলেছিল ধূর্জটি, জেলে যাব ঘানি-ঘুরোতে।

বৃদ্ধা পিসিকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাশীতেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ধূর্জটি।

যাবার আগে বৃদ্ধা সজল চোখে বলেছিলেন, চিন্তা করিস্ নে কিছু। বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে ; আমি বিশ্বনাথকে দিনরাত ডাকব।

—হ্যাঁ পিসি, তাই ডেকো। আর বলো, তিনি টুটুন আর তার মাকে যেখানে পাঠিয়েছেন আমাকেও যেন একটু তাড়াতাড়ি সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

—ষাট্—বালাই—ষাট্, এসব কি কথা বলছিস্? তুই না পুরুষ? পুরুষ মানুষের এত সহজে ভেঙে পড়লে কি চলে?

ধূর্জটি আর কোন কথা না বলে কেবল নীরবে বিদায় দিয়েছিল বৃদ্ধাকে।

মাঝে মাঝে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে ধূর্জটি—সত্যিই কি সেই ছেলেটিকে হত্যা করার সঙ্গে টুটুনের এই মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে? না, সমস্ত ব্যাপারটাই কাকতালীয়?

প্রশ্নটা কিন্তু প্রশ্নই থেকে যায়। দিনরাত আকাশ-পাতাল ভেবেও তার জবাব পায় না।

ধূর্জটি আর থানায় যায় না। যাবার প্রয়োজনও নেই। জুডিসিয়াল এন্‌কোয়ারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সাস্‌পেন্‌শনেই থাকতে হবে। দিনরাত নিজের কোয়ার্টারেই দরজা বন্ধ করে বসে বসে ভাবে। অন্তহীন সেই চিন্তাভাবনা। না, নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না ধূর্জটি। সে প্রয়োজন তার ফুরিয়েছে। পাপ-পূণ্যের কথাও সে ভাবে না। ভাবে কেবল তার টুটুনের কথা, আর সেই কিশোর ছেলেটির কথা।

সেই দৃশ্যটা মনে পড়লেই কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে ধূর্জটি। একটি কিশোর তার রক্তাক্ত বুকে হাত চেপে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। একটি সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান হচ্ছে তার চোখের সামনে। আর সে জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী সে নিজেই।

থানার অফিসাররা কেউ কেউ মাঝে-মধ্যে এসে খবর নিয়ে যায় ধূর্জটির। ভবদেব দু'একবার এসেছিল। এসে সাহস দিয়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল, কিছু ভাববেন না। আমি বলছি, এ ফায়ারিং জাস্‌টিফায়েড্ না হয়ে যায় না।

মুখে কিছু না বললেও বড়বাবুর কথায় মনে মনে হেসেছিল ধূর্জটি। বিচারকেরা না হয় তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করলেন, কিন্তু নিজের কাছে সে নির্দোষ প্রতিপন্ন হবে কোন্ বিচারকের হুকুমে?

সেই নিহত কিশোরটির পরিচয় জানতেও বিশেষ দেরি হয়নি তার। তাই মেজবাবু অমিত যেদিন কোয়ার্টারে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেদিন সত্যিই বিপন্ন বোধ করছিল ধূর্জটি। খানিকক্ষণ সে মাথা তুলে অমিতের সঙ্গে কথাই বলতে পারেনি।

অমিত কিন্তু সহজ কণ্ঠে বলেছিল, আপনি এত বিব্রত বোধ করছেন কেন, ধূর্জটিবাবু? অজিতেশ দত্তর ছেলে শঙ্কর সত্যিই আমার ঘনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেদিন সেই অবস্থায় আপনি যা' করেছেন, তা' না করে আপনার উপায় ছিল না। একথা আর কেউ বিশ্বাস না করলেও আমি অন্ততঃ করি।

—কি—কি বললেন, মেজবাবু? চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিল ধূর্জটি, আপনি যা বললেন তা' কি সত্যিই আপনার মনের কথা?

ম্লান হেসে অমিত বলেছিল, মুখে মনে যে দু'রকম কথা আমি বলি না তা' বোধহয় আপনার অজানা নয়।

লজ্জিত মুখে একটু সময় চুপ করে থেকে ধূর্জটি বলেছিল, জানি বলেই তো জিজ্ঞেস করছি মেজবাবু, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন সেদিন আমি উচিত কাজই করেছিলাম?

—দেখুন ধূর্জটিবাবু, জবাবে বলেছিল অমিত, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন না তুলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, সেদিন যে অবস্থায় আপনি গুলি ছুঁড়ে ছিলেন, সেই অবস্থায় নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে অন্য যে কেউ হয়ত তা' করতো। আমি নিজেও বোধহয় তাই-ই করতাম।

আবেগে আপ্লুত ধূর্জটি খানিকক্ষণ কথাই বলতে পারিনি। তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে সে এটুকু বুঝেছিল যে, এটা অমিতের বিনয় তো নয়ই, এমনকি ভাবাবেগে তাড়িত হয়েও সে একথা বলেনি। এ তার সত্যিই অন্তরের কথা।

সেই মুহূর্তে এই তরুণ অফিসারটির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এসেছিল ধূর্জটির। মনে মনে কেবল বলেছিল, আপনি এখানে সত্যিই বেমানান্ মেজবাবু—এবসোলিউট্‌লি মিস্‌ফিট্। আপনার স্থান এই সংকীর্ণ পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অনেক—অনেক—উর্ধ্বে।

* * *

সেদিনের ঘটনায় বাস্তবিকই মুষড়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত। একেই তো শঙ্করের মৃত্যুতে চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন তিনি, তার ওপর সেদিন অমিতকে স্মৃতিকণা যেভাবে তাড়িয়ে দিলে তাতে নিজের ঘরে একা বসে লজ্জায় দুঃখে মরমে মরছিলেন তিনি। ছি—ছি, একি কাণ্ড স্মৃতির? মানুষ মানুষকে এমনিভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়? শেয়াল-কুকুরকেও তো কেউ এমনিভাবে তাড়ায় না।

মনে মনে অনেক কল্পনা ছিল অজিতেশের। অনেক আশা ছিল অমিত সম্বন্ধে। এই যুবকটির বাইরের পুলিশ আবরণ ভেদ্ করে ওর মনের ছবিটি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। দেখে, বিস্মিত হয়েছিলেন। এ যুগে তা' হলে অমিতের মত ছেলে সংসারে এখনও আছে। ওর চালচলন কথাবার্তায় ওর মনের আসল পরিচয়টি পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর সেই থেকেই নিজের মনের মধ্যে একটি গোপন বাসনাকে লালন-পালন করে আসছিলেন। অজিতেশ মোটেই প্রাচীনপন্থী নন। মনে মনে ভাবতেন, ওরা এ যুগের ছেলেমেয়ে। ওরা পরস্পরকে জানুক বুঝুক, একে অন্যকে যাচাই করে নিক। তবেই না ওরা ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হতে পারবে।

কিন্তু কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। সংসারে যে সব সময় একে একে দুই হয় না, মানুষের হাতে তৈরি ছক্ অনুযায়ী যে সব সময় মানুষের ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয় না, এ তত্ত্ব তার জানা থাকলেও নিজের কল্পনার এই অপমৃত্যু যেন কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

কিন্তু নিরুপায় তিনি। অক্ষম অশক্ত। কন্যা স্মৃতিকণার বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর তার চিরকালের অগাধ বিশ্বাস। সেই স্মৃতিকণাই যখন অমিতের প্রতি হঠাৎ এমনি অবিচার করে বসল, তখন সত্যি সত্যিই নিজেকে বিপন্ন বোধ করেছিলেন অজিতেশ। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে কেবল মনে মনে বলেছিলেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, ঠাকুর।

মাসখানেক কেটে গেল তারপর। মনের গোপন কোণে তখনও যে একটু আশার আলো জ্বলছিল তাকেও যেন আর জ্বালিয়ে রাখতে পারছিলেন না অজিতেশ। ভেবেছিলেন অমিত হয়ত একদিন আসবে। অন্ততঃ তার সঙ্গে দেখা করতেও একদিন সে আসবে। কিন্তু অমিত এল না। এদিকে মেয়েটাও যেন কেমন হয়ে উঠেছে আজকাল। মুখে কোন কথা নেই, পড়াশোনায় মন নেই তেমন। কলেজে যায়, এই পর্যন্ত। সাধ্যমত সেবাযত্নও করে তাঁকে। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহহীন বাঁধাধরা নিয়মের মত করে যায় শুধু। তাতে সবই ঠিক থাকে, থাকে না কেবল প্রাণের সাড়া।

অবশেষে অজিতেশ একদিন একটুক্‌রো চিঠি লিখে চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন অমিতের বাসায়। চিঠিতে বিশেষ কিছুই লেখেননি তিনি। অমিতকে একবার আসতে লিখেছিলেন কেবল।

কথাটা স্মৃতিকণার কানেও গিয়েছিল। কিন্তু সে উচ্চবাচ্য করেনি। কেবল চাকরটি ফিরে এসে অজিতেশের ঘরে ঢুকতেই স্মৃতিকণা দরজার পাশে কান খাড়া করে দাঁড়িয়েছিল।

অজিতেশ চাকরটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাবুর দেখা পেলি?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল চাকরটি।

—চিঠি পড়ে বাবু বললেন কিছু?

—হ্যাঁ, আপনাকে বলতে বললেন যে তাঁর নাকি এখান থেকে বদলী হয়ে যাবার কথাবার্তা চলছে। এখান থেকে চলে যাবার আগে তিনি আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই একবার দেখা করে যাবেন।

একটু সময় চুপ করে রইলেন অজিতেশ। তারপর চাকরটিকে বললেন, আচ্ছা, তুই এবার যা।

চাকরটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগেই স্মৃতিকণা এসে প্রবেশ করেছিল তার নিজের ঘরে। তারপর জানালার গরাদ ধরে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল।

বিকেলে বাড়ির খোলা ছাদে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল স্মৃতিকণা। সন্ধ্যা হতে চলল তবুও চুল বাঁধার গরজ নেই তার। কাঁধের আঁচলটা খসে পড়েছে হাতের ওপর। আল্‌গা খোঁপাটা নেমে এসেছে ঘাড়ের দিকে। কপালের কাছে কয়েক গাছা অবাধ্য চুল দক্ষিণের মৃদু হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ছিল তার চোখের ওপর। একটু দূরে আর একটি বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল গুটিকয়েক ছেলে। ওপাশে অন্য একটি বাড়ির দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে একটি যুবতী মা তার কোলের অশান্ত ছেলেটিকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিল।

চোখ চেয়ে সবকিছুই দেখছিল স্মৃতিকণা। কিন্তু কিছুই যেন তার মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছিল না। সে তখন খেইহীন আপন চিন্তায় বিভোর।

হঠাৎ ছাদের আলসের কাছে এসে দাঁড়াতেই সামনের বড় রাস্তায় নজর পড়ে স্মৃতিকণার। কে ও? পুলিশের পোশাক পরে সাইকেল চেপে এদিকে আসছে কে? সে নয় তো? বুকটা তোলপাড় করে ওঠে স্মৃতিকণার। একটা বেদনামিশ্রিত আনন্দের শিহরণ যেন অনুভব করে বুকের মধ্যে। মুহূর্তে তার পঞ্চেন্দ্রিয় অতিরিক্ত সজাগ হয়ে ওঠে। কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে সে তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে।

সাইকেল আরোহী সেই পুলিশ অফিসারটি আরও এগিয়ে আসে। দুই হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডল্ ধরে ঋজু ভঙ্গিতে প্যাড্‌ল্ করছে সে। চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ।

আরও কাছে এসে পড়েছে অফিসারটি। মুখখানা তার স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবার। কিন্তু কই, অমিত নয় তো! এ যে অন্য এক ব্যক্তি! সহসা এক নিদারুণ অবসাদে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে স্মৃতিকণার। দেহটাও যেন আর সহ্য করতে পারে না মনের সেই ভার। ছাদের রেলিং য়ের ওপর দেহভার ন্যস্ত করে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিকণা। সে স্পষ্ট অনুভব করে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে কেমন এক নিরাশার বেদনায়।

দারোগা পিনাকী সরকার সাইকেলে চেপে অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চারিদিকে। ছেলেগুলো তাড়াতাড়ি সুতো টেনে আকাশের ঘুড়িকে নিচে নামিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সেই যুবতী মা তার সন্তানকে শান্ত করতে সমর্থ হয় এতক্ষণে। স্মৃতিকণা কিন্তু তখনও ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে স্থির হয়ে।

॥ তেইশ ॥

মানুষের সমাজ-জীবনে কিছু কিছু কুসংস্কার সর্বদেশে সর্বকালেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, যতই দিন যাচ্ছে মানুষ এই সংস্কারের পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে সেগুলো পরিত্যাগ করছে। এই কুসংস্কারগুলোর মধ্যে কিছু আছে ক্ষতিকর, আবার কিছু আছে নিতান্তই সাদামাটা নিরীহ প্রকৃতির। এতে মানুষের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না।

বর্ষাকাল। বাড়িতে হয়ত কোন শুভ কাজ হয়েছে। প্রচুর ধুমধাম। কিন্তু সমস্ত আয়োজনই নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি অকস্মাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। গৃহকর্ত্রী হয়ত তখন ছোটেন কোন পড়শীর বাড়িতে তার পানের সরঞ্জাম থেকে চূণের বাটিটি চুরি করে নিয়ে আসতে। হ্যাঁ, চুরি। বলে-কয়ে নিয়ে এলে চলবে না। চুরি করে নিয়ে এসে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। তবেই নাকি আর বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে না।

হয়ত প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ছিঁচ্ কাদুনে বৃষ্টি। কিছুতেই থামবার নাম করছে না। খোঁজো—খোঁজো। কোথায় একটা জলজ্যান্ত ব্যাঙ পাওয়া যায় তার সন্ধানে ছোটো। সেই নিরীহ প্রাণীটিকে হত্যা করে চিৎ করে ফেলে রেখে দাও উঠোনের মধ্যে। ঘেম চিরে চক্‌চকে রোদ নাকি অবধারিত।

তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে হয়ত যাকে হাওয়া করা হচ্ছে তার গায়ে প্যাখাটা একটু লেগে গেল। সেকালের ঠাকুমা-দিদিমারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয় উঠে একবার মেঝেয় ঠুকে নিতেন। জিজ্ঞেস করলেই বলতেন, এটা করতে হয়। তাছাড়া, কোথাও যাবার সময় হাঁচি পড়লে যে দাঁড়িয়ে যেতে হয় এ নিয়ম তো এদেশে আজও চালু আছে।

এই সংস্কারের পেছনে কোন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি কিংবা কারণ হয়ত নেই। একমাত্র বিশ্বাসের ওপরই এরা টিকে থাকে।

শুধু আমাদের দেশে কেন, প্রগতির অগ্রদূত সাহেবদের দেশেও এমনি কত কুসংস্কার রয়েছে। ইংরেজি মতে 'তের' সংখ্যাটি এমন কি অপরাধ করেছে যে, তাকে একঘরে করে রেখে 'আন্‌লাকি থার্টিন্' আখ্যা দিতে হবে? কালো বেড়াল কি কেবল তার দেহের কালো রংঙের জন্যেই সাদা মেম-সাহেবদের পিলে চমকে দিয়ে তাদের নিজেদের বুকে যীশুর ক্রশ আঁকতে বাধ্য করে?

একবার কলকাতায় একটা বড় অফিসের সামনে লিফটের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মোট দু'টো লিফ্‌ট্‌। একটা অফিসের বড় বড় সাহেবসুবোদের জন্যে। আর একটা আমার মত অভাজনদের জন্যে। সাহেবদের লিফ্‌ট্‌ প্রায় ফাঁকা। আর আমাদের লিফ্‌টের সামনে দীর্ঘ 'কিউ'।

একটা বড় গাড়ি এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এলেন প্যাণ্ট, কোট, টাই পরিহিত একজন দেশী সাহেব। সঙ্গে ফাইলপত্র হাতে তক্‌মা আঁটা আর্দালী।

সাহেবটি স্বভাবতই সেই সংরক্ষিত লিফ্‌টে যাবেন। কিন্তু রাস্তা বন্ধ। আমাদের 'কিউ' এত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে যে, যেতে হলে আমাদের মধ্য দিয়েই তাঁকে যেতে হবে।

আর্দালীটি আমাদের কিউয়ের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল। আর, সাহেবটি একটু ইতস্ততঃ করে আমাদের দু'জনের মাঝখানে সামান্য একটু পথ তৈরি করে পার হয়ে গেলেন। যাবার সময় অসাবধানে তাঁর মাথাটা সামান্য একটু ঠুকে গেল আমার মাথার সঙ্গে।

সাহেবটি প্রায় তাঁর সংরক্ষিত লিফ্‌টের সামনে চলে গিয়েছেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা আমার কাছে চলে এসে বললেন, 'এক্‌স্‌কিউজ মী'। পরক্ষণেই তিনি দু'হাতে আমার মাথাটি ধরে নিজের মাথার সঙ্গে আর একবার ঠুকে দিয়ে গট্‌গট্‌ করে নিজের লিফ্‌টের দিকে চলে গেলেন।

সেই মুহূর্তে হাসি পেলেও হাসতে পারিনি আমি। কি জানি, সাহেব হয়ত অফেণ্ডেড্‌ হতে পারেন।

তা'ছাড়া সুন্দর নাদুসনুদুস ছেলেমেয়ের কড়ে আঙুল কামড়ানো, তাদের কপালে একটির বদলে দু'টি কালির টিপ্‌পরানো প্রভৃতি আরও কত কি রয়েছে।

এ তো গেল কুসংস্কারের একটি দিক। তা'ছাড়া আরও আছে। সন্ধ্যের পর গঙ্গার পাড়ে গিয়ে ইলিশ মাছের আশায় কোন ইলিশের নৌকো দেখে যদি জানতে চাওয়া হয় যে, ইলিশ মাছ আছে কিনা, তবে সেই ক্রেতাকে জেলেদের কাছ থেকে এমন সম্ভাষণ শুনতে হবে যে, জীবনে হয়ত আর কোন দিন ইলিশ মাছ খাওয়ার শখ তার হবে না। সেখানে 'মাছ' শব্দটিকে বাদ দিয়ে শুধু বলতে হবে—'আছে নাকি?'

এমন অনেক দোকানী আছে যারা সন্ধ্যের পর পাঁচ টাকার বিনিময়েও ক্রেতাকে একটি সূঁচ বিক্রি করবে না। রাতে সূঁচ বেচলে নাকি দোকানীর অমঙ্গল হয়।

ঠিক তেমনি, পুলিশ মহলেও রয়েছে এমনি কতকগুলো কুসংস্কার যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও অনেকেই মেনে চলে সেগুলো।

অমিত তখন 'প্রবেশনার' দারোগা অর্থাৎ শিক্ষানবীশ। ট্রেনিং কলেজ থেকে বেরিয়ে সবে একটি থানায় শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগ দিয়েছে। পুলিশ মহলের সংস্কার-কুসংস্কারের সঙ্গে তখনও প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি তার।

একদিন সে থানায় বসে কাজ করছে। হঠাৎ হাতের ধাক্কায় সামনের লাল কালির দোয়াতটা উল্টে গিয়ে লাল কালি ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে।

আর যায় কোথায়? একজন খুঁতখুঁতে প্রকৃতির অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলে তাকে, কি মশাই, একটু সাবধানে কাজ করতে পারেনা না? দিলেন তা লাল কালির দোয়াতটা উল্টে?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় অমিত। কালির দোয়াত উল্টে গেছে তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?

অপ্রতিভ মুখে ন্যাক্ড়া দিয়ে টেবিলের কালি মুছতে মুছতে লজ্জিত কণ্ঠে সে বললে, হঠাৎ পড়ে গেল। এই তো মুছে দিচ্ছি।

—মুছে তো দিলেন, খেঁকিয়ে ওঠে সেই অফিসারটি, এখন মার্ডার কেসের ঝামেলা কে ঠেকাবে মশাই?

সেইদিনই অমিত জানতে পেরেছিল, পুলিশ মহলে অনেকের নাকি বিশ্বাস যে, লাল কালির দোয়াত উল্টে পড়লে থানায় মার্ডার কেস্ আসে।

কথাটা শুনে অমিত মনে মনে একটু হেসেছিল কেবল। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসী করে তুলতে চায়নি।

এই থানায় এসেও আর একটা কথা জানতে পেরেছিল অমিত যা' সে ইতিপূর্বে কখনও শোনেনি।

একদিন সন্ধ্যায় অফিসাররা থানায় বসে কাজ করছে। ভবদেব ছাড়া আর সবাই উপস্থিত। কাজ করতে করতে হঠাৎ সুশান্তর টেবিলের ওপর থেকে কাঠের রুলারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। শব্দটা কানে যেতেই জ্যা-ছেঁড়া ধনুকের মত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল পিনাকী। তারপর ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে ধমকাতে লাগল সুশান্তকে।

থানার সর্বকনিষ্ঠ অফিসার বেচারী সুশান্ত মুখ বুজে চুপ করে রইল।

অমিত সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করে, নিজের টেবিলের সামনে বসে ধূর্জটি মৃদু মৃদু হাসছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অমিত পিনাকীর দিকে তাকিয়ে বললে, কি ব্যাপার পিনাকীবাবু, আপনি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন?

পিনাকী তেড়ে উঠে বললে, কি বলছেন, মেজবাবু? উত্তেজিত হব না? ভর সন্ধ্যেবেলা রুলারটাকে গড়িয়ে নিচে ফেলে দিলে, আর আপনি বলছেন এতেও উত্তেজিত হব না!

কৌতুক কণ্ঠে এই সময় বলে ওঠে ধূর্জটি, আপনি তো দেখছি কিছুই জানেন না, মেজবাবু। দেখছেন, আজ সকাল থেকে পিনাকীবাবু পাঁয়তারা কষছেন যে, আগামী তিনচারদিন নাকি কতগুলো মামলার তদন্তের ব্যাপারে তাকে এত পরিশ্রম করতে হবে যে, নাওয়া-খাওয়ারও সময় পাবেন না। কিন্তু ঐ বোকা সুশান্তটা দিলে সব মাটি করে? এখন তো ওর সিক্ রিপোর্ট করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, কি বলেন পিনাকীবাবু?

গলা চড়িয়ে পিনাকী বলতে থাকে, আপনারা তো বিশ্বাস করবেন না। কাল সকালেই যখন একটি চৌকিদার থানার সামনে এসে উঁকি-ঝুঁকি দেবে তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

—আহা, চট্ছেন কেন পিনাকীবাবু? আমিও তো সেই কথাই বললাম, আজ রাতেই আপনাকে সিক্ রিপোর্ট করে কোয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। নইলে কালকের সেই ডাকাতি মামলা যদি আপনার ঘাড়ে চাপে—

—হয়েছে—হয়েছে। আমাকে আর কাজ দেখাতে হবে না। কাজের ভয়ে কে সিক্ রিপোর্ট করে, আর কে করে না, তা আমার জানা আছে। আপনি তো মশাই, রয়েছেন কেবল পরের পেছনে কাঠি দিতে। বলেই পিনাকী রাগ করে বাইরে চলে যায়।

হো-হো শব্দে হেসে ওঠে ধূর্জটি। সুশান্তও হাসে।

ধূর্জটি হাসতে হাসতে অমিতকে বললে, বুঝলেন মেজবাবু, আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস, টেবিল কিম্বা হাত থেকে রুলার কিম্বা লাঠি সশব্দে থানার মেঝেয় পড়ে গেলে ডাকাতি কেস্ আসে। আর জানেন তো, ডাকাতি মামলার তদন্ত কি ভয়ানক ব্যাপার তাই থানার রুলার কিম্বা লাঠি পড়ে যাওয়াটা কিছুতেই পিনাকীবাবু সহ্য করতে পারেন না।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হয় অমিতের।

ধূর্জটি আবার বললে, আপনিই বলুন মেজবাবু, এসব অন্ধ সংস্কারের পেছনে কি কোন যুক্তি আছে?

জবাবে অমিত হেসে বললে, সংস্কার চিরকালই অন্ধ। এর পেছনে কোনকালেই তেমন কোন যুক্তি থাকে না।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার নিজের কাজে মন দেয় ধূর্জটি।

অমিতও আবার টেনে নেয় ডাইরীর খাতাটা।

বাংলা ভাষায় 'থানা' ও 'খানা' শব্দ দু'টির মধ্যে কেবল ধ্বনিগত সাদৃশ্যই নেই, এদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আছে। তবে, থানায় গেলেই খানায় পড়তে হয়—এ তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী আমি ঠিক্ তাদের দলের নই। তা'হলে আমাকে অনেক আগেই খানায় পড়ে গিয়ে খোঁড়া হতে হত।

থানার সঙ্গে যে 'খানা' শব্দটির সম্পর্ক সেটা শুধু খানা নয়, তার আগে একটি 'মাল' শব্দ রয়েছে, অর্থাৎ 'মালখানা'। সোজা কথায় দুনিয়ায় দামী, অ-দামী বস্তু ও ছাইপাঁশের ডিপো এই থানার মালখানা। তবে এ ছাইপাঁশ সাধারণ ছাইপাঁশ নয়। একটু অসাধারণ। এই অসাধারণ ছাইপাঁশের ফেস্ ভেল্যু হয়ত শূন্য, কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে তা' অমূল্য।

যে কোন থানার একটা মালখানার মধ্যে ঢুকলেই প্রথমে ভ্যাপসা একটা গন্ধে বমি হবার উপক্রম হবে। বমির উদ্রেক সংবরণ করে চোখ মেলে সেই প্রায় অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে যেন একটি মীনাবাজার। রাজ্যের এমন বস্তু নেই যা-এখানে না আছে।

কোথাও হয়ত দেখা যাবে একটুক্‌রো ময়লা ন্যাক্‌ড়া যা' নাকি অতি সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। ঐ রকম নোংরা ন্যাকড়া বাড়ির যে কোন গৃহিণীর হাতে পড়লে হয়ত ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতেন, কিন্তু ঐ ন্যাক্‌ড়াটুকুই পুলিশের কাছে অত্যন্ত দামী বস্তু। ঐ বস্তুটি দিয়েই হয়ত আদালতে একটি কঠিন মামলা প্রমাণ হবে। হয়ত কোথাও রয়েছে একটি ছোট কাগজের মোড়ক। মোড়কটি খুললেই হয়ত বেরিয়ে পড়বে সামান্য কিছু মাটি কিংবা কয়েকগাছা চুল। সাধারণ দৃষ্টিতে এদের কোনই মূল্য নেই। কিন্তু এরাই হয়ত একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডেরর জ্বলন্ত প্রমাণ। এমন আরও কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর খোঁজ পাওয়া যাবে থানার ঐ মালখানায়। পোড়া কাঠের কিংবা ছেঁড়া মাদুরের টুক্‌রো থেকে শুরু করে দামী দামী সোনারূপোর গহনা, সবকিছুই পাওয়া যাবে এখানে।

থানার দরজা জনসাধারণের জন্যে সর্বদাই উন্মুক্ত কেবল দুইটি প্রকোষ্ঠ ছাড়া। তার একটিতে রাখা হয় জীবন্ত প্রাণী অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তিদের। এটির নাম হাজত ঘর। আর অপরটিতে থাকে নির্জীব পদার্থ যার নাম মালখানা।

এই মালখানার ভার যাঁর ওপর থাকে তিনি হচ্ছেন মালখানাবাবু। দায়িত্বপূর্ণ এই কাজ। আবার বিপজ্জনকও বটে। একটি ছোটখাটো বস্তুর এদিক-ওদিক হলেই আর রক্ষা নেই। জবাব-দিহি করতে করতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে। এমন কি, চাকরি খতম্ হওয়াও বিচিত্র নয়।

ডাক্তারখানার কর্মচারী যেমন আলমারীর ভেতরে হাজারো রকম ওষুধের মধ্যে বেছে ক্রেতার প্রয়োজনীয় ওষুধটি অতি অনায়াসেই বের করে দেয়, তেমনি এই মালখানার কর্মচারীটিও রকমারি বস্তুর মধ্যে বেছে ঠিক প্রয়োজনীয় বস্তুটি বের করে দিতে পারে।

সিনিয়র এ. এস্. আই. শ্রীপতিবাবুই এই কোতোয়ালী থানার মালখানাবাবু।

মালখানার খাতা লিখতে লিখতে নিজের মনেই শ্রীপতি বলেছিল, হুঃ, যেমন হয়েছে আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রার দল! একটা মাল বের করতে বললেই চোখ কপালে তুলে বসে বসে ভাববে। আরে বাপু, আমরা হচ্ছি গিয়ে সেকালের অফিসার। সাহেবসুবোদের কাছে কাজ শিখেছি। একালের ছোক্‌রারা কাজ শিখবে কার কাছে? যারা শেখাবে তারা নিজেরাই তো কিছু জানে না।

ওপাশ থেকে ফোড়ন কাটে ধূর্জটি, তা' শ্রীপতিবাবু, আপনার মত একজন কাজ-জানা ওস্তাদ লোক থাকতে ছেলে-ছোক্‌রাদের আর চিন্তা কি? আপনিই তো হাতে ধরে তাদের কাজ শেখাতে পারেন।

একটু থেমে মুচকি হেসে ধূর্জটি আবার বলেছিল, আপনি বুঝি শোনেন নি শ্রীপতিবাবু, খুব শিগগিরই পুলিশ ট্রেনিং কলেজে মালখানা রক্ষণাবেক্ষণের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে একটা আলাদা বিভাগ খোলা হবে। সেদিন আমাদের পুলিশ অফিসে গিয়ে শুনলাম, সেখানে নাকি ইনসট্রাক্টর হিসাবে আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে।

খাতা থেকে মুখ তুলে খানিকক্ষণ ধূর্জটির মুখের দিকে তাকিয়েছিল শ্রীপতি। তারপর বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, আপনার তো স্যার সবতাতেই ঠাট্টা। কি আর বলব স্যার, হাতী হয়ে ফাঁদে পড়েছি। এখন মশাও লাথি মারে!

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর পাল্টে গিয়েছিল ধূর্জটির। বুঝতে পেরেছিল, এই বুড়ো লোকটি সত্যি সত্যিই তার কথায় মনে আঘাত পেয়েছে। তাই লজ্জিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, এ কি কথা বলছেন, শ্রীপতিবাবু? মশা হতে পারি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আপনার মত একজন বয়স্ক লোককে লাথি মারার কথা কল্পনাও করতে পারি না।

সেই শ্রীপতিই একবার মালখানার ব্যাপার নিয়ে সাংঘাতিক বিপদে পড়েছিল। রাত তখন আটটা সাড়ে-আটটা হবে। ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জির ঘরে বসে তার সঙ্গে একটা মার্ডার কেস্ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ঠিক আলোচনা নয়। তার কাছ থেকে সেই কেসের খবর সংগ্রহ করছিলাম পত্রিকা অফিসে পাঠাবো বলে।

ঠিক এমনি সময় হন্ত দন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল শ্রীপতি মিত্র। তার হাতে একটা বড় মুখের কাঁচের শিশি। তার মধ্যে খানিকটা তরল পদার্থ।

শ্রীপতি ভবদেবকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাকে সেখানে দেখে হঠাৎ চুপ করে গেল।

শ্রীপতির মুখের দিকে তাকিয়ে ভবদেব জিজ্ঞেস করেছিল, কি শ্রীপতিবাবু, কি হল? এত হাঁপাচ্ছেন কেন?

—একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে, স্যার। কিন্তু—কিন্তু! কথাটা শেষ না করেই আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গিয়েছিল সে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার উপস্থিতিই শ্রীপতিকে কথাটা বলতে দিচ্ছিল না। শত হলেও আমি হচ্ছি বাইরের লোক। তাই ভবদেবকে বললাম, আমি বরঞ্চ একটু বাইরে যাই, বড়বাবু। একটু পরেই না হয় আসব।

ভবদেব আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে শ্রীপতিকে আবার জিজ্ঞেস করেছিল, কি এমন সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল যা' আমাদের এই সংবাদ-প্রভাকরের সামনে বলা চলবে না?

এরপর আমার আর স্থান ত্যাগ করা চলে না। তাই আমি বসেই রইলাম।

শ্রীপতি একটা ঢোক গিলে বলেছিল, মালখানা থেকে একটা জিনিস হারিয়ে গেছে, স্যার।

—হারিয়ে গেছে? ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল ভবদেবের। একটু সময় চিন্তা করে আবার বলেছিল, কি জিনিস হারিয়ে গেল, শ্রীপতিবাবু? সোনাদানা—টাকাপয়সা—না, অন্য কিছু।

—আজ্ঞে, কালকের সেই তিনশো ছাব্বিশ ধারার মামলার সেই কানটা—

—কানটা? বিস্ময়সূচক শব্দ করে উঠেছিল ভবদেব, বলেন কি মশাই, সেটা স্পিরিটের মধ্যে ডুবিয়ে রাখেননি?

হাতের সেই শিশিটা দেখিয়ে বলেছিল শ্রীপতি, এই তো, স্যার, রাখব বলে এইমাত্র শিশি, স্পিরিট জোগাড় করে নিয়ে এসেছি। কিন্তু কানটা খুঁজে পাচ্ছি না—। মুখখানা কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল শ্রীপতি।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম আমি। কান পাওয়া যাচ্ছে না, সে আবার কি কথা! কিসের কান? কার কান? চিলে কান নিয়ে গেছে বলে বোকারা নাকি নিজের কান দু'খানা পরীক্ষা না করেই চিলের পেছনে ছোটাছুটি করে—এমনি একটি প্রবাদ অবশ্য আমাদের দেশে চালু আছে। কিন্তু এ যে দেখছি সত্যিই তেমনি একটা অবস্থা। অবশ্য, কানটা নিশ্চয়ই শ্রীপতির নিজের নয়। তবে কার?

আমার মুখ দেখেই সম্ভবতঃ আমার মনের কথা টের পেয়েছিল ভবদেব। তাই সে বলেছিল, কি হে, সংবাদ-প্রভাকর, ভারি অবাক্ হচ্ছ, তাই না? সত্যিই একটা মানুষের কান। কাল রাতে এসেছিল কেস্‌টা। শালা-ভগ্নিপতির ব্যাপার। কথা কাটাকাটি থেকে খুনোখুনি। ভগ্নিপতি একখানা ধারালো কাটারি দিয়ে দিলে এক ঘা শালার মাথায়। হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়ে শালার একখানা কান সোজা নেমে গেল। একহাতে গামছা দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধরে অন্য হাতে নিজের কানটা নিয়ে ছুটে এল থানায়। তিনশো ছাব্বিশ ধারায় মামলা নিয়ে লোকটাকে পাঠিয়ে দিলাম হাসপাতালে। আর ঐ কানটা রেখে দেওয়া হল মালখানায়। মামলার সময় ওটার প্রয়োজন হবে। এখন শ্রীপতিবাবু বলছেন যে, সেই কানটাই নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। বোঝ একবার ব্যাপারখানা। ওঁকে কাল রাতেই সেটা স্পিরিটের মধ্যে রাখতে বলেছিলাম। কিন্তু—

ভবদেবের কথার মধ্যেই বলে উঠেছিল শ্রীপতি, ভাবলাম স্যার, এত রাতে আবার কোথায় স্পিরিট্ জোগাড় করতে যাব! তার চাইতে আজ সকালে শিশি, স্পিরিটের ব্যবস্থা করে ওটাকে রেখে দেব। শীতের দিন। একরাতে নিশ্চয়ই ওটা নষ্ট হয়ে যাবে না। তাই ন্যাক্‌ড়ায় মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম মালখানায়।

—কিন্তু এই একটা রাতের মধ্যে ওটা যাবে কোথায়? প্রশ্ন করেছিল ভবদেব।

শ্রীপতি কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আমি বলেছিলাম, বেড়াল টেড়াল নিয়ে যায়নি তো?

—না—না, জোরে মাথা নেড়ে বলেছিল শ্রীপতি, মালখানার মধ্যে বেড়াল ঢুকবে কোত্থেকে? পিঁপড়ে, আরশোলা আর গোটাকতক ধেড়ে ইঁদুর ছাড়া আর কোন জ্যান্ত প্রাণী নেই মালখানায়।

ভবদেব আবার বলেছিল, তা' হলে মশাই আবার ভালমত খুঁজুন গিয়ে। ইঁদুরেই হয়ত টেনে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলেছে।

—কিন্তু স্যার, ইঁদুর কি মাংস খায়? প্রশ্ন করেছিল শ্রীপতি।

—হ্যাঁ, মশাই, খায়—খায়। আজকালকার ইঁদুর সবই খায়। না খেলেও টেনে নিয়ে যেতে আপত্তি কি?

মালখানাটা আবার ভালমত খোঁজা হয়েছিল তারপর। একা শ্রীপতি নয়, সুশান্ত, ধূর্জটি এবং আরও দু'একজন কনস্টেবল্ সেই ছোট কুঠরিতে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল। শ্রীপতি কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যদি ঐ বস্তুটি না-ই পাওয়া যায় তো কি উপায় হবে?

টর্চের সাহায্যে মালখানার আনাচ-কানাচ খুঁজতে খুঁজতে ধূর্জটি ঠাট্টার সুরে বলেছিল শ্রীপতিকে, সত্যিই শ্রীপতিবাবু, যদি না-ই পাওয়া যায় তো কি হবে? এ তো আর ভাঙা কলম কিম্বা অন্য কোন সাধারণ জিনিস নয় যে, ঠিক ঐ রকম দেখতে আর একটা যোগাড় করে এনে দিলেই কাজ চলে যাবে! এ হচ্ছে মানুষের খাঁটি কান। এ জিনিস কোথায় পাওয়া যাবে?

তারপর একটু থেমে অনেকটা যেন নিজের মনেই আবার বলেছিল, অবশ্য তেমন অবস্থা হলে মালখানাবাবুর নিজেরই একখানা—। কথাটা ইচ্ছে করেই অসম্পূর্ণ রেখেছিল ধূর্জটি।

ধূর্জটির কথার ধরনে রেগে ওঠেও হেসে ফেলেছিল শ্রীপতি। বলেছিল, তা' আর কি করব, স্যার? এই বুড়ো মানুষটার একখানা কান দিয়েই যদি কাজ চলে যায় তো তাই হবে। চাকরির চাইতে তো আর কান বড় নয়!

কানটা কিন্তু পাওয়া গিয়েছিল। পেয়েছিল ধূর্জটিই। এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো চটাওটা মেঝেয় একটা ইঁদুরের গর্তের মুখে সেই পিঁপড়ে জড়ানো বস্তুটিকে পড়ে থাকতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল ধূর্জটি, এই যে, শ্রীপতিবাবু, আপনার কানটা পাওয়া গেছে। আসুন, এদিকে আসুন। ঐ দেখুন আপনার কানটা।

শ্রীপতি মিত্র একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই ধূর্জটি আবার বলেছিল, যাক্, এবারের মত তা'হলে আপনার নিজের কানের ফাঁড়া কাটলো, কি বলেন?

ততক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে শ্রীপতি। ভাগ্যিস্, বুদ্ধিমান ইঁদুরটা ওটাকে গর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়নি। তা' হলেই হয়েছিল আর কি!

টেলিফোন বেজে উঠতেই ভবদেব বাঁ হাতে রিসিভারটা কানের কাছে তুলে নিয়ে বললে, কোতোয়ালী থানা। ও. সি. বলছি।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে গম্ভীর কণ্ঠস্বর, আমি এস্. ডি. ও.।

ভবদেব তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, নমস্কার স্যার, বলুন।

—আপনার এলাকার কোন খবর-টবর রাখেন?

—আজ্ঞে, স্যার—প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু আমতা আমতা করে ভবদেব।

—বলছি, আপনার এলাকার কোথায় কি হচ্ছে সে খবর রাখেন? এস্ ডি. ও'র ভারি কণ্ঠস্বর আরও ভারি হয়ে ওঠে।

মাত্র মাস তিনেক হল ভদ্রলোক এই সদর সাব-ডিভিশানের চার্জ নিয়েছেন। একটু কড়া মেজাজের মানুষ।

ভবদেব মোলায়েম কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ স্যার, কিছু কিছু রাখি—

—রাখেনই যদি তো বাজারের ঐ ব্যবসাদারগুলো এত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে কেন, বলতে পারেন? কৈফিয়ত তলবের সুরে প্রশ্ন করেন এস. ডি. ও।

—কি হয়েছে স্যার?

—কি আর হবে? আপনারাও চুপ করে থাকবেন, আর ঐ ব্যাটারাও যা' খুশি তাই করে বেড়াবে। জিনিসপত্রের দাম খুশিমত তো নেবেই, তার ওপর আবার ওজনেও চুরি! আজ

সকালেই আমার আর্দালী বাজারে গিয়ে পাঁচশো গ্রাম মাছ নিয়ে এল। কেমন যেন সন্দেহ হল আমার। বাড়িতে মেপে দেখলাম ঠিক সাড়ে চারশো গ্রাম। ব্যাটারা এমনিভাবে দিনের পর দিন জনসাধারণকে ঠকিয়ে যাবে, আর আপনারা চুপ করে থাকবেন?

—না স্যার, ঠিক চুপ করে নেই আমরা! এই তো পরশু দিনও একটা মাছওয়ালাকে চালান দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন স্যার, সর্ট স্টাফ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। তাই সবসময় ঠিকমত চারিদিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না।

ভবদেবকে থামিয়ে দিয়ে এস. ডি. ও অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠেন, না মশাই, ওসব লেম্ এক্সকিউজ শুনতে চাই না। এমন অরাজকতা চলতেই পারে না। এসব বন্ধ করতেই হবে।

আর কথা না বাড়িয়ে ভবদেব জবাব দেয়, ঠিক আছে স্যার। আমি দেখছি কি করা যায়।

—হ্যাঁ, তাই দেখুন। বলেই অকস্মাৎ টেলিফোন ছেড়ে দেন এস. ডি. ও.।

ভবদেব টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই সামনে বসে থাকা অমিত মুখে কিছু না বলে কেবল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের দিকে।

একটু ম্লান হেসে ভবদেব বললে, এস. ডি. ও. সাহেব টেলিফোন করেছিলেন। আজ এক মাছওয়ালা নাকি তাঁর আর্দালীকেই ঠকিয়েছে। পাঁচশো গ্রামের বদলে সাড়ে চারশো গ্রাম মাছ দিয়েছে।

একমুহূর্ত থেমে ভবদেব আবার বললে, বুঝলে অমিত, এঁরা হচ্ছেন বড় অফিসার। আমাদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপার তো এঁরা বুঝবেন না। সর্ট স্টাফের কথা বলতেই বললেন, এসব নাকি লেম্ এক্সকিউজ। সে যাই হোক, একটা কিছু ব্যবস্থা এবার করতেই হবে। মাঝে মধ্যে ওরকম একটা দু'টোকে চালান দিয়ে কিছু হবে না। মাছের বাজারে একদিন রীতিমত রেইড্ চালাতে হবে। প্রত্যেকের পাল্লা-বাটখারা পরীক্ষা করতে হবে। আর তা' করতে হবে খুব সকালেই। অফিসবাবুরা সাধারণত সকালেই বাজারে ছোটেন। ওজন বাটখানা পরীক্ষা করবার তেমন সময় পান না তাঁরা। আর ঐ মাছওয়ালারা তাদেরই গলা কাটে নিশ্চিন্ত মনে। সুযোগও বেশি। পঞ্চাশ গ্রাম কম দিতে পারলেই পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নটি পয়সা নগদ লাভ।

একটু থেমে ভবদেব আবার বললে, কাল সকালেই তা'হলে চল, কেমন?

পরের দিন সকালে কিন্তু ভবদেবকে পাওয়া গেল না। সকালে অমিত থানায় যেতেই রাতের ডিউটি অফিসার পিনাকী সরকার বললে, একটু আগেই বড়বাবু বড়সাহেবের বাংলোয় গেছেন। কি একটা জরুরী দরকারে বড়সাহেব ডেকেছেন তাঁকে। যাবার আগে বড়বাবু বলে গেছেন, সুশান্তকে নিয়ে আপনি যেন রেইড্ করতে চলে যান।

জুনিয়ার এ. এস্. আই. সুশান্ত ও আট-দশজন কনস্টেবল নিয়ে কোতোয়ালী থানার মেজবাবু অমিত রায় যখন মাছের বাজারে হানা দেয় তখন বাজার সবে জমে উঠেছে।

পুলিশের এমনি হঠাৎ আগমনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মাছওয়ালারা। ক্রেতারাও বিব্রত বোধ করে। এ আবার কি ঝামেলা শুরু হল? কোথায় এখন তাড়াতাড়ি কেনাকাটা শেষ করে বাড়ির দিকে ছুটবে, না তো পুলিশের ঝঞ্ঝাট আরম্ভ হল।

অমিতের নির্দ্দেশ, একটি মাছওয়ালাও যেন বিনা অনুমতিতে মাছের বাজারের বাইরে যেতে না পারে। ক্রেতারা অবশ্য অনায়াসেই চলে যেতে পারবে।

পুলিশের পদার্পণে বাজারের শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। ছন্দপতন ঘটে বেচাকেনায়। অম্ল মধুর রকমারি মন্তব্য জেগে ওঠে বিরক্ত ক্রেতাদের কণ্ঠে। তবে মধুর চাইতে অম্লের জোরই বেশি। অধিকাংশ ক্রেতাই ক্ষুব্ধ।

অমিত কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সুশান্তকে সঙ্গে নিয়ে মাছওয়ালাদের পাল্লা-বাটখা'রা পরীক্ষা করতে থাকে একে একে।

ক্রেতারা কেউ কেউ সন্তুষ্ট হয়। বলে, বেশ হয়েছে। এবার টিট্ হবে ব্যাটারা। বড্ড বাড় বেড়েছে ওদের। খুশিমত দাম তো নেবেই, আবার ওজনেও চুরি করবে। আবার কেউ বলে, পুলিশের কথা আর বলবেন না, মশাই। নেই কাজ তো খই ভাজ। দেশের চুরি-ডাকাতির কিনারা করতে পারে না, এখন এসেছে এইসব পুঁচকে মাছওয়ালাদের পেছনে লাগতে। কই, এলেম থাকে তো যা দেখি বাঘা বাঘা রাঘব-বোয়ালদের কাছে! তাদের টিকিটি ছোঁবারও তো ক্ষমতা নেই।

সবরকম মন্তব্যই কানে আসে অমিতের। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মনটা। এরা কি নিজের ভালও বোঝে না? দিনের পর দিন এরা এই অসৎ মাছওয়ালাদের কাছে ঠক্‌বে, তবুও পুলিশের হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না? কিন্তু কেন? কি চায় এরা? কি হলে এরা সন্তুষ্ট হয়? নিজেদের দৈনন্দিন কেনাকাটায় একদিন একটু অসুবিধা হয়েছে বলেই কি এদের এই বক্রোক্তি?

হঠাৎ মাছের বাজারের একপ্রান্তে একটা গণ্ডগোল শুরু হতেই অমিত ছুটে যায় সেখানে। না, তেমন কিছু নয়। হাফ-প্যাণ্ট পরা একটা ছোট ছেলে একপাশে বসে কিছু কুচো মাছ বিক্রি করছিল। বেচারী নেহাত-ই গরীব। নিজের হাতে তৈরি একটা যেমন-তেমন দাঁড়িপাল্লাই তার সম্বল। বাটখারার অভাবে গোটাকতক ইট-পাথরের টুকরো দিয়েই কাজ চালাচ্ছিল ছেলেটা। হঠাৎ পুলিশের আগমনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সে। তারপর, পুলিশকে দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা পরীক্ষা করতে দেখেই মুখ শুকিয়ে ওঠে তার। মাছের ছোট্ট চুবড়িতে দাঁড়িপাল্লা ঢাকা দিয়ে গুটি গুটি সরে পড়বার তালে ছিল সে। হঠাৎ একজন হিন্দুস্থানী কনস্টেবল্ প্রবল বিক্রমে ধরে ফেলে তাকে। আর যায় কোথায়। ভ্যা-করে কেঁদে ফেলে ছেলেটা। লোক জমে যায় প্রচুর সেখানে। অসন্তুষ্ট ক্রেতার দল মারমুখী হয়ে ওঠে কনস্টেবলটির ওপর।

ব্যাপারটা কিন্তু বেশিদূর গড়াতে পারে না। অমিত ছুটে এসে মিটিয়ে দেয়। ছেলেটাকে পুলিশব্যূহের বাইরে বের করে দিতে দিতে অমিত বললে, এবার থেকে ভাল বাটখারা নিয়ে এসে বাজারে বসবি, বুঝলি?

একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে মাথা কাত করে সায় দিয়ে ছুটে পালায় ছেলেটা।

পাঁচ-ছ'জন মাছওয়ালাকে এ্যারেস্ট্ করে অমিত। তারপর বামাল সমেত অপরাধীদের সঙ্গে নিয়ে বাজারের বাইরে আসার পথে পেছনে একজনের একটি কর্কশ মন্তব্য কানে আসে তার। লোকটি আর একজনকে বলছিল, আরে মশাই, ভেবেছেন বুঝি মাছওয়ালারা আমাদের ঠকায় বলে পুলিশ এসে ওদের ওপর হামলা করছে? আরে, মোটেই না—মোটেই না। আমাদের জন্যে ওদের যেন কত মাথাব্যথা! আসলে ব্যাপার কি জানেন, পুলিশের সঙ্গে ওদের একটা বন্দোবস্ত আছে। সেই বন্দোবস্তের ব্যাপারে বোধহয় কোন গোলমাল হয়েছে। তাই এই লাল পাগড়ীর আগমন, বুঝলেন?

একটু ম্লান হাসি জেগে ওঠে অমিতের ঠোঁটের কোণে। শান্ত দৃষ্টিতে সেই বক্তার দিকে একবার তাকিয়েই একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বাজারের বাইরের চলে আসে সে।

অপর লোকটি কিন্তু তখন সেই বক্তাকে বলছিল, বুঝলেন মশাই, আপনার দিকে তাকিয়ে আপনাকে চিনে রাখলে। সুযোগ মত একদিন বিপদে ফেলবে আপনাকে।

বক্তার মুখখানা শুকিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তেজিত হয়ে উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে আরও কিছু কটু মন্তব্য করে বাজারের থলি হাতে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

পুলিশ ভ্যানে বসে মাথার টুপিটা হাঁটুর ওপর নামিয়ে রাখে অমিত। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বাজারের সেই বক্তার কথাগুলিই ভাবতে থাকে মনে মনে।

॥ চব্বিশ ॥

অবশেষে কোতোয়ালী থানা থেকে অমিতের অন্যত্র বদলির দরখাস্ত নাকচ হয়ে গেল।

এর পেছনে ভবদেবের কতখানি হাত ছিল জানা যায় না। তবে রিজার্ভ অফিসার অমিতকে ডেকে বললে, আপনার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করিনি, অমিতবাবু। কিন্তু বড়সাহেব রাজি হলেন না। বললেন, না—না, তা' হবে না। অমিত রায় ইয়ং এনার্জেটিক অফিসার। ওকে ঐ কোতোয়ালী থানাতেই থাকতে হবে। হেভী থানা, কাজের চাপ বেশি। কিন্তু তাই বলে কাজের ভয়ে ওকে সেখান থেকে পালাতে দেওয়া হবে না। এ্যাট্ দি বিগিনিং অব দি সার্ভিস, এ ইয়ং অফিসার মাস্ট্ ওয়ার্ক হার্ড্ ইন্ এ হেভী পোলিস্ স্টেশন।

একটু থেমে রিজার্ভ অফিসার আবার বললে, আমি তখন সাহেবকে বললাম, কিন্তু স্যার, ও যদি ছুটি নিয়ে চলে যায় তো এমনিতেই ওকে বদলী করে দিতে হবে। শুনে সাহেব বললেন, ও নো—নো, দ্যাট্ কাণ্ট্ বি। বদলির জন্যে ছুটি নেবে এমন অফিসার অমিত রায় নয়।

অমিত আর কিছু না বলে থানায় ফিরে এসেছিল। মনে মনে একটু দুঃখিতই হয়েছিল। বদলির আবেদন নাকচ হবার জন্যে যতটা দুঃখ, তার চাইতেও বেশী দুঃখ পেয়েছিল সাহেবের কথায়। শেষে কিনা বড়সাহেব ভাবলেন যে, কাজের ভয়েই সে কোতোয়ালী থানা থেকে বদলী হতে চাইছে? ছি—ছি, তিনি তার সম্বন্ধে এমনি একটি ধারণা করে বসলেন? যাক গে, আর চেষ্টা তদ্বিরের দরকার নেই। এখানেই থাকবে সে। যত কিছু অস্বস্তি তো কেবল ঐ স্মৃতিকণা ও তার বাবাকে নিয়ে! সে পাট তো চুকেই গেছে। স্মৃতিকণা নিজের হাতে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছে। তবে আর ভাবনা কিসের? এই ভাল হয়েছে। গরীবের ঘোড়া-রোগের মত পুলিশের পক্ষে স্নেহ-প্রেম-ভালবাসাও এক ধরনের রোগ ছাড়া আর কি? এদের প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। তাতে উভয় তরফেরই মঙ্গল।

মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে একদিন বিকেলে ওর বাড়িতে বসেই ওকে জড়িয়ে ধরে আমি বলেছিলাম, এ ভালই হল—ভালই হল, ভাই। একটা মেয়েকে এড়াতে গিয়ে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাবে কেন? হোক না কেন সে যতই অসামান্যা, কিন্তু তাই বলে ভীরুর মত পালিয়ে যেতে হবে? আর, পালিয়ে গিয়েই কি সমস্যার সমাধান করতে পারবে? এই করেই কি তাকে মন থেকে তাড়াতে পারবে তুমি? তা' ছাড়া, আমি তো কোন দোষ করিনি।

আমার সেই গাঢ় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে একটুও চেষ্টা না করে অমিত কেবল ছল্ ছল্ চোখে আমার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল খানিকক্ষণ। তারপর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, ভগবান বোধহয় একমাত্র তোমার আবেদনই শুনতে পেয়েছিলেন, তরুণ। তাই আমার এখান থেকে চলে যাওয়া আর হল না।

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিল, কিন্তু একদিন তো আমাকে যেতেই হবে, ভাই। সেদিন কি হবে? সেদিন যে আমি নিজেও অন্য কোথাও গিয়ে সুস্থ মনে চাকরি করতে পারব না।

অমিতকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দিয়ে তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে আমি বলেছিলাম, সেদিনের কথা না হয় সেদিনই ভাবা যাবে, অমিত। তা' নিয়ে এখনই ভেবে মরি কেন?

এমনি সময় অমিতের সেই কম্বাইণ্ড্ হ্যাণ্ড্ ছোকরাটি ঘরে ঢুকতেই আমি পকেট থেকে দু'টো টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা সুরে বললাম, যাও তো, শিগগির গিয়ে দু' টাকার গরম গরম সিঙ্গাড়া কচুরি নিয়ে এস। তোমার বাবুর বদলির দরখাস্ত নাকচ হওয়ার ঘটনাকে আজ সিঙ্গারা কচুড়ি দিয়ে সেলিব্রেট করব।

অমিত আমাকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে যেতেই আমি ওর ঠোঁটের ওপর আঙুল ছুঁইয়ে হাল্‌কা মেজাজে মৃদু ধমক দিয়ে বললাম, চুপ, একটি কথাও নয়। আজ দু'জন মিলে পুরো দু'টাকার সিঙ্গার কচুরি খাব।

—সেকি, তুমি না অম্বলের রোগী? ওসব জিনিস তোমার পেটে পড়লে কি আর রক্ষা আছে? বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল অমিত।

—আজকের দিনে ওসব কথা কিছুই শুনতে চাই না। কঠোরতার ভান করে আমি জবাব দিয়েছিলাম, আজ আমাকে বাধা দিতে এলে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে ছাড়ব। বলেই হেসে উঠেছিলাম আমি।

ছোকরাটি টাকা দু'টো হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ হাঁ-করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎ কি ভেবে একগাল হেসে টাকা দু'টো জামার পকেটে ফেলে ছুটল দোকানে।

অমিত কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, না ভাই তরুণ, এসব জিনিস তুমি না খেলেই পারতে। মিছিমিছি শরীরটা খারাপ করে—

অমিতকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কৃত্রিম ধমকের সুরে আমি বলেছিলাম, চুপ করো তো। আমার ওপর তোমাকে ডাক্তারী ফলাতে হবে না।

একটা চেয়ারে বসতে বসতে অমিত কেবল মুচ্‌কি হেসে বলে উঠেছিল, বদ্ধ পাগল!

জবাবে আমি বলেছিলাম, তা তো বটেই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। এদিকে উলুখাগড়ায় প্রাণ যায় আর কি।

কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু বুঝে নিয়ে অমিত আবার হেসে বলেছিল, তুমি বুঝি উলুখাগড়া?

—তা' নয় তো কি? ভেবেছিলাম রাজায় রাজায় মিত্রতা থাকবে, সখ্যতা হবে। একে অন্যের সান্নিধ্যে এসে নিজেদের জীবনকে সুন্দর মধুমত করে তুলবে। আর উলুখাগড়া তাই দেখে দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাসে মাথা দোলাবে। কিন্তু তা' আর হল কই? কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল।

মুহূর্তে মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছিল অমিতের। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে বলেছিল, না ভাই। সেসব ভুলে যাও। ওসব আর হবার নয়। আমরা পুলিশ—এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয়। এর বাইরে আমাদের আর অন্য কোন পরিচয় নেই। তোমার মত বোকা ছাড়া আর কে আমাদের সঙ্গে সখ্যতা করতে আসবে? একটা আলাদা গোষ্ঠীর লোক যে আমরা। সকলের দেওয়া অপবাদ আর অভিশাপ কুড়িয়ে নিজেদের মাথা ভারি করে তোলার জন্যেই যে আমাদের সৃষ্টি—। বলতে বলতে জোর করে মুখের ওপর একটা হাসির ভাব ফুটিয়ে তুলে অকস্মাৎ থেমে গিয়েছিল অমিত।

আমি ওর মুখ দেখে সেই মুহূর্তে টের পেয়েছিলাম যে, ওর ঐ ম্লান হাসিটুকুর অন্তরালে লুকিয়ে ছিল একটা বেদনার ছায়া, একটা ব্যর্থতার আক্ষেপ। আর তার জন্যে সবচাইতে বেশি দায়ী তার সেই মানসী স্মৃতিকণা।

স্মৃতিকণার প্রসঙ্গে অমিত যে কতটা স্পর্শকাতর সেকথা জানা সত্ত্বেও কথায় কথায় ঐ প্রসঙ্গ টেনে এনে ঘরের হাল্‌কা আবহাওয়াকে ভারি করে তোলার জন্যে নিজের ওপরই রাগ হয় আমার। তাই চুপ করে বসে থেকে সংশোধনের পথ খুঁজতে থাকি।

এমনি সময় সিঙ্গাড়া কচুরি এসে পড়তেই সুযোগ আসে আমার। খাবারের ঠোঙ্গাটা হাতে নিয়ে বলেছিলাম, থাক ভাই, ওসব আলোচনা এখন বন্ধ থাক। এসো, এবার এগুলোর সদ্ব্যবহার করি। বলেই ঠোঙ্গাটা মেলে ধরি ওর সামনে।

আঘাত যতই তীব্র হোক না কেন, সময়ের ব্যবধান মানুষকে একটু একটু করে আঘাতের তীব্রতা থেকে মুক্তি দেবেই। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আর এই নিয়ম এখনও চালু আছে বলেই রোগ শোক দুঃখ বেদনা ভুলে মানুষ আজও সংসারে হেসে-খেলে বেড়ায়।

শঙ্করের বিয়োগ ব্যথা একটু একটু করে যতই ভুলতে থাকে স্মৃতিকণা, অমিতের প্রতি তার সেদিনকার আচরণ ততই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ অজিতেশবাবু অবশ্য কিছু বলেন না। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে শান্তি পেতে চেষ্টা করেন। আর, মাঝে মধ্যে নিজের মনেই বলেন, না, অভিমানী ছেলেটা আর এল না তা' হলে।

স্মৃতিকণা নিজের ঘরে বসে হাতের ওপর চিবুক রেখে কেবল চিন্তা জাল বোনে। অন্তহীন সেই চিন্তা। অনুশোচনায় দগ্ধ মনটাকে যুক্তির প্রলেপ দিয়ে শীতল করতে ব্যর্থ চেষ্টা করে কেবল। অবশেষে একসময় জানালার সামনে এসে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

দূরে ঐ আব্‌ছা উঁচু বাড়িটাই ধনী ব্যবসায়ী সাহাদের। ওর কাছেই একটা দোতলা বাড়ির একতলায় থাকে অমিত। অমিতের সঙ্গেই সে কয়েক মিনিটের জন্যে একবার গিয়েছিল সেখানে। বিশেষ অতিথির সম্মানে তাকে ঘরে এনে বসিয়েছিলে অমিত। চাকরটা ছুটোছুটি করে একরাশ মিষ্টি এনে হাজির করেছিল তার সামনে। চোখদু'টো কপালে তুলে অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল স্মৃতিকণা, একি, এত মিষ্টি খাবে কে?

—কেন তুমি? তোমার জন্যেই তো আনালাম।

—আমি কি রাক্ষস নাকি? বলেই একটিমাত্র মিষ্টি তুলে মুখে দিয়েছিল সে।

বিব্রতকণ্ঠে অমিত বলেছিল, সেকি, আর খাবে না?

—না। ছোট্ট সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিল স্মৃতিকণা।

একটু ইতস্ততঃ করে অমিত আবার বলেছিল, বেশ, তা'হলে এককাপ চা খাও।

—না, চা খাব না।

—কেন?

—চা করতে দেরি হবে।

—হলই বা একটু দেরি! বাড়িতে তোমার এমন কি কাজ?

—না বাড়িতে তেমন কিছু কাজ নেই। তবে এখানে বেশিক্ষণ বসতে ভাল লাগছে না।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল অমিত, কেন?

একটু সময় চুপ করে থেকে স্মৃতিকণা জবাব দিয়েছিল, সেকথা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না।

মনে মনে একটু আহত হয়েছিল অমিত। আর পীড়াপীড়ি না করে স্মৃতিকণাকে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল সে।

গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে পথ চলছিল অমিত। স্মৃতিকণা একবার আড়চোখে অমিতের মুখের ভাব লক্ষ্য করে সামান্য একটু হেসে মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, এতেই যে বাবু রেগে উঠলেন! তারপর একমুহূর্ত থেমে আবার বলেছিল, ভর সন্ধ্যেবেলা একটি কুমারী মেয়ের পক্ষে একজন অবিবাহিত পুরুষের ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকাটা কি ভাল দেখায়? লোকে জানতে পারলেই বা বলবে কি?

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল অমিত। সত্যিই তো। এদিকটা তো সে একেবারেই ভেবে দেখেনি। তাই, একটু ম্লান হেসে লজ্জিত কণ্ঠে কেবল বলেছিল, ও—তাই বুঝি? আমি ঠিক এতটা খেয়াল করিনি।

—তা' জানি। আর, জানি বলেই তখন বলেছিলাম যে, তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অতীতের স্মৃতির মধ্যে ডুবে যায় স্মৃতিকণা। হঠাৎ তার স্বপ্নভঙ্গ হয় একটা দাঁড়কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বরে। কাকটা সামনের বকুল গাছের ডালে বসে যেন তাকে চম্‌কে দিতেই কর্কশকণ্ঠে ডেকে উঠেছিল।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে স্মৃতিকণা। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, বেলা প্রায় দেড়টা। অমিত এখন কি করছে? খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছে নিশ্চয়। নাকি, এখনও থানা থেকেই ফেরেনি? তাও হতে পারে। খাওয়া-দাওয়া কিংবা বিশ্রামের কোন বাঁধা-ধরা সময় নেই ওদের। হয়ত আজ সারাদিন ওর খাওয়াই হবে না। এমনি নাকি ওদের মাঝে মাঝেই হয়। অমিত নিজেই একদিন বলেছিল সেকথা। এক-একদিন কাজের চাপ নাকি এত বেশি থাকে যে, বাড়ি এসে খাওয়ার সময়ও থাকে না। সেদিন দোকান থেকেই কিছু খাবার আনিয়ে খেতে হয় তাকে।

হঠাৎ স্মৃতিকণার চিন্তাস্রোত অন্য পথ ধরে। অমিত কি এখানে আছে? চলে যায়নি তো এখান থেকে? কথাটা মনে হতেই অকস্মাৎ তার মনের মধ্যে একটা চাপা কান্না গুমরে ওঠে। চঞ্চল মনের আনাচে-কানাচে একটা সূক্ষ্ম অথচ প্রকাশরহিত বেদনাবোধের তরঙ্গ খেলে যায়। বাষ্পাকুল নয়নে সিলিং পাখাটার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

না, যায় নি বোধহয়। তার বাবাকে সে বলে পাঠিয়েছিল যে যাবার আগে সে নিশ্চয় একবার দেখা করে যাবে তাঁর সঙ্গে। সেই আশাতেই শঙ্কিত মনে স্মৃতিকণা অপেক্ষা করেছিল এতদিন। একই সঙ্গে আশার আনন্দ ও নিরাশার শঙ্কা নিয়ে অধীর আগ্রহে বসেছিল। কিন্তু অমিত আসেনি। না এসে একদিকে ভালই করেছে। তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসার অর্থই হত তার এখান থেকে বদলী হয়ে যাবার সংকেত। তবে কি সে বদলী হয়নি? কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, তার বাবার সঙ্গে দেখা না করেই সে চলে গেছে।

সারাটা দুপুর ছট্‌ফট্ করে নিজের ঘরের মধ্যে কাটায় স্মৃতিকণা। অবশেষে বিকেলে রোদের তেজ একটু কমে আসতেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু প্রসাধন করে শাড়িটা পাল্টে অজিতেশের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

অজিতেশবাবু চোখ তুলে কন্যার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, কোথাও বেরোচ্ছিস নাকি, মা?

—হ্যাঁ, বাবা। একটু ঘুরে আসি। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় স্মৃতিকণা।

বৃদ্ধ যেন একটু খুশি হন। মাথা নেড়ে বললেন, তাই যা মা। একটু বেড়িয়ে আয়। সারাটা দিন একা একা বাড়িতে বসে না কাটিয়ে কলেজের দু'একটি মেয়ের বাড়িতে বেড়িয়ে এলে মনটাও ভাল থাকবে।

স্মৃতিকণা আর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে থাকে।

একতলায় রান্নাঘরে প্রবেশ করে রাঁধুনী বামুনকে রাতের রান্নার যথাযথ নির্দেশ দেয় স্মৃতিকণা। তারপর বাড়ির পুরোন ঝিকে অজিতেশের বৈকালিক জলযোগ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ঝি জিজ্ঞেস করে, আপনার কি বাড়ি ফিরতে দেরি হবে, দিদিমণি?

—বলতে পারি না। বলেই সদর দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে।

বাড়ির গেট্ পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা। একমুহূর্ত চিন্তা করে। তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর জেগে ওঠে একটা দৃঢ়তার ছাপ। হাত ঘুরিয়ে মণিবন্ধের সঙ্গে বাঁধা ছোট্ট হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে একবার সময় দেখে নেয়। তারপর রাস্তা ধরে চলতে শুরু করে।

রোদে পোড়া ক্লান্ত দিনের শেষে সবে বইতে আরম্ভ করেছে দক্ষিণের মৃদু বাতাস। প্রখর সূর্যকিরণে ভীত ফেরিওয়ালার দল এতক্ষণে নিঃশঙ্ক চিত্তে রাস্তার পাশে সাজিয়ে বসেছে তাদের পসরা। ঘর্মাক্ত রিক্সাওয়ালা দেহের সমস্ত শক্তি পায়ের পেশীর ওপর ন্যস্ত করে বেল বাজিয়ে সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলেছে গন্তব্যস্থলের দিকে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশের এখানে ওখানে জমে থাকা টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ওপর। তারই একটা অংশ এসে স্পর্শ করেছে স্মৃতিকণার মুখখানাকে।

মুক্তাবিন্দুর মত কপালে ঘাম জমেছে তার। শাড়ির আঁচলটা আদুরে মেয়ের মত লেপটে রয়েছে গায়ের সঙ্গে। পায়ের স্যাণ্ডালের লাঞ্ছনায় ফেলে আসা পদচিহ্নের কাছে ধুলো উড়ছে একটু একটু। আনত দৃষ্টিতে মরাল ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে স্মৃতিকণা।

গন্তব্যস্থলের যতই কাছাকাছি হচ্ছে ততই যেন চলার স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাঁটা পড়ছে তার। মুখের সেই দৃঢ়তার ওপর নেমে এসেছে কুণ্ঠার ছায়া।

অবশেষে একসময় কুণ্ঠিত চরণে শঙ্কা উদ্বেলিত বক্ষে অমিতের বাসার বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সে।

ভেতরে সাড়াশব্দ নেই। তবে দরজা যখন ভেতর থেকে বন্ধ তখন কেউ নিশ্চয়ই রয়েছে ঘরের মধ্যে। কিন্তু কে সে? অমিত যদি সত্যি সত্যি চলে গিয়ে থাকে? যদি অন্য কোন ভাড়াটে এসে থাকে ইতিমধ্যে?

একটু সময় ইতস্ততঃ করে স্মৃতিকণা। তারপর মসৃণ পেলব হাতখানি দরজার কড়ার ওপর রেখে শব্দ করে।

মানুষের সাড়া জেগে ওঠে ভেতরে। আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিকণা।

দরজার কপাট খুলে যায়। মাথা জোড়া টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, একজন সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ এসে দাঁড়ান স্মৃতিকণার সামনে।

বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে স্মৃতিকণার। কে এই ব্যক্তি? তবে কি তার সেই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল? অমিত কি তবে চলে গেছে এখান থেকে? নতুন ভাড়াটে এসেছে নাকি?

বৃদ্ধের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই মাথা নিচু করে স্মৃতিকণা। সেই মুহূর্তে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে সে।

বৃদ্ধও অবাক হয়ে যান স্মৃতিকণাকে দেখে। এখানে এইসময় একটি মেয়েকে যেন ঠিক আশা করেননি তিনি।

একটু সময় চুপ করে থেকে মোলায়েম কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে মা তুমি? কি চাই তোমার?

ধীরে ধীরে মাথা তোলে স্মৃতিকণা। একটা ঢোক গিলে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললে, আপনি—আপনি বুঝি এখানে—মানে, এই বাড়িতে থাকেন?

ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে বৃদ্ধের। জবাব দেন তিনি, হ্যাঁ, পরশু থেকে এখানেই আছি। কিন্তু কেন বল তো, মা?

মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে নিষ্ফল চেষ্টা করে স্মৃতিকণা জবাব দেয়, ও—তাই বুঝি? আমি ঠিক জানতাম না। এখানে আপনার আগে যিনি থাকতেন—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে যায় সে।

চিন্তার রেখা ফুটে উঠে বৃদ্ধের মুখে। বললেন তিনি, এখানে আমার আগে থাকতেন? তুমি কার কথা বলছো, মা?

—আজ্ঞে, আপনি বোধহয় তাঁকে দেখেননি। আপনার আগে এখানে একজন পুলিশ অফিসার থাকতেন। আমি তাঁরই খোঁজে এসেছিলাম।

এতক্ষণে বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জবাব দেন তিনি, থাকতেন বলছো কি মা? সে তো এখনও এখানেই থাকে। তুমি অমিতের কথা বলছো তো? সে আমারই ছেলে। কিন্তু তোমার পরিচয় তো কই বললে না, মা?

অমিতের বাবা! কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রচণ্ড লজ্জা যেন হঠাৎ ঘিরে ধরে স্মৃতিকণাকে। সেই মুহূর্তে যেন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয় তার। ছি—ছি! এবার সে কি জবাব দেবে? কি পরিচয় দেবে নিজের।

একবার মনে হয়, জবাব না দিয়েই সে ছুটে পালিয়ে যায় এখান থেকে। কিন্তু তাতে যে ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হয়ে দাঁড়াবে। অমিত সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে তার বাবার মনে। তার চাইতে—তার চাইতে—

কিন্তু তার চাইতে কি বললে যে ভাল হয় তা ঠিক সেই মুহূর্তে মাথায় আসে না স্মৃতিকণার। তাই সে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে।

স্মৃতিকণার মনের দ্বিধাগ্রস্ত নজর এড়ায় না বৃদ্ধের। তিনি আবার বললেন, ওর কাছে বুঝি কোন দরকারে এসেছো, মা? তা' অমিত তো এখন বাড়ি নেই। সেই সাত সকালে বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি। কিসের একটা তদন্তে নাকি কোন একটা গ্রামে গেছে। বলে গেছে, সন্ধ্যের পর ফিরবে। তুমি ইচ্ছে করলে একবার থানায় গিয়ে খোঁজ নিতে পারো, মা।

স্মৃতিকণা তখন যে কোন ছুতোয় সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, হ্যাঁ, সেই ভাল। আমি বরং একবার থানায় গিয়ে খোঁজ করি। বলেই সে সবে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে—ঠিক এমনি সময় একটা থলিতে কিছু আনাজপত্র নিয়ে এসে হাজির হয় অমিতের সেই চাকর ছোক্‌রাটি।

স্মৃতিকণার ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আকর্ণ বিস্মৃত হাসি হেসে সে বলে ওঠে, এ কি দিদিমণি যে!

—তুমি ওকে চেন নাকি? অমিতের বাবা সতীকান্ত প্রশ্ন করেন ছোক্‌রাটিকে।

—হ্যাঁ, খু-উ-ব চিনি। মুখের একটা ভঙ্গি করে জবাব দেয় চাকরটি, দাদাবাবুর সঙ্গে একবার এখানে এসেছিলেন। তা'ছাড়া দাদাবাবু তো প্রায়ই ওঁদের বাড়িতে যেতেন।

—ও—এতক্ষণে তোমাকে চিনতে পেরেছি, মা। স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে সতীকান্ত আবার বললেন, তুমি বোধহয় আমাদের অজিতেশবাবুর কেউ হবে। শুনেছি, অজিতেশবাবু খোকাকে নাকি খুব স্নেহ করেন।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় স্মৃতিকণা, আমি তাঁরই মেয়ে।

—ও—আচ্ছা, আচ্ছা। হেসে জবাব দেন সতীকান্ত। তারপর একটু থেমে অনেকটা আবদারের সুরে আবার বললেন, তা'হলে তো তোমাকে এখনই যেতে দিতে পারি না, মা। তুমি এসেই চলে যাবে, তা' তো হয় না। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে আমার খোকা একা থাকে। তাকে তোমার বাবা স্নেহ করেন। সেই অজিতেশবাবুর মেয়েকে যখন হাতের কাছে পেয়েছি তখন তো তার সঙ্গে ভালমত আলাপ-পরিচয় না করে তাকে ছেড়ে দিতে পার না! তুমি কি বলো মা?

সর্বনাশ, এ আবার কোন বিপদে পড়লো স্মৃতিকণা? ঐ চাকর ছেলেটা এসেই তো সব ভেস্তে দিলে। নইলে এতক্ষণে সে এখান থেকে সরে পড়তে পারতো।

—আমি বরঞ্চ আর একদিন আসব। বলেই স্মৃতিকণা দু'পা পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করতেই সতীকান্ত বলে ওঠেন, তা' হয় না, মা। ঘরে এসে বস। একটু চা খাও। তারপর না হয় যেও। এরমধ্যে খোকা হয়ত এসেও পড়তে পারে।

বৃদ্ধ যদিও সহজভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু স্মৃতিকণার যেন লজ্জা রাখবার আর কোন ঠাঁই রইল না। ইস্, কি লজ্জা! এই বৃদ্ধ তার সম্বন্ধে মনে মনে কি ভাবছেন তা' তিনিই জানেন।

এই অবস্থায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করাও চলে না। অগত্যা সতীকান্তের পেছনে পেছনে তাকে এসে ঘরে ঢুকতে হয়।

স্মৃতিকণাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজে আর একটা চেয়ারে বসে সতীকান্ত বলতে থাকেন, আমার মুখে তোমার বাবার নাম শুনে খুব আশ্চর্য হয়েছো, না মা? সত্যিই তাই। তোমার বাবাকে যদিও আমি চিনি না, কিন্তু খোকার প্রতিটি চিঠিতে তাঁর সম্বন্ধে আমি এত খবর পেয়েছি যে, মনে হয় তিনি যেন আমার বহুকালের পরিচিত।

একটু থেমে সতীকান্ত আবার বলতে থাকেন, হ্যাঁ মা, তোমাদের পরিবারের সব খবরই আমি জানি। কিছুদিন আগে তোমাদের পরিবারে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল সে কথাও খোকা আমায় জানিয়েছে। পুলিশের গুলিতে তোমার একমাত্র ভাই মারা গেছে। খোকার চিঠির ভাষাতেই বুঝতে পেরেছি যে, ঐ ঘটনায় সে নিজেও কম বিচলিত হয়নি। তোমার ঐ ভাইটিকে খোকা নাকি খুবই স্নেহ করতো। তাই ওর পক্ষে বিচলিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। বিশেষ করে, তারই এক সহকর্মী নাকি এর জন্যে দায়ী।

স্মৃতিকণা মাথা নিচু করে সতীকান্তর কথা শুনছিল। এবার শঙ্করের প্রসঙ্গ উঠতেই মাথাটা আরও নিচু হয়ে পড়ে তার। ছল্ ছল্ করে ওঠে চোখ দু'টো।

সতীকান্ত কিন্তু স্মৃতিকণার মুখের ভাব লক্ষ্য না করে আপন মনে বলতে থাকেন, আমি কিন্তু মা, জবাবে খোকাকে লিখেছিলাম যে, এই ঘটনায় তার নিজেকে অপরাধী মনে করা মোটেই উচিত নয়। বিশেষ একজন ডাক্তারের অবহেলায় কোন রোগী মারা গেলে অন্য ডাক্তাররা হয়ত লজ্জিত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি তাদের পক্ষে নিজেদের অপরাধী

মনে করা উচিত? তা'হলে কি তারা এরপরে সুষ্ঠুভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে? আসল কথাটা কি জান মা, নিজের মনের কাছে নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ থাকতে হবে। অন্যে কে কি বলল সেটা আসল কথা নয়। তা'ছাড়া, অপরেও বা একজনের দোষে অন্যকে দায়ী কববে কেন? তুমি কি বলো, মা? কথার শেষে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে স্মৃতিকণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সতীকান্ত।

কি জবাব দেবে স্মৃতিকণা। এই প্রশ্নের জবাব কি জানা আছে তার? তাই যদি থাকতো, তবে কি সে সেদিন নিজেদের বাড়িতে বসে অমিতকে তেমনিভাবে অপমান করতে পারতো?

নিজেকে বড়ই স্বার্থপর মনে হতে থাকে স্মৃতিকণার। শঙ্কর ছিল তার নিজের ভাই। রক্তের সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে। তাই, তার সেই আকস্মিক মৃত্যুতে তার নিজের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক হয়ে থাকলেও সেই মুহূর্তে অমিতের মনের দিকেও একবার ফিরে তাকানো উচিত ছিল। আজ সতীকান্তের কথা শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল শঙ্করের মৃত্যুতে অমিত নিজেও তা'হলে কম আঘাত পায়নি। তাই সে তার মনের কথা চিঠির ভাষায় প্রকাশ করেছিল নিজের বাবার কাছে। সেদিন নিজেকে একটু সংযত রাখতে পারলে সে নিজেও হয়ত অমিতের মনের কথা টের পেত। কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেয়নি সে। তার একটি কথাও শোনার মত অবকাশ সেদিন তার ছিল না। একের দোষে অন্যকে শাস্তি দিয়েছিল। আর, এই মুহূর্তে তাকে সেই প্রশ্নই করেছেন সতীকান্ত। কি জবাব দেবে সে?

অনন্যোপায় স্মৃতিকণা সতীকান্তের প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে মুখ তুলে একটু ম্লান হেসে বলল, ওসব কথা থাক। আপনি আর ক'দিন থাকবেন এখানে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন সতীকান্ত, ইচ্ছে তো ছিল আজই চলে যাই, মা। কিন্তু খোকাই যেতে দিলে না। আরও দু'একদিন থেকে যেতে বললে। আমিও ভাবলাম এদিকে তো আর আসা হয় না। থাকি উত্তরবঙ্গে। একটু বিশেষ কাজ ছিল বলেই অনেকদিন পর এদিকে এসেছি। তা' খোকা যখন এত করে বলছে তখন না হয় আর দু'টো দিন থেকেই যাই।

ইতিমধ্যে ছোকরা চাকরটি চা নিয়ে এল। সেই সঙ্গে স্মৃতির জন্যে প্লেটে করে কিছু খাবার।

চাকরটির দিকে তাকিয়ে সতীকান্ত বললে, বাঃ চমৎকার! এর মধ্যে অতিথি সৎকারের বন্দোবস্তও করে ফেলেছো দেখছি। ছোকরা চাকরটি একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে কেবল।

চা খেতে খেতে স্মৃতিকণা বললে, একদিন আমাদের বাড়ি চলুন না? আপনাকে দেখে বাবা খুব খুশি হবেন।

—নিশ্চয়—নিশ্চয় যাব, সোৎসাহে বলে ওঠে সতীকান্ত, বেশ, কাল বিকেলের দিকেই না হয় তোমাদের বাড়ি যাব।

স্মৃতিকণা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে বাইরের দরজা ঠেলে অমিত ঘরে প্রবেশ করতেই সে থেমে যায়।

ঘরে ঢুকে স্মৃতিকণার দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়ায় অমিত। একমুহূর্ত স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্মৃতিকণাও নিজের অজান্তেই একবার মুখ তুলে তাকায়। চোখাচোখি হয় দু'জনের। চোখ নামিয়ে নেয় স্মৃতিকণা।

তারপর সতীকান্তর দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে অমিত বললে, তোমার জন্যে পরশু রিজার্ভেশান্ পাওয়া গেছে, বাবা।

—পেয়েছিস? ভালই হয়েছে। গাড়িতে যা ভিড়! রিজার্ভেশান্ ছাড়া ওদিকে যাওয়াই মুশকিল। বলেই সতীকান্ত স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন।

স্মৃতিকণাকে যেন লক্ষ্যই করেনি, এমনি একটা ভঙ্গিতে পোশাক পাল্টাতে পাশের ঘরে প্রবেশ করে অমিত।

অমিত চলে যেতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা। তারপর সতীকান্তর দিকে তাকিয়ে বললে, আমি তা'হলে আজ যাই। রাত হয়ে গেছে। আপনি কিন্তু কাল আমাদের বাড়ি যাবেন। আমি বাবাকে বলব।

—বেশ, 'তা' না হয় যাব। কিন্তু তুমি এখনই যাবে কোথায়? খোকার জন্যে তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। খোকা এল। আর তুমি তার সঙ্গে কথা না বলেই চলে যাবে?

লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে স্মৃতিকণার। ছি—ছি। পাশের ঘরেই অমিত রয়েছে। সে কি ভাবছে কে জানে?

একটা ঢোক গিলে স্মৃতিকণা জবাব দেয়, না, এমন কিছু নয়। উনি অনেকদিন আমাদের বাড়িতে যাননি। বাবা ওঁকে একবার যেতে বলেছেন। এই কথাটা বলতেই আমি এসেছিলাম।

—তুমি নিজেই ওকে সেই কথাটা বলে যাও না কেন, মা? বলেই সতীকান্ত অমিতকে ডাকেন, খোকা—খোকা, একবার এই ঘরে আয় তো।

ততক্ষণে পোশাক পাল্টে পাজামা-গেঞ্জি পরে নিয়েছে অমিত। স্মৃতিকণার কথা তার কানে গিয়েছিল। সতীকান্তর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে শান্ত অথচ গম্ভীরকণ্ঠে সে বললে, হ্যাঁ, যাব। সময়মত একদিন যাব।

স্মৃতিকণা কিন্তু আর একমুহূর্তও দাঁড়ায় না সেখানে। দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই সতীকান্ত তাকে পিছু ডাকে, সেকি মা! বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে, এখন তুমি একা যাবে নাকি?

জবাব দেয় অমিত, একা যখন আসতে পেরেছে তখন একাই যেতে পারবে, বাবা।

—না, তা' হয় না। ওকে এই অন্ধকারে একা কিছুতেই যেতে দিতে পারি না। ছোক্‌রাটা হেঁসেল আগলাচ্ছে। তুইও তো সারাদিন পরিশ্রম করে এসেছিস—

তারপর একটু ইতস্ততঃ করে আবার বললেন, আমিই না হয় ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—তা' কি করে হয়, বাবা? অমিত বললে, তুমি তো এখানকার রাস্তাঘাট কিছুই চেন না।

—কিন্তু তাই বলে ওকে একা ছেড়ে দিতে বলছিস!

একমুহূর্ত চুপ করে থাকে অমিত। তার মুখের অস্বাভাবিক কাঠিন্যটুকু একটুও শিথিল হয় না। তারপর সে জবাব দেয়, বেশ, তাহলে আমিই ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

—হ্যাঁ, তাই ভাল। খুশি হয়ে ওঠেন সতীকান্ত।

নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে চলছিল অমিত ও স্মৃতিকণা। কারুর মুখেই কোন কথা নেই। পাশাপাশি চললেও যেন একে অন্যের অপরিচিত। সেই মুহূর্তে দু'জনের মনের মধ্যে যে চিন্তা-স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কিন্তু একই।

সমস্ত পথটাই একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটছিল স্মৃতিকণার। অবশেষে নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

বাড়ির বাইরে গেটের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে অমিত। স্মৃতিকণাও দাঁড়ায়। রাস্তার ম্লান আলোয় অমিতের মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, ভেতরে আসবে না?

তেমনি মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, তার কি কোন প্রয়োজন আছে? গেট থেকে বাড়ির দরজা অবধি এই পথটুকু বোধহয় তুমি একাই যেতে পারবে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে স্মৃতিকণা বললে, হ্যাঁ, তা' পারব। শুধু এইটুকু কেন, সমস্ত পথটাই আমি একা আসতে পারতাম।

—তা' আমি জানি। কেবল বাবার অনুরোধেই তোমার সঙ্গে আসতে হল।

স্মৃতিকণা আর কিছু না বলে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। অমিতও একটু সময় চুপ করে থেকে বললে, আমি তা' হলে চললাম। বলেই আর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে দাঁড়ায়।

অমিতকে পেছন থেকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ গেটের সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিকণা। অবশেষে রাস্তার বাঁকের মুখে অমিত অদৃশ্য হয়ে যেতেই একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করে।

প্রথমটায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল অমিত। কাজের অছিলায় সতীকান্তর সঙ্গে অজিতেশ দত্তর বাড়ি যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল।

সতীকান্ত বলেছিলেন, তা'হলে তো আমার আর যাওয়া হয় না। আমি তো ওদের বাড়ি চিনিনা। তা'ছাড়া, তোর সঙ্গেই যখন ওদের আসল পরিচয় তখন আমার পক্ষে একা যাওয়াটা কি ভাল দেখায়?

অমিত আর কিছু বলে না। সতীকান্ত অনেকটা নিজের মনেই আবার বলেছিলেন, মেয়েটা বার বার যেতে বলে গিয়েছিল। আমিও কথা দিয়েছিলাম। ওরা হয়ত আমার জন্যে অপেক্ষা করবে—

—তা'হলে চলো, তোমাকে ওদের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে ঐ পথেই আমি আমার কাজে চলে যাব।

আগের দিন সন্ধ্যায় স্মৃতিকণার প্রতি অমিতের ব্যবহার কেমন যেন একটু বিসদৃশ ঠেকেছিল সতীকান্তর চোখে। আজ আবার তাদের বাড়ি যেতে অমিতের অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সন্দেহটা আরও দৃঢ় হয়েছিল তার। তাই, অমিতের কথায় তিনি বলেছিলেন, তোর এমন কি কাজ যে সামান্য দু'দশ মিনিটেই সব নষ্ট হয়ে যাবে? ভদ্রলোক তোকে স্নেহ করেন। এত করে যেতে বলেছেন। একটু সময় করে যেতে পারিস না?

অমিত আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করেই ছিল। অবশেষে বিকেল বেলা সতীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে সে এসে উপস্থিত হয়েছিল অজিতেশ দত্তর বাড়ি।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন অজিতেশবাবু। পরিচয়ের পালা শেষ হতেই তিনি সতীকান্তকে লক্ষ্য করে বললেন, বুঝলেন রায়মশাই, আপনার ছেলেটি তো আজকাল এদিকে আসা একরকম ভুলেই গিয়েছে।

—কেন বলুন তো? প্রশ্ন করেন সতীকান্ত। মনের সন্দেহটুকু আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

তাকে নিয়ে দুই বৃদ্ধের আলোচনার মাঝখানে চুপ করে বসে থাকা যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করে অমিত ঘর ছেড়ে আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

সতীকান্ত ও অজিতেশ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা বলতে থাকেন।

বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে অমিত। মাঝে মাঝে দুই বৃদ্ধের অস্পষ্ট কথা ভেসে আসছিল তার কানে। এই বাড়িতে এই মুহূর্তে তার উপস্থিতি নিজের কাছেই কেমন যেন একটু বিসদৃশ ঠেকছিল।

হঠাৎ পেছনে স্মৃতিকণার চাপা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে ফিরে তাকায় অমিত। অজিতেশের ঘরে চা ও জলখাবার পৌঁছে দিয়ে ফিরছিল স্মৃতিকণা।

অমিত ঘুরে দাঁড়াতেই তেমনি চাপাকণ্ঠে স্মৃতিকণা বললে, এসো।

এ তো সামান্য অনুরোধ নয়! এ যেন আদেশ। সেই আদেশ অবহেলা করার মত শক্তি ছিল না অমিতের।

একটু সময় স্থির চোখে স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত অমিত এসে প্রবেশ করে তার ঘরে।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু দরজাটা ভেজিয়ে দেয় স্মৃতিকণা।

অমিত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে নিরুত্তাপ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আমাকে ডাকলে কেন?

স্মৃতিকণাও অমিতের সামনে আর একটা চেয়ারে বসে তার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বললে, কাল বিকেলে তোমার ওখানে কেন গিয়েছিলাম, জানো?

চুপ করে থাকে অমিত।

স্মৃতিকণা নত মুখে মৃদুকণ্ঠে আবার বললে, ক্ষমা চাইতে। সেদিন তোমাকে যে অপমান করেছিলাম তারই জন্যে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম তোমার কাছে।

অমিতের ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে সে বললে, ক্ষমা? সেকি? পুলিশের মত একটা নিম্নস্তরের জীবের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলে তুমি? আর, এমন কি অপরাধ করেছিলে যার জন্যে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে ছুটতে হয়েছিল তোমাকে?

অমিতের মুখের দিকে বেদনা ভরা দৃষ্টি মেলে স্মৃতিকণা বললে, ঠাট্টাই করো, আর যাই করো, আমি সত্যি সত্যিই ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম তোমার কাছে।

বাধা দিয়ে অমিত বললে, না, ঠাট্টা করছি না। আমার ধারণা, তুমি এমন কোন অপরাধ করোনি যার জন্যে আমার কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

একটু থেমে সে আবার বললে, মনের অগোচরে পাপ নেই। নিজের অগোচরেই সেদিন সত্যি কথাটা বেরিয়েছিল তোমার মুখ থেকে। তাই, কোন অপরাধই তুমি করো নি। মনের কথা মুখে প্রকাশ করা অপরাধ নয়।

স্মৃতিকণা স্থির হয়ে অমিতের কথা শুনতে থাকে। সেই মুহূর্তে তার বলতে ইচ্ছে করে—না-না, তুমি ভুল বুঝো না আমাকে। সেদিনের কথা সত্যিই আমার মনের কথা নয়। তুমি শুধু আমার মুখের কথাই শুনেছ, মনের কথা জানতে পারোনি।

কাতর দৃষ্টিতে অমিতের দিকে তাকিয়ে স্মৃতিকণা বললে, সেদিন উত্তেজিত হয়ে যা' বলেছিলাম তা-ই কি তুমি সত্যি বলে ধরে নিয়েছো?

—ধরে নেব কেন? জবাব দেয় অমিত, সেটাই ছিল তোমার মনের কথা। তোমার কাছে, শুধু তোমার কাছে কেন, অনেকের কাছেই অমিত রায়ের কোন অস্তিত্বই নেই। সেখানে মানুষ অমিত রায় একান্তই গৌণ। পুলিশের দারোগা অমিত রায়ই হচ্ছে তার আসল পরিচয়। তাই

সেদিন অত সহজেই আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলে। তাই সেদিন পুলিশের ন্যায্য পাওনা দিয়েই বিদায় করেছিলে আমাকে।

অমিতের পুঞ্জীভূত অভিমানজ্বালা শাণিত বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশের পথ খোঁজে। আর, সেই বাক্যের তীক্ষ্ণ ফলাগুলো একে একে গিয়ে বিদ্ধ করতে থাকে স্মৃতিকণার মনটাকে।

প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করে স্মৃতিকণা জিজ্ঞেস করে, শুনলাম তুমি নাকি এখান থেকে বদলী হবার চেষ্টা করছো?

—হ্যাঁ, করেছিলাম, জবাব দেয় অমিত। ইচ্ছে করেই সে সেই প্রচেষ্টার ফলাফলের কথা চেপে যায়।

স্মৃতিকণা আরও কিছুক্ষণ নতমুখে কেবল টেবিলক্লথের উপর একমনে আঁচড় কাটতে থাকে। তারপর একসময় মুখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে অমিতের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি কি ভাবছো, এখান থেকে বদলি হয়ে চলে গিয়েই তুমি আমাদের ভুলতে পারবে?

জবাব দেয় অমিত, তা' জানি না। তবে মেকি ভালবাসার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এ ছাড়া আর কোন পথ আমার জানা নেই।

—মেকি ভালোবাসা? কি বলছো তুমি? প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে স্মৃতিকণা।

উত্তেজনায় নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে অমিতের। তার কণ্ঠদেশে যেন ভর করে কোন দুষ্ট সরস্বতী। সেই মুহূর্তে নিজের কথার তাৎপর্য যেন সে নিজেই ঠিক বুঝতে পারে না। অমিত জবাব দেয়, হ্যাঁ, মেকি ছাড়া আর কি? একটা নিষ্প্রাণ পুতুল নিয়ে খেলা করার মত এতদিন আমাকে নিয়ে খেলা করেছো তুমি। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলে পুলিশেরও প্রাণ আছে।

অমিতের কথায় স্মৃতিকণা নিজেকে আর সামলাতে পারে না। অমিতের মুখে এ ধরণের কথা সে কোনদিন শোনেনি। সে যে কোনদিন এত নিষ্ঠুর হতে পারে তা' ছিল তার স্বপ্নেরও অতীত। একটা প্রচণ্ড বেদনায় সেই মুহূর্তে বুকটা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছিল তার। অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বললে, না, ভুলে যাইনি যে পুলিশেরও প্রাণ আছে। তবে আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেই প্রাণ পাথরের মতই শক্ত। তাতে জীবনের কোন সাড়া নেই।

—কি বলতে চাইছো তুমি? কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে অমিতের।

তেমনি ধরা গলায় জবাব দেয় স্মৃতিকণা, অনুতপ্তকে ক্ষমা করতে যাদের বিবেকে বাধে, প্রিয়জনের অকালমৃত্যুতে দিশেহারা মানুষকেও যারা ক্ষমা করতে জানে না, তাদের প্রাণ যে কি ধাতুতে গড়া তা' বোধহয় একমাত্র ভগবানই জানেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তিহীন মানুষ যেমন হঠাৎ কোন কঠিন আঘাতে স্মৃতিশক্তি আবার ফিরে পায়, ঠিক তেমনি স্মৃতিকণার শেষের কথায় একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে যায় অমিতের মনের মধ্যে। সেই সুন্দর ছোট ছেলেটার মৃত্যু-প্রসঙ্গ অমিতকে আবার ফিরিয়ে আনে তার সত্যিকারের চেতনার রাজ্যে।

একি করেছে সে? কি বলেছে এতক্ষণ স্মৃতিকণাকে? কোথায় এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল তার স্বভাবের সেই স্নিগ্ধতাটুকু যা দিয়ে এতদিন সে সকলের মন জয় করে এসেছে? বিস্মৃতির কোন্ অতল তলে ডুবে গিয়েছিল তার সেই আজন্ম সাধনার ধন—ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম?

অমিত আর কথা বলে না। দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে কেবল ধিক্কার দিতে থাকে নিজেকে। স্মৃতিকণার মুখের দিকে তাকাবার সাহসটুকুও যেন আর অবশিষ্ট নেই তার।

স্মৃতিকণাও চুপ করে থাকে। একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে দু'জনের মধ্যে। আপন আপন চিন্তায় বিভোর একজোড়া নর-নারী যেন সেই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে তাদের কণ্ঠের ভাষা।

এমনিভাবেই কেটে যায় কিছু সময়। অবশেষে একসময় উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করতে করতে স্মৃতিকণা বললে, একটা অনুরোধ রাখবে?

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, বলো।

অমিতের সেই ছোট্ট জবাবের মধ্যে তার অভিমান-জ্বালার একটুও কিন্তু আর অবশিষ্ট ছিল না। নিজের হারিয়ে যাওয়া সত্তাকে ফিরে পেয়ে সেই সংযত স্বাভাবিক অমিত যেন আবার ফিরে এসেছিল নিজের মধ্যে।

স্মৃতিকণা তেমনি ভারি কণ্ঠে বললে, যে ক'দিন এখানে আছো সে ক'দিন অন্ততঃ বাবার কাছে মাঝে মাঝে এসো। চাপা মানুষ তিনি। সহসা মনের কথা মুখে প্রকাশ পায় না তাঁর। শঙ্করের মৃত্যুতে মনে মনে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন। তাই বলছিলাম, তুমি মাঝে মাঝে এলে তিনি ভাল থাকবেন। তোমাকে সত্যিই স্নেহ করেন তিনি।

মাথা নীচু করে জবাব দেয় অমিত, আমার বদলির দরখাস্ত নাকচ হয়ে গেছে, স্মৃতি। আপাততঃ এখানেই থাকতে হবে আমাকে।

কথাটা কানে যেতেই একপলকের জন্যে স্মৃতিকণার বিষণ্ণ মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললে, ও—!

অমিত মুখ তুলে স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে তার প্রসারিত হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে আবেগ কম্পিতকণ্ঠে আবার বললে, আমাকেও তুমি ক্ষমা করো, স্মৃতি। আমি এতক্ষণ তোমাকে যা বলেছি, বিশ্বাস করো, সে সব আমার মনের কথা নয়। এতক্ষণ নিজেকে কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। কি বলতে গিয়ে কি সব যা'-তা' বলে ফেলেছি তোমাকে। সব যেন কেমন—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সে থেমে যায়।

অমিতের উষ্ণ মুঠোর মধ্যে স্মৃতিকণার অবশ হাতটা একবার থর থর করে কেঁপে ওঠে। তার দু'চোখের কোল বেয়ে এতক্ষণে গড়িয়ে পড়ে জলধারা। ধরা গলায় সে বললে, আমি তা' জানতাম।

—তুমি জানতে? প্রশ্ন করে অমিত, তুমি জানতে আমি তোমাকে এতক্ষণ যা বলেছি তা' সত্যিই মনের কথা নয়?

—হ্যাঁ জানতাম। আঁচলের কোণে চোখ মুছে জবাব দেয় স্মৃতিকণা।

অকস্মাৎ মনটা হাল্কা হয়ে ওঠে অমিতের। একটা জগদ্দল পাথরের ভার যেন সহসা নেমে যায় তার বুকের উপর থেকে। তীব্র অভিমানে সে এতদিন স্মৃতিকণার কাছ থেকে যতই দূরে সরে যেতে চেষ্টা করুক না কেন, আসলে তার মনটা উদ্‌গ্রীব হয়েছিল স্মৃতিকণার সান্নিধ্য লাভের আশায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে স্মৃতিকণার মুখোমুখি হল, সেই মুহূর্তেই তার মনের ওপর আরো জোরে চেপে বসল সেই অভিমানের বোঝা। স্বভাববিরুদ্ধ অনেক কথা বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। স্মৃতিকণাও নিঃশব্দে মেনে নিল তার সমস্ত অনুযোগ।

তাই স্মৃতিকণা যখন বললে যে, সে জানতো অমিতের কণ্ঠে উচ্চারিত কথাগুলো তার মনের কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অমিতের মনের ওপর থেকে এতদিনের মান-অভিমানের-অভিযোগের কালো পর্দাগুলো একে একে সরে গিয়ে সেখানে ঝলমল করে উঠল প্রভাত রৌদ্র। মনটা খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠল। নতুন করে যেন সে চিনতে পারলো স্মৃতিকণাকে।

স্মৃতিকণার সুন্দর পেলব হাতে আর একটু চাপ দিয়ে অমিত আবেগময় কণ্ঠে বললে, তুমি—তুমি মানবী নও, স্মৃতি। তুমি—তুমি—

স্মৃতিকণার মুখের ওপরও ততক্ষণে প্রতিফলিত হয়েছে আলোয় রোশনাই। অমিতের কথায় তার ঠোঁটের কোণে দেখা দেয় একটু মিষ্টি হাসি। প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে হাল্‌কা কণ্ঠে সে বললে, মানবী নই তো আমি কি? দানবী নাকি?

স্মৃতিকণার সেই পরিহাসের সুরটুকু কানে পৌঁছায় না অমিতের। ভাব-বিভোর কণ্ঠে সে জবাব দেয়, না, না। মানবী দানবী কিছুই নও তুমি। তাদের অনেক ওপরে তোমার স্থান। তুমি দেবী।

অমিতের কথা শেষ হতেই দরজার বাইরে ঝিয়ের কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে, দিদিমণি—দিদিমণি। বাবু ডাকছেন।

হাত ছাড়িয়ে সশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা। তারপর চাপাকণ্ঠে বললে, বাবা ডাকছেন। আমি যাই।

—হ্যাঁ, বাবাকে নিয়ে আমাকেও এবার উঠতে হবে। বলেই নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমিতও উঠে দাঁড়ায়।

দরজার দিকে যেতে যেতে বিচিত্র গ্রীবাভঙ্গি করে স্মৃতিকণা বললে, আবার আসবে তো?

জবাবে অমিত বললে, হ্যাঁ, আসব বৈকি! তবে তোমার কাছে নয়, তোমার বাবার কাছে। বলেই একটু হাসে।

স্মৃতিকণাও হাল্‌কা হাসি হেসে বললে, হ্যাঁ, তাই এসো।

সেদিন রাতে অমিতের বাসায় বসে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম। থানা ডিউটির শেষে বাসায় ফিরে এসে ক্লান্ত অমিত বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। আর, আমি টেবিলের পাশে বসে একটা বাংলা মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে কথা বলছিলাম ওর সঙ্গে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমাকে হাতজোড় করে নমস্কার করতে দেখে বিস্মিত অমিত প্রশ্ন করে, ওকি, নমস্কার করছো কাকে?

জবাবে নিরীহ ভঙ্গিতে আমি বললাম, নমস্কার করছি তোমার সেই মানসীর ব-কলমে সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে।

হেসে অমিত বললে, হঠাৎ স্ত্রী-জাতির উপর এত সদয় হয়ে উঠলে যে?

—তার মানে, আমি বুঝি ওদের ওপর খুব নির্দয়?

—না—না, তা' নয়। তবে হঠাৎ এত নমস্কারের ঘটা কেন বুঝতে পারছি না।

ঘটা আর কি? অভিমানী সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ করবার ক্ষমতা তো সহজ ক্ষমতা নয়! অবশ্য ভগবান ওদের ঐ বিশেষ ক্ষমতায় ক্ষমতাবতী করেই মর্তে পাঠিয়েছেন। তাই ওদের নমস্কার করছি।

অমিত এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটু হাসে কেবল।

আমি আবার বললাম, আরে ভাই, আমি হচ্ছি পেশায় শিক্ষক আর নেশায় সাংবাদিক। আমার নজর এড়ানো কি এতই সহজ মনে করেছো? তোমার কথার ধরন, মুখের হাসিই প্রমাণ করছে যে, এতদিনে তুমি কোন একটা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছো। তবে সেই সন্ধির শর্ত কি, তা' অবশ্য আমার জানা নেই। সম্ভবত কোন চরম শর্তেই তোমাকে রাজী হতে হয়েছে, কি বলো?

বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে হাত দু'টো বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে মৃদু হাসছিল অমিত। আমার কথায় হাল্কা সুরে পাল্টা প্রশ্ন করে, চরম শর্ত মানে কি বলতে চাইছো তুমি?

—তার মানে কম্‌প্লিট্ সারেণ্ডার অর্থাৎ পাকাপাকি বন্দীত্ব। জবাব দিয়েই আমি হেসে উঠি।

অমিতও হেসে বললে, তা'হলে আর সন্ধি হল কোথায়? কমপ্লিট্ সারেণ্ডার মানে তো সম্পূর্ণ হেরে যাওয়া।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভদ্রভাষায় তাকে ঐ কথাই বলে। কন্‌সোলেশন্ আর কি! অনেকটা সাক্‌সেস্‌ফুল রিট্রিট্ ধরনের কথা—সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ।

অমিত আর কিছু না বলে কেবল তেমনিভাবেই হাসতে থাকে। আমি আবার বললাম, এখন বলো তো অমিত, তোমাদের বড়সাহেব সেদিন যদি তোমার বদলীর দরখাস্ত নাকচ না করতেন তো ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াতো?

—কি আর এমন হত? কৃত্রিম উদাসীনকণ্ঠে বললে অমিত, চলে যেতাম এখান থেকে।

—তা' তো বটেই! মনে মনে আফ্‌সোস করতে নিশ্চয়ই?

অমিত আর কোন জবাব দেয় না।

একটু সময় থেমে আমি আবার বললাম, এখন বলতে বাধা নেই, তোমার সেই বদলির দরখাস্ত কিন্তু স্বাভাবিক পথে নাকচ হয়নি। এর পেছনে এক ব্যক্তির হাত ছিল।

—কে সে? অমিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় আমার মুখের দিকে।

জবাবে আমি বললাম, তোমার পরিচিত এক ব্যক্তি।

—আরে, নামটাই বলো না।

—কেন, কৃতজ্ঞতা জানাতে চাও নাকি?

—আবার কৈফিয়ত তলব করতেও তো পারি?

হেসে বললাম, তা' পারো তো যাও, কৈফিয়ত তলব করো গিয়ে। তিনি হচ্ছেন আমাদের ভবদেব ব্যানার্জী।

—ও—তা'হলে তোমরাই একটা ষড়যন্ত্র করেছিলে? আর সেই ষড়যন্ত্রকারীদের পাণ্ডা হচ্ছেন আমাদের ও. সি.?

—না—না, বাধা দিয়ে আমি বললাম, সে সব কিছু নয়। একাধিক ব্যক্তি ছাড়া ষড়যন্ত্র হয় কি করে? যা' করেছেন ভবদেববাবু একাই করেছেন। আমাকে কেবল কথাটা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

আমি মাঝপথে থেমে যেতেই অমিত উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি বলেছিলেন তিনি?

জবাব দিই আমি, বলেছিলেন, সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, আউট অব সাইট্ আউট্ অব মাইণ্ড্। কাজেই অমিতকে এখন এখান থেকে কিছুতেই যেতে দেওয়া চলে না। ওকে যে করেই হোক আটকাতে হবেই। ঘর বাঁধার আগেই ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে আমরা নিরীহ দর্শকের মত চুপ করে থাকলে পাপের ফল আমাদেরও ভোগ করতে হবে।

কৃত্রিম গম্ভীরকণ্ঠে অমিত বললে, তাই বুঝি তিনি সোজা বড়সাহেবের কাছে গিয়ে আমার দরখাস্ত নাকচ করে দেবার সুপারিশ করে এলেন?

একটু থেমে আমি জবাব দিই, হয়ত তাই। ডিটেল্‌স্ আমি ঠিক জানি না। তবে ভবদেব ব্যানার্জীর মত একজন জাঁদরেল অফিসারের সুপারিশ যে তোমাদের বড়সাহেব অগ্রাহ্য করবেন না, সে তো জানা কথা।

অমিত আর কিছু না বলে বিছানায় উঠে বসে ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা হাই তুলে বললে, যাক গে, ওসব যেতে দাও এবার। কি খেতে চাও তাই আগে বলো।

আমি বললাম, কিছু না, শুধু এক কাপ চা।

—বেশ তাই খাও। বলেই ছোকরা চাকরটির খোঁজে সে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। আমিও হাতের মাসিকপত্রটার ওপর মনোযোগ দিতে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠি।

॥ পঁচিশ ॥

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ। আর শ্রেষ্ঠ বলেই হয়ত তার সম্পর্কিত সবকিছুই শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। এমনকি সংসারের আনাচে-কানাচে প্রতিনিয়ত যে পাপানুষ্ঠান প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে তার মধ্যে কোন কোনটির ভীষণতা সময় সময় নিম্নস্তরের পশুদেরও বোধকরি লজ্জা দিতে পারে। এখানেও নিঃসন্দেহে মানুষই শ্রেষ্ঠ।

আমি একবার ভবদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বড়বাবু, আমাদের দেশে অপরাধের সংখ্যা কি সত্যি সত্যি বেড়েছে, না কমেছে? আপনাদের ক্রাইম স্ট্যাটিস্টিক্স্ কি বলে?

হেসে জবাব দিয়েছিল ভবদেব, সংখ্যাতত্ত্ব যা-ই বলুক না কেন, তা' দিয়ে কি রোগের সত্যিকারের গভীরতা ধরা যায়, ভাই? স্ট্যাটিস্টিক্স্ নিয়ে দিল্লীর লোকসভায় আলোচনা চলতে পারে, রাজ্যের বিধানসভায় তর্কের ঝড় বইয়ে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে সমাজের পাপের আসল চেহারাটা ফুটে ওঠে বলে আমি মনে করি না। আসল কথাটা কি জানো? মানুষের মনে পাপের প্রতি অশ্রদ্ধা কমেছে। অপরাধপ্রবণতা সত্যিই বেড়ে চলেছে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ এখন আর সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে না। আর, এইটাই এখন সমাজ জীবনের আসল ব্যাধি। নইলে, সদানন্দ চৌধুরীর মত তোমাদের এই শহরেরই একজন অতি পরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আমাদের সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে কেন? আমি ঠিক জানি, এর পরেও সদানন্দ চৌধুরী দিব্যি মাথা উঁচু করেই সমাজে ঘোরাফেরা করবে। শহরের পরিচিত লোকেরা হেসে তার সাথে কথা কইবে। জিজ্ঞেস করবে, এই যে চৌধুরী মশাই, কেমন আছেন? শুধু তাই নয়, এর পরও রাতের অন্ধকারে আবার তাকে ঠিক ঐ পাড়ায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাবে।

আমি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেনি ভবদেব। সদানন্দ চৌধুরীর পয়সা আছে। তাই সে অন্যায় করেও সমাজে চিরকালই মাথা উঁচু করে থাকবে। পেছনে হাসি-ঠাট্টা করলেও সামনে দাঁড়িয়ে কেউ তার সেই জঘন্য কৃতকর্মের সমালোচনা করবে না। সে পাড়ার বারোয়ারী পুজোয় মোটা চাঁদা দেয়। পাড়ার লাইব্রেরী তার দানের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে থাকে। মা সরস্বতীর সঙ্গে তেমন একটা সম্বন্ধ না থাকলেও মা লক্ষ্মী তার সহায়। কাজেই পাড়ার লোকেরা মা লক্ষ্মীর এই বরপুত্রটিকে অনাদর কিংবা অবজ্ঞা করবে কোন্ সাহসে?

সদানন্দ চৌধুরী শহরের সবচাইতে ভাল ও বড় চার-পাঁচটা কাপড়ের দোকানের মালিক। ছেলেরা বড় হয়েছে। তারাই এখন ব্যবসা দেখাশোনা করে। সদানন্দ আজকাল প্রায় সবসময় বাড়িতেই থাকে। কেবল রাতের বেলা দু'তিন ঘণ্টার জন্যে বাইরে বেরোতে হয় তাকে। সেইসময় তার কলপ-মাখা সাদাচুল পাটকরে আঁচড়ানো থাকে। গায়ে থাকে গিলে করা

আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে কালো গ্লাস্‌কিডের চক্‌চকে পাম্প-সু। সারা দেহে আতরের গন্ধ। এই বেশে রিক্সায় চেপে প্রতিদিন তাকে একটি বিশেষ পল্লীতে যেতে দেখা যায়। দু'তিন ঘণ্টা পরে আবার ঐ রিক্সাতেই সে বাড়ি ফেরে।

সদানন্দর এই অভ্যাসটি আজকের নয়। বহুদিনের। তাই পুত্র কিংবা পুত্রবধূদের কোন অনুরোধ-উপরোধই এই নেশা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি তাকে। সেই পল্লীতে সদানন্দর বাঁধা ঘর থাকলেও এই বয়সেও নতুনের আহ্বানে সাড়া দিতে সে সর্বদাই উন্মুখ। তার জন্যে পয়সা খরচ করতেও মোটেই ইতস্ততঃ করে না সে।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। পায়ে নতুন পাম্প-সুর মশ্‌-মশ্‌ শব্দ তুলে সদানন্দ চৌধুরী এসে গলির মুখে দাঁড়ায়। সেখানেই অপেক্ষা করছিল রিক্সাওয়ালা। রিক্সার সিটের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে ছিল বাবুর অপেক্ষায়। সদানন্দর জুতোর শব্দে ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসে নেমে দাঁড়ায়। তারপর অভ্যাসমত বলে, আসুন বাবু।

সদানন্দ রিক্সায় উঠতে যাবে ঠিক এমনি সময় আবছা অন্ধকারে একটি নারী মূর্তি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, বাবু।

—কে? পেছন ফিরে তাকায় সদানন্দ।

—আমি—আমি টগর। জবাব দেয় সেই নারীমূর্তি।

—ও—টগর! টগর বাড়িউলী? তা' কি মনে করে?

—একটু কথা ছিল, বাবু।

—বেশ তো। বল্‌ না কি কথা?

টগর বাড়িউলী কিন্তু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

সদানন্দ তার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে আবার বললে, কিরে, বল্‌ না, কি বলতে চাইছিস?

—একটু এদিকে আসুন, বাবু। বললে টগর।

সদানন্দ বুঝতে পারে রিক্সাওয়ালার সামনে সে কিছু বলতে চায় না। তাই সে টগরের পিছে পিছে একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বল্‌ এবার।

টগর বাড়িউলী সদানন্দর আরও একটু কাছে সরে এসে চাপাকণ্ঠে কি যেন বলতে থাকে।

শুনতে শুনতে চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সদানন্দর। লোভের আগুন ঠিক্‌রে বেরোয় তার চোখ থেকে। একটু বিকৃত হাসি হেসে চাপাকণ্ঠে বললে, এই জন্যেই তোকে আমার এত ভালো লাগে, টগর। বেশ তাই হবে। কাল একটু বেশি রাতেই আমি তোর বাড়ি আসব। সব ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে।

—তা' আর বলতে! গদগদ সুরে জবাব দেয় টগর।

—আর, এই নে। এটা রাখ তোর কাছে। বলেই সদানন্দ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একতাড়া নোট বের করে পাঁচখানা দশটাকার নোট তুলে দেয় টগরের হাতে।

টাকাটা হাতে নিয়ে কৃতার্থ হবার ভঙ্গিতে একটু হাসে টগর।

এমনিভাবেই সভ্য-সমাজের নাকের ডগায় বসে একজন সম্পদশালী বৃদ্ধ একটি আনকোড়া নারীদেহ বেচাকেনার ব্যবস্থায় খুশি হয়ে মুখে চোখে কুৎসিত লালসার আগুন ফুটিয়ে রিক্সায় উঠে বসে।

সেই হতভাগিনীর নাম লছমী। বছর ষোল-সতের বয়স। সুন্দর গোলগাল দেহাতি গড়ন। চেহারায় তেমন জৌলুস না থাকলেও একটি সুন্দর গ্রাম্যশ্রী বর্তমান। দেশ তার মজঃফরপুর জেলার কোন এক গ্রামে। মাত্র ছ'মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে মহীন্দরের সঙ্গে।

মহীন্দর একটু খিট্‌খিটে প্রকৃতির পুরুষ। ক্ষেতির কাজ নিয়ে সে প্রায়ই খিট্‌মিট্ করতো লছমীর সঙ্গে। অবশেষে একদিন সেই খিটিমিটি যখন ঝগড়ায় পরিণত হল, সেদিন লছমী কাউকে কিছু না জানিয়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়ল তার ভেইয়ার উদ্দেশে।

তার ভেইয়া অর্থাৎ ভাই থাকে কলকাতায়। সংসারে ঐ ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না তার। গাঁয়ের মেয়ে লছমী কলকাতাকে ভেবেছিল তার ছোট্ট গাঁয়ের মতই। মনে করেছিল, ঠিকানা ছাড়াই সে তাকে খুঁজে নিতে পারবে। সেই উদ্দেশ্যেই সে একখানা কলকাতাগামী ট্রেনে চেপে বসেছিল।

ট্রেনের মেয়ে-কামরাতে তার আলাপ হয়েছিল একজন বয়স্কা স্ত্রীলোকের সঙ্গে। স্ত্রীলোকটির সারা গায়ে গহনা, পরনে ফর্সা শাড়ি, চোখে সুর্মার রেখা। কথাবার্তায় বিশেষ পটু সেই স্ত্রীলোকটি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে ভাব করে ফেললে লছমীর সঙ্গে।

লছমীর কথায় স্ত্রীলোকটি হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, ক্যাঁ, তুম পাগল হো গই? কলকাত্তাকো তুমহারি ছোটী গাঁও সম্‌ঝি হ্যায়? পত্তা বিনা তুম আপনা ভাইকো খোঁজ নিকালোগি?

—তো ক্যাঁ, ভেইয়াকা খোঁজ নেহি মিলেগা?

—নেহি বহিন, নেহি। পহলে পত্তা লাগাও। তব না খোঁজ মিলেগা।

—লেকিন—। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে যায় লছমী। এতক্ষণ তার ধারণা ছিল কলকাতায় গিয়েই সে ভাইয়ের খোঁজ পাবে। তাই স্ত্রীলোকটির কথায় একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, তবে ক্যাঁ হোগা?

স্ত্রীলোকটি চঞ্চল দৃষ্টিতে আশপাশের পরিবেশটা দেখে নেয় একবার। তারপর লছমীর আরও একটু গা ঘেঁষে বসে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠে বললে, কুছ ডর্ নেহি বহিন। ম্যাঁয় তুমহারি ভাইকো খোঁজ কর তুম্‌কো উসকে পাশ পঁহুছা দুঙ্গী। লেকিন, দো-চার রোজ দের হোগি।

—মগর, এ সময় তক্ ম্যাঁয় রহুঙ্গী কঁহা? বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে লছমী।

—কোই চিন্তা নেহি বহিন, স্ত্রীলোকটি আশ্বাস দেয় তাকে, কলকাত্তাকে নজদিগ্ মেরি এক বহিন রহতি হ্যাঁয়। উস্‌কি সাথ তুম খুশীসে দো-চার রোজ রহ সকতি হো। পিছে আপনা ভাইকো খোঁজ মিলনেসে উস্‌কা পাস চলা যায়গি।

এতক্ষণে একটু আশার আলো চোখে পড়ে লছমীর। ভগবান বিপদে মানুষকে এমনিভাবেই সাহায্য করেন মনে করে 'রামজী'কে স্মরণ করে সে। সেই মুহূর্ত থেকেই অবলম্বনহীন লছমীর কাছে সেই স্ত্রীলোকটি হয়ে ওঠে প্রধান অবলম্বন।

হাওড়া স্টেশনের আগেই সেই স্ত্রীলোকটি লছমীকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়ে। তারপর, তাকে টগর বাড়িউলীর হাতে সঁপে দিয়ে মোটা কিছু দক্ষিণা শাড়ির আঁচলে বেঁধে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

লছমী দেহাতি বালিকা হলেও নারী। তাই নারীর স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই দু' একদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে সে কোথায় এসেছে। কিন্তু তখন সে নিরুপায়। তার বাঁধন-হারা চোখের জল মোটেই টলাতে পারে না টগর বাড়িউলীকে। এ লাইনে এমনি আন্‌কোড়া মেয়েদের চোখের জল সে জীবনে অনেক দেখেছে। পরে আবার তারাই তার হাতদু'টো জড়িয়ে ধরে বলেছে—তোমার জন্যেই এখনও দু'টো করে খাচ্ছি, মাসি। নইলে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে?

সদানন্দ চৌধুরীর বয়স ষাটের ওপর। আর, লছমীর মাত্র সতের। সেদিন গভীর রাতে সেই নিষ্পাপ অসহায় মেয়েটা সদানন্দের পা ধরে অনেক কান্নাকাটি করেছিল। অনেক

অনুনয়-বিনয় করেছিল তাকে। কিন্তু ভবি ভোলেনি। এমন সুযোগ কদাচিৎ পাওয়া যায়। তা'ছাড়া সদানন্দ পয়সা খরচ করে টগরের কাছ থেকে যে সুযোগ কিনেছিল, ঐ দেহাতি মেয়েটার কয়েক ফোঁটা চোখের জল কি করে তা নষ্ট করে দিতে পারে?

কাজেই, সেদিন রাতে সেই পল্লীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরও একটি নিষ্পাপ বালিকার চরম সর্বনাশ হয়ে গেল।

কয়েকজন দাগী আসামীর খোঁজে সেদিন শহরের গণিকাপল্লীতে ব্লক্ রেইড় অর্থাৎ পুলিশের হানা দেবার ব্যবস্থা করেছিল ভবদেব। দেহ ব্যবসায়িনীরা পুলিশের এই হানাকে বড়ই ভয় করে। এতে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খদ্দেররা দু'চার দিন এ পথ মাড়ায় না।

গভীর রাতে পুলিশ বাহিনী সমস্ত পল্লীটাকে ঘিরে ফেলেছিল। তারপর ভবদেব ও অমিত সেই দাগী আসামীর খোঁজে একে একে প্রতিটি ঘরে তল্লাসী চালাচ্ছিল।

পল্লীর এক প্রান্তে যখন এমনি কাণ্ড চলছিল, তখন ঠিক অন্যপ্রান্তে টগরের বাড়িতে চরম সর্বনাশ হচ্ছিল সেই দেহাতি মেয়েটার। সদানন্দ কিম্বা টগর কেউই পুলিশের আগমন টের পায়নি।

অবশেষে সদানন্দ যখন উৎফুল্ল মনে টগরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলিপথে নিজের রিক্সার দিকে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল ভবদেব ও অমিতের সঙ্গে।

পুলিশ দেখে প্রথমটায় চমকে উঠেছিল সদানন্দ। ভয়ও পেয়েছিল। পুলিশকে তো বিশ্বাস নেই। গণিকাপল্লীতে যাতায়াত সমাজের চোখে অপরাধ হলেও আইনের চোখে নয়। আর আইনের বিধানমত চলাই হচ্ছে পুলিশের কাজ। তবুও এদের বিশ্বাস করা চলে না। হয়ত এই ডামাডোলের মধ্যে তাকেও নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেবে। বলা তো যায় না কিছু!

আবছা অন্ধকারে টর্চের আলোয় সদানন্দকে চিনতে পেরে ভবদেব শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, এই যে চৌধুরীমশাই, আপনিও যে আজ ধরা পড়ে গেলেন। বয়স তো অনেক হল, এখনও এই বদ-অভ্যাসটা ছাড়তে পারলেন না?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে স্যার! মুখে একটা অপ্রতিভ হাসি ফুটিয়ে তুলে আমতা আমতা করতে থাকে সদানন্দ।

—আজ তা'হলে থানায় চলুন, কি বলেন চৌধুরী মশাই? মুচকি হেসে ভবদেব আবার বললে।

ভয়ে আঁৎকে ওঠে সদানন্দ। হাত কচলে কাঁচুমাচু মুখে বললে, আজ্ঞে স্যার—আমি—আমি তো কোন অন্যায় করি নি স্যার। এই রাতের ঝোঁকে একটু-আধটু—

—থাক্; আর বলতে হবে না আপনাকে। বলি, বয়সটা কি বাড়ছে না কমছে?

লজ্জিতকণ্ঠে জবাব দেয় সদানন্দ, তা' ঠিক স্যার। এই আপনাকে কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন এদিকে আসব না, স্যার—

—ধরা পড়ে এমনি কথা তো আপনি অনেকবার দিয়েছেন, চৌধুরী মশাই। আর তো আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি না।

—না স্যার। এবারের মত ছেড়ে দিন। আর কোনদিন আসব না।

—ঠিক তো? হাসি চেপে প্রশ্ন করে ভবদেব।

—হ্যাঁ, স্যার। দয়া করে আর একটি বার সুযোগ দিন। আর কখনও—।

—বেশ, এবার ছেড়ে দিচ্ছি। এর পরের বারে কিন্তু আপনাকে থানায় যেতেই হবে, বুঝলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার—। বলতে বলতে ত্রস্ত পায়ে সেখানে থেকে সরে পড়ে সদানন্দ।

সদানন্দ অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই ভবদেব হেসে অমিতকে বললে, পার্‌ভারশান্—বুঝলে অমিত, স্রেফ পার্‌ভারশান্। মরতে বসেছে তবুও নেশা ছাড়ে না। দেখে রাখো ভাই, চিনে রাখো। আমাদের সমাজের এই রূপটির সাথেও পরিচয় করে রাখো, বুঝলে? সাক্‌সেস্‌ফুল পুলিশ অফিসার হতে হলে সব কিছু দেখতে হবে, বুঝতে হবে, চিনতে হবে।

টগর বাড়িউলীর বাড়িতে গিয়েই কিন্তু দেখা হয় লছমীর সঙ্গে। মেয়েটা তখন বিছানায় উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

টগরকে প্রশ্ন করতেই টগর একটা ঢোক গিলে কম্পিতকণ্ঠে জবাব দেয়, আজ্ঞে ওর নাম লক্ষ্মী। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বেচারী সেই সন্ধ্যে থেকে পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। তাই কাঁদছে।

—ও—তাই বুঝি? ভবদেব বললে, কোন ব্যাটাছেলে নেই তো বাড়িতে?

—আজ্ঞে, না স্যার। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় টগর।

—কোন দাগী আসামীকে লুকিয়ে রাখো নি তো এখানে?

—না, স্যার। খুঁজে দেখতে পারেন। মিথ্যে বললে দশ ঘা জুতো খাব, স্যার।

বাইরে যাবার জন্যে ভবদেব ও অমিত সবে পা বাড়িয়েছে। অকস্মাৎ আলুথালু বেশে লছমী এসে তাদের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, মুঝে বাঁচাও, বাবুজী—মুঝে বাঁচাও। ইস্ নরকসে মুঝে মুক্ত্ কর দো।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়ে অমিত। এমনি একটা ব্যাপারের সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়।

ভবদেব কিন্তু দু'পা পিছিয়ে যায়। তারপরই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে টগরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, এই দেহাতি মেয়েটা বুঝি তোমার আত্মীয়?

টগরের মুখে আর বাক্যস্ফূরণ হয় না। মাথা নীচু করে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভবদেব তখন লছমীর দিকে তাকিয়ে দরদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তুম কোন্ হো, বেটী?

—ম্যাঁয়—ম্যাঁয়—! কথাটা শেষ করতে পারে না লছমী। ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে।

অমিতকে দাগী আসামীর খোঁজে পাঠিয়ে ভবদেব নিজে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে লছমীর কাহিনী—এক তরলমতি বালিকার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কাহিনী—সমাজের আনাচে-কানাচে যে সব বিষধরেরা লুকিয়ে অসহায় নারীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে বেড়ায়, তাদের কাহিনী।

অবশেষে ভবদেব একসময় তাকায় টগর বাড়িউলীর মুখের দিকে। অস্বাভাবিক গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করে, লোকটা কে?

—আজ্ঞে, স্যার—। জবাব দিতে গিয়ে অকস্মাৎ থেমে যায় টগর। সদানন্দর নামটি বলে দেওয়ার অর্থই হল অমন সরেস খদ্দেরটিকে বরাবরের মত হাতছাড়া করা। তাই তার নামটা মুখে এলেও বলতে পারে না টগর।

—কি, থেমে গেলে কেন? কে সেই লোকটা?

—আজ্ঞে—আজ্ঞে, তার কোন দোষ নেই, স্যার। তিনি তো খদ্দের। পয়সা খরচ করে এসেছেন। তিনি কি করে এত জানবেন?

—চুপ কর, বেয়াদপ। রাগে ফেটে পড়ে ভবদেব, পয়সা খরচ করেছে বলেই একটা অসহায় মেয়ের সর্বনাশ করবার অধিকার জন্মেছে তার, তাই না? কি নাম সেই লোকটার?

একটু সময় চিন্তা করে মৃদুকণ্ঠে টগর সদানন্দর নাম বলতেই ভবদেব বলে ওঠে, ও—সেই বুড়ো শকুনটা? তাই বুঝি লোকটা তখন অমন তড়বড় করে ছুটে পালালো?

সেই রাতেই তিনশো ছিয়াত্তর ধারার মামলায় গ্রেপ্তার হল সদানন্দ চৌধুরী। পুলিশ-হাজতে ঢুকতে হল টগর বাড়িউলীকেও। ধনী সদানন্দ চৌধুরী বড় বড় উকিল, এ্যাডভোকেটের চতুর যুক্তিজালের সাহায্যে জামিনে ছাড়া পেল, আর টগর বাড়িউলীকে পাঠানো হল জেল-হাজতে।

মামলার তদন্ত সময়সাপেক্ষ। সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করে উপযুক্ত প্রমাণসহ একটি মামলা বিচারের জন্যে আদালতে পাঠাতে পুলিশকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

খবর পেয়ে লছমীর স্বামী মহীন্দর তার দু'জন দেশওয়ালী ভাইকে নিয়ে হাজির হল থানায়। ততদিনে, লছমীকে পাঠান হয়েছে একটা রেস্‌কিউ হোমে।

ভবদেবের কথায় মহীন্দর গোম্‌ড়া মুখে মাথা নেড়ে বললে, ঐ আউরৎকো ক্যাঁয়সে ঘরমে লে যানে সক্‌তা, বাবুজী।

ভবদেব প্রশ্ন করে, কিঁউ?

জবাবে মহীন্দর বললে, মুঝে মাফ্‌ কিজীয়ে, বাবুজী। যিসকা ধরম্‌ নষ্ট্‌ হুয়া উস্‌কো লেকর ম্যাঁয় ক্যাঁ করেগা?

সেই সনাতন সমস্যা। যুগ যুগ ধরে হিন্দুসমাজ যে সমস্যার সমাধান আজও খুঁজে পায় নি, সেই সমস্যা। অপবিত্রতার অপবাদে সমাজ যাদের পতিতালয়ে গিয়ে ভিড় বাড়াতে সাহায্য করে, সেই সহায়-সম্বলহীনা হতভাগিনীদের সমস্যা।

লছমীর বরাতেও হয়ত তাই জুটবে। একমুহূর্তের ভুলে তাকেও হয়ত শেষপর্যন্ত দাঁড়াতে হবে অন্য কোন বাড়িউলীর দরজায়। এরপর, আরও কত সদানন্দ এসে জুটবে তার সেই ছোট কুঠুরীতে মধুলোভী মৌমাছির মত। তখন কিন্তু আর কাউকে ফেরাবে না লছমী। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই সেই সদানন্দদের খাতির-যত্ন করতে হবে তাকে। মদির কটাক্ষ হেনে ভোলাতে হবে তাদের।

আর সদানন্দ চৌধুরীর? না, তার হয়ত কিছুই হবে না। স্বয়ং ভবদেবের মত তদন্তকারী অফিসার সদানন্দর বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করলেও আদালতে গিয়ে হয়ত সে মুক্তি পাবে। কারণ, তার পয়সা আছে। কলকাতা থেকে বাঘা বাঘা উকিল-ব্যারিস্টার নিয়ে এসে কথার মারপ্যাঁচে বিচারকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে কতক্ষণ? আর, বিচারকের মনে একবার সন্দেহের ছোঁয়া লাগলে অপরাধীরই লাভ ষোল আনা। তাইতো 'বেনিফিট্‌ অব্‌ ডাউট্‌, শব্দটি এখনও চালু রয়েছে এদেশে। এই ছিদ্রপথেই কতশত অপরাধী আইনকে ফাঁকি দিয়ে বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খোঁজ কে রাখে?

এমনি ধরনের একটা কথাই একদিন বলেছিল ভবদেব। কথা হচ্ছিল দেশের আইন ও বিচার-ব্যবস্থা নিয়ে। আমাদের দেশের বিচার-ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আমি বলেছিলাম, ব্রিটিশরাজশক্তি সত্যিই যদি আমাদের দেশে কোন ভাল কাজ করে গিয়ে থাকে তবে তা' হচ্ছে দেশের বর্তমান বিচার-পদ্ধতির প্রবর্তন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সরকার বাহাদুর পর্যন্ত কোন কাজে হাত দেবার আগে আদালতের কথা স্মরণ করে নেয়। বিচার-বিভাগ কাউকে খাতির করে না। খোদ্‌ গভর্নমেন্টকেও না। আইনের মর্যাদা রাখতে গিয়ে সময় সময় গভর্ণমেন্টের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দিতে তারা দ্বিধা করে না।

আমার কথার কোন প্রতিবাদ করেনি ভবদেব। একটু হেসেছিল কেবল।

আমি বলেছিলাম, ও কি, হাসছেন যে?'

—না, ও কিছু না। এমনি।

—না, এমনি নয়, বলেছিলাম আমি, আপনি বোধহয় আমার কথায় ঠিক সায় দিতে পারছেন না। তাই না, বড়বাবু?

একটু সময় চুপ করে থেকে বলেছিল ভবদেব, সত্যি সংবাদ-প্রভাকর, তোমাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। একথা একশ' বার সত্যি যে, দেশের এই ডামাডোলের বাজারে এখনও যদি কোন বিভাগের ওপর কিছু ভরসা রাখা চলে, তা' হচ্ছে এই বিচার-বিভাগ। কিন্তু সেখানেও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। একশ'টি দোষী ব্যক্তি শাস্তি এড়িয়ে যাক্ ক্ষতি নেই, কিন্তু একজন নির্দোষ ব্যক্তিও যেন শাস্তি না পায়—আইনের এই মহান আদর্শ পরিবর্তনের বোধহয় সময় এসেছে। দেশের যা বর্তমান পরিস্থিতি, হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, নীচতা, লোভ, অনাচার প্রভৃতি পাপের আগুনে সমাজজীবন যেখানে জর্জরিত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছে, সেখানে আইনের আদর্শ হওয়া উচিত—একশ'টি নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পাক ক্ষতি নেই, কিন্তু একজন অপরাধী ব্যক্তিও যেন শাস্তি এড়িয়ে যেতে না পারে। কথাটা শুনতে নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগছে তোমার। হয়ত আমার এই মনোভাবকে ফিউডাল্ যুগের মনোভাব বলে ঠাট্টা করবে তুমি। কিন্তু ভাই, আমি নিরুপায়। আইনের মর্যাদা রাখতে গিয়ে যে সত্যের মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে সেদিকে নজর দিচ্ছে কে? আইনের মর্যাদার চাইতেও সত্যের মর্যাদা নিশ্চয়ই বড়। আইন পরিবর্তনশীল, কিন্তু সত্য শাশ্বত। আইনের কচকচির ফাঁকে প্রকৃত অপরাধী যে আইন ও সত্য উভয়কেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরে পড়বে তা, বন্ধ করতেই হবে। তাতে যদি দু'দশটা নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পায় তো সমাজকে সেই ক্ষতি হাসিমুখেই মেনে নিতে হবে। নইলে দিনে দিনে আমাদের সমাজজীবন যে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। মানুষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে, অপরাধীকে শাস্তি পেতে হবেই। কিছুতেই তার নিষ্কৃতি নেই। কোন উকিল, ব্যারিস্টারের কৌশল কিম্বা আইনের কোন ব্যাখ্যা, কিছুই তাকে অব্যাহতি দিতে পারবে না।

যার যেমন ভাবনা, তার সিদ্ধিলাভও হয় ঠিক তেমনি। সাব ইন্‌স্‌পেক্টর পিনাকী সরকারের বদলির আদেশ এসেছে। বদলী হয়েছে তার এমন একটি জায়গায় যেখানে কাজকর্ম তেমন কিছুই নেই। সারাদিনে ঘণ্টা দু'য়েক কাজ করলেই যথেষ্ট, তাও আবার বসে বসে লেখাপড়ার কাজ। মামলার তদন্ত নেই, নাইট ডিউটি নেই, চোর-ডাকাতের পিছু পিছু ছুটোছুটিও নেই। নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবন।

পিনাকী খুব খুশি। এমনি একটি জায়গাতেই সে পোস্টিং চেয়েছিল যেখানে শুয়ে-বসে দিন কাটবে তার। ভাবনা কিম্বা দুশ্চিন্তা কিছুই থাকবে না। অবশ্য এমন জায়গায় বদলী অনেকের পছন্দ নয়। কাজের মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় বিশ্রামের কল্পনা সুখকর হলেও নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম অনেকের জীবনেই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কেউ চায় না অন্য একটি বিশেষ কারণে। কাজ না থাকা মানেই দায়িত্বও না থাকা। আবার দায়িত্ব না থাকলে দু'টো বাড়তি পয়সা আগমনের পথও বন্ধ। কাজেই এমন একটা পোস্টিং তাদের কাছে অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিনাকী সরকারের ক্ষেত্রে এদু'টো কারণের একটাও প্রযোজ্য নয়। সে চায় স্রেফ শুয়ে-বসে কোনরকমে দিন কাটিয়ে দিতে। পরিশ্রম করতে সে একেবারেই নারাজ।

কিন্তু খবরটা কানে যেতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে বাসন্তী। তার মতে একেই তো তার স্বামীটি একটি অকর্মার ধাড়ী। আখের গুছিয়ে নেবার ফন্দীফিকিরে দিকে মন নেই। তবুও বলে-কয়ে অন্যের উপমা দিয়ে যদিও বা একটু তাতিয়ে তোলা যেত, তার সম্ভাবনাও আর থাকবে না ঐ নিরামিষ জায়গায় গিয়ে। চিরকাল ঐ মাইনের টাকা ক'টার ওপর ভরসা করেই কেবল থাকতে হবে।

তাই পিনাকী যখন একদিন কথায় কথায় বললে—যাক, ভালোই হল। দু'টো বছর এই কোতোয়ালী থানার মত হেভী থানায় যে কি করে কাটলো, তা' একমাত্র ভগবানই জানেন। এবার অন্ততঃ একটু হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করা যাবে—তখন আর নিজেকে সামলাতে পারিনি বাসন্তী। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, ইস্, এই দু'টো বছর খেটে খেটে হাড় ক'খানা একেবারে কালি হয়ে গেছে তোমার! এবার যাও নিশ্চিন্ত মনে একটু বিশ্রাম কর গিয়ে।

পিনাকী স্ত্রীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাকলেও বাসন্তী কিন্তু সেখানেই থামে না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলতে থাকে, এতই যদি শখ ছিল তো পুলিশের চাকরিতে না ঢুকে কেরানীগিরি করলেই পারতে?

পিনাকী হাল্‌কা সুরে জবাব দেয়, তা'হলে কি আজ তুমি দারোগার বউ বলে নিজের পরিচয় দিতে পারতে?

—রেখে দাও তোমার দারোগার বউ! যখন বিয়ে হয়েছে তখন তো ছিলে কনস্টেবল্। সেদিন আমায় যতটা সুখে রেখেছিলে আজ কি তার চাইতে বেশি সুখে রেখেছো নাকি? সেদিন তোমার পঁচিশ টাকা মাইনেতেও যা' ছিলাম, আজ তোমার তিনশ'তেও তাই আছি। সেদিনও সংসার চালাতে যা' কষ্ট পেতাম, আজও তাই পাচ্ছি। তবুও তো বরাত ভালো, পেটে একটা ধরিনি, তা'হলে তো ভিক্ষে করতে হত।

—কেন, ভিক্ষে করতে হত কেন? এই মাইনেতে কেউ সংসার চালায় না।

—কে চালায়, দেখাও দেখি? চ্যালেঞ্জ জানায় বাসন্তী, ঐ যে বুড়ো শ্রীপতিবাবু, সেও কি কম উপরি আয় করে? নইলে এ. এস্. আই.-য়ের মাইনেতে অতগুলো পোষ্যকে সামলাচ্ছে কি করে? কত লোক জমিজমা, বাড়িঘর করে ফেললে চাকরি করতে করতে, আর তুমি রইলে ধোয়া তুলসী গঙ্গাজল হয়ে। সৎ—সৎ অফিসার! অমন সততার মুখে আগুন! বলেই মুখ ঝামটা দিয়ে সেখান থেকে সরে যায় বাসন্তী।

এমনিতে যাই হোক না কেন, বাসন্তী খুব মিশুক প্রকৃতির স্ত্রীলোক। সকলের বাড়িতেই সে যেত, সকলের খবরাখবরই সে নিত। তাই, পিনাকী ও বাসন্তী যেদিন তাদের মালপত্র নিয়ে সরকারি কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যায়, সেদিন থানার অফিসারদের অন্দরমহলে সত্যিই একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। সবাই অনুভব করেছিল তার অভাব।

যাবার আগে জুনিয়র এ. এস্. আই. সুশান্তর স্ত্রী রেখা বাসন্তীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিল, আপনি তো শুনছি ভালো জায়গাতেই যাচ্ছেন দিদি। ওখানে তো রাতদিনই কর্তাকে কাছে কাছে পাবেন।

মৃদু হেসে বাসন্তী জবাব দিয়েছিল, তোমারও ভাই ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে নাকি?

—খু-উ-ব। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলেছিল রেখা, এ আর ভালো লাগছে না, দিদি। দিন নেই রাত নেই কেবল কাজ আর কাজ। দু'দণ্ড যদি একটু স্থির হয়ে বসে ঘরের ভাবনা ভাবতে পারে!

সিনিয়র এ. এস. আই. শ্রীপতির স্ত্রী মহামায়া একপাল ছেলেমেয়ের ব্যূহ থেকে নিজেকে কোনক্রমে মুক্ত করে কাছে এসে বলেছিল, চললেন? আবার কবে দেখা হবে কে জানে!

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিল, আমাদেরও তো এখান থেকে চলে যাবার সময় হয়ে এল।

—তাই নাকি? কই শুনি নি তো? শ্রীপতিবাবুরও বদলির আদেশ এসেছে নাকি?

জবাবে মহামায়া বলেছিল, না—না, এখনও আসেনি। ওঁর প্রমোশনের নাকি কথাবার্তা চলছে। তাই ভাবছি প্রমোশন হলে কি আর এখানে রাখবে? নিশ্চয়ই বদলি করে দেবে।

মহামায়ার কথায় বাসন্তী মনে মনে একটু হেসেছিল কেবল। শ্রীপতির প্রমোশনের যে আর কোন সম্ভাবনা নেই, সেকথা এই মহামায়া ছাড়া আর সকলেই জানে। শ্রীপতি যতই কেন না তার স্ত্রীকে গল্প করুক, আর সেই গল্প শুনে মহামায়া যতই কেন না পুলকিত বোধ করুক, সবাই জানে যে, শ্রীপতি মিত্রকে বাকি ক'টা বছর এ. এস্. আই-য়ের চাকরিই করতে হবে। দারোগাগিরি আর তার বরাতে জুটবে না।

অন্যসময় হলে বাসন্তী হয়ত স্বামীর গরবে গরবিনী এই সরল স্ত্রীলোকটিকে সত্যি কথাটা শুনিয়ে দিত, কিন্তু যাবার সময় সে'সব কিছু বলতে ইচ্ছা হল না তার। মহামায়ার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল কেবল।

যাবার আগে বাসন্তী ভবদেবের কোয়ার্টারে প্রবেশ করতেই কমলা সামনে এগিয়ে এসে শুষ্কমুখে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল—কি ভাই, চললে?

—হ্যাঁ দিদি, যাচ্ছি। আপনারা তো আর আমাদের কাছে রাখলেন না। তাই যেতেই হচ্ছে।

জবাবে কমলা বলেছিল, রাখা-না-রাখা কি ভাই আমাদের হাতে? বদলির চাকরি। সবাইকেই একদিন যেতে হবে। কেউ দু'দিন আগে, আর কেউ বা দু'দিন পরে।

বাসন্তী হেঁট হয়ে কমলার পায়ের ধুলো নিতে যেতেই কমলা দু'পা সরে গিয়ে বলে উঠেছিল, থাক্ থাক্, আশীর্বাদ করার তো আমার অধিকার নেই। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তোমরা ভাই সুখে থাকো।

—কেন দিদি, আপনার আশীর্বাদ করবার অধিকার নেই কেন?

মুহূর্তে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কমলা। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সত্যি কথাটা গোপন করে একটু ম্লান হেসে বলেছিল, না—না। এমনি বললাম! বয়সে আমি তোমার চেয়ে কতই বা বড় হব। তাই ওকথা বললাম।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। পুত্র অমল অসৎসঙ্গে মিশে একেবারেই অমানুষ হয়ে উঠেছে। মুখের ওপর যা'-তা' বলে কমলাকে। বাপ ভবদেবও হাল ছেড়ে দিয়েছে। এমন ছেলের মুখদর্শন করাও পাপ বলে সময় সময় নিজের ওপরই বিরক্তি প্রকাশ করা ছাড়া অমল সম্বন্ধে আর কিছু বলে না। মনটা যেদিন অতিরিক্ত খারাপ লাগে, সেদিন অসময়েই থানায় গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থেকে সবকিছু ভুলতে চেষ্টা করে মাত্র।

কিন্তু কমলা স্ত্রীলোক। ঘর ছেড়ে তার কোথাও যাবার উপায় নেই। তাই সংসারের কাজেই মধ্যেই অমলের কথা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠে। একটিমাত্র পুত্রের এই নিদারুণ পরিণতি তার মাতৃমনে সৃষ্টি করে এক সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া। ইদানীং তার কেবলই মনে হয়, অমলের এই পরিণতি জন্যে তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দায়ী। ভবদেব তার চাকরি নিয়েই এত ব্যস্ত যে, ছেলের দিকে কোনদিন নজর দেয়নি। আর কমলা নিজে স্বামীর ভয়ে প্রথম প্রথম

অমলের অনেক দোষত্রুটি নিঃশব্দে হজম করে তাকে আস্কারা দিয়েছিল বলেই আজ তার এই পরিণতি।

এমনিতেই কমলা একটু ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির স্ত্রীলোক। তার ওপর, অমলের ব্যাপারে ঘৃণায় দুঃখে নিজেকে একেবারেই গুটিয়ে নিলে শামুকের মত। পুত্রের দোষে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেললে। আর এই থেকেই তার মনের মধ্যে জন্ম হল একটা কম্প্লেক্স। হয়ত মেলাঙ্কলিয়া নামক মানসিক রোগ থেকেই এই কম্প্লেক্সের সৃষ্টি। অমলের মত পুত্রের জননী বলে সে নিজেই যেন মস্তবড় অপরাধী! এমনিভাবে ধীরে ধীরে কমলা নিজের কাছেই নিজে হয়ে উঠল এক অশুভের প্রতিমূর্তি। পুত্রস্নেহে অন্ধ এক জননীর জীবনে সেই পুত্রস্নেহই যেন হয়ে উঠল এক নিদারুণ অভিশাপ। নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে হতে থাকে। একটা ভীষণ অমঙ্গলের ছায়া যেন অক্টোপাশের মত বাহুবিস্তার করে তাকে ঘিরে রাখে সদাসর্বদা। তার নিজের পদশব্দে যেন জেগে ওঠে সেই অমঙ্গলের পদধ্বনি, তার নিজের নিঃশ্বাসে যেন সে অনুভব করে সেই অমঙ্গলের উষ্ণ নিঃশ্বাস।

কন্যা অমিয়া মাঝে মাঝে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে, তুমি যেন দিন দিন কেমন হয়ে উঠছো মা!

---কেমন আবার? শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে কমলা।

—তা' জানি না। তবে আমার ঠিক ভালো লাগে না। সেই আগের তুমি আর নেই।

—সেই আগের তোরাই কি আর আছিস?

বুদ্ধিমতী অমিয়া বুঝতে পারে তার মা বহুবচনে কথাটা বললেও সে বোঝাতে চাইছে একমাত্র তার দাদাকে। তাই, অমলের প্রসঙ্গ তুলে মায়ের মনে অযথা কষ্ট না দিয়ে সে চুপ করেই থাকে।

* * *

—প্রিভেনশন্ অব্ ব্রীচ্ অব্ পীস—শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা দিলে তা' প্রতিরোধ করতে হবে। কোনক্রমেই যেন শান্তিভঙ্গ না হয়। পুলিশের কার্যাবলীর মধ্যে এইটি অন্যতম।

কিন্তু এই 'শান্তিভঙ্গ' শব্দটা শুনলে কেন যেন হাসি পায় অমিতের। দেশের যা' বর্তমান হাল তাতে শান্তি কোথায় যে, তা' ভঙ্গের আশঙ্কা থাকবে? শান্তি থাকলে তো তা' ভঙ্গের আশঙ্কা? ঘরে বাইরে, স্কুলে কলেজে, অফিসে ফ্যাক্টরীতে সর্বত্রই আজ অসন্তোষ। সর্বত্রই আজ ধূমায়িত অশান্তি। অশান্তির সেই ধুম্রজালের আড়ালে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা চোখবুঁজে উন্মত্ত তাণ্ডবে মেতে ওঠে, দেশের পুলিশবাহিনী অন্ধের মত এলোপাথাড়ি তাড়া করে তাদের, দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ঘরে দরজায় খিল এঁটে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়, আর সাধারণ নাগরিকরা হাঁ-করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর হা হুতাশ করে।

লোকগুলো থানায় এসেছিল আগের দিন রাতে। একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা নিয়ে মামলা রুজু করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু অমিত রাজি হয়নি। কেবল ঘটনার বিবরণ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করে বিদায় দিয়েছিল তাদের। তা'ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল? এই পারমাণবিক যুগে তুক্-তাক্ কিম্বা মন্ত্র-তন্ত্রের জোর আছে কি নেই তা' নিয়ে হয়ত তর্ক করা চলতে পারে, কিন্তু তা' নিয়ে থানায় মামলা রুজু করা চলে না।

অভিযোগকারী গোয়ালা শ্রেণীভুক্ত। শহরের একপ্রান্তে তার গরুমোষের খাটাল। তার অভিযোগ ছিল পাশের অন্য একটি খাটালের মালিকের বিরুদ্ধে। দুধ বেচাকেনার ব্যাপারে

তার সঙ্গে এদের অনেকদিনের রেষারেষি। তারই পরিণতিতে সেই লোকটি নাকি স্রেফ মন্ত্রের জোরে এদের গুরু-মোষের দুধ শুষে নিয়েছে। যে মোষটা সারা দিনে তের-চৌদ্দ সের দুধ দিত, এখন নাকি তার কাছ থেকে দু'সের দুধ জোগাড় করাই শক্ত। সবক'টা গরু-মোষেরই নাকি এমনি হাল।

ঘটনার কথা শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করেছিল অমিত। এই অবস্থায় কেবল ডাইরী করা ছাড়া আর কি করতে পারে? সত্যি সত্যি মন্ত্র-তন্ত্রের কোন ব্যাপার কিনা কে জানে? আবার এমনও হতে পারে যে, গরু-মোষগুলোকে কিছু খাওয়ানো হয়েছে। অথবা হঠাৎ কোনরকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ওগুলোর দুধ কমে গেছে। কাজেই ঘটনাটা ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করে একজন ভেটারিনারি সার্জেনের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্যে উপদেশ দিয়ে তাদের বিদায় করেছিল। অবশ্য অমিত তাদের এমন আশ্বাসও দিয়েছিল যে, পশু চিকিৎসকের পরামর্শের পর যদি বোঝা যায় সেই লোকটির এই ব্যাপারে কোন হাত থাকতে পারে তবে তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই মামলা রুজু করা হবে।

কিন্তু লোকগুলো ধৈর্য ধরতে পারলে না। পরের দিন সকালেই দুই খাটালের লোকজনের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। লাঠি-বল্লম নিয়ে সবাই প্রস্তুত। দাঙ্গা বাধে আর কি!

খবর পেয়ে সাইকেল চেপে তখনই সেখানে ছুটতে হয়েছিল অমিতকে।

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা বাধেনি। দু'দলকেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে সমর্থ হয়েছিল অমিত। অভিযোগকারীরা রাজি হয়েছিল ভেটারিনারি সার্জেনের পরামর্শ গ্রহণ করতে।

সারাদিন অস্নাত অভুক্ত অমিত। তবুও ব্যাপারটা যে বেশিদূর গড়াতে পারেনি তাতেই সে খুশি হয়ে ওঠে। নিজের হাতঘড়ির দিকে একবার তাকায়। তিনটে বাজতে মিনিট কয়েক মাত্র বাকি। থানায় ফিরতে সাড়ে তিনটে বেজে যাবে নিশ্চয়।

আপন মনে আস্তে আস্তে সাইকেল চালাচ্ছিল অমিত। গোয়ালাদের ঐ ঘটনার কথাই ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডেকে ওঠে, দারোগাবাবু!

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় অমিত। না, কেউ তো নেই। রাস্তা তো ফাঁকা। তবে কে ডাকলে তাকে? তা'হলে, কি তার শোনার ভুল? হয়ত তাই।

ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে তাকিয়ে আবার সাইকেল চালাতে থাকে অমিত।

আবার সেই কণ্ঠস্বর, দারোগাবাবু!

না, এবার আর ভুল নয়। পরিষ্কার স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ে অমিত। তারপর সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে দাঁড়ায়।

এতক্ষণে রাস্তার পাশে বস্তির দিকে নজর পড়ে অমিতের। বস্তির একপাশে একটা কাঁচা নর্দমার কাছে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক। মাথার ঘোমটা কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়ানো। গোবর-মাখা হাতে সন্তর্পণে মুখের ঘাম মুছতে ব্যস্ত। দু'খানি পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে একটু মিষ্টি হাসি।

ভ্রু-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অমিতের। কে এই বস্তিবাসিনী? কেন ডাকছে তাকে? কি তার প্রয়োজন?

অনুচ্চকণ্ঠে অমিত প্রশ্ন করে, আমাকে ডাকছেন?

স্ত্রীলোকটি সারা মুখে আবার এক ঝলক্ হাসি ছড়িয়ে বললে, হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। নইলে রাস্তায় আর কোন্ দারোগাবাবু আছে?

একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে দু'পা এগিয়ে যায় অমিত। তারপর বললে, কি দরকার আপনার, বলুন!

স্ত্রীলোকটি কিন্তু এবার খিল খিল শব্দে হেসে উঠে বললে, সে কি, দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভয় পেয়েছেন নাকি? কাছে আসুন।

স্ত্রীলোকটির সপ্রতিভ কথার ভঙ্গিতে বিস্মিত হয় অমিত। একমুহূর্ত চিন্তা করে এগিয়ে যায় স্ত্রীলোকটির দিকে।

একরাশ গোবরের পাশে দাঁড়িয়েছিল স্ত্রীলোকটি। সম্ভবতঃ পাশের নোনা ধরা ইটের দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিল।

স্ত্রীলোকটির মুখের ওপর ভালমত নজর পড়তেই অমিতের ভ্রূ দু'টো আবার কুঁচকে ওঠে। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে ঠিক মনে করতে পারছে না।

স্ত্রীলোকটি আবার খিল্ খিল্ শব্দে হেসে ওঠে। তারপর কৌতুক কণ্ঠে বললে, কি, এখনও চিনতে পারলেন না? শুনতে পাই, পুলিশের লোকেরা নাকি কাউকে একবার দেখলে আর ভোলে না। তা' এর মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলেন?

ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল অমিতের। স্ত্রীলোকটিকে এর আগে সে নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছে। এর কণ্ঠস্বরও একেবারে অপরিচিত নয় তার কাছে। কিন্তু তবুও মনে করতে পারছিল না বলেই তার এই অস্বস্তি।

হাসি থামিয়ে স্ত্রীলোকটি এবার বললে, মিনতিকে আপনার মনে আছে? সেই মিন্‌তি সিং —জয়রাম সিংয়ের মেয়ে?

অকস্মাৎ অমিতের চোখের সামনে থেকে অপরিচয়ের পাতলা আবরণটা সরে যায়। এতক্ষণে মনে পড়ে তার। জয়রাম সিংয়ের মেয়ে মিন্‌তি ওরফে মিনতি সিং। গানের মাস্টার পরাশর সেনের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। ধরা পড়ে জেল হয়েছিল পরাশরের। সেই মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী হয়েও আদালতে দাঁড়িয়ে উল্টোপাল্টা সাক্ষ্য দিয়ে পরাশরকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল মেয়েটা। এই সেই মিনতি।

মিনতির কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা। তাই, এতক্ষণ তাকে চিনতে পারেনি অমিত। তা'ছাড়া এই একবছরের মধ্যে মেয়েটার চেহারায়ও কেমন যেন একটা পরিবর্তন এসেছে।

মৃদু হেসে অমিত বললে, ও—তুমি? তা' তুমি এখানে কেন?

—বাঃ, এখানে থাকব না তো থাকবো কোথায়? হেসে জবাব দেয় মিনতি, বিয়ের পরে মেয়েরা থাকে কোথায়?

—সেকি, তোমার এখানে বিয়ে হয়েছে? এই বস্তিতে? কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না অমিত। ধনী ব্যবসায়ী জয়রাম সিংয়ের মেয়ের বিয়ে হয়েছে এই বস্তিতে? সে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ঘুঁটে দিচ্ছে?

এতক্ষণে খেয়াল হল অমিতের। এই বস্তিতেই তো পরাশর সেন তার স্ত্রী কনক ও কতগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে থাকতো। কনকের জবানবন্দী নিতে তাকে একবার আসতে হয়েছিল এখানে।

একটু সময় চুপ করে থেকে অমিত আবার প্রশ্ন করে, পরাশরবাবু কি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে?

ফিক্ করে আবার একটু হাসে মিনতি। তারপর বললে, ছাড়া না পেলে তার কাছে চলে এলাম কি করে? মাস চারেক হল ছাড়া পেয়েছেন তিনি।

অমিতের মুখে আর কথা ফোটে না। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে কেবল তাকিয়ে থাকে মিনতির হাসি ঢলঢলে মুখখানার দিকে। কি সাংঘাতিক মেয়ে! শেষ পর্যন্ত ঐ পরাশরকেই স্বামীরূপে গ্রহণ করলে! স্ত্রী ও কতকগুলো ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও ঐ জেল ফেরত লোকটার সঙ্গে থাকতে তার বাধলো না!

এক সময় সে কথাটা বলেই ফেললে মিনতিকে। বললে, পরাশরবাবুর স্ত্রী কনক ও তার ছেলেমেয়েরা এখন থাকে কোথায়?

—কেন, এখানেই থাকে তারা।

—এই একই বাড়িতে থাকো তুমি?

—হ্যাঁ, থাকি। তাতে হয়েছে কি?

মিনতির জবাব দেবার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটু থতমত খায় অমিত। মৃদুকণ্ঠে বললে, না—না। কিছু হয়নি। তবে কিনা স্ত্রী ও একদল ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও ঐ পরাশরবাবুকে তুমি—

অমিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে খিল্ খিল্ শব্দে হাসতে হাসতে মিনতি জবাব দেয়, বিয়ে করলাম কেন, এই তো? তা' দারোগাবাবু, বিয়ে তো আর ওঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের করিনি? করেছি ওঁকে। আর আমাদের বিয়ে তো হয়েছিল ওঁর জেলে যাবার আগেই।

অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে! অন্য কেউ হলে অমিত হয়ত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা না বলে চলেই যেত। কিন্তু এই মিনতির চরিত্রের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা অমিতের কৌতূহলকে উত্তরোত্তর বাড়িয়েই তুলছিল। তাই, শারীরিক ক্লান্তি সত্ত্বেও মিনতির সব কথা না জেনে সে যেতে পারছিল না।

—জয়রাম সিং, মানে, তোমার বাবা আপত্তি করেনি? প্রশ্ন করে অমিত।

—তা' আবার করেননি? কিন্তু তাঁর আপত্তি টিকবে কেন? সেদিন সাবালিকা হইনি বলে আমার মতামতকে অগ্রাহ্য করে আপনারা তাঁকে জেলে পুরতে পেরেছিলেন। আজ তো আমার সে অসুবিধে নেই। আপনাদের আইন-আদালতের চোখেই আজ আমি সাবালিকা। তবে হ্যাঁ, বাবা বলেছেন, তিনি জীবনে আর আমার মুখ দেখবেন না। সত্যি, বাবার জন্যে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় কি, বলুন? হিন্দুর ঘরের মেয়ে বাপের কথা চিন্তা করে তো আর স্বামীর ঘর ছেড়ে দিতে পারে না।

মিনতির কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়ে অমিত। জীবনটাকে কত সহজভাবেই না গ্রহণ করেছে এই মেয়েটা। কোথাও এতটুকু জড়তা কিম্বা আড়ষ্টতা নেই। সহজ, সরল, প্রাণবন্ত জীবন। অনুশোচনাও যেমন নেই, অভিযোগও নেই কারুর বিরুদ্ধে। জীবনকে যারা এমন হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে পারে তাদের মনে দুঃখ দেবার ক্ষমতা বোধকরি স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই।

অমিতের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে চঞ্চল কণ্ঠে মিনতি বলে ওঠে, আপনাকে কিন্তু খুব শুকনো দেখাচ্ছে দারোগাবাবু। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বুঝি সারাদিন?

ম্লান হেসে জবাব দেয় অমিত, না, এখনও হয়নি। কাজে আট্‌কে পড়ে গিয়েছিলাম।

মিনতি মুখ টিপে হেসে বললে, আপনারা পুরুষেরা বড়ই অবুঝ। বাড়িতে আপনার গিন্নী বোধহয় এতক্ষণ ভাতের থালা বেড়ে রেখে বসে বসে মাছি তাড়াচ্ছে। আর আপনি এদিকে দিব্যি কাজ করে বেড়াচ্ছেন।

—কাজ আর করছি কোথায়? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো গল্প করছি তোমার সঙ্গে।

—ঐ হল। গল্পের মধ্যে দিয়ে লোকের পেটের কথা টেনে বের করাই তো আপনাদের কাজ। তা' যাক্, যখন এসেই পড়েছেন তখন একবার গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দেবেন না?

—না—না। এই অসময়ে আর যাব না তোমাদের ওখানে। বরঞ্চ আর একদিন এসে তোমার ঘরকন্না দেখে যাব।

—তা' হলেই হয়েছে। যারা নিজেদের ঘরকন্নার দিকে নজর দিতে সময় পায় না, তারা আবার সময় করে অন্যের ঘরকন্না দেখতে আসবে!

—তুমি আমাদের সম্বন্ধে এত কথা জানলে কি করে, মিনতি?

মিনতি একটু হেসে জবাব দেয়, আমার বাপের বাড়ির কাছেই একটা বস্তিতে একজন পুলিশ কনস্টেবল থাকতো। আমাদের দোতলা থেকে তাদের ঘরটা পরিষ্কার দেখতে পেতাম আমি। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ঘরকন্না দেখতাম।

—ও—তাই বলো।

একটু সময় চুপ করে থেকে অমিত আবার বললে, তা' হলে এবার চলি, মিনতি!

—আপনি আমাদের বাড়ি আসবেন না?

আচ্ছা নাছোড়বান্দা মেয়ে তো। করে তো সতীনের ঘর। সেখানে তার এমন কি রাজ-ঐশ্বর্য রয়েছে যা' দেখাবার জন্যে মেয়েটা তাকে এত পীড়াপীড়ি করছে?

অমিতের মুখে সংকোচের ভাবটুকু লক্ষ্য করে মিনতি হেসে বললে, কোতোয়ালী থানার দারোগাবাবু কি করে বস্তির এক ভাড়াটে ঘরে যাবেন তাই বুঝি ভাবছেন?

—না—না, তা' কেন? আমরা পুলিশ। আমাদের গতি সর্বত্র।

—তা' তো কেবল কাজের বেলায়। এখন তো কাজে যাচ্ছেন না। তাই বুঝি এত চিন্তা?

—না—না, সেসব কিছু নয়—

অমিতের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মিনতি আপন মনেই বলে যেতে থাকে, গরীব হলেও আমরা যেমন মানুষ, পুলিশ হলেও আপনি তেমনি মানুষ। মানুষই মানুষের বাড়িতে যায়। তাই বলছি, আসুন না একবার।

'পুলিশ' হলেও আপনি তেমনি 'মানুষ'—কথাটা ভারি চমৎকার লাগে অমিতের। তার এই অল্পদিনের চাকরির মধ্যে এমনি একটা কথা আর কখনও কারুর কাছে শুনেছে বলে মনে পড়ে না।

অমিত আর কিছু না বলে মিনতির পেছনে পেছনে সাইকেল ঠেলে স্যাঁতসেঁতে গলিপথে প্রবেশ করে।

যেতে যেতে মিনতি একসময় ঘাড় ফিরিয়ে আবার একটু হেসে বললে, আসুন—আসুন, ভয় নেই। এক বছর আগে যাকে জেলে পুরেছিলেন তিনি এখন বাড়ি নেই। আর, থাকলেও আপনাকে দেখে তিনি মোটেই অসন্তুষ্ট হতেন না।

অমিত কোন জবাব না দিয়ে চলতে থাকে।

পরাশর সেনের বাড়ি ঢুকতেই ছেলেমেয়েদের কলরব একমুহূর্তে থেমে যায়। ভীত দৃষ্টিতে কোন ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় তারা পোশাক পরা অমিতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিনতি কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই সোরগোল তোলে। কুয়োতলায় গিয়ে হাতের গোবর পরিষ্কার করতে করতে কনককে ডেকে বললে, দিদি—দিদি, বাইরে এসো। দেখো, কাকে ধরে এনেছি।

একটু পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে কনক। সেই ফর্সা ছিপছিপে স্ত্রীলোকটি এই এক বছরে যেন আরো শীর্ণ হয়ে উঠেছে। সারা মুখে একটা বিষাদের ছায়া।

অমিতকে দেখেই একটু ম্লান হেসে একখানা টুল এগিয়ে দেয় কনক। তার সেই হাসির মধ্যে আনন্দের চাইতে যেন কৃতজ্ঞতার ছাপই বেশি। কোতোয়ালী থানার বড়বাবু ভবদেবের কাছে কনক সত্যিই কৃতজ্ঞ। সে না থাকলে পরাশরের সেই অনুপস্থিতির মধ্যে হয় তাকে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হত, নয়তো সেই পাজী বাড়িওয়ালার অঙ্কশায়িনী হয়ে ঘৃণ্য জীবন-যাপন করতে বাধ্য হত।

মিনতি শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললে, গরীবের বাড়ি এসে চায়ের সঙ্গে আর কি খাবেন, দারোগাবাবু?

—না, আর কিছু না। জবাব দেয় অমিত, শুধু এক কাপ চা।

—তা' কি হয়? এই ভরদুপুরে শুধু এক কাপ চা দিয়ে বিদেয় করব আপনাকে?

তারপর একটু থেমে হেসে আবার বললে, সন্দেশ, রসগোল্লা তো আপনারা কতই খান, দারোগাবাবু। একটা জিনিস খাবেন? বাড়িতে তৈরি নারকেলের নাড়ু আছে, আর আজ সকালেই মুড়ি ভেজেছি। নাড়ু দিয়ে টাটকা মুড়ি খেতে ভালই লাগবে, খাবেন?

অমিতের সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল। তার ওপর মিনতির ঐ আন্তরিকতাটুকু সত্যিই মুগ্ধ করে তাকে। হেসে বললে, তুমি যেমন সাংঘাতিক মেয়ে, না বললে কি ছাড়বে? নিয়ে এস, খাব।

এই বাড়িতে একটা জিনিস দেখে কিন্তু সত্যিই আশ্চর্য লাগে অমিতের। মাত্র তিন-চার মাস আগে মিনতি এই বাড়িতে সতীনের ঘর করতে এসেছে। কিন্তু এর মধ্যেই যেন সে হয়ে উঠেছে এই বাড়ির কর্ত্রী। স্বল্পভাষিণী কনক যেন অনেক পেছনে পড়ে আছে। দেখে মনে হয়, কনক যেন এ বাড়িতে দু'চার দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে কেবল। শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েগুলোকেও বশ করে ফেলেছে মিনতি।

একটা দৃশ্য মনে পড়ে অমিতের। এক বছর আগে সেই কিড্ন্যাপিং মামলার তদন্তের ব্যাপারে সে যখন এই বাড়িতে প্রথম এসেছিল কনকের জবানবন্দি নিতে, সেদিন এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো কনকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েই ভীত চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। আজও তেমনিভাবেই তারা যার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সে কিন্তু তাদের নিজেদের মা কনক নয়, সে মিনতি—তাদের নতুন মা মিনতি—যাকে বিয়ে করতে গিয়ে তাদের বাবাকে জেলে যেতে হয়েছিল, সেই মিনতি।

অমিত সত্যিই ভেবে পায় না কোন্ মন্ত্রবলে সেই ধনীর দুলালী মিনতি সিং আজ মিনতি সেন হয়ে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এই ছেলেমেয়েগুলোর মা সেজে তাদের এমনিভাবে আপন করে নিতে পেরেছে? কোন্ গরবে গরবিনী মিনতি আজ সতীনের ঘর করেও মা দুর্গার মত দশ হাতে সমস্ত সংসারটাকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে? কি সেই গর্বের বস্তু? প্রেম?—ভালবাসা?—কিংবা অন্য কিছু? সত্যিই নারী-চরিত্র বিচিত্র!

।। ছাব্বিশ ।।

রাত তখন দশটা।

নিজের ঘরে চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে বসে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে জুতো পালিশ করছিল অমিত। টেবিলের ওপর পড়েছিল দু'খণ্ড পাতিলেবু। একপাশে একবোতল পেট্রল, একটা জুতোর কালির খোলা বাক্স আর কতকগুলো ন্যাকড়া। অন্যপাশে একটা জুতোর ক্রীমের শিশি।

বাঁ হাতে জুতোখানা প্রায় বুকের কাছে তুলে ধরে ডান হাতে আঙুলে জড়ানো ন্যাকড়া দিয়ে অতি আলতোভাবে তাতে হাত বুলোচ্ছিল অমিত। আর মাঝে মাঝে জুতোটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখে নিচ্ছিল জুতোর সামনের সরু অংশটা ঠিক চমকাচ্ছে কিনা।

সামান্য জুতো পালিশ করা। কিন্তু তাতেই কি বিরাট আয়োজন। পাতিলেবু, পেট্রল, কালি এবং আরও কত কি! জুতো পালিশ করতে যে এত আয়োজনের প্রয়োজন হয় তা হয়ত কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকার শ্রেষ্ঠ সু-সাইন বয়রাও জানে না।

কিন্তু অমিত জানে। শুধু অমিত কেন, অনেক পুলিশ অফিসারই জানে। এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, জুতোকে চক্চকে করে তোলার কেরামতিতে পুলিশ অফিসাররা শ্রেষ্ঠ সু-সাইন বয়দেরও হার মানায়। বিশেষ করে যারা এই ডিপার্টমেণ্টে নতুন ঢুকেছে তাদের তো কথাই নেই। কায়দাটা তাদের রপ্ত করিয়ে দেওয়া হয় সেই পুলিশ ট্রেনিং কলেজে।

না, সেখানে জুতো পালিশের কোন ট্রেনিং ক্লাশ নেই। কিন্তু ট্রেনিং কলেজের ভেতরে ঢুকলেই দেখা যাবে দিনের একটা বিশেষ সময়ে শিক্ষার্থী অফিসারেরা সারিবদ্ধ হয়ে জুতো পালিশ করতে বসে গেছে। বিশেষ করে, মাস্টার প্যারেড্ অর্থাৎ প্রধান কুচ্কাওয়াজের আগের দিন তো বটেই। বুট জুতোয় চমক্ তুলবার সে কি কঠিন প্রচেষ্টা! যেন এক ভীষণ প্রতিযোগিতা।

মাস্টার প্যারেড। জেলার কিংবা মহকুমার পুলিশের কর্তা স্বয়ং সেদিন ইন্স্পেক্শান্ করেন পোশাক পরিচ্ছদ। তাই, মাস্টার প্যারেডের আগের দিন একটু ঘষামাজা করতেই হয়।

ট্রেনিং কলেজের অভ্যাসটি কিন্তু এখনও বজায় রেখেছে অমিত। জেলায় এসেও মাস্টার প্যারেডের আগের দিন এক জোড়া জুতো পালিশ করতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগে তার।

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে জুতোয় কালি লাগাতে লাগাতে নানা কথা ভাবছিল অমিত। আজ নিয়ে তিনদিন স্মৃতিকণার ওখানে যাওয়া হয়নি। রোজই যাব যাব মনে করেছে। কিন্তু বিকেলের দিকে আর সময় করে উঠতে পারেনি। আজও যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই মিনতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে থানায় এসে এমন একটা কাজে আট্কে পড়েছিল যে, রাত আটটার আগে নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় হয়নি তার।

এতক্ষণে বাড়ি ফিরে আর স্মৃতিকণার ওখানে যেতে ইচ্ছে করছিল না। একে তো সারাদিন খাওয়া হয়নি, তার ওপর আবার কাল সকালে মাস্টার প্যারেডে যেতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক করে রাখতে হবে।

কাল বিকেলের দিকে যেমন করেই হোক একবার যেতেই হবে স্মৃতিকণার কাছে। গিয়ে হয়ত আবার মান ভাঙ্গাতে হবে তার। বেচারীর দোষ কি? সে চায় প্রতিদিন যেন একবার

করে অমিত এসে তাকে দেখা দিয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই। এ তো আর দশটা-পাঁচটা অফিসের চাকরি নয় যে, অফিস থেকে একবার বেরোতে পারলেই অফিসের সঙ্গে সেদিনের মত সম্পর্ক চুকে গেল!

হাতের কাজ করতে করতে একা ঘরের মধ্যে বসে এমনি নানা কথা ভাবছিল অমিত। পাশের ঘরে রান্না চাপিয়ে তার ছোক্‌রা কম্বাইণ্ড্ হ্যাণ্ডটি ফুটপাথ থেকে কিনে আনা একখানা প্রথম ভাগের সাথে প্রথম পরিচয়ে ব্যস্ত ছিল। ঠিক এমনি সময় আমি এসে দাঁড়াই অমিতের বাড়ির খোলা দরজার সামনে।

অমিত দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকায় আমার আগমন টের পায়নি। আমি নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে ওর হাতের জুতোর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাঃ—বাঃ, বেশ হয়েছে তো! একেবারে মুখ দেখা যাচ্ছে।

অমিত ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বলে ওঠে, দূর ছাই, কিছুই হয়নি! এত চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই আজ জুতোর জেল্লা তুলতে পারছি না।

—সেকি? অমিতের পাশে আর একটা চেয়ারে বসতে বসতে অকৃত্রিম্ বিস্ময়ে আমি বললাম, এতেও তোমার মন উঠছে না? এর চাইতে আর কি ভাল হবে, শুনি?

—আরে হবে—হবে। এ তো কিছুই হয়নি।

আমি হেসে আবার বললাম, আসলে ব্যাপার কি জানো? প্রিয়তমার মুখের জেল্লা দেখে দেখে মনটা তোমার এমন তৈরি হয়ে উঠেছে যে, জুতোর জেল্লা এখন আর তোমার চোখেই লাগছে না।

—তার মানে? হাসি চেপে কৃত্রিম রাগের সুরে অমিত বললে, তুমি স্মৃতিকণার মুখের সাথে এই জুতোর তুলনা করছো?

—ইস্, একেবারে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঘা লাগলো যে! এখনও তো অর্ধাঙ্গিনী হয়ে ওঠেনি। হলে কি যেন হত!

—এখানেই একটা মস্ত ভুল করলে তরুণ, অমিত বলতে থাকে, অর্ধাঙ্গিনী যেদিন হবে সেদিন হয়ত প্রাণে এত লাগবে না। জানো তো ভাই, মানুষের কাছে দূরের বস্তুর মূল্যই সর্বাধিক। বস্তুটি পাওয়ার যদি কোনদিন কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা হয়ে ওঠে মহামূল্য। আর তা হাতের কাছে এসে পড়লেই তার মূল্য যায় কমে।

—ওরে বাবা, এসব ব্যাপারে জ্ঞানের যে একেবারে অধীশ্বর হয়ে বসে আছো! তা' ভাই, আজকাল কাকে ফলো করছো তুমি?

—তার মানে?

আমি হেসে আবার বললাম, বলছি, কাকে ফলো করছো? দেশী মত, না বিদেশী? বাৎস্যায়ন, না ফ্রয়েড্?

—ও—এই কথা? হেসে ওঠে অমিত। বললে, ফলো যাকেই করি না কেন, বক্তব্য দু'জনেরই প্রায় এক। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে বাৎস্যায়ন যা' বলেছিলেন, একালের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েড্ও ঠিক তাই বলছেন। তবে দু'জনের বলার ঢং কিছু আলাদা, এই যা।

একটু সময় চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম, সেকথা যাক। আমার কিন্তু ভাই ভয় করছে। জুতো পালিশের প্রতি তোমার যেমন নিষ্ঠা, তাতে বিয়ের পর স্মৃতিকণা বিরক্ত হয়ে না ওঠে। কাজের নিষ্ঠা থাকা ভালো, কিন্তু তাই বলে আশেপাশের সব কিছু ভুলে যাওয়া কি খুব সুখের ব্যাপার?

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে অভয় দেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে অমিত বললে, ভয় নেই বৎস, তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। তার আগেই তাকে এমন মোক্ষম ওষুধ ধরিয়ে দেব যে সেই বেচারী তেমন কোন ভাবনা ভাববার সুযোগই পাবে না।

—তার মানে? আমি প্রশ্ন করি, কি সেই ওষুধ?

আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে অমিত বলতে থাকে, একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে ভীষণ মনোমালিন্য। স্বামী মদ খায়। স্ত্রী কিছুতেই তা' সহ্য করতে পারে না। স্বামী তার স্ত্রীকে যতই মদের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনায় স্ত্রী ততই চটে ওঠে। অবশেষে অনন্যোপায় স্বামী একটা মতলব ঠিক করলে। শরীর ভাল করার অজুহাতে স্ত্রীকে প্রতিদিন এমন একটা কবিরাজী ওষুধ খাওয়াতে শুরু করলে যার শতকরা আশিভাগই বিশুদ্ধ সুরা জাতীয় পদার্থ। স্ত্রীও প্রতিদিন ভক্তিভরে সেই ওষুধ পান করতে লাগল। দেখতে দেখতে স্ত্রীলোকটির এমন অবস্থা হল যে, একদিন ঐ ওষুধ না হলে তার আর চলে না। স্বামীও তখন লেবেল-আঁটা মার্কামারা শিশি ছেড়ে দিয়ে সেই কবিরাজী ওষুধ সেবন করতে আরম্ভ করল। ব্যস্, নিষ্পত্তি হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীতে তখন গলাগলি ভাব। বুঝলে?

আমি হেসে বললাম, তুমিও তাই সেই পথ ধরতে চাও নাকি?

—নিশ্চয়ই, হাসতে হাসতে জবাব দেয় অমিত, ওর মনেও জুতো পালিশের প্রতি এমন একটা মমতা জাগিয়ে তুলব, যাতে একদিন হয়ত দেখা যাবে, উনুনের ওপর তরকারি পুড়ে কালী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে একমনে আমার জুতোয় জেল্লা তুলতে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

—সর্বনাশ, তা'হলেই হয়েছে আর কি! তারপর হয়ত দেখা যাবে দু'জনেই উপোসী থেকে সারারাত দু'খানা জুতোকে আঁকড়ে ধরে অঘোর নিদ্রায় অচেতন হয়ে রয়েছে। কেমন?

কথা শেষ হতে দু'জনেই একসঙ্গে হো-হো শব্দে হেসে উঠি।

আমাদের হাসির শব্দে এতক্ষণে বোধহয় রান্নাঘরে সেই কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড্ ছোক্‌রাটির তপোভঙ্গ হয়। প্রথম ভাগখানা সযত্নে দেয়ালের ফোঁকড়ে রেখে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে ধীর পায়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে, চায়ের জল চাপাব, বাবু?

—সেকি, এখনও চাপাসনি? শিগ্‌গির চাপিয়ে দে। অমিত বললে।

ছোক্‌রাটি চলে যেতেই অমিত পুরোন কথায় ফিরে এসে মৃদু হেসে বললে, কিন্তু ভাই, ওতে একটা বিপদ আছে।

—কি বিপদ? প্রশ্ন করি আমি।

অমিত জবাব দেয়, কমেডি অব এররস্।

—সে আবার কি?

—সে একটা ঘটনা। অবশ্য, ঘটনা বললে তাকে ছোট করা হয়। একটা কাহিনী বলতে পারো।

—কিসের সেই কাহিনী?

—জুতো পালিশের কাহিনী। বলেই একটু থেমে অমিত আবার বলতে থাকে, কিছুকাল আগের কথা। তখন এদেশে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম ছিল। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সাহেব-সুবোদের অধিকাংশই ছিল লালমুখো সাহেব। সেই লালমুখো সাহেবদের দু'টো বিষয়ের প্রতি ছিল প্রখর নজর। ডিপার্টমেণ্টের বাইরে তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল স্বদেশীওয়ালাদের ওপর। আর, ডিপার্টমেণ্টের ভেতরে যে বস্তুটির ওপর তাদের প্রখর নজর ছিল তার নাম ডিসিপ্লিন্।

সেকালে লোকে নাকি ঠাট্টা করে বলতো—ডিসিপ্লিণ্ড ওয়েতে নরহত্যা করলেও নাকি বিলিতি সাহেবরা তা' মুখবুজে সহ্য করতে পারতো।

এমনি দিনে পূর্ববঙ্গের এক কোতোয়ালী থানায় কাজ করতো এক বৃদ্ধ এ. এস্. আই। ভদ্রলোকের চাকরি প্রায় শেষ হয়ে এলেও তার কপালে আর দারোগাগিরি জোটেনি, অনেকটা আমাদের কোতোয়ালী থানার শ্রীপতিবাবুর মত।

যাই হোক্, ভদ্রলোক অবশেষে প্রমোশন পেয়ে হল দারোগা। বৃদ্ধ তো মহাখুশি। বদ্লি হল জেলার কোতোয়ালী থানায়। বুড়ো বয়সে প্রমোশন পেয়েছে, কাজেই খাটাখাটনি করছে প্রাণপণে।

থানার অফিসার-ইন্-চার্জ লোকটি ছিল একটু কড়া প্রকৃতির। একদিন রাতে সে সেই বুড়ো দারোগাকে ডেকে বললে, আপনাকে কাল মাস্টার প্যারেডে যেতে হবে।

সেই বুড়োমানুষটি শুকনো মুখে অনেক ওজর-আপত্তি তুলতে চাইল, কিন্তু অফিসার-ইন্-চার্জের কড়া হুকুম, তাকে মাস্টার প্যারেডে যেতেই হবে। কোন আপত্তি সে শুনবে না।

অগত্যা, ভদ্রলোক একজন কনস্টেবলকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল স্ত্রীকে খবরটা দিতে, যাতে সে তার জামা-জুতো ঠিক করে রাখে।

পুলিশ অফিসারের স্ত্রী। কাজেই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অনেক কিছুই তাদের জানা। মাস্টার প্যারেডে যেতে হলে কর্তাকে কি কি পোশাক পরে যেতে হবে তা'ও তাদের মুখস্ত।

রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। এত রাত্রে এসব ঝামেলা কার সহ্য হয়? নিরুপায় ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, সারামুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলে কর্তার জামাকাপড় ঠিক করতে লাগলো।

সেকালে এ. এস্. আই'য়ের জুতোর রঙ ছিল কালো, আর. এস্. আই অর্থাৎ দারোগার ছিল লালচে। মহিলাটি স্বামীর জুতোয় পুলিশ লাগাতে গিয়ে ভুল করে ফেললে। এ. এস. আই. অবস্থায় কর্তার যে কালো জুতোর কালি ছিল, তাই সে লাগিয়ে দিলে লালচে রংয়ের জুতোয়।

—সর্বনাশ, এমন ভুল করে ফেললে? আমি হেসে মন্তব্য করলাম। একটু হেসে অমিত বললে, তার দোষ কি বলো? একে তো ঘুমে জড়ানো চোখ, তায় আবার বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল না। কালিপড়া হ্যারিকেনের আলোয় অতটা লক্ষ্য না করে মহিলাটি দিব্বি লাল রঙের জুতোয় কালো রঙের পালিশ লাগিয়ে কোনরকমে দু'বার ব্রাশ ঘষে খাটের নিচে রেখে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে।

গভীর রাতে থানার কাজ সেরে কর্তা এসে গিন্নীকে প্রশ্ন করতেই গিন্নী ঘুম-জড়ানো চোখে জবাব দিলে যে, সে সব ঠিক করে রেখেছে। কাজেই কর্তাও নিশ্চিন্ত মনে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লে।

মাস্টার প্যারেড্। সেদিন আবার পাঁচ-সাতটা জেলার পুলিশের প্রধান-কর্তা প্যারেড গ্রাউণ্ডে আসবেন। কাজেই একটু রাত থাকতেই ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে ধড়াচুড়ো পরে সেই বুড়ো দারোগাটি চলে গেল মাঠে। পায়ের জুতোর সেই কিম্ভূতকিমাকার অবস্থাটা অন্ধকারে সে নিজেও লক্ষ্য করলে না।

অফিসাররা প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ প্রধান আসবেন একটু পরে। তার আগেই, রিজার্ভ ইনস্পেক্টর অফিসারদের পোশাক পরিচ্ছদ চেক্ করতে এল।

কিন্তু সেই বুড়ো দারোগাটির জুতোর দিকে নজর পড়তেই তো তার চক্ষু স্থির! বিস্মিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, একি করেছেন, মশাই?

—কেন স্যার? প্রশ্ন করে সেই দারোগা।

—লাল জুতোয় দিব্বি কালো কালি লাগিয়ে এসেছেন?

—এ্যাঁ—! চোখদুটো ছানাবড়া করে ভদ্রলোক নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকে।'

তার অবস্থা দেখে পাশের অন্য অফিসাররা মুখ টিপে হাসতে থাকে। ভদ্রলোক দারুণ ঘাবড়ে যায়। সর্বনাশ, এখন উপায়? নতুন প্রমোশন, পুলিশ প্রধানের চোখে এ জিনিস পড়লে আর রক্ষে নেই। নির্ঘাৎ তাকে রিভার্ট করে এ. এস. আই. করে দেবেন। খাঁটি বিলিতি সাহেব তিনি। এমন কাণ্ড তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।

ভদ্রলোক কাঁদ কাঁদ মুখে রিজার্ভ ইন্‌স্‌পেক্টরের দিকে তাকিয়ে বললে, এখন উপায়, স্যার?

—শিগগির আপনি দূরে ঐ গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ান। প্যারেড্ করতে হবে না আপনাকে। সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি যাহোক একটা জবাব দেব। আপনি যান, শিগ্‌গির চলে যান।

ভদ্রলোক ছুটে গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর, একটু পরেই জেলার পুলিশ কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ প্রধান এসে হাজির হলেন।

হঠাৎ দূরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারটির প্রতি তাঁর নজর পড়তেই তিনি প্রশ্ন করলেন, হু ইজ্ দ্যাট অফিসার?

একটা ঢোক গিলে ইন্‌স্‌পেক্টর জবাব দেয়, কোতোয়ালী থানার একজন সাব্ ইন্‌স্‌পেক্টর, স্যার।

—হোয়াই ইজ্ হি স্ট্যাণ্ডিং দেয়ার?

আর একটা ঢোক গিলে ইন্‌স্‌পেক্টর সোজা মিথ্যে কথা বলে। বললে, হঠাৎ ওর শরীরটা খারাপ হওয়াতে আমিই ওকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

—ও—আই সী—! সাহেব আর কিছু বলেন না।

বিলিতি সাহেব কোন রকম সন্দেহ করতে না পারলেও জেলার পুলিশ কর্তা কিন্তু সন্দেহ করেন। তিনি ছিলেন দেশী সাহেব। ঝানু অফিসার। পুলিশ প্রধানের সামনে অবশ্য কিছু বললেন না। তবে তিনি চলে গেলে ইন্‌স্‌পেক্টরকে ডেকে প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপার? ঐ অফিসারটি কে? কি হয়েছে ওর?

এবার কিন্তু মিথ্যে বললে না ইন্‌স্‌পেক্টর। সত্যি কথাটা বলে ফেললো।

শুনে, পুলিশ কর্তা মনে মনে একটু হেসে গম্ভীর মুখে বললেন, হাউ ফানি! লাল জুতোয় কালো পালিশ লাগিয়ে প্যারেড্ গ্রাউণ্ডে এসেছে? অদ্ভুত লোক তো! ওকে কাল আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললে, বুড়ো মানুষ, স্যার। বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেনি—

—নো—নো। আপনি ওকে অফিসে পাঠাবেন। আমি ওর মুখ থেকেই ওর বক্তব্য শুনতে চাই।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক্ দিয়ে অমিত একটু থামে।

—তারপর? হেসে প্রশ্ন করি আমি, সেই বুড়ো দারোগাবাবুটির কি অবস্থা হল?

—অবস্থা আর কোথায়? হেসে জবাব দেয় অমিত, বরঞ্চ বলতে পারো দুরবস্থা। সত্যিই তাই। ভদ্রালোক সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেল। এবার তার নির্ঘাৎ পদাবনতি। এত কষ্ট করে শেষ বয়সে যদিও বা দারোগাগিরি জুটলো তো, কপালে টিকলো না।

পরের দিন বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে দারোগাবাবু এসে হাজির হল জেলার পুলিশ কর্তার অফিসে।

পুলিশ কর্তা মুখ তুলে দারোগাবাবুর আপাদমস্তক একবার ভালমত পরীক্ষা করে গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, ব্যাপার কি? কাল আপনি লাল জুতোয় কালো কালি লাগিয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়েছিলেন কেন?

দারোগাবাবু ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক, কথাবার্তায়ও পরিষ্কার পূর্ববঙ্গীয় টান।

পুলিশ কর্তার প্রশ্নটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা আরও কাঁচুমাচু হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে, মারছি স্যার, খুব মারছি—

জবাব শুনে পুলিশ কর্তা একটু চম্‌কে ওঠেন। বললেন, সেকি? কাকে মেরেছেন?

—আজ্ঞে স্যার, বাড়ির সেই মাইয়ালোকটারে খুব পিটাইছি—

—কি বিপদ, আপনি আপনার স্ত্রীকে মেরেছেন নাকি?

—মারুম না, স্যার! চাক্‌রির মর্ম ওরা কি বুঝবে? লাল জুতায় কালা কালি লাগাইয়া আমার চাকরিডা খাইছিল আর কি! খুব মারছি, স্যার।

দারোগাবাবুর কথার ধরনে পুলিশ কর্তা আর গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারেন না। হো হো শব্দে হেসে ওঠেন।

হেসে উঠি আমিও। অমিতও হাসে। হাসতে হাসতে আমি বললাম, এরপর বোধহয় দারোগাবাবুর আর শাস্তি পেতে হয়নি? স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম-প্রহার করেই বোধহয় নিজের শাস্তি সে এড়িয়ে গিয়েছিল? কিন্তু সত্যি সত্যিই সে তার স্ত্রীকে মেরেছিল নাকি?

জবাবে অমিত বললে, তা' জানি না ভাই। ঘটনার সেইটুকু আর জানতে পারিনি।

আমি ঠাট্টার সুরে বললাম, তা ভাই, তোমার বেলায় তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। স্মৃতিকণা যে ধরনের মেয়ে তাতে তার এমনি ভুল কোনকালেই যে হবে না, সে বিষয়ে আমি তোমাকে হাণ্ড্রেড্ পার্সেণ্ট্ গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

অমিত আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এবার উঠি, অনেক রাত হল।

অমিত বললে, কোথায় এমন রাত হল? মাত্র তো দশটা।

—দশটা কি কম রাত নাকি? তা'ছাড়া, তুমি আজ নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে। কাল খুব সকালে উঠে তোমাকে মাস্টার প্যারেডে যেতে হবে না?

—আরে, সে হবেখন। এখন তো বস।

অমিতের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমাকে আবার বসতে হল। একটু সময় চুপ করে থেকে ভারিকণ্ঠে অমিত আবার বললে, থানায় তো বড়বাবুর ঘরেই এতক্ষণ বসেছিলে। বড়বাবু তোমাকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেননি।

—তোমার সম্বন্ধে? কই, না তো।

—আমার বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের কাছে যে একটা দরখাস্ত এসেছে যে সম্বন্ধে বড়বাবু তোমাকে কিছুই বলেননি?

—তোমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত? সেকি? কে করেছে সেই দরখাস্ত? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি আমি।

অমিতের মুখখানা অকস্মাৎ বেদনাময় হয়ে ওঠে। বিষণ্ণ কণ্ঠে সে জবাব দেয়, বেনামী দরখাস্ত। কে করেছে জানি না। তাতে আমার বিরুদ্ধে নানাধরনের কল্পিত অভিযোগ। পুলিশ সুপার আবার দরখাস্তখানা থানার বড়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে আমি বললাম, এতে তুমি এত মুষড়ে পড়েছ কেন? যতদূর জানি, পুলিশ অফিসারদের ভাগ্যে একরকম দরখাস্ত হামেশাই জুটে থাকে। এই সামান্য কারণে বিচলিত হলে কি চলে?

খনিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে অমিত একসময় বললে, তা' হয়ত ঠিক। কিন্তু আমি ভাবছি, আজ পর্যন্ত কখনও কোন অন্যায় করেছি বলে তো মনে পড়ে না। কারুর সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহারও করিনি। জনসাধারনের কল্যাণ চেয়েছি বরাবর। তাদের ভালবাসতে চেয়েছি, তাদের ভালোবাসা পেতে চেয়েছি। কিন্তু তবুও কেন আমার বিরুদ্ধে এই অপবাদ?

অমিতের শুচিশুভ্র মুখের দিকে তাকিয়ে আমার দুঃখ হয়। মনে পড়ে আর একটি দিনের কথা। সেদিন এখানে বসেই অমিত একটা কবিতার বই পড়ছিল। আমিও বসে বসে একটা মাসিকপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ অমিত পড়া থামিয়ে খোলা বইটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠেছিল, জানো ভাই তরুণ, কবিগুরুর এই বক্তব্যকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু সফল হলাম কোথায়? খোলা মন নিয়ে বারে বারে এগিয়ে গিয়েছি তাদের কাছে । হাত বাড়িয়ে দিয়েছি তাদের দিকে। কিন্তু তবুও কোন বন্ধুত্বপূর্ণ হাতের স্পর্শ পেলাম না। তাই মাঝে মাঝে ভয় হয়, এসব বুঝি কেবল আমার মিথ্যা কল্পনা।

বইটার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই আমার নজরে পড়ে কয়েকটা লাইন—"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক। আর কিছু নয়, এই মোর শেষ পরিচয়।"

আর কেউ বিশ্বাস করে কিনা জানি না, কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, অমিত তার চাকরির প্রথম দিনটি থেকেই আমাদের লোক হতে চেয়েছিল। সে চেয়েছিল আমাদের মধ্যে একটা সুস্থ সুন্দর সম্পর্ক। আমি আর তুমি ভিন্ন নয়। "আমি তোমাদেরই লোক"—তার মতে এই হওয়া উচিত পুলিশের একমাত্র পরিচয়।

কিন্তু কেন যেন বারে বারে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এক এক সময় সব কিছুকেই যেন আকাশ-কুসুম বলে মনে হয় অমিতের। এ যেন কেবল অলীক কল্পনা। বাস্তবে যেন এ জিনিস সম্ভব কেন। কিন্তু কেন—কেন সম্ভব নয়?

এর জবাব অমিত জানে। কিন্তু জেনেও যেন জানতে চায় না। বুঝেও বুঝতে পারে না। তা'হলে যে তার আদর্শটাই মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়!

দোষ কারুর একার নয়। দোষ সকলের। পুলিশ অসৎ—একথা মোটেই মিথ্যে নয়। তারা অসাধু, তারা লোভী। কিন্তু এই অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেয় কে? তাদের লোভের খোরাক জোগায় কারা?

আমি বললাম, দেখ অমিত, তুমি তো জানো, তুমি যতই কেন না ভাল কাজ করো, বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে যতই কেন না জনসাধারণের উপকার করতে চেষ্টা করো, সবাইকে সন্তুষ্ট করা একা তোমার পক্ষে কেন, কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই যারা অসন্তুষ্ট হবে তারা এই ব্যাক্‌ডোর পলিসি নিয়ে তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইবে। এতে মন খারাপ করে লাভ কি?

অমিত আর কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। একটু সময় চুপ করে থেকে আমি আবার বললাম, তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে যখন সৎ অসৎ দুই-ই আছে তখন এ ধরনের দু'চারটা অভিযোগপূর্ণ উড়ো চিঠি তোমার মত অপাত্রে পড়লেও অধিকাংশই দেখা যায় ঠিক ঠিক উচিত পাত্রে পড়ে, আর সেই সব অসৎ অফিসারদের মুখোস খুলে দিতে সাহায্য করে—একথা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করো?

—হ্যাঁ, তা' স্বীকার করি। কিন্তু এতে কি সময় সময় সৎ অফিসারদের মোরাল নষ্ট হয়ে যায় না?

আমি বললাম, দেখ ভাই অমিত, একটা সত্যি কথা না বলে পারছি না। বলতে পারো তোমাদের মধ্যে ক'জন কর্তব্য করতে গিয়ে জনসাধারণের মোরালের দিকে নজর রাখে? পুলিশের মধ্যে কেউ কেউ জনসাধারণের সঙ্গে যে চরম দুর্ব্যবহার করে তা' বোধহয় মিথ্যে নয়? বিশেষ করে, দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোককে তোমাদের মধ্যে অনেকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। এতে তাদের মোরাল নষ্ট হচ্ছে কিনা তাব খোঁজ কি তোমরা রাখো?

অমিতের মনে কষ্ট দেবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু পুলিশ—পাবলিক রিলেশানের ক্ষেত্রে জনসাধারণেরও যে কিছু বক্তব্য আছে সেই কথাটাই কেবল ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম।

অমিত কিন্তু আমার অভিযোগগুলো খণ্ডন করতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে মাথা নিচু করে শুনতে থাকে আমার কথা।

আমি বলতে থাকি, জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্কের ব্যাপারে সেদিন তোমাদের বড়বাবুর কাছেই এমন একটি কাহিনী শুনলাম, যা' শুনে একদিকে যেমন আমার হাসি পাচ্ছিল তেমনি আবার কষ্টও হচ্ছিল। স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই এদেশের কোন একটি জেলার পুলিশ সুপার নাকি আদেশ জারি করলেন, কোন অভিযোগকারী থানায় এলে তার সঙ্গে কোনরকম দুর্ব্যবহার করা তো চলবেই না, বরঞ্চ তাকে চেয়ারে বসিয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে তার বক্তব্য শুনতে হবে এবং যথাসাধ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ সুপার নাকি আরও আদেশ দিলেন, যে তাঁর এই আদেশ অমান্য করবে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

জেলার অফিসার মহলের টনক নড়ল। বিশেষ করে থানার চেয়ারে বসে যে সব পুলিশ অফিসার নিজেদের রাজা-উজীর মনে করতে অভ্যস্ত তারা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি জানি, কে কখন গিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ করে, তার ঠিক কি?

তেমনি একজন অফিসার একদিন কোন একটি থানায় বসে আছে, এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক সসঙ্কোচে থানায় ঢুকে অতি বিনীত ভঙ্গিতে অফিসারটিকে নমস্কার করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অফিসারটি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লোকটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তার স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে প্রশ্ন করে, কি চাই?

—আজ্ঞে, আমার গোয়াল থেকে কাল রাতে একটা গরু চুরি হয়ে গেছে। জবাব দেয় লোকটি।

—ও—গরু চুরি? আচ্ছা, ঠিক আছে, বস। এজাহার নিচ্ছি। বলেই অফিসারটি এজাহার বইটা সামনে টেনে নেয়।

লোকটি কিন্তু করজোড়ে দাঁড়িয়েই থাকে।

দারোগাবাবু তখন সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে তাকে বললে, কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস।

লোকটির মুখখানা শুকিয়ে ওঠে। থানায় এসে বরাবর যারা ধমক্ খেতেই অভ্যস্ত তারা দারোগাবাবুর সামনে চেয়ারে বসবে কোন্ সাহসে?

ভ্রূকুঞ্চিত করে লোকটির দিকে তাকিয়ে দারোগাবাবু এবার একটু জোরেই বললে, কি, কথা শুনতে পাচ্ছো না? বস ঐখানে।

লোকটির মুখখানা এবার ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। মনে মনে শঙ্কিত হয় সে। ভাবে দারোগাবাবু কি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে?

এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় দারোগাবাবুর। পুলিশ সুপারের আদেশ আর মনে থাকে না। লোকটিকে একটা প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, তবে রে বেটা উল্লুক! বসতে বলছি, বসছিস্ না যে? মেরে হাড় একেবারে গুঁড়িয়ে দেব, জানিস? বলেই দারোগাবাবু টেবিলের ওপর থেকে কাঠের রুলারটা হাতে তুলে নিতেই, লোকটি অকস্মাৎ ঘরের বাইরে লাফিয়ে পড়ে একেবারে চোঁ-চোঁ দৌড়। পড়ে রইল তার এজাহার দেওয়া। এখন প্রাণটা বাঁচলেই সে-খুশি।

কাহিনী শেষ করে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারি না। অমিতও হেসে ওঠে আমার সঙ্গে।

একসময় হাসি থামিয়ে আমি বললাম, এবার বলো, সেই পুলিশ সুপারের আদেশ যদি এমনিভাবে প্রতিপালিত হয়, তবে ঐ সমস্ত অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের পুলিশ প্রীতি কি বাড়বে না কমবে? পুলিশ অফিসারেরাও তাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে?

হাসি থামিয়ে অমিত কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই তার সেই কম্বাইণ্ড্-হ্যাণ্ড্ ছোকরাটি ঘরে ঢুকে বললে, রান্না হয়ে গেছে, বাবু। আপনি কি এখন খাবেন?

আমি তাড়াতাড়ি আমার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, ইস্, অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার আমি উঠি! কাল তোমার প্যারেড্ রয়েছে। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। উঠতে তো হবে সেই সাতসকালে।

অমিত মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ, তা' হবে।

—আমি এবার চললাম। বলেই ভেজানো দরজা ঠেলে আমি বাইরে চলে এলাম।

রাস্তায় যেতে যেতে অমিতের কথাই ভাবতে থাকি। মনে মনে অমিতকে উদ্দেশ করে বলি, তুমি ভাই সত্যিই এই ডিপার্টমেণ্টে একেবারেই মিস্ ফিট্। এমন সংবেদনশীল মন নিয়ে সাক্সেসফুল অফিসার হতে পারলেও সুখী হতে পারবে না কোনদিন।

॥ সাতাশ ॥

কাঁটায় কাঁটায় বেলা ঠিক আটটায় থানায় ঢুকেই ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জী অমিতের খোঁজ করে।

সেদিন থানার মর্নিং ডিউটি ছিল অমিতের। হাতের পেন্সিলটা ডাইরী বইয়ের মধ্যে রেখে বইটা বন্ধ করে সে এসে দাঁড়ায় ভবদেবের ঘরে। তারপর জিজ্ঞেস করে, আমাকে ডেকেছেন, বড়বাবু?

—হ্যাঁ, তোমার খোঁজ করছিলাম। তুমি এখন কোন কাজে বাইরে যাচ্ছো নাকি?

—না বড়বাবু, জবাব দেয় অমিত, এখন তো আমার থানা ডিউটি।

—কেন, তোমাদের কালাপাহাড়বাবুর থানা ডিউটি ছিল না আজ? তিনি কোথায়?

আসল নাম তার কালাপাহাড় নয়। নামটা ছিল ভালই, সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। বিশাল দেহ, কালো আবলুস কাঠের মত গায়ের রঙ। দেহটি বড় বড় লোমে ঢাকা যেন সাক্ষাৎ এক গরিলা জাতীয় জীব। ঐ বিশাল চেহারার জন্যেই সারা জেলায় ওর নাম কালাপাহাড়—কালাপাহাড় চক্রবর্তী। সরকারী কাগজপত্রে অবশ্য এখনও ঐ সচ্চিদানন্দ নামটাই বর্তমান। কিন্তু লোকে তার ঐ আসল নামটা প্রায় ভুলেই গেছে।

কালাপাহাড়বাবু কিছুদিন একটা থানায় অফিসার-ইন্-চার্জের কাজও করেছিল। কিন্তু অচিরেই সেই এলাকার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তার কাজকর্মের দাপটে। একটার পর একটা দরখাস্ত আসতে শুরু করল জেলার পুলিশ কর্তার দপ্তরে ঐ কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে।

পুলিশ কর্তা তাকে বদলী করে দিলেন এমন একটি জায়গায় যেখানে খেয়াল খুশিমত কিছু করার কোন সুযোগ রইল না তার। খাঁচায় আবদ্ধ পশুর মত তিনটি বছর ছট্ফট্ করে সেখানে কাজ করলে কালাপাহাড়। অবশেষে পুলিশ কর্তার মন একটু নরম হল। বোধহয় তিনি ভাবলেন কালাপাহাড় এখন সত্যিই ভদ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডিপার্টমেণ্টের এমন একটি রত্নকে তিনি কোথায় নিয়ে গিয়ে বসাবেন? অবশেষে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি নিজের চোখের সামনে জেলার কোতোয়ালী থানায় পিনাকী সরকারের জায়গায় থার্ড অফিসার হিসেবে বদলী করলেন তাকে।

প্রথমটায় মনটা একটু খারাপ হয়েছিল কালাপাহাড়ের। শেষে কিনা থানার থার্ড অফিসার! তার মাথার ওপরে থাকবে আরও দু'জন অফিসার! তা-ও আবার এমন একটা থানার, যেখানে অফিসার ইন্-চার্জ হচ্ছে ভবদেব ব্যানার্জীর মত ডাকসাইটে ব্যক্তি! সেখানে তার নিজের কতটুকুই বা ক্ষমতা থাকবে! তা'ছাড়া ভবদেব ব্যানার্জী যেমন ঘোড়েল লোক তাতে তার সঙ্গে যে এঁটে ওঠা নিজের পক্ষে সম্ভব নয়, এ জ্ঞানও তার ছিল।

কিন্তু উপায় নেই। বদলির আদেশ যখন হয়েছে তখন যেতেই হবে সেখানে।

খবরটা আগেই পেয়েছিল ভবদেব। তাই একদিন অমিতকে ডেকে বললে, বুঝলে অমিত, পিনাকীবাবুর জায়গায় কে আসছেন জানো?

—না তো। জবাব দেয় অমিত।

—আসছেন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। নাম তাঁর সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী।

এই জেলায় আসার পর থেকে কালাপাহাড়ের নাম শুনলেও সচ্চিদানন্দর নামটা জানা ছিল না অমিতের। তাই সে বললে, কে তিনি? কোথায় আছেন এখন?

মৃদু হেসে ভবদেব বললে, সচ্চিদানন্দ ওরফে কালাপাহাড়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, একটু সময় থেমে ভবদেব আবার বললে, চোখ-কান খোলা রেখে একটু সমঝে চলো এবার থেকে। লোকটি কিন্তু তেমন সুবিধের নয়। সুযোগ পেলে যে কোন সময় তোমাকে বিপদে ফেলে দিতে পারে, বুঝলে?

প্রথমদিন থানায় এসেই কালাপাহাড় যথারীতি ভবদেবের ঘরে ঢুকে তার সাথে কথা বলে বেরিয়ে আসতেই অমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। অমিত তখন নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিল।

কালাপাহাড় অমিতের সামনে এসে সশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কুচকুচে কালোমুখে সাদা দাঁতের পাটি বের করে হেসে বললে, আপনিই বুঝি অমিতবাবু, থানার সেকেণ্ড অফিসার?

একটু হেসে অমিত জবাব দেয়, হ্যাঁ। আপনিই তো সচ্চিদানন্দবাবু? আমাদের এখানে পিনাকীবাবুর জায়গায় এলেন?

—হ্যাঁ, তবে আমাকে সবাই কালাপাহাড় বলে ডাকে এই চেহারার জন্যে।

অমিত আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

কালাপাহাড় বিষণ্ণ কণ্ঠে আবার বললে, দেখুন মশাই অবিচার! এমন অবিচার এই পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না। ও. সি' গিরি করেছি অনেকদিন। এখন কিনা' থার্ড অফিসার করে বদলী করলে এখানে! ঠুঁটো জগন্নাথ, বুঝলেন মশাই, এক্কেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ। কোন ক্ষমতা রইল না হাতে।

তারপর কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে অমিতের দিকে ঝুঁকে আবার বললে, তার উপর, ঐ ভবদেবের বাড়ুজ্যের মত একটি আস্ত ঘুঘুর পাল্লায় এসে পড়লাম। এখানে তো আছেন অনেকদিন। এতদিনে ঐ ঘুঘুটিকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন, কি বলেন মশাই?

কালাপাহাড়ের কথার ধরনে বিরক্ত বোধ করলেও মুখে কিছু প্রকাশ না করে অমিত বললে, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি বৈকি! বলেই টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত কাগজপত্রের দিকে মন দিতে চেষ্টা করে মনে মনে বললে, তার চাইতেও বেশি চিনতে পেরেছি আপনাকে এই সময়টুকুর মধ্যেই!

—হেঁ—হেঁ, তা' আর পারবেন না! আপনারা হচ্ছেন গিয়ে আজকালকার ছেলে। লেখাপড়াও শিখেছেন বিস্তর! মানুষ চিনতে আপনাদের তেমন বেগ পেতে হবে কেন?

চুপ করে থাকে অমিত।

কালাপাহাড় আবার বললে, আপনি হচ্ছেন গিয়ে সেকেণ্ড্ অফিসার। আর আমি থার্ড। তবে থার্ড অফিসার হলেও এই ডিপার্টমেণ্টে আপনার চেয়ে অভিজ্ঞতা আমার ঢের বেশি।

—তা' তো একশো বার। জবাব দেয় অমিত।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কালাপাহাড় আবার বললে, আপনি নতুন লোক হলেও কোন চিন্তা নেই আপনার। আমি আছি আপনার পাশে, বুঝলেন? আরে মশাই, থানার মেজ আর সেজ দারোগা যদি একজোট বাঁধে তো, ও. সি.'কে টিট্ করতে কতক্ষণ? তা' সে যতই ঘোড়েল মাল হোক না কেন, কি বলেন?

লোকটা নিদারুণ বোকা, মনে মনে ভাবে অমিত, নইলে প্রথম দিন আলাপের সূত্র ধরেই থানার ও. সি.'র পেছনে লাগতে কাউকে প্ররোচিত করে? ও. সি.'র সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কিরকম তা' ভালমত না জেনেই কেউ নিজের কুটিল চরিত্রের পরিচয় দেয় এমনি করে?

কালাপাহাড়ের কথায় কোনরকম মন্তব্য না করেই জোর করে মুখের ওপর একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে চুপ করে থাকে অমিত।

কালাপাহাড় বললে, এ থানায় কতদিন হ'ল আপনার?

মনে মনে হিসেব করে অমিত জবাব দেয়, প্রবেশনার পিরিয়ড্ শেষ হতেই এখানে বদলী হয়ে এসেছি। তা' প্রায় বছর দেড়েক হয়ে গেল।

—তা'হলে তো এতদিনে রক্তের স্বাদ নিশ্চয়ই পেয়েছেন, কি বলেন? বলেই কালাপাহাড় টেনে টেনে হাসতে থাকে।

অমিত ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কালাপাহাড়ের দিকে তাকাতেই সে আবার বললে, কি মশাই, কথাটা ধরতে পারলেন না? তারপর ডানহাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর সাহায্যে একটা ভঙ্গি করে অন্তরঙ্গ সুরে বললে, সুন্দরবনের বাঘ যেমন একবার রক্তের স্বাদ পেলে আর ভুলতে পারে না, এও ঠিক তাই, বুঝলেন?

অমিত কিছু জবাব দেবার আগেই কালাপাহাড় বলে ওঠে, না—না মশাই, এতে কিছু লজ্জার নেই। এ তো সহজ সরল কথা। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢুকে যদি দু'টো পয়সা পকেটেই না এল তো কি করলাম? তা' হ্যাঁ মশাই, এই থানায় আমদানী কি রকম?

রাগে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল অমিতের। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই লোকটার সামনে থেকে এখনই উঠে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা বিসদৃশ দেখাবে মনে করেই দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংবরণ করে সে চুপ করে থাকে। মনে মনে ভাবে, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সেই ব্ল্যাক্-শিপ্‌গুলোর একজন জলজ্যান্ত প্রতিনিধি বসে রয়েছে তার চোখের সামনেই।

এমনিভাবেই স্বনামধন্য কালাপাহাড়ের সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের সূত্রপাত হয়েছিল অমিতের।

তারপর যতই দিন যেতে থাকে ততই একটু একটু করে স্বরূপ প্রকাশ হতে থাকে কালাপাহাড়ের। একমাত্র ভবদেব ছাড়া থানার আর কাউকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। খুশিমত থানায় আসে যায়। অমিত তাকে থানা ডিউটি দিতে চাইলে মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে জবাব দেয়, দেখুন অমিতবাবু, থানায় বসে বসে এসব কুঁড়েমির কাজ আমার ঠিক ভালো লাগে না। এলাকায় ঘুরবো ফিরব, দেখাশুনা করব—এই তো হচ্ছে দারোগার আসল কাজ। বলেই নির্লজ্জের মত একটু হেসে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে অমিতের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

ভবদেবের প্রশ্নে অমিত বললে, হ্যাঁ, আজকের থানা ডিউটি ওকেই দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি নিতে রাজি হননি। তাই বাধ্য হয়ে নিজেকেই নিতে হল।

ভবদেব খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, ও—বুঝতে পেরেছি। উনি থানায় এসেছেন?

—না, এখনও আসেননি, জবাব দেয় অমিত।

—ঠিক আছে, থানায় এলেই ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে?

চক্‌চকে ধোপ্ দুরস্ত পোশাকে কালাপাহাড় ও. সি.'র ঘরে ঢুকতেই ভবদেব খানিকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। তার সেই আপাত শান্ত স্থির দৃষ্টি কিন্তু বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না কালাপাহাড়। বিব্রতকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, আমাকে—আমাকে আপনি খুঁজছিলেন, বড়বাবু?

সামান্য একটু হেসে ভবদেব জবাব দেয়, ও—হ্যাঁ, আপনাকে আমি ডেকেছিলাম বটে। তবে কেন ডেকেছিলাম তা-ই এতক্ষণ মনে করতে পারছিলাম না। এবার মনে পড়েছে। বলেই ভবদেব আবার কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে একসময় বললে, কিছু মনে করবেন না সচ্চিদানন্দবাবু, আপনি নতুন লোক, এই থানায় নতুন এসেছেন। তাই থানার ইন্‌চার্জ হিসেবে আপনাকে গোটাকতক কথা বলে দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি।

একটু থেমে ভবদেব আবার বলতে থাকে, কাল রাতে তো গিয়েছিলেন একটা চুরি মামলার তদন্তে। বাদীর বাড়ি মিনিট দশ-বারো কাটিয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত আপনি সেই অঞ্চলে যাদের পিছে ঘুরে কাটালেন ওরা কিন্তু বিশেষ সুবিধের লোক নয়। অত মিশতে যাবেন না ওদের সঙ্গে, বুঝলেন?

স্তব্ধ বিস্ময়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কালাপাহাড়। লোকটার নজর দেখছি সর্বত্র। তদন্তে গিয়ে সে কোথায় কি করেছে তাও দেখেছি লোকটার মুখস্ত।

ভবদেব আবার বললে, আপনি নতুন লোক, তাই আপনাকে একটু সাবধান করে দেয়া। নইলে, অফিসার হিসেবে আপনি যা' করবেন তা' তো আপনি নিজের দায়িত্বেই করবেন। ওরা নিচু ক্লাশের লোক—তাড়িওয়ালা, তাড়ির ব্যবসা করে খায়। আর পুলিশকেও ওরা ভয় করে। তাই না আপনি ভয় দেখিয়ে ওদের কাছে থেকে কিছু আদায় করতে পারলেন? কিন্তু মনে রাখবেন ওরা কিন্তু ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক। তাই বলছি, এবার থেকে যখন ওদের কাছে যাবেন, একা যাবেন না। নিদেন পক্ষে একটি কনস্টেবল্ অন্ততঃ সঙ্গে নেবেন, যে নাকি আপনার তেমন কোন বিপদ ঘটলে থানায় দৌড়ে এসে খবর দিতে পারবে, বুঝলেন?

মুখ থেকে একটি কথাও বের হয় না কালাপাহাড়ের। লোকটি যে প্রতিটি খবর নিখুঁতভাবে জোগাড় করেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য! এত অল্পসময়ের মধ্যে এত খবর সে জোগাড় করলে কি করে?

কালাপাহাড় কোন প্রশ্ন না করে পাংশুমুখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভবদেব আবার একটু হেসে বললে, ভাবছেন, আমি এত কথা কি করে জানতে পারলাম, তাই না? দেখুন, আমি এখানে বসে বসেই এলাকার যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর জানতে পারি। লক্ষ্য করে দেখবেন, খুব প্রয়োজন না হলে বিশেষ কোথাও যাই না আমি। কিন্তু এলাকার প্রতিটি খবর চলে আসে আমার কাছে। বলেই একটু কৃত্রিম হাসি হেসে তির্যকদৃষ্টিতে তাকায় কালাপাহাড়ের মুখের দিকে।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে থাকে ভবদেব, এই থানায় যখন বদলী হয়ে এসেছেন তখন থানার নিয়মকানুনগুলো একটু মানতে হবে বৈকি! থানা ডিউটি হয়ত আপনার ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু তাই বলে তা' না করলে চলবে কেন? মেজবাবু যা' করেন আমার হুকুম মতই করেন। কাজেই তিনি যখন যা' ডিউটি দেন, তা' না করে উপায় কি বলুন?

কালাপাহাড় এবার একটু নড়ে ওঠে। হয়ত কিছু একটা জবাব দিতে যায়। কিন্তু তার আগেই আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে মুখের ভাব ও কণ্ঠস্বর পাল্টে ফেলে গম্ভীরকণ্ঠে ভবদেব বললে, একটা বিশেষ কাজে মেজবাবুকে একটা জায়গায় পাঠাতে হবে। আপনি গিয়ে ওর কাছ থেকে থানা ডিউটি বুঝে নিন। বলেই কালাপাহাড়কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বাঁ হাতে টেলিফোন রিসিভারটা কানের কাছে তুলে নেয়।

আরও একটু সময় স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে কালাপাহাড়। তারপর ভবদেবের মুখের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

অমিত ঘরে ঢুকতেই ভবদেব জিজ্ঞেস করে, সচ্চিদানন্দবাবুকে ডিউটি বুঝিয়ে দিয়েছো?

—হ্যাঁ বড়বাবু, রাগে মুখখানা লাল করে আমার কাছ থেকে ডিউটি নিয়েছেন।

হেসে ভবদেব বললে, ভুল করছো কেন? লাল নয়, ঐ চেহারায় রেগে গেলে বরঞ্চ বেগুনী হয়ে যেতে পারে। তা, মনে হচ্ছে এবার থেকে ভদ্রলোক হয়ত ঠিকমত থানা ডিউটি করবে।

একটু থেমে ভবদেব আবার বললে, হ্যাঁ, যে জন্যে তোমাকে ডাকা, আজ বেলা দশটা থেকে ধূর্জটিবাবুর সেই ফায়ারিংয়ের ব্যাপারে জুডিশিয়াল এন্‌কোয়ারী শুরু হচ্ছে। ধূর্জটিবাবুকে তো যেতেই হবে, সেই সঙ্গে তুমিও থাকবে তার কাছে কাছে। সে যেন মনে না করে, তার এই বিপদের সময় আমরা তাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছি।

অমিত জিজ্ঞেস করে, জুডিশিয়াল এন্‌কোয়ারী হচ্ছে কোথায়? করছেন কে?

—ডিষ্ট্রিক্ট জজ নিজে তাঁর এজলাশে বসে এন্‌কোয়ারী করবেন। বলেই ভবদেব নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আবার বললে, সাড়ে নটা বেজে গেছে। ঠিক দশটায় এন্‌কোয়ারী শুরু হবে। ধূর্জটিবাবু বোধহয় এতক্ষণে কোর্টে চলে গেছে। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দু'টো খেয়ে চলে যাও সেখানে। এন্‌কোয়ারী শেষ হতে হয়ত বিকেল হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি। বলেই অমিত ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

অমিত মনে মনে ভেবেছিল, আদালতে গিয়ে হয়ত প্রচণ্ড ভিড় দেখতে পাবে। সোজা কথা তো নয়! যে পুলিশ ফায়ারিংয়ের ব্যাপারে সারা শহরটা তোলপাড় হয়ে উঠেছিল, সেই ঘটনার এন্‌কোয়ারী হবে আজ। সেদিন যারা পুলিশের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল, তারা নিশ্চয়ই এসে ভিড় করে দাঁড়াবে আদালতের সামনে। অপরাধী পুলিশ অফিসারের এন্‌কোয়ারী পর্বটা দেখতে নিশ্চয়ই উৎসুক হয়ে উঠবে তারা।

কিন্তু, হা হতোস্মি! কোথায় লোকজন? সেদিন যাদের এত উৎসাহ দেখা গিয়েছিল আজকে তারা প্রায় কেউই নেই।

জজ সাহেব তখনও এজলাশে আসেননি। জনাকয়েক উকিল বসে রয়েছে সারিবদ্ধ চেয়ার অধিকার করে। একপাশে কয়েকজন সাক্ষী। আর, অন্যপাশে শুক্‌নো মুখে বসে রয়েছে ধূর্জটি।

অমিতকে দেখেই মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ধূর্জটির। বললে, এখানে কেন? কোন কাজ আছে নাকি?

জবাবে অমিত বললে, আপনার এই এনকোয়ারীর ব্যাপারেই বড়বাবু আমাকে পাঠালেন। যদি আপনার কিছু দরকার হয়।

ধূর্জটি নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললে, বড়বাবুর নজর সবদিকে। তবে, আমার আর কি প্রয়োজন হবে! আমার তরফে একজন উকিল দিয়েছি, এই পর্যন্ত।

মাথার টুপিটা হাতে নিয়ে অমিত বসে পড়ে ধূর্জটির পাশে।

একটু পরে, অমিত ধূর্জটিকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ধূর্জটিবাবু, এমন একটা ব্যাপার, এত হৈ-চৈ হল সারা শহরে, কিন্তু আজ এখানে লোকজন নেই কেন?

ধূর্জটি কোন জবাব না দিয়ে একটু ম্লান হেসে চুপ করে থাকে। মেজবাবু তো জানে না, এসব ব্যাপারে এমনিই হয়। যে ঘটনা নিয়ে সারা শহর তোলপাড় হয়ে উঠল, দু'দিন যেতে না যেতেই সবাই ভুলে গেল সেকথা। জুডিশিয়াল এন্‌কোয়ারীর দাবীতে সেদিন যে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সব চাইতে বেশি, সে-ই আজ এই এন্‌কোয়ারীর ব্যাপারে কোন উৎসাহ বোধ করে না। এমনিই হয়। জনগণের স্বভাবই এই। বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায় তারা সবকিছু।

জজ সাহেব এজলাশে এলেন ঠিক সাড়ে দশটায়। তারপর যথারীতি শুরু হল এন্‌কোয়ারী।

এন্‌কোয়ারী শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। অনেক চেষ্টা করেও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পাঁচ-ছ'জনের বেশী সাক্ষী জোগাড় করা যায়নি। আর ধূর্জটির পক্ষে ছিল একজন মাত্র সাক্ষী—সেই ট্রাফিক্ কনস্টেবলটি, যে নাকি মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে মাসখানেক হাসপাতালে পড়েছিল।

সাক্ষী-সাবুদের জেরা শেষ হল প্রায় দু'টো নাগাদ। জজ সাহেব পরের দিন রায় দেবেন বলে জানিয়ে দিয়ে খাসকামরায় চলে গেলেন। ধূর্জটিকে সঙ্গে নিয়ে অমিতও আদালত থেকে বেরিয়ে এল।

পথে যেতে যেতে ধূর্জটি একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, বুঝলেন মেজবাবু, জজ সাহেবের রায় যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, তবে তো আমার বিরুদ্ধে মার্ডার কেস্ হবে। আর সেই মামলার তদন্ত করতে হবে আপনাদেরই।

অমিত জবাব দেয়, তা' কেন? আপনার বিরুদ্ধে যে মার্ডার কেস্ হবেই তার কি মানে আছে? কর্তৃপক্ষ ডিপার্টমেণ্টাল্ এ্যাক্‌শানও নিতে পারে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ তেমন-ই তো শুনলাম।

ধূর্জটি আর কিছু না বলে মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে স্মৃতিকণাদের বাড়িতে আসার সময় হল অমিতের। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল বাড়ির পুরনো ঝি'র সঙ্গে। স্ত্রীলোকটি অমিতকে দেখেই একগাল হেসে বলে ওঠে, এসেছেন দাদাবাবু, এদিকে কর্তাবাবু তো রোজই একবার করে আপনার কথা বলেন। আর দিদিমণি তো—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে ফিক্ করে একটু হেসে সেখান থেকে সরে পড়ে স্ত্রীলোকটি। অমিত সোজা চলে যায় অজিতেশবাবুর ঘরে।

বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত নিজের মনে সেকালের কতকগুলো পুরনো আইনের বই ঘাঁটছিলেন। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে অমিতকে দেখেই বললেন, এসো—এসো। আমি জানতাম তুমি আজ আসবে।

অমিত অজিতেশবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে একটা চেয়ারে বসতেই অজিতেশবাবু বইগুলো একপাশে ঠেলে রেখে বললে, সেই ফায়ারিংয়ের এন্‌কোয়ারীর রায় দিয়েছে আজ, তাই না?

সঙ্কুচিতকণ্ঠে অমিত জবাব দেয়, হ্যাঁ।

তারপর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে মাথা নিচু করে অমিত আবার বললে, ফায়ারিং জাস্টিফায়েড্ হয়েছে বলে জজ সাহেব রায় দিয়েছেন।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে অজিতেশবাবু শান্তকণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করেন, জজ সাহেব তাঁর ফাইণ্ডিং পড়বার সময় তুমি আদালতে উপস্থিত ছিলে? তিনি ব্যাপারটাকে জাস্টিফায়েড্ দেখাতে গিয়ে কি গ্রাউণ্ড্ দেখিয়েছেন, বলতে পারো?

মাথা নিচু করে তেমনি সঙ্কুচিতকণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, হ্যাঁ, উপস্থিত ছিলাম। পঁচিশ পাতা ফাইণ্ডিং পড়লেন তিনি। তাতে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঐ অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ধূর্জটিবাবুর পক্ষে গুলি চালানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

অজিতেশবাবু আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, যাক্, ভালই হল। যে যাবার সে তো চলেই গেছে। এখন শুধু শুধু একটা লোককে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে উপোস করিয়ে লাভ কি। সে তো ছিল কেবল নিমিত্ত মাত্র। তার হাত দিয়েই ঠাকুর এই দত্তবংশের শেষ প্রদীপটি কেড়ে নিলেন। তারা—তারা—মা! বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি।

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বললেন, যাক্ গে ওসব কথা। তুমি কেমন আছো? শিলিগুড়ি থেকে তোমার বাবার খবর কিছু পেয়েছো?

এতক্ষণে মাথা তোলে অমিত। তারপর অপেক্ষাকৃত সহজকণ্ঠে জবাব দেয়, আমি ভালই আছি। কাল বাবার চিঠি পেয়েছি। সেখানে তাঁরা ভালই আছেন।

—হ্যাঁ, বাবা। ভাল থাকলেই ভাল। যা' দিনকাল পড়েছে, তাতে তো ভাল থাকাই মুশকিল।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আর হ্যাঁ, তোমার সেই প্রফেসর বন্ধুটির, কি যেন নাম—সেই বরুণ, না কি যেন—

—তরুণ—তরুণ ঘোষ। অমিত বললে।

—হ্যাঁ, তরুণ, তাকে একদিন এখানে নিয়ে এসো। অনেকদিন দেখিনি তাকে। চমৎকার ছেলে। কথা বলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

আমার সুখ্যাতিতে সেই মুহূর্তে বন্ধুগর্বে অমিতের বুকখানা ভরে ওঠে। সে জবাব দেয়, আচ্ছা, নিয়ে আসব একদিন।

অজিতেশবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে স্মৃতিকণার ঘরে ঢুকতেই অমিত লক্ষ্য করে স্মৃতিকণা জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

অমিত স্মৃতিকণার কাছে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, স্মৃতি!

ধীরে ধীরের ঘুরে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা। অমিত লক্ষ্য করে তার দু'চোখে জল।

—ওকি, তুমি কাঁদছো? অমিত বললে।

স্মৃতিকণা তার শাড়ির আঁচলে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে, কই, না তো। চোখ দুটো কেন যেন একটু জ্বালা করছিল। তাই—

অমিত একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আমার কাছে কিছু লুকিও না স্মৃতি। কেন কাঁদছিলে বলো!

স্মৃতিকণা কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকে।

অমিত পীড়াপীড়ি করে, কি বলবে না আমাকে? আমি এ ক'দিন এদিকে আসতে পারিনি বলেই কি অভিমানিনীর চোখে জল এসে গেল? বলেই অমিত তার চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে।

হাসতে গিয়ে কিন্তু স্মৃতিকণার চোখে আবার জল জমে যায়। নিজেকে সংযত করে মৃদুকণ্ঠে সে জবাব দেয়, তোমার ওপর অভিমান করে থাকলেই কি তুমি আমার কথা শুনবে? আমি জানি, ইচ্ছে থাকলেও কাজের চাপে তুমি আসতে পারোনি। আমি কাঁদছি সেজন্যে নয়।

কেমন যেন একটু নিরাশ হয় অমিত। স্মৃতিকণার এই অশ্রুকে অভিমানিনীর চোখের জল বলে ধরে নিতে পারলেই বোধহয় মনে মনে সে তৃপ্তি পেত।

—তবে, এখানে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন? প্রশ্ন করে অমিত।

একমুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে আস্তে আস্তে জবাব দেয় স্মৃতিকণা, বারান্দায় যেতে যেতে বাবার ঘরে তোমাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। তাই হঠাৎ সেই বোকা ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল। বলতে বলতে আবার দু' ফোঁটা মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়ে স্মৃতিকণার চোখের কোল বেয়ে।

আর কোন প্রশ্ন জোগায় না অমিতের মুখে। একটু সময় বাইরে তাকিয়ে থেকে সে আবার বললে, হ্যাঁ, জজ সাহেব সেই ফায়ারিং জাস্টিফায়েড্ বলে ঘোষণা করেছেন। এতদিনে নিষ্কৃতি পেল সেই লোকটি।

—কার কথা বলছো তুমি? প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা।

—ফায়ারিং আন্ জাস্টিফায়েড হলে যে লোকটির চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল সেই ধূর্জটি গাঙ্গুলীর কথাই বলছি। নিজের কৃতকর্মে নিজেই মনে মনে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। এর ওপর, চাকরি থেকে বরখাস্ত হলে বোধহয় মরার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ত।

একটু সময় ইতস্ততঃ করে অমিত আবার বললে, আজ বরঞ্চ আমি যাই, আর একদিন আসব।

স্মৃতিকণা তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বললে, সেকি, এসেই চলে যাবে কেন? একমাত্র ঐ খবরটা দিতেই কি তুমি এসেছিলে?

—না, তা' নয়। অনেকদিন জোড়পুকুর মাঠে বেড়াতে যাইনি। তাই ভেবেছিলাম আজ তোমাকে নিয়ে একবার ওদিকে যাব।

—কেন, আমি কি যাব না বলেছি? প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা।

—না, তা' অবশ্য বলো নি। তবে—

স্মৃতিকণা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। অমিতের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, না এর মধ্যে কোন তবে নেই। তারপর অমিতের একেবারে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে বললে, তাই চলো। একটু বেড়িয়েই আসি। নইলে মনটা কিছুতেই শান্ত হবে না।

—বেশ, চলো।

জোড়পুকুরের মাঠে তখন সবে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দেবদারু আর ঝাউগাছগুলো প্রহরীর মত বেষ্টন করে রেখেছে সারা মাঠটা। খেলাধুলোর শেষে ছেলের দল বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে। সান্ধ্য-ভ্রমণকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। মাঠের প্রবেশপথে রাস্তার পাশে ঝালমুড়ি ও বাদামওয়ালারা কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়ে বেচাকেনায় ব্যস্ত।

স্মৃতিকণাকে সঙ্গে নিয়ে অমিত ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ায় তাদের পরিচিত সেই দেবদারু গাছটার নিচে।

দু'জনে খানিকক্ষণ পাশাপাশি চুপ করে বসে থাকে। এক সময় অমিত মৃদুকণ্ঠে ডাকে, স্মৃতি!

—বলো। তেমনি মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় স্মৃতিকণা।

অমিত স্মৃতিকণার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবার খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একসময় সামনের উঁচু গীর্জাটার চূড়ায় লাল আলোটা দেখিয়ে বললে, আজকাল ঐ লাল আলোটার দিকে তাকালে আমার কেন যেন ভয় করে।

—কিসের ভয়? প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা। তুমি পুরুষ, তোমার আবার ভয় কিসের?

—না—না, সে ভয়ের কথা বলছি না। ঐ লাল আলোটার দিকে তাকালেই কেন যেন মনে হয়, ওটা রক্তচক্ষু মেলে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে। যেন বলছে, যাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পেতে চাইছিস তাকে সুখী করতে পারবি তো? জীবনের পথ বড় কঠিন। ঐ পথে পা বাড়াবার আগে ভালমত ভেবে-চিন্তে নিস্। খুব সাবধান!

স্মৃতিকণা গীর্জার লাল আলোটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, একথা ভাবছো কেন তুমি? আমাকে নিয়ে এত চিন্তিত হচ্ছো কেন?

—না হয়ে উপায় কি, বলো? যে চাকরি করি তাতে তোমার দিকে কি তেমন নজর দিতে পারব? থানার ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জীর স্ত্রীকে দেখছি, দেখছি পিনাকী সরকারের স্ত্রীকে। তারা যেন কেউই সুখী নয়। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘটলে মানুষের মুখের

ওপর যে ধরনের অসন্তুষ্টির ছায়া পড়ে, তেমনি ছায়া-ই যেন আমি দেখতে পেয়েছি তাদের মুখে।

অমিতের কথায় স্মৃতিকণা হেসে উঠে বললে, তেমনি কোন ছায়া আমার মুখের ওপরও দেখতে পেয়েছো নাকি?

—না। এখনও পাইনি। তবে, ভবিষ্যতে পাব কিনা, তাই ভাবছি।

স্মৃতিকণা তেমনি হেসে আবার বললে, ভবিষ্যতের ভাবনা তোমাকে এখনই ভাবতে হবে না। তুমি দিন দিন বড় বেশি ভাবুক হয়ে উঠছো। পুলিশের চাকরি না করে কবি হওয়া উচিত ছিল তোমার। এত ভাবুক মন নিয়ে তুমি এই চাকরি কি করে করছো, তাই ভাবি।

এবার অমিত হেসে উঠে বললে, তা'হলে তুমিও আমার মত ভাব?

—বাঃ, ভাবব না? ভাবনা-চিন্তা কি তোমার একার নাকি? তা'ছাড়া, সঙ্গদোষে এমনিই হয়। বলেই স্মৃতিকণা সশব্দে হেসে ওঠে।

অমিত আর কিছু না বলে কেবল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখেব দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

হাসি থামিয়ে একটু সময় চুপ করে থাকে স্মৃতিকণা। তারপর আবার বললে, যে চাকরি তুমি করছো তাতে তুমি আমার ওপর নজর দিতে না পারলেও ক্ষতি কি? আমি তো আর তোমার ঐ চাকরি করছি না। তোমার দিকে নজর দিতে পারলেই আমি খুশি। এর বেশি আর কিছু চাই না আমি।

—তুমি—তুমি সত্যিকথা বলছো, স্মৃতি? আবেগপূর্ণকণ্ঠে বলে অমিত।

—আমি কি তোমার কাছে কখনও মিথ্যে বলি? তুমি একটুও ভয় পেও না। তুমি আর আমি দু'জনে মিলে যে ঘরখানি বাঁধব সেখানে দুঃখের লেশমাত্র থাকবে না।

অমিত ধীরে ধীরে নিজের বাঁ হাতখানা স্মৃতিকণার কাঁধের ওপর রাখে। একটা অনাস্বাদিত আনন্দের গভীরতায় সারা মনপ্রাণ উদ্বেল হয়ে ওঠে তার। আত্ম-শাসনের কঠিন শৃঙ্খল টুক্‌রো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে সেই মুহূর্তে। পারিপার্শ্বিকতার কথাও মনে থাকে না তার। স্মৃতিকণার দিকে ঘুরে বসে দু'হাতে তার সুন্দর মুখখানি তুলে ধরে অমিত।

একটা দ্বিধা-সংকোচপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় চোখদু'টো বুজে আসে স্মৃতিকণার। তার গোলাপের পাপড়ির মত লাল্‌চে ঠোঁট দু'খানি একজোড়া আকাঙ্খিত বস্তুর প্রথম স্পর্শের আশায় থর থর করে কেঁপে ওঠে। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যেও অমিতের মনে হয় স্মৃতিকণার মসৃণ গাল দু'খানি যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

অমিতের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। জীবনে এই প্রথম একটি নারীর মুখে ভালবাসার চিহ্ন এঁকে দিতে চলেছে সে। অক্ষয় হয়ে থাকবে এই চিহ্ন দু'জনের মনেই। এর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় অতি সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখবে তারা জীবনভোর।

অমিত একটু একটু করে ঝুঁকে পড়ে স্মৃতিকণার মুখের ওপর। স্মৃতিকণার স্বপ্ন-ঘেরা সুন্দর মুখখানা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। তার উষ্ণ নিশ্বাস এসে লাগে তার চোখে-মুখে। রসে টইটম্বুর স্মৃতিকণার ঠোঁট দু'খানির কম্পন যেন আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

ঠোঁটের ঐ কম্পনকে থামিয়ে দিতে হবে। যুগে যুগে পুরুষ যেমনি করে তার মানসীর ঠোঁটের কম্পন থামিয়ে দিয়ে আসছে, ঠিক তেমনি করেই থামিয়ে দিতে হবে।

একটি মুহূর্তমাত্র। এখনই সবকিছু একাকার হয়ে যাবে। বাঁধভাঙা বন্যায় দু'কূল ছাপিয়ে উঠবে এখনই।

হঠাৎ, পেছনে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে। কারা যেন কথা বলতে বলতে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

অমিত বিদ্যুৎবেগে স্মৃতিকণার মুখখানা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে বসে। স্মৃতিকণাও চমকে উঠে তার শাড়ির স্খলিত আঁচলটা সামলে নেয়। একটা তীব্র বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের মন। বাঁধভাঙা বন্যা যেন একটা পাষাণ দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। দু'কূল ছাপিয়ে ওঠবার আর অবসর পেল না।

লোকগুলো কিন্তু কথা বলতে বলতে অন্যদিকে চলে গেল। তারা ওদের দেখতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

অমিত উঠে দাঁড়ায়। বাঁ হাতে ধুতির ধুলো ঝেড়ে ফেলে ডান হাতখানা স্মৃতিকণার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, চলো, আর এখানে নয়। এবার ওঠা যাক।

অমিতের হাতখানা ধরে উঠে দাঁড়ায় স্মৃতিকণা। তারপর বললে, এবার বাড়ি ফিরবে তো?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অমিত বললে, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর ফিরব।

রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে স্মৃতিকণা আবাব প্রশ্ন করে, আজ থানায় যাবে না?

—হ্যাঁ, যাব। আজ আমার নাইট ডিউটি।

—বাড়ি ফিরবে তো কাল সকালে, তাই না?

মৃদু হেসে অমিত জবাব দেয়, নিয়ম অবশ্য তাই। কিন্তু সবসময় তা' ঠিক হয়ে ওঠে না। হাতে প্রচুর কাজ। তাই বাড়ি ফিরতে সেই বারোটা-একটা।

স্মৃতিকণা এবার একটু উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, এত পরিশ্রম করো কেন?

অমিত উদাসকণ্ঠে জবাব দেয়, না করে উপায় নেই বলেই করতে হয়। পুলিশের জীবনটাই এমনি।

—খুব কষ্ট হয় তো? দরদ মাখানো সুরে প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা।

স্মৃতিকণার প্রশ্নের তখনই কোন জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ নিশব্দে পথ চলে অমিত। তারপর একসময় চলার বেগ একটু কমিয়ে দিয়ে বিষণ্ণকণ্ঠে বললে, না, এতে কষ্ট হয় না। শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে করি না। কিন্তু কষ্ট হয় অন্য কারণে।

স্মৃতিকণা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে মাথা নিচু করে পথ চলতে থাকে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে অমিত আবার বলতে থাকে, বুঝলে স্মৃতি, যাদের সাহায্য করতে গিয়ে এত পরিশ্রম করছি, তারাই যখন বিনা কারণে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তখনই কষ্ট হয়। যে আদর্শ নিয়ে এই চাকরিতে ঢুকেছিলাম, সেই আদর্শে আর আস্থা রাখতে না পেরে যখন শঙ্কিত হয়ে উঠি, তখন সত্যি সত্যিই মনটা হাহাকার করে ওঠে।

অমিত থামতেই স্মৃতিকণা বলে ওঠে, তা'হলে তো বলতে হয়, তোমার আন্তরিকতায় বোধহয় কোন খাদ আছে। নইলে, আমার বিশ্বাস, জনসাধারণ এত কৃতঘ্ন নয়। তারা উপকারীর উপকার মনে রাখতে জানে। আসল-নকল চিনে নেবার স্বাভাবিক ক্ষমতাও তাদের আছে।

প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে অমিতের কণ্ঠে। সে বললে, আমার আন্তরিকতায় তুমি সন্দেহ করো, স্মৃতি?

—না, তা' করি না। কিন্তু তুমি একাই তো তোমাদের এই গোটা ডিপার্টমেন্ট্ নও। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই তেমন আন্তরিকতা নেই কিংবা থাকলেও তা' একেবারেই মেকি। তাই, জনসাধারণ এক থলি মেকি সিকি আধুলির মধ্য থেকে আসলটি চিনে নিতে যদি ভুল করে তা'হলে কি সমস্ত দোষটা তাদের ঘাড়ে চাপানো উচিত?

এ ধরনের আলোচনা স্মৃতিকণার সঙ্গে না হলেও আমার সঙ্গে অমিতের বহুদিন হয়েছে। কিন্তু অমিতের সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, স্মৃতিকণা যেমনি সহজ সরলভাবে জনসাধারণের সত্যিকারের মনোভাবটি তুলে ধরেছে, এমনি প্রাঞ্জলভাবে আমিও তা' কোনদিন প্রকাশ করতে পারিনি।

চলতে চলতে অমিত জবাব দেয়, হয়ত তোমার কথাই ঠিক, স্মৃতি। কিন্তু এ নিয়ে মাঝে মাঝেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে ওঠে আমার। এক এক সময় ভাবি, এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় স্মৃতিকণা, তা'হলে তো তোমার পরাজয় হবে। নিজের আদর্শ সামনে তুলে ধরে পথ চলতে না পেরে আদর্শচ্যুতির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া তো পরাজয়েরই সামিল। সেই গ্লানি কি তুমি সহ্য করতে পারবে?

অমিত এই প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব দিতে না পেরে নিঃশব্দে পথ চলতে থাকে ;

*　　　*　　　*

বিকেলে অমিত থানায় ঢুকতেই ডিউটি অফিসার জুনিয়র এ. এস্. আই. সুশান্ত বলে ওঠে, আপনি এসে পড়েছেন, মেজবাবু? আমি ভাবছিলাম আপনার বাসায় লোক পাঠাব।

—কেন? বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে অমিত।

সুশান্ত বললে, বেলা তিনটে নাগাদ একটা ইউ, ডি, কেস্ এসে পড়ে আছে। কে যে সেখানে যাবে বুঝতে পারছি না।

—বড়বাবুকে খবর দেননি? অমিত জিজ্ঞেস করে।

—না। বেলা আড়াইটে নাগাদ থানার কাজ শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরছেন। তাই তাঁকে বিরক্ত করিনি।

—ভালই করেছেন। তা, শ্রীপতিবাবু তো এখনও অসুস্থ, তাই না?

—হ্যাঁ। জ্বরে ভুগছেন তিনি।

একমুহূর্ত চিন্তা করে অমিত আবার প্রশ্ন করে, কোথাকার কেস?

—আজ্ঞে, মনসাতলার বস্তিতে একটা মেয়েছেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

মনসাতলার বস্তির নাম শুনেই অমিতের ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সুশান্তকে।

কিন্তু তার আগেই সুশান্ত আবার বললে, কিছুক্ষণ আগে কালাপাহাড়বাবু থানায় এসেছিলেন। ইউ, ডি, কেসটার কথা বলতেই তিনি কট্মট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে, এসব মড়া-ঠেলার কাজ নাকি দারোগাবাবুদের নয়। এ, এস, আই, নাকি এ কাজ করবে। আমি তখন বললাম, বেশতো, থানায় এ, এস্, আই, বলতে তো একমাত্র আমি। শ্রীপতিবাবু তো অসুস্থ। আমিই না হয় যাচ্ছি। আপনি বরঞ্চ থানার চার্জ নিয়ে থাকুন। কথাটা শুনেই তিনি বললেন যে, তাঁর নাকি ভীষণ দরকারী কাজ পড়ে আছে। এই বলে পাকা পনেরো মিনিট আমাকে একটানা লেক্চার শুনিয়ে কেটে পড়লেন।

অমিত আর কিছু না বলে সোজা সুশান্তর টেবিলের সামনে চলে আসে। তারপর ইউ, ডি, অর্থাৎ আন্-ন্যাচারল্ ডেথ্ কেসের রেজিস্টার টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে।

মনসাতলার বস্তিতেই তো সেই মেয়েটি থাকে—সেই মিন্তি সিং—গানের মাস্টার পরাশর সেনের স্ত্রী মিনতি সেন।

ইউ, ডি, কেস রেজিস্টারে বিশেষ পাতাটা খুলতেই চম্‌কে ওঠে অমিত। যে খবর দিয়েছিল তার নাম পরাশর সেন। তবে কি সেই মিনতি সুইসাইড করল নাকি? না, মিনতি সুইসাইড করেনি। নিচেই মৃতব্যক্তির নাম স্পষ্ট লেখা—কনক সেন, ওয়াইফ্ অব্ পরাশর সেন।

কনক শেষে সুইসাইড করলে? কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র জবাব কেউ দিতে পারেনি। পরাশর তো নয়ই, এমনকি মিনতিও নয়।

গলির মুখেই দেখা হয়ে গেল পরাশরের সঙ্গে। উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল চেহারা। অমিতকে দেখেই খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আপনি এসেছেন? কনক চলে গেছে। সেই আমি যখন জেলে ছিলাম তখন আপনারাই তো তাকে আর আমার ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এবার কিন্তু সবাইকেই ফাঁকি দিয়ে সে চলে গেল।

পরাশরের কথার ধরনে তাকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছিল না অমিতের। অমিত বললে, চলুন পরাশরবাবু, ডেড্ বডিটা একবার দেখে আসি।

দু'খানি মাত্র ঘর পরাশরের। তারই একখানা ঘরে মাঁচার বাঁশের সঙ্গে ঝুলছে দেহটা। হতভাগিনী নিজের পরনের শাড়িখানাই গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করেছে। দেহের সঙ্গে রয়েছে কেবল একটা আধময়লা সায়া ও একটা ছেঁড়া ব্লাউজ। কপালের সিঁদুরের.টিপটি কিন্তু তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে। মনে হয়, যাবার আগে মেয়েটা নিপুণহাতে শেষ সিঁদুরের টিপটি পরেছিল নিজের কপালে।

খবর পেয়ে বস্তির দু'চারজন লোকও এসে হাজির হয়েছে ততক্ষণে। পরাশরের ছেলেমেয়েগুলো একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কেবল তার ছোট মেয়েটা লেপটে রয়েছে মিনতির বুকের সঙ্গে।

দু'হাতে মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে বসে রয়েছে মিনতি। তার বড় বড় ডাগর চোখে কেমন যেন এক বিহ্বলতা।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে পরাশর বেরিয়ে গিয়েছিল তার ট্যুইশানিতে। কনক তার ছোট মেয়েটাকে নিয়ে শুয়েছিল নিজের ঘরে। বাকি ছেলেমেয়েরা শুয়েছিল তাদের ছোট মা অর্থাৎ মিনতির কাছে।

একটু পরেই পাশের ঘর থেকে ছোট মেয়েটা এসে হাজির হয় মিনতির কাছে। মিনতি তাকে কোলের কাছে শুইয়ে দিয়ে বলে উঠেছিল, কিরে দুষ্টু, তোর মা বুঝি তোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে? একবছর বয়সের মেয়েটা খিল্ খিল্ করে অকারণে হেসে উঠতেই মিনতি তার মুখে হাতচাপা দিয়ে আবার বলেছিল, চুপ চুপ, সবাই উঠে পড়বে। এখন ঘুমো।

সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর মিনতি নিজেও কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ বড় মেয়েটার চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসে মিনতি ছুটে যায় পাশের ঘরে কিন্তু তার অনেক আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

কাপড়ের ফাঁস খুলে কনকের দেহটা নিচে নামানো হল। অমিত যথারীতি পরীক্ষা করলে দেহটা। সুইসাইড্যাল হ্যাঙ্গিং-এর সমস্ত চিহ্নই বর্তমান। তবুও, সাবধানের মার নেই। বলা তো যায় না—শত হলেও সতীনের ঘর। কার মনে কি ছিল কে জানে? অমিত তাই দেহটা

ময়না তদন্তের জন্যে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে পরাশরকে, উনি সুইসাইড করলেন কেন বলতে পারেন?

কোন জবাব না দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ অমিতের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে পরাশর। তারপর কান্নাজড়িত সুরে জবাব দেয়, ও বড়ই অভিমানী ছিল, দারোগাবাবু। অভিমান করেই চলে গেল।

মিনতির চোখে কিন্তু একটুও জল নেই। সারাটা সময় সে ছোট মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে একপাশে স্থির হয়ে বসে ছিল। অমিতের প্রশ্নে সে চম্‌কে উঠে তাকায় তার দিকে। তারপর কোন জবাব না দিয়ে নিজেই উল্টে সেই প্রশ্ন করে, বলুন তো দারোগাবাবু ও কেন চলে গেল? আমি তো কোনদিন এতটুকু কষ্ট দিইনি ওর মনে। সব সময়ই বড় বোনের মত দেখেছি। তবুও কেন ও এমনি করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল? কি অপরাধ করেছি আমি, বলতে পারেন দারোগাবাবু?

একটু থেমে মিনতি আবার বলতে থাকে, জাননে দারোগাবাবু, ওকে আমি কোন কাজ করতে দিতাম না। এমনকি, এই ছেলেমেয়েগুলোর দেখাশোনাও আমিই করতাম। ওর শরীর তেমন ভাল ছিল না। তাই আমি বলতাম, তুমি বসে বসে কেবল হুকুম করো, আমি দাসীর মত তোমার সংসারের যাবতীয় কাজ করে দেব। তোমার জিনিসে ভাগ বসিয়ে যে অপরাধ আমি করেছি, এমনি করেই তার অন্ততঃ খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। আমার কথা শুনে ও হেসে বলতো, না—না, তুই কোন অপরাধ করিসনি। যাকে মনে ধরেছে তাকে ভালবাসা তো অপরাধ নয়। যা' ভবিতব্য তাকে এড়াব কি করে? বলতে বলতে এতক্ষণে টপ্‌ টপ্‌ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মিনতির গাল বেয়ে।

একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, জানেন দারোগাবাবু, ওর কথা শুনে আমার মনে হত ও যেন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছে। তখন কিন্তু বুঝতে পারিনি, ও মনে মনে এমনিভাবে সকলকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার মতলব আঁটছিল।

অমিত বসে বসে শুনতে থাকে মিনতির কথা। কনকের শুকনো মুখখানা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। আজকে নিয়ে চারবার সে দেখেছে কনককে। এই চারবারে চার রকম মূর্তিতে তার সামনে আবির্ভূতা হয়েছিল স্ত্রীলোকটি। সেই প্রথম দিন যখন সে পরাশরের বিরুদ্ধে কিড্‌ন্যাপিং মামলার তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছিল, তখন ঐ স্ত্রীলোকটির মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল একটা লজ্জা মিশ্রিত অভিমান। ছাত্রীকে নিয়ে স্বামীর উধাও হয়ে যাবার জন্যেই সেই লজ্জা, আর সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড অভিমান।

তারপর দ্বিতীয়বার তাকে দেখেছিল থানায়, যেদিন স্বামীর জেলে যাবার সুযোগ নিয়ে বাড়িওয়ালা তার কাছে কুৎসিত প্রস্তাব করেছিল। আর সেই অসহায় স্ত্রীলোকটি সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছিল থানায়। সেদিন তার মুখে ফুটে উঠেছিল একটা শঙ্কাকুল অসহায়তা।

তৃতীয় দিন তাকে দেখেছিল এখানেই, যেদিন মিনতি তাকে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে এখানে ডেকে এনেছিল। সেদিন ঐ কনকের মুখে-চোখে ছিল কেমন যেন এক নিরাসক্তভাব। নিজেকে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিলে মানুষের মুখে যে ছায়া পড়ে তেমনি একটা ছায়া সেদিন তার মুখে ফুটে উঠতে দেখেছিল অমিত।

আর, আজ ছিল তার মুখখানা সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন। মুখখানা ঈষৎ বিকৃত হলেও সেই মুখে ভাবনা-চিন্তা, শঙ্কা-ভয়, এমনকি কোন অভিমানের ছায়া পর্যন্ত ছিল না। কেমন যেন এক ভয়ঙ্কর শীতলতা।

অমিতের কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য লাগে ঐ মিনতিকে। কি অদ্ভুত চরিত্রের নারী! পুরুষের ভালবাসা যে কোন নারীকে এমনিভাবে আত্মহারা করে তুলতে পারে এ তথ্য সত্যিই এতকাল অমিতের জানা ছিল না।

॥ আটাশ ॥

কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় সেইদিনই হল।

খবরের সন্ধানে যথারীতি থানায় যেতেই দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। ভবদেব কিংবা অমিত কেউ-ই থানায় ছিল না। সামনে হলঘরে বসে ডিউটি করছিল কালাপাহাড়।

আমি যথারীতি হলঘরের পাশ দিয়ে বড়বাবুর ঘরের দিকে তাকাতেই কালাপাহাড় ব্যস্তকণ্ঠে ডাকে আমাকে, ও মশাই—ও মশাই শুনছেন, ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়?

দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। তারপর কালাপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, যাচ্ছি বড়বাবুর কাছে।

—তিনি নেই। বাইরে গেছেন।

—আপনাদের মেজবাবু—অমিতবাবু আছেন?

—না—না, তিনিও নেই।

তারপর একটু থেমে কালাপাহাড় আবার বললে, থানাদার তাঁর প্রধান সাগরেদটিকে নিয়ে এলাকা চষে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে।

আমি বললাম, ওঁরা কি এখনই ফিরবেন?

—তা' বলতে পারি না, মশাই। যখন তাঁদের মর্জি হবে তখন ফিরবেন। থানা আগলে থাকার জন্যে তো আমরা চুনোপুঁটিরাই রয়েছি। তা' মশাইয়ের কি দরকার তাদের কাছে?

জবাবে আমি বললাম, না, তেমন কিছু নয়। আমি একটা কাগজের স্থানীয় রিপোর্টার। কিছু খবরের আশায় এসেছিলাম।

—প্রেস রিপোর্টার? একমুহূর্ত কি যেন ভাবে কালাপাহাড়। তারপর বলে ওঠে, ও—বুঝেছি। আপনিই আমাদের মেজবাবুর সেই বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি? আরে আসুন—আসুন, বসুন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রলোকের আহ্বানে আমাকে গিয়ে বসতে হয় তার পাশের চেয়ারে। কালাপাহাড় বললে, বলুন, কি ধরনের খবর প্রয়োজন আপনার?

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি তাকাই তার মুখের দিকে। ভদ্রলোক কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে নাকি?

একটু চিন্তা করে আমি বললাম, চাওয়া-না-চাওয়ার কি আছে? কোন ইণ্টারেস্টিং খবর থাকে তো বলুন।

—কি যে বলেন, মশাই! খবরের কি দুর্ভিক্ষ লেগেছে নাকি? খবর না থাকে তো তৈরি করে দিতে কতক্ষণ?

—সেকি? আপনি বানিয়ে বানিয়ে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদবেন, আর আমি তাই খবর বলে চালাব নাকি? বিরক্তকণ্ঠে বলে উঠি আমি।

—কি যে বলেন, বলতে থাকে কালাপাহাড়, পেপারওয়ালারা ক'টা সত্যি খবর ছেপে বের করে, বলতে পারেন?

কালাপাহাড়ের কথার ধরনে বিরক্ত বোধ করলেও নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললাম, পেপারওয়ালারা কি করে আমি জানি না। তবে, রিপোর্টার হিসেবে বলতে পারি, আমি কোন বাজে খবর তাদের কাছে পাঠাই না।

কালাপাহাড় সেকথার কোন জবাব না দিয়ে বললে, এই দেখুন না, আমাদের অর্থাৎ পুলিশের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু খবর পর্যন্ত আপনারা ফলাও করে কাগজে ছাপেন। আচ্ছা, বলুন তো মশাই, আমরা আপনাদের কোন্ পাকাধানে মই দিয়েছি যে, আমাদের পেছনে আপনারা এমনি করে লাগেন?

কালাপাহাড়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ হলেও তার সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর আমি অমিতের কাছেই জানতে পেরেছিলাম। তাই, তার এই প্রশ্নের জবাবে ইচ্ছে হয়েছিল বলি— আপনার মত রত্ন যতদিন এই ডিপার্টমেণ্টে থাকবে ততদিন আপনাদের পেছনে আমরা লাগবই।

মুখে শুধু বললাম, পেছনে লাগার মত কাজ করেন বলেই লাগতে হয়। নইলে শুধু শুধু খুঁচিয়ে ঘা করি না আমরা।

কালাপাহাড় বললে, না মশাই, সে-সব কিছুই নয়। আসলে ওটা পেপারওয়ালাদের সস্তা বাহবা পাবার চেষ্টা, বুঝলেন?

ওখানে বসে বসে ঐ লোকটির সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না আমার। তাই বললাম, তা' হয়ত হবে। আমি নিজে পেপারওয়ালা নই। তাই ও বিষয় আপনাকে কিছু বলতে পারব না। আপনার যা' মনে হয় আপনি স্বচ্ছন্দে ভাবতে পারেন। বলেই আমি উঠে দাঁড়াই।

কথাটা একদিন বলেই ফেলেছিলাম ভবদেবকে। শুনে, সে হেসে বলেছিল, তুমি আবার ওর সাথে তর্ক করতে গিয়েছিলে কেন, সংবাদ-প্রভাকর? আসলে ও হচ্ছে একটি সেয়ানা পাগল। যদিও নিজের থানার একজন অফিসারের বিরুদ্ধে কিছু বলা ঠিক নয়, তবুও না বলে পারছি না, এই ডিপার্টমেণ্টে দোষ বলতে যা' বোঝায় তার প্রত্যেকটিই ওর আছে। আর গুণ বলতে যা' বোঝায়, তার একটিও ওর চরিত্রে নেই। কাজেই, এমন লোককে এড়িয়ে চলাই ভাল। আমার বরাত নেহাতই খারাপ, নইলে ওর মত একজন অফিসার এই কোতোয়ালী থানার মত একটা ইম্পর্টেণ্ট্ থানায় বদলী হয়ে আসবে কেন? আর, আমাকেই বা ভুগতে হবে কেন ওকে নিয়ে?

সেই কালাপাহাড়ের সঙ্গেই আর একদিন দেখা হয়ে গেল আমারই বাড়ির সামনে। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে বাড়ির গেট্ খুলে ভেতরে ঢুকতে যাব, ঠিক এমনি সময় বড় রাস্তার ওপরেই দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। কালাপাহাড় সাইকেলে চেপে কোথায় যেন যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই সাইকেল থেকে নেমে তার কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁতের ঝিলিক্ তুলে হেসে বললে, এই যে রিপোর্টার মশাই, এখানেই থাকেন বুঝি?

সত্যি বলতে কি, লোকটির সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপ থেকেই তাকে ভাল লাগেনি আমার। তাই, কলেজ থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার মুখে লোকটির সঙ্গে দেখা হওয়ায় মোটেই খুশি হই নি আমি।

কিন্তু উপায় নেই। লোকটি নিজেই যখন যেচে এগিয়ে এল, তখন চুপ করে থাকা কিংবা তার কথা না শোনার ভান করে তাড়াতাড়ি বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকে পড়া চরম অভদ্রতা। তাই আমাকেও মুখে একটু কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তুলে বলতে হল, এই যে সচ্চিদানন্দবাবু, আপনি এদিকে যে? চললেন কোথায়?

কালাপাহাড় তার সাইকেলের সীটের ওপর একটা হাত, আর অন্য হাতটা হ্যাণ্ডেলের ওপর রেখে সামনে এসে দাঁড়ায়। তার বিশাল দেহের পাশে সাইকেলটিকে একটি খেলনা সাইকেল বলেই মনে হচ্ছিল।

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বললে, আপনিও দেখছি আমার পোশাকী নামটা জেনে ফেলেছেন। আসলে কালাপাহাড় নামটা শুনতে শুনতে আমি এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, ঐ পোশাকী নামটা যে আমারই তা' আমি নিজেই মাঝে মাঝে ভুলে যাই। বলেই হো হো শব্দে হেসে ওঠে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে হাসতে হয় একটু। বললাম, হ্যাঁ, এটাই আমাদের বাড়ি। আপনি চললেন কোথায়?

—আর বলেন কেন, জবাব দেয় কালাপাহাড়, একটা এন্‌কোয়ারীর ব্যাপারে ঐ বাবুপাড়া এলাকায় একটা লোককে আজ দু'দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু শালাকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। আর আমাদের বড়বাবুও হয়েছে তেমনি নাছোড়বান্দা। লোকটাকে নাকি ধরতেই হবে। এখন বলুন তো মশাই, যার কোন খোঁজই পাচ্ছি না, তাকে ধরব কেমন করে?

আমি আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাকি। মনে মনে ভাবি, এবার হয়ত লোকটা সাইকেলে চেপে সরে পড়বে।

কালাপাহাড়ের ভাবভঙ্গিতে কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ঘাড় উঁচু করে আমাদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, বেশ সুন্দর বাড়ি করেছেন তো মশাই! যেন রাজবাড়ি!

জবাবে আমি বললাম, না, এ বাড়ি আমার আমলের নয়। এমনকি আমার বাবাও করেন নি। করেছিলেন আমার ঠাকুর্দা। অনেক কালের পুরনো বাড়ি, হালে একটু রং-চং করা হয়েছে বলে এমন দেখাচ্ছে।

—তাই বুঝি? কালাপাহাড় বললে, তা' চলুন না মশাই, একবার আপনাদের বাড়িটা দেখে আসি।

এমনই বুঝি হয়। যাকে এড়াতে চাই সে এমনি করেই বুঝি ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু উপায় নেই। লোকটি নিজের মুখে যখন ভেতরে যেতে চাইছে তখন তাকে না বলি কি করে? তাই বাধ্য হয়েই তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাতে হয়। এমনকি, ভদ্রতার খাতিরে এক কাপ চা-ও এনে হাজির করতে হয় তার সামনে।

চা খেতে খেতে কালাপাহাড় কথা বলতে থাকে। বললে, এ থানায় নতুন এসেছি। আপনারা হচ্ছেন গিয়ে স্থানীয় লোক। শুধু তাই নয়, আপনি নিজে হচ্ছেন একজন পুলিশ-ফ্রেণ্ড্। আপনাদের সঙ্গে খাতির রেখে চলা ভাল, কি বলেন?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই আমি, না সচ্চিদানন্দবাবু, আমি পুলিশ-ফ্রেণ্ড্ কিংবা পুলিশ-এনিমি কিছুই নই। আমি সাংবাদিক। তাই সংবাদের জন্যে আমাকে আপনাদের কাছে যেতেই হয়। সেই সূত্রেই আপনাদের ও. সি.'র সঙ্গে আলাপ। আর, আপনাদের অমিতবাবু হচ্ছে আমার পার্সোন্যাল্ ফ্রেণ্ড্।

একটু হেসে কালাপাহাড় আবার বললে, শুনতে পাই আমাদের মেজবাবুটির সঙ্গে নাকি আপনার একেবারে হরিহর-আত্মা।

আমি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকি।

কালাপাহাড় বলতে থাকে, বুঝলেন মশাই, আপনার ঐ বন্ধুটি কিন্তু লোক খারাপ নয়, তবে একেবারেই কাঁচা। তা' ছাড়া ওর যে একটি দোষ আছে সেটা বাস্তবিকই মারাত্মক।

—সেকি! অমিতের আবার কি এমন মারাত্মক দোষ দেখলেন আপনি? বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করি আমি।

চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে কালাপাহাড়। কোন জবাব দেয় না।

আমি অধৈর্য কণ্ঠে আবার বললাম, বলুন না, এমন কি দোষ আছে অমিতের, যা' নাকি সত্যিই মারাত্মক?

—না-ই বা শুনলেন সেকথা। আপনি হচ্ছেন গিয়ে তার বন্ধু। শুনতে হয়ত খুব খারাপ লাগবে আপনার।

আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি কালাপাহাড়কে।

কালাপাহাড় এবার একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বললে, ছেলেবেলায় একটা বইতে পড়েছিলাম—হোয়েন মানি ইজ লস্ট্ নাথিং ইজ লস্ট্; হোয়েন হেল্‌থ্ ইজ লস্ট্, সামথিং ইজ লস্ট্; হোয়েন ক্যারেক্টার ইজ লস্ট্, এভ্‌রিথিং ইজ লস্ট্। আমাদের ঐ মেজবাবুর, বুঝলেন কিনা মশাই, তার সবই আছে কেবল ঐ চরিত্রটিই নেই। ছেলে মানুষ, কিন্তু দেখুন এই বয়সেই মেয়েছেলে রোগে ধরেছে। দু'দিন আমার চোখে পড়েছে, কোথাকার একটা স্ত্রীলোককে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, বুঝলেন?

এতক্ষণে ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি। বললাম, মেয়েটি হয়ত তার পরিচিত কেউ।

—আরে রেখে দিন মশাই পরিচিত। সুযোগ পেয়েছে, দু'দিন লুটে-পুটে খাচ্ছে। এখান থেকে যেদিন বদলি হয়ে যাবে সেদিন চিবানো ছোব্‌ড়ার মত পেছনে ফেলে রেখে যাবে, বুঝলেন? ঢের-ঢের দেখেছি মশাই। আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রাদের আমার চিনতে বাকি নেই।

ইচ্ছা হয় একবার বলি, হ্যাঁ, দেখেছেন হয়ত ঢের, কিন্তু ঐ অমিতকে দেখলেন এই প্রথম।

মুখে বললাম, এমনও তো হতে পারে আপনি যা' মনে করেছেন তা' নয়। মেয়েটিকে সত্যিই সে ভালবাসে। তাকে হয়ত সে বিয়ে করবে।

—বিয়ে করবে কিনা জানি না, মশাই। তবে বিয়ের আগেই যে তাকে মা করে ছাড়বে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তারপর, সুযোগ বুঝে একদিন ফুড়ৎ। বলেই হা-হা করে হেসে ওঠে কালাপাহাড়।

আর চুপ করে থাকতে পারি না আমি। স্মৃতিকণার ব্যাপারে এমন একটা কুৎসিত ইঙ্গিত সহ্য হয় না আমার। তাই বললাম, আপনি ভুল করেছেন, সচ্চিদানন্দবাবু। শিগগিরই ওদের বিয়ে হচ্ছে। আর ঐ মেয়েটিও একজন রিটায়ার্ড এ্যাড্‌ভোকেটের কন্যা। কলেজের ছাত্রী।

—আপনি তবে সত্যিই চেনেন নাকি তাকে?

—তবে কি আপনাকে মিথ্যে বলছি?

আমার কথায় কালাপাহাড় যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়। ব্যাপারটা যে আমরা জানি, তা' বোধহয় সে ধারণা করতে পারেনি। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, তা' হলেও ব্যাপারটা কিন্তু খুবই দৃষ্টিকটু। একজন পুলিশ অফিসারের পক্ষে—

কালাপাহাড়কে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বাকিটা আমিই বলে দিলাম, ভালবাসা অপরাধ, তাই না?

ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বলে ওঠে কালাপাহাড়, কি যে মশাই আপনারা ভালবাসা-ভালবাসা করেন! বিয়ের আগে এসব একেবারেই বুজরুকি। আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সাহেব-সুবোদের কানে ব্যাপারটা উঠলে মুশকিলে পড়তে হবে আপনার বন্ধুকে।

—কেন, আপনাদের পুলিশ রেগুলেশানে ভালবেসে বিয়ে করায় কোথাও বাধা আছে নাকি?

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কালাপাহাড় ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চললাম মশাই। বাবুপাড়ার সেই লোকটার খোঁজে আবার যেতে হবে। বলেই কালাপাহাড় বাইরে এসেই নিজের সাইকেলটা টেনে নেয়।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে আমি বললাম, ইস্, ভূতের মুখে রামনাম! নীতিবাক্য শোনাবার মত যোগ্য লোকই বটে ঐ কালাপাহাড় দারোগা!

অমিতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কোন্ স্তরের তা' যারা জানে না, তারা মাঝে মাঝে আমাদের দু'জনের মধ্যে তর্কের ধরন দেখে অন্য কিছু অনুমান করতে পারে। পুলিশ ও জনসাধারণের সম্পর্কের ব্যাপারে যখনই আমাদের কোন আলোচনা হয়, অমিত তখনই আমাকে জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে করে তার যুক্তির তীক্ষ্ণ তীরগুলি একে একে বর্ষণ করতে শুরু করে আমার ওপর। আমিও আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি ; আবার কখনও কখন পালটা আক্রমণও চালাই। সেই তর্কের শেষ হয় না কখনও। যুক্তি ও পাল্‌টা-যুক্তির বোঝা যখন ভারি হয়ে ওঠে তখন অমিত কিংবা আমি হয়ত এক সময় বলি, আজ বরঞ্চ থাক ভাই। আর একদিন হবে। সেদিন বোঝা যাবে তুমি ঠিক, কি আমি ঠিক। সেই সমাধানের পথে আজ পর্যন্ত আমরা কেউই আসতে পারিনি ; কিন্তু তাই বলে কোনদিন কোন তিক্ততারও সৃষ্টি হয়নি আমাদের মধ্যে। আমরা পরস্পরের যুক্তিকে শ্রদ্ধা করতাম বলেই হয়ত কোন তিক্ততা আমাদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

সেদিনও এম্‌নি একটা তর্ক শুরু হয়েছিল আমাদের মধ্যে। ব্যাপারটা শুরুতে অবশ্য ছিল সাধারণ সাহিত্য আলোচনা। কিন্তু দেখতে দেখতে তা-ই আমাদের মধ্যে একটা তর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

গ্রীষ্মের ছুটি। কলেজ বন্ধ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলাম। এমনি সময় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সাইকেল চেপে এসে হাজির হয় অমিত।

ঘরে ঢুকেই অমিত ফ্যানের রেগুলেটরটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে আমার পাশে বসতে বসতে বললে, উঃ, কি গরম!

হাতের বইটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর রেখে আমি বললাম, এই দুপুর রোদে হঠাৎ কি মনে করে?

আমার প্রশ্নে একটু হেসে সে বললে, কাল সারারাত জেগেছি। পাশের থানা এলাকায় একটা সাইমল্‌টেনিয়াস্ রেইড্ করতে যেতে হয়েছিল। তিনটে ফেরারী ডাকাত ধরেছি। সর্দারটাকে ধরতে পারিনি, চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে। সকালে থানায় ফিরে কিছু কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরলাম। খেয়ে-দেয়ে উঠে শুলাম, কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। বিছানায় খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলাম। তারপর সোজা চলে এলাম এখানে। বলেই টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে নিয়ে বললে, এ যে দেখছি কম্‌প্লিট্ ওয়ার্কস্ অব্ শেক্সপীয়র! তা' ভাল, গরমের দুপুরে বসে বসে শেক্সপীয়র পড়তে একমাত্র তোমার মত বইয়ের পোকারাই পারে।

ঠাট্টার সুরে বললাম, পোকা-মাকড় জানি না ভাই। শেক্সপীয়র-সমুদ্রে ডুব দিতে এত চেষ্টা করছি, কিন্তু ডুব দেওয়া তো দূরের কথা, জলের কাছেও ঘেঁষতে পারছি না।

বইটা সশব্দে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে অমিত জিজ্ঞেস করে, কোনটা পড়ছিলে?

—হ্যাম্‌লেট।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে অমিত গম্ভীরকণ্ঠে সুন্দর উচ্চারণে হ্যাম্‌লেট ও তাঁর পিতার প্রেতাত্মার কথোপকথনের সিন্‌টা মুখস্ত বলে যেতে থাকে—আই অ্যাম দাই ফাদার্‌স্‌ স্পিরিট্‌..........আই কুড্‌ এ টেল্‌ আন্‌ফোল্ড্‌ হুজ্‌ লাইটেস্ট্‌ ওয়র্ড্‌ উড্‌ হরো আপ্‌ দাই সোল্‌, ফ্রিজ্‌ দাই ইয়ং ব্লাড, মেক্‌ দাই টু আইজ্‌ লাইক্‌ স্টারস্‌ স্টার্ট ফ্রম দেয়ার স্ফিয়ার্স্‌........

অবশেষে 'হোরেশিও' ও 'মার্সেলাসের' প্রবেশের জায়গাটায় এসে অমিত থামতেই বাহবা দিয়ে বলে উঠি, চমৎকার গোটা হ্যাম্‌লেট-টাই তোমার মুখস্থ নাকি?

অমিত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হাল্‌কাসুরে হেসে বললে, যা'ই বলো ভাই তরুণ, শেক্সপীয়র সেকালে না জন্মে একালে জন্মালে গোটা হ্যামলেটটাই একটা সাক্‌সেস্‌ফুল্‌ ক্রাইম্‌ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারতো।

জবাবে আমিও ঠাট্টা করে বললাম, নাটকটাই তো একটা চমৎকার ক্রাইম্‌ উপন্যাসের ওপব প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি কেবল দারোগা-পুলিশকেই ওতে টেনে আনতে ভুলে গেছেন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অমিত বললে, সেকালে বিলেতের মাটিতে দারোগা-পুলিশ ছিল কিনা জানি না, আর থাকলেও সেকালের জনসাধারণ যে একালের মত তাদের কেবল ঠাট্টা-বিদ্রুপই করতো না, তা' বেশ বোঝা যায়।

—তার মানে? প্রতিবাদ করে উঠি আমি, একালের জনসাধারণ কি কেবল পুলিশকে ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে থাকে?

—হ্যাঁ, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই করে থাকে।

—প্রমাণ দিতে পারো? প্রশ্ন করি আমি।

—হ্যাঁ, পারি। বলেই একটু থামে অমিত। তারপর আবার বলতে থাকে, আমাদের দেশের ক্রাইম-উপন্যাসগুলো পড়লেই দেখতে পাবে, সেখানে শখের কিংবা প্রফেশন্যাল্‌ যে গোয়েন্দা থাকে তিনিই হচ্ছেন সকল বুদ্ধির আধার। তাঁর কর্মক্ষমতা অকল্পনীয়, তাঁর তদন্ত-জ্ঞান অসীম, তাঁর বিচার-বিবেচনা প্রায় অবিশ্বাস্য। আর পার্শ্বচরিত্র হিসেবে যে পুলিশ অফিসারটিকে দেখানো হয়, সে যেন একটি সার্কাসের ক্লাউন। মোটা গোলগাল চেহারা। বুদ্ধিও তার তেমনি মোটা। দশ-বিশ বছর পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করেও সে যেন তদন্তের এ. বি. সি.ও জানে না। লেখকরা তাদের গল্প-উপন্যাসে পুলিশকে এমনি ভাঁড়ের ভূমিকায় নামায় কেন, বলতে পারো? এর পেছনে কি ধরনের মনোবৃত্তি রয়েছে?

একটু ভেবে আমি জবাব দিই, সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয়, এখানেও সেই কম্‌প্লেক্স। যাদের দাপট বেশি, যাদের হাতে রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা, তেমন একদল মানুষকে সাধারণের চোখে একটু হাস্যাস্পদ করে তোলার মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া যায় পাঠকদের তেমনি কিছু আনন্দ দিতেই বোধহয় সচেষ্ট থাকেন এইসব লেখকরা।

আমার কথার সূত্র ধরে অমিত তেমনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতে থাকে, কিন্তু মজার কথা এই যে, পৃথিবীর কোন দেশে সমষ্টিগতভাবে শখের গোয়েন্দারা তদন্তের ব্যাপারে পুলিশ অফিসারদের চাইতে বেশি কৃতিত্বের অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়নি।

—তা' হয়ত হয়নি, কিন্তু শার্লক্ হোম্স্ যে কোনান্ ডয়েলের একটি অপূর্ব সৃষ্টি তাতে বোধ হয় তুমি সন্দেহ করবে না? তাছাড়া, আমাদের দেশেও নীহাররঞ্জনের কিরীটী কিংবা শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশও তাদের ঘটনাবহুল জীবনে প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

একটু হেসে অমিত বললে, ঘটনাবহুল জীবন বলো না। বরঞ্চ বলো, কাল্পনিক ঘটনাবহুল জীবন। আর, অনেকক্ষেত্রেই লেখকরা তাঁদের এই কাল্পনিক সৃষ্টিকে উচ্চতার শিখরে তুলেছেন পাশাপাশি এক বা একাধিক পুলিশ অফিসারের বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে তাদের তুলনা করে—অপ্রিয় হলেও আমার মনে হয়, কথাটা সত্যি।

হাসি মুখে বললাম, তাই বলে তুমি এই অপবাদ একা বাংলা সাহিত্যকে দিতে পারো না, অমিত। ইংরেজি ক্রাইম স্টোরিতেও এ জিনিস দেখতে পাবে।

—তা' হয়ত পাব, জবাব দেয় অমিত, তবে সেখানে পুলিশকে ভাঁড় হিসেবে না দেখিয়ে গোয়েন্দার সহযোগী বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখানো হয়। সেখানে পুলিশ ও গোয়েন্দার মধ্যে একটা পীস্‌ফুল কো-এক্‌জিস্টেন্স্ রয়েছে। আর, আমার মনে হয়, যে কোন দেশের পুলিশ-পাব্‌লিক্ রিলেশান্ সাহিত্যের এই বিশেষ শাখার মাধ্যমে যাচাই করে দেখা যায়। এতেই প্রতিফলিত হয় দেশের পুলিশের প্রতি জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব।

—কিন্তু এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, অমিত। আমি বললাম।

—কোথায়? অমিত প্রশ্ন করে।

—ভিক্টর হুগোর লা' মিজারেব্‌ল্, জবাব দিই, সেখানে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরের বলিষ্ঠ চরিত্রে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে পুলিশী কাঠিন্য, তেমনি অন্যদিকে তার অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণতাই প্রকাশ পেয়েছে।

আমার কথায় অমিতের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বললে, হ্যাঁ, এমন চরিত্র সৃষ্টি ওদের দেশেই সম্ভব।

তারপরই আবার বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, বাংলা ভাষায় এমন একখানা উপন্যাসের নাম করো তো, যেখানে এমনি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পুলিশ অফিসারের চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি যতদূর জানি তেমন চরিত্র একটিও নেই।

আমি বললাম, থাকবে কি করে? বাস্তবে অমন চরিত্রের পুলিশ অফিসার যেমন আমাদের দেশে নেই, তেমনি সাহিত্যেও তা সম্ভব নয়। সাহিত্য তো বাস্তবের বাইরে কিছু নয়।

—তোমার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি, তরুণ। আমাদের দেশে 'ক্রাইম্' এখনও ঠিক সাহিত্যের মর্যাদা পায়নি। কিন্তু তবুও জিজ্ঞেস করি, বাংলা ভাষায় যদি কিরীটী কিংবা ব্যোমকেশের মত কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে, তবে লা' মিজারেব্‌লের পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরের মত চরিত্র সৃষ্টি হয় না কেন? তা' কি কেবল সে পুলিশ বলেই?

কথা বলতে বলতে অমিত যেন ক্ষুব্ধ, বিচলিত হয়ে ওঠে। ওর সংবেদনশীল মনের বেদনার আভাসটুকু স্পষ্ট ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে।

চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে সে আবার বলতে থাকে, ইংরেজ সরকার নিজেদের প্রয়োজনে এককালে এদেশের পুলিশকে লেঠেল করে তুলেছিল। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাই ছিল তাদের নীতি। সেই সময় পুলিশকে রাখা হয়েছিল জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক দূরে। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। স্বাধীনতার পরেও সেই কলোনিয়াল্ নিয়মকানুনের বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হল না। যা' ছিল প্রায় তাই রইল। সেই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরটিকে ভেঙে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেবার তেমন কোন

আন্তরিক প্রচেষ্টাই দেখা গেল না আজ পর্যন্ত। পুলিশ অত্যাচারী, পুলিশ অসৎ—এই আখ্যা নিয়েই তাকে সমাজের কঠিনতম কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতে বলা হল। আন্তরিক সহানুভূতি কিংবা আশীর্বাদ সে পেল না কোথাও। এমন কি, দেশের সাহিত্যিকরাও তাদের নেক্ নজর ফেললেন না এই হতভাগ্যদের ওপর। বাংলার কামার, কুমোর, তাঁতী থেকে শুরু করে বেদে, সাপুড়ে এমন কি বাংলার যাত্রার দলকেও তারাশঙ্কর স্থান দিলেন তাঁর উপন্যাসে, গ্রামবাংলার সার্থক চিত্র আঁকলেন বিভূতিভূষণ, জমিদার থেকে সুরু করে জেলে পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের নরনারীর কথা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরে তুললেন বরণীয় সাহিত্যিকরা, এমন কি, জেলখানার জীবন নিয়েও সৃষ্টি হল সার্থক উপন্যাস, কেবল বাদ গেল একটি মাত্র গোষ্ঠী—পুলিশ। কেউ তাদের কথা ভাবলেন না, কেউ তাদের চিনতে চেষ্টা করলেন না। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামাতে কোন সাহিত্যিকই রাজি হলেন না। পুলিশী জীবনের এইটেই বোধহয় সবচাইতে বড় ট্র্যাজেডি।

কথার শেষের দিকে অমিতের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছিল। তার স্বপ্নালু চোখ দু'টোকে ঘিরে জেগে উঠেছিল এক সীমাহীন অভিমানের স্পষ্ট অভিব্যক্তি।

অমিতের কথার বিরুদ্ধে আমারও অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে আর কিছু না বলে চুপ করে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করি।

কিছুক্ষণ তেমনিভাবেই চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থেকে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে অমিত। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললে, এসব আলোচনা আজ থাক ভাই। আর একদিন হবে। আজ বরঞ্চ বইটা থেকে তোমাকে ম্যাক্‌বেথ পড়ে শোনাই। বলেই টেবিলের ওরর থেকে বইটা হাতে তুলে নেয়।

স্মৃতিকণার বাবা অজিতেশ দত্ত একদিন আমাকে যেতে বলেছিলেন তাঁর বাড়িতে। গিয়েওছিলাম আমি। অমিতকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সে রাজি হয়নি কাজের অছিলায়। বলেছিল, ঐ বাড়িতে তো তুমি আগেও গিয়েছো। কাজেই পথপ্রদর্শক হিসেবে আমার না গেলেও চলবে। তোমাকে যেতে বলেছেন, তুমিই যাও।

আমি হেসে বলেছিলাম, তোমার কোন ভয় নেই, ব্রাদার। ওয়ার্ড অব্ অনার, বুড়োর ঘর থেকে এক পা-ও বাইরে আসব না আমি। তোমাদের এতটুকু অসুবিধা করব না।

অমিত হেসে বলেছিল, ফাজলামো রাখো। তোমাকে যেতে বলেছেন, তুমিই যাও। আমার অনেক কাজ আছে। অগত্যা একাই গিয়েছিলাম। বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত আমাকে সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর ঘরে। তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন মেয়েকে, স্মৃতি—স্মৃতি! এগিকে একবার আয় তো মা। দেখে যা, কে এসেছেন।

স্মৃতি ঘরে ঢুকে একটু মিষ্টি হেসে দু'হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে বলেছিল, ভাল আছেন?

আমার প্রিয়তম বন্ধুর ভাবী-পত্নী স্মৃতিকণা। তার রূপ-লাবণ্যের কথা চিন্তা করা আমার পক্ষে অন্যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে সত্যিই আমার মনে হয়েছিল স্মৃতিকণা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা যেন আরও কমনীয় হয়ে উঠেছে। তার পটল-চেরা চোখের তারার সেই চঞ্চলতা আর নেই। সেখানে কেমন যেন এক গভীর দৃষ্টি পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় স্থির হয়ে রয়েছে। তার জীবনে সেই পূর্ণতা আনবে আমার প্রিয়তম বন্ধু অমিত।

আমিও হেসে প্রতি নমস্কার করে বলেছিলাম, ভাল আছি। আপনি ভাল তো?

মাথা নেড়ে একটু স্নিগ্ধ হাসি হেসেছিল স্মৃতিকণা। তারপর অজিতেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমি যাই, বাবা। ওঁর জন্যে চা নিয়ে আসি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, হ্যাঁ, শুধু এককাপ চা-ই খাব। আর কিছু নয়। সেবার যখন আপনাদের এখানে এসেছিলাম, তখন চায়ের সঙ্গে এমন টা' খাইয়েছিলেন যে, বাড়ি ফিরে স্রেফ্ একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়তে হয়েছিল।

আমার কথায় কিন্তু প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন অজিতেশবাবু। বলেছিলেন, তা' কি হয় বাবা? এতদিন পরে আমাদের এখানে এলে, আর শুধু এককাপ চা খেয়ে চলে যাবে? না—না, তা' হয় না। তারপর, স্মৃতিকণার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, তুই মা ওর কথা শুনিস্ না। তোর নিজের হাতে তৈরি করা যে খাবার আছে তাই নিয়ে আয়।

আমি আর প্রতিবাদ করতে পারিনি। স্নেহ ও প্রীতির এই অত্যাচারটুকু সহ্য করতেই হয়।

স্মৃতিকণা হাসিমুখে চলে যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে এমন একটি মুখের ভঙ্গি করলে যার একমাত্র অর্থ—কেমন, হল তো? না খেয়ে যেতে পারবেন?

স্মৃতিকণা চলে যেতেই অজিতেশবাবু বলেছিলেন, শিলিগুড়ি থেকে অমিতের বাবার চিঠি পেয়েছি। এ মাসের মধ্যেই তিনি শুভকাজটি শেষ করতে চান। আগামী রবিবার তিনি আশীর্বাদের দিন স্থির করেছেন। তার আগেই তিনি এখানে এসে পড়বেন। আমিও তাঁর ব্যবস্থায় রাজি হয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছি। শুভকাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে ফেলাই ভাল, কি বলো, বাবা।

উৎসাহিত কণ্ঠে আমি বলে উঠেছিলাম, নিশ্চয়। মনে মনে কেবল বলেছিলাম, আমার বন্ধুটির বোধহয় আর একটি দিনও সবুর সইছে না।

অজিতেশবাবু আবার বলেছিলেন, কেনাকাটা কিন্তু তোমাকেই সব করতে হবে, বাবা। আমি বুড়ো মানুষ। রাস্তায় বেরোবার শক্তি নেই। আর আত্মীয়স্বজন যারা আছে তাদের তো বিয়ের দু'একদিন আগে ছাড়া পাবার আশা নেই। কাজেই তোমাকে একটু সাহায্য করতেই হবে। তা' ছাড়া, তোমার বন্ধুর বিয়ে। তার কি পছন্দ-অপছন্দ তা' তুমিই ভাল জানো।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিলাম, আমাকে দিয়ে কি এসব কাজ হবে? কোনদিন করি নি তো!

—আরে হবে—হবে, খুব হবে। দেখে-শুনে পছন্দমত জিনিস কেনাকাটা করা এমন কি শক্ত কাজ?

এমনি সময় স্মৃতিকণা একথালা খাবার ও চায়ের কাপ সাজানো ট্রে দু'হাতে নিয়ে এসে আমার সামনে টি-পয়ের ওপর সাজিয়ে রাখতেই আমি তাকে বলেছিলাম, আপনি কি বলেন? কেনাকাটার ভারটা আপনার বাবা আমাকে দিতে চান। আপনার পছন্দ হবে তো?

স্মৃতিকণা আমার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নীচু করে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ওর মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে আমি অনুযোগের সুরে আবার বলেছিলাম, একি করেছেন আপনি? এত খাবার আমি খাব কি করে?

অজিতেশবাবু বলেছিলেন, না বাবা, ঐটুকু খাও। এমন কিছু বেশি নয়। তোমরা দু'টি বন্ধু স্বভাবে কিন্তু একই রকম। খাবার দেখলেই না-না করে ওঠো কেবল। তোমাদের বয়সে কিন্তু এটুকু খাবারে আমাদের পেটের একটা কোনও ভরতো না।

স্মৃতিকণাও স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেছিল, খান না। এতই যদি বেশি মনে করেন, তা'হলে না হয় বাড়ি গিয়ে রাতের খাবার খাবেন না।

সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্পগুজব করেছিলাম অজিতেশবাবু ও স্মৃতিকণার সঙ্গে। অবশেষে একসময় বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

রবিবার দিনটি কিন্তু আমার স্মৃতিপটে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সেদিন পাত্র ও পাত্রী দু'জনেরই আশীর্বাদ।

শিলিগুড়ি থেকে সবাই আসতে পারেনি। অমিতের মা ও বাবা এসেছিলেন অমিতের একটি ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু তাই বলে ঘটা একটুও কম হয়নি। কি হৈ-চৈ হুল্লোড়! সেদিন একরকম গোটা থানাটাই ভেঙে পড়েছিল অমিতের বাড়িতে। রাস্তার পথচারীরা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখছিল বিয়ের সেই প্রাথমিক পর্বটি।

থানার ও. সি. ভবদেব ব্যানার্জীর মত বয়স্ক ব্যক্তিও যে কোনদিন অমন ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে পারে, তা' আমি আগে কোনদিন কল্পনাই করতে পারিনি। অমিতের ঘরে ঢুকেই সে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলে, আজ আমার থানার মেজবাবুর সম্পূর্ণ অফ ডে। আজ আমি তাকে কোন কেস্ তদন্তে যেতে বলব না, থানা ডিউটি করতে বলব না, কোন জুয়োর আড্ডায় রেইড্ পর্যন্ত করতে বলব না। তিনি আজ সমস্ত দিন ঘরে বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে একখানা মুখ কল্পনা করতে পারেন। এমনকি, খোদ্ বড়সাহেবও যদি আজ থানার মেজবাবুর খোঁজ করেন তো আমি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেব, আই অ্যাম্ সরি, স্যার ; হি ইজ সিরিয়াস্‌লি এন্‌গেজড্ উইথ্ এ লেডি। কাইণ্ডলি ডোণ্ট্ ডিস্টার্ব্ হিম টুডে।

ভবদেব থামতেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত আমরা হো-হো শব্দে হেসে উঠেছিলাম। অমিতও হাসিমুখে চুপ করেছিল। আমাদের হৈ-হুল্লোড়ের দাপটে অমিতের মা, বাবা কিংবা পাত্রীপক্ষের লোকজনেরা এঘরে আসতে সাহস পায়নি। অমিতের ছোট বোন একবার দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই পালিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় বেচারীর দাদার কাছে কিছু বলার ছিল। কিন্তু সাহস করে আর ঘরে ঢুকতে পারেনি। ঘরের মধ্যে কালাপাহাড়বাবু ও ধূর্জটি গাঙ্গুলীও উপস্থিত। ধূর্জটি মাত্র আগের দিন থানায় জয়েন করেছে। তার সাস্‌পেন্‌শান্ উইথ্‌ড্র হয়েছে। বদলিও হয়েছিল অন্য একটি থানায়। কিন্তু কোতোয়ালী থানায় অফিসার কম। তাই তাকে ঐ থানাতেই কিছুদিন কাজ করতে বলা হয়েছিল।

ধূর্জটি প্রথমটায় আসতে চায়নি। অবশেষে অমিতের পীড়াপীড়িতে আসতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, ধূর্জটি না এলে বোধহয় আসরই জমতো না। একদিকে ধূর্জটি ও অন্যদিকে ভবদেব, এই দু'জনই সেদিন গোটা আসরটা জমিয়ে রেখেছিল। কালাপাহাড়বাবু তার বিশাল দেহটি একখানা চেয়ারে ন্যস্ত করে একটু দূরে বসে পান চিবোচ্ছিল কেবল।

অমিতের পর ভবদেব আমাকে নিয়ে পড়লে। পরিকল্পনা হল, আমাকেই নাকি বিয়ের দিন নিতবর সাজতে হবে। আমি রাজী না হলে নাকি দু'জন বন্দুকধারী কনস্টেবলের সাহায্যে আমাকে নিতবর হিসাবে অমিতের সঙ্গে যেতে বাধ্য করা হবে।

হাসি-ঠাট্টা হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সেদিন শেষ হয়েছিল অমিতের আশীর্বাদ পর্ব।

॥ ঊনত্রিশ ॥

কোতোয়ালী থানার মেজবাবু অমিত রায়ের পক্ষে এখন থানায় বসে কাজ করাই একরকম মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবসময়ই ঐ আলোচনা—অমিতের বিয়ে। বিশেষ করে ধূর্জটি যদি থানায় থাকে তো কথাই নেই। সে একাই একশো।

মাঝে মাঝে অবশ্য ভবদেব নিজের ঘরে বসেই মৃদু ধমক দেয়। বলে, আচ্ছা, তোমরা সব কি পেয়েছো, বলো তো? এখনই এই শুরু করেছো, বিয়ের দিন তো মনে হচ্ছে থানার দরজায় তালা ঝুলবে। নিজেরাও কাজ করবে না, আর ঐ ছেলেটাকেও কাজ করতে দেবে না। বলি মেজবাবুর বিয়ের আনন্দে সরকারি কাজ কি বন্ধ থাকবে নাকি?

জবাবে এপাশের ঘর থেকে ধূর্জটি বলে ওঠে, না বড়বাবু, আমি একটা প্ল্যান্ ঠিক করে ফেলেছি।

—কি প্ল্যান্। বলতে বলতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ভবদেব।

তাকে দেখেই কিন্তু সুশান্ত হাতের পেন্‌সিলটা তুলে নিয়ে হাসিমুখে সামনের কাগজপত্রের দিকে ঝুঁকে পড়তেই ভবদেব কৃত্রিম গম্ভীরকণ্ঠে ধম্‌কে ওঠে তাকে। বললে, ও কি হচ্ছে সুশান্ত? আমাকে দেখেই বুঝি তোমার কাজের কথা মনে পড়ে গেল? বলি, আজ মাসের কত তারিখ হল? স্টেট্‌মেণ্টগুলো পাঠাবে কবে?

সুশান্ত মুখের হাসি চেপে জবাব দেয়, আমি তো স্যার, কাজটা সেরে ফেলতে সেই থেকেই চেষ্টা করছি, কিন্তু ঐ স্যারের জন্যেই তো পারছি না। বলেই ধূর্জটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

—হ্যাঁ, বুঝেছি। তুমি একেবারেই সাধু! এখন দয়া করে হাতের পেন্সিলটা একটু নামিয়ে রেখে ধূর্জটিবাবুর প্ল্যান্‌টা শোন। তারপর না হয় গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ শুরু করবে। বলেই ভবদেব ধূর্জটির দিকে তাকিয়ে আবার বললে, হ্যাঁ, এবার বলুন আপনার প্ল্যান্‌টা।

ধূর্জটি হেসে বললে, বিয়ের তো আর মাত্র দিন কুড়ি বাকি। এর মধ্যেই আমরা একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। বিয়ের দিন আমরা সবাই তো বরযাত্রী যাব। সেদিন রাতে থানা আগলে বসে থাকবে কে? আমি ঠিক করেছি, ঐদিন থানার দরজায় একটা বড় তালা ঝুলিয়ে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দেব। তাতে লেখা থাকবে—অনিবার্য কারণে আজ রাতের জন্য থানার স্থান পরিবর্তন করা হইল। অভিযোগকারিগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন দয়া করিয়া নিচের ঠিকানায় যাইয়া তাহাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। আসামীদের জন্যও সেখানে একটি অস্থায়ী হাজত-ঘরের ব্যবস্থা থাকিবে। নিচে লেখা থাকবে বিবাহ-বাসরের ঠিকানা।

—আসামীদের জন্যে অস্থায়ী হাজত-ঘরে ব্যবস্থা কোথায় হবে? বাসর ঘরে নাকি? হেসে প্রশ্ন করে ভবদেব।

ধূর্জটি বললে, না স্যার। অবশ্য ওটাও একটা হাজত ঘর বটে। তবে ওটা সাধারণ আসামীদের জন্যে নয়। ওটা রিজার্ভড ফর্ মেজবাবু অন্‌লি। পুলিশ অফিসার নিজেই আসামী কিনা, তাই একটু বিশেষ ব্যবস্থা।

ধূর্জটির কথায় উপস্থিত সবাই হেসে ওঠে। অমিতও মুখ নিচু করে সলজ্জ হাসি হাসে।

ভবদেব বললে, প্ল্যানটা মন্দ নয়, কিন্তু তাতে ঝামেলা অনেক। তার চাইতে সহজ ব্যবস্থা তো হাতের কাছেই রয়েছে।

সকলেই একযোগে তাকায় ভবদেবের মুখের দিকে।

কৌতুককণ্ঠে ভবদেব বলতে থাকে, থানা আগলে বসে থাকার জন্যে লোকের অভাব কি? আমাদের শ্রীপতিবাবুই তো রয়েছেন। উনিই তো থানায় থাকতে পারবেন।

বৃদ্ধ শ্রীপতি মিত্র হাসিমুখে বললে, কেন বড়বাবু, বুড়ো হয়েছি বলে কি বরযাত্রী যেতে পারবো না?

—না—না, তা' কেন? আমাদের শাস্ত্রে বুড়োদের বরযাত্রী যেতে মানা নেই। তবে জানেন তো, আমাদের দেশে সামাজিক নিয়ম অনুসারে বিধবা স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ বিবাহ-বাসরে যেতে পারে না। ঠিক তেমনি, খুব শিগগিরই পরিবার-পরিকল্পনা দপ্তর আদেশ জারী করছে যে, দু'টি কিংবা তিনটির বেশি সন্তান যাদের থাকবে তারা অনিবার্যকারণেই বিবাহসভায় উপস্থিত থাকতে পারবে না। কারণ তাদের গায়ের হাওয়া লেগে নবদম্পতির—

কথাটা আর শেষ করতে পারে না ভবদেব। হাসির রোল ওঠে ঘরে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাসি সামলাতে চেষ্টা করে শ্রীপতি। আর লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে অমিত।

অমিতের বাবা তার মা ও বোনকে নিয়ে পরের দিনই চলে গেলেন শিলিগুড়ি। ঠিক হল, বিয়ের তিন চার দিন আগে তিনি সবাইকে নিয়ে আসবেন। অমিতের বাড়িওয়ালাও দু'খানা বাড়তি ঘর ছেড়ে দিতে রাজি হল। আর, ইতিমধ্যে এদিকের ব্যবস্থার সমস্ত ভার এসে পড়ল আমার ওপর।

দিশেহারা হয়ে উঠি আমি। অজিতেশবাবু আগেই কেনাকাটার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবার দিয়ে গেলেন অমিতের বাবা। এদিকে এসব ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ি। তবে, ভরসার মধ্যে একমাত্র ভবদেব। কোথাও ঠেকে গেলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব। তা'ছাড়া হাতেও আমার প্রচুর সময়। কলেজে এখন ছুটি চলছে।

সমাজ-জীবনে ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা কারুর মুখ চেয়েই বসে থাকে না। তারা নিয়ম মতই আসে। আর, তা' রোধ কিংবা তার প্রতিকার করতে পুলিশকে সব সময়ই থাকতে হয় প্রস্তুত হয়ে। তাদের তরফে এতটুকু অবহেলা কিংবা ঢিলেমিও সমাজ জীবনকে করতে পারে মারাত্মক আঘাত।

তাই, অমিতের বিয়ের ব্যাপারে কোতোয়ালী থানায় যতই কেন না আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাক, তাদের নিয়মমতই কাজ করে যেতে হয়। এ থেকে খোদ্ অমিতেরও পরিত্রাণ নেই। যেদিন থেকে তার ছুটি শুরু হবে, তার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাকে এমনিভাবেই কাজ করে যেতে হবে।

রাতের কোতোয়ালী থানা। অফিসাররা প্রায় সবাই উপস্থিত। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। থানা ডিউটি কালাপাহাড়ে। কেবল শ্রীপতিবাবু একটা জরুরী এন্‌কোয়ারীতে রয়েছে বাইরে।

ও. সি. ভবদেবের ঘরে যথারীতি বসে আছি আমি। একটু আগেই ভবদেব একটা দুঃসাহসী চুরির ঘটনা বলেছিল আমাকে। তাড়াতাড়ি নোট্ নিয়ে রেখেছিলাম তখন। ভবদেব এখন ডুবে রয়েছে তার কাজের মধ্যে। সেই সুযোগে আমিও বসে বসে ঘটনাটা গুছিয়ে লিখ্‌ছিলাম পত্রিকা অফিসে পাঠাব বলে।

ঠিক এমনি সময় একটি লোক সোজা চলে আসে ভবদেবের ঘরে।

লোকটি আমার মুখ চেনা। বহুবার আমি ওকে ভবদেবের কাছে আসতে দেখেছি। লোকটির পরিচয় ভবদেবকে কোনদিন জিজ্ঞেস না করলেও তার ভাবভঙ্গি, চলাফেরা দেখে তাকে ভবদেবের একজন বিশ্বস্ত ইন্‌ফর্মার বলেই মনে হয়েছিল আমার।

লোকটি ভবদেবের কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই ভবদেব মুখ তুলে তাকায় তার দিকে। তারপর লোকটিকে চোখের ইশারায় অনুসরণ করতে বলে ভবদেব তার কক্ষ-সংলগ্ন বারান্দায় চলে যায়। লোকটিও অনুসরণ করে তাকে।

আমি বুঝতে পারি কোন গোপন খবর আছে নিশ্চয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল নেই, কিংবা থাকা উচিতও নয়। এটা পুলিশের নিজস্ব ব্যাপার। কাজেই, আমি একমনে আমার নিজের কাজই করে যেতে থাকি।

দু'তিন মিনিট পরেই ভবদেব লোকটিকে নিয়ে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে। তাকে বেশ একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। লোকটি ঘরের কোণে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারে ফিরে এসেই ভবদেব অমিতকে ডাকে। সাড়া দেয় অমিত। তারপর সে ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াতেই চোখের নিমেষে ঘটে যায় ব্যাপারটা।

ভবদেব অমিতের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যায়, কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বেরোয় না। সহসা তার মুখখানা সাংঘাতিক লাল হয়ে ওঠে। আর পরক্ষণেই একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে জ্ঞান হারিয়ে টেবিরে ওপর লুটিয়ে পড়ে ভবদেব। তার নাক ও মুখ থেকে বেরিয়ে আসে রক্তের ধারা।

চিৎকার করে ওঠে অমিত। আমিও মুখ তুলে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠি। দৌড়ে আসে থানা অফিসাররা। মুহূর্তে খবর চলে যায় কনস্টেবল্ ব্যারাকে। সেখান থেকেও ছুটে আসে তারা।

ভবদেবকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেয়া হয় একটা বেঞ্চিতে। আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে ফোন করি এক পরিচিত ডাক্তারকে। খবর চলে যায় অফিসারদের কোয়ার্টারে। থানার ভেতরের দিকের ছোট্ট চত্তরটুকু ভরে ওঠে মহিলা ও ছোটদের কলরবে। একমাত্র ভবদেবের মেয়ে অমিয়া এসে বসে বাপের শিয়রের কাছে।

একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হন ডাক্তার। তিনি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন ভবদেবকে। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, ব্লাড প্রেশার থেকেই স্ট্রোক হয়েছে। তবে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়েই বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। নইলে, ব্যাপারটা ফ্যাটাল্ হতে পারতো।

অমিত অস্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ওকে হসপিট্যালে রিমুভ করতে বলেন?

—না—না। তেমন কোন প্রয়োজন নেই আর। বাড়িতেই রিমুভ করুন। আর এই ওষুধ লিখে দিচ্ছি, এগুলো আনিয়ে এখনই এ্যাপ্লাই করুন। মনে হয়, এতেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে, ওঁকে এখন বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে রেষ্ট্ নিতে হবে। নড়াচড়া করা একেবারেই চলবে না।

ভবদেবকে ধরাধরি করে তার কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে আসে। তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমি জিজ্ঞেস করি, এখন কেমন লাগছে, বড়বাবু?

মৃদু হেসে আস্তে আস্তে জবাব দেয় ভবদেব, একটু ভাল, তবে ভীষণ দুর্বল লাগছে।

হেসে বললাম, ডাক্তার বলে গেছেন, এখন বেশ কিছুদিন আপনাকে ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

ভবদেব কোন জবাব না দিয়ে আবার একটু ম্লান হাসে।

টেলিফোনে পুলিশের ওপর মহলে ভবদেবের হঠাৎ অসুস্থতার খবর পাঠিয়ে এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়ে অমিত। যাক্, আপাততঃ একটা কাজ শেষ হল। পরক্ষণেই কিন্তু নিজের মনে আবার বলে ওঠে, শেষ হল, না শুরু হল? ভবদেব নেই। এই কোতোয়ালী থানার মত একটা বিরাট থানার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন তার নিজের ওপর। এ যেন মাথার ওপর থেকে বৃদ্ধ পিতার সরে যাবার মত অবস্থা। পিতা বৃদ্ধ কিংবা অক্ষম হলেও সংসারে তার শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মূল্যই অনেক। তিনি যে মুহূর্তে সরে যান, সেই মুহূর্তেই উপযুক্ত পুত্ররাও প্রথমটায় চোখে অন্ধকার দেখে।

সেই ইন্‌ফর্মার লোকটি কিন্তু তখনও থানা ছেড়ে যায়নি। এতক্ষণে তার ওপর নজর পড়তেই অমিত প্রশ্ন করে, তুমি বোধহয় বড়বাবুর কাছেই এসেছিলে? কিছু খবর ছিল নাকি?

—হ্যাঁ সাব, ভাঙা বাংলায় জবাব দেয় লোকটি, একঠো ভারি খবর ছিল, সাব। বড়াবাবুকো বলেও ছিলাম। লেকিন, তিনি খবরঠো আপনাকে বলতে আর ফুরসৎ পাননি, সাব।

অমিত বললে, ও—তাই বুঝি তখন বড়বাবু আমাকে ডেকেছিলেন?

—জী, সাব। লোকটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

অমিত একটু ইতস্ততঃ করে আবার বললে, আমাকে বলতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

লোকটি তার ময়লা দাঁতগুলো বের করে হেসে বললে, আপত্তি থাকবে কেন, সাব? বড়াবাবুর বেমারি হল। এখন আপ হি তো থানেদার।

অমিত তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে যায়।

লোকটি অনুচ্চকণ্ঠে বললে, সুন্দর কো খবর মিলা। উস্‌কো পাকড়নে সক্‌তে।

সুন্দর অর্থাৎ সুন্দরলাল। একটা ডাকাত দলের সর্দার সে। পাশাপাশি চার-পাঁচটা থানা এলাকায় ছ'-সাতটা ডাকাতির জন্যে এই দলটাই দায়ী। মাত্র কিছুদিন আগেই পাশের থানা এলাকায় সাইমল্‌টেনিয়াস্ রেইড্ করতে গিয়ে ঐ দলের কয়েকটা লোক ধরা পড়েছিল। একটুর জন্যে দলের সর্দার সুন্দরলাল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল। সেই সুন্দরলালের খোঁজ পাওয়া গেছে। কথাটা শুনেই অমিতের চোখ দু'টো চক্‌চক্ করে ওঠে।

সে জিজ্ঞেস করে, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?

লোকটি বললে, সিনেমার এপাশে যে সরাবখানা আছে, ওখানেই আজ রাতে আসবে সুন্দরলাল। এক দোস্ত্-এর সাথে মোলাকাত করতে আসবে। সরাব-উরাব খাবে।

—খবর তোমার ঠিক তো?

—একেবারে পাক্কা খবর, সাব্। এই খবর-ই বড়াবাবুকো দিয়েছিলাম। আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে, বড়াবাবুকে ঝুট্ খবর দেব?

একটু সময় চিন্তা করে অমিত বললে, ঠিক আছে। আমি যাব। তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে?

—কিছু জরুরৎ আছে, সাব? সুন্দর কো আপনি চিনতে পারবেন না?

—হ্যাঁ, ফটো দেখেছি। তারপর একটু থেমে অমিত আবার বললে, ধূর্জটিবাবুও বোধহয় তাকে চেনে।

—কে, গঙ্গোলী সাব? হ্যাঁ—গঙ্গোলী সাব ভি উস্‌কো পহচন্তে হ্যাঁয়।

—ওর কাছে নিশ্চয়ই ছোরাছুরি থাকবে? জিজ্ঞেস করে অমিত।

হেসে লোকটি বললে, জরুর সাব। ছোরাছুরি তো জরুর থাকবে। পিস্তল ভি থাকতে পারে।

অমিত ধূর্জটিকে ডাকে।

ধূর্জটি সব শুনে উত্তেজিতকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি সুন্দরকে ভালমতই চিনি।

লোকটি আবার সাবধান করে দেয় অমিতকে। বললে, গোঁসা মৎ কিজিয়ে, সাব। আপনার ওমর কম বলেই বলছি, খুব হুঁসিয়ার! টের পেলে কিন্তু সুন্দর গোলাগুলি ছুঁড়বে।

লোকটি যেন অল্পবয়সী অমিতের ওপর ঠিক ভরসা করতে পারে না। তাই, আবার ধূর্জটিকে বললে, আপনিও তো যাবেন সাব?

ধূর্জটি অমিতের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, মেজবাবু বললেই যাব।

অমিত লোকটিকে আশ্বাস দেয়, হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই যাব।

লোকটি খুশি মনে চলে যায়। সে চলে যেতেই ধূর্জটি মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললে, দেখলেন মেজবাবু, কাণ্ডটা? ঝঞ্ঝাট যখন শুরু হয় তখন এমনিভাবেই হয়। বড়বাবুকে নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি, এদিকে ঐ লোকটাও ঠিক এই সময় এসে হাজির। এখন তো আমাদের দু'জনকেই যেতে হবে। বড়বাবুর বাড়িতেও তো একজন কারুর থাকা উচিত। যদি এর মধ্যে আবার খারাপ কিছু হয়ে পড়ে তো—

ধূর্জটিক কথা শেষ হবার আগেই অমিত বললে, উপায় কি বলুন? সুশান্তবাবুকেও তো আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। থানায় থাকবেন একা কালাপাহাড়বাবু। তাকেই বড়বাবুর বাড়ির দিকে একটু নজর রাখতে বলে যেতে হবে। তা'ছাড়া তরুণ তো বড়বাবুর বাড়িতেই রয়েছে। তাকেই না হয় আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত বড়বাবুর বাড়িতে থাকতে বলব।

ভবদেবের বাড়িতে এসে অমিত আমাকে একটু আড়ালে ডেকে সব কথা বলতেই আমি সানন্দে রাজি হলাম। অমিত বললে, তা' হলে আমি চলি?

সেইদিনই বোধহয় প্রথম আমি অমিতকে তার কাজের বিষয়ে কিছু উপদেশ দিলাম। বললাম, বেশ যাও। তবে একটা কথা, গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না। মনে রেখো, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সরকারী কাজ করতে গিয়ে তোমাদের ডিপার্টমেন্টেই অনেকে 'ট্যাক্‌ট্‌লেস্' আখ্যা লাভ করেছে।

অমিত চলে গেল। আমি নিদ্রিত ভবদেবের শিয়রের কাছে একখানা চেয়ারে বসে রইলাম।

অমিত থানায় ফিরে আসতেই ধূর্জটি প্রশ্ন করে, কিভাবে আমরা যাব, মেজবাবু? ফোর্স নিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

জবাবে অমিত বললে, না, টের পেলে সেদিনের মত আবার পালাবে।

একটু সময় চিন্তা করে অমিত আবার বললে, পুলিশ লাইন থেকে ফোর্স নিয়ে যাব, তাদের সঙ্গে থাকবে সুশান্তবাবু। তারা ঐ সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি আর আপনি সাদা পোশাকে গিয়ে ঢুকব সেই মদের আড্ডায়। বিপদ বুঝলে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে ফোর্স ডাকব। সুশান্তবাবুকে তেমনি ডিরেক্‌শানই দেয়া থাকবে।

ধূর্জটি বললে, ব্যবস্থা মন্দ নয়। কিন্তু ঐ ব্যাটা আমাকে ভালমতই চেনে। আমাকে দেখামাত্র যদি গুলিগোলা ছুঁড়তে আরম্ভ করে?

একটু ভেবে অমিত বললে, তা'হলে থাক। আপনার ওখানে গিয়ে কাজ নেই। আপনি বরঞ্চ ফোর্সের সঙ্গে সিনেমা হলের কাছেই থাকুন। আমি একাই গিয়ে ঢুকব সেই মদের দোকানে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে ধূর্জটি। বললে, না মেজবাবু, তা' হতে পারে না। আপনি একা ঐ সুন্দরলালের মুখোমুখি হবেন তা' কিছুতেই হবে না। মদের আড্ডায় আমি আপনি দু'জনেই যাব। আমি বরঞ্চ দরজার কাছে থাকব যাতে সে প্রথমেই আমাকে দেখতে না পায়। আপনি ভেতরে ঢুকবেন। তারপর আপনি আচম্‌কা লোকটাকে এ্যাটাক্ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও গিয়ে হাজির হব।

অমিত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে, বেশ তাই হবে।

ধূর্জটি বললে, একটা কথা মনে রাখবেন মেজবাবু, সুন্দরলালকে পকেটে হাত ঢুকিয়ে কোন অস্ত্রশস্ত্র টেনে তোলার সুযোগই দেবেন না। তা' হলেই বিপদ।

আরও প্রায় আধঘণ্টা পরে এদিকের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে অমিত ও ধূর্জটি যখন একখানা সাইকেল রিক্সায় উঠে বসে, তখন তাদের চিনতে পারা সত্যিই কষ্টকর। অমিতের পরনে একটা ময়লা পাজামা, গায়ে একটা ছেঁড়া সার্ট, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। ধূর্জটির গায়েও ছেঁড়া সার্ট কিন্তু পরনে একটা আধময়লা লুঙ্গি। গোয়েন্দা উপন্যাসের ডিটেক্‌টিভের মত ছদ্মবেশ ধরতে তারা মোটেই ওস্তাদ নয়। তবুও চেষ্টা করছিল যাতে ভাটিখানার ভিড়ে হঠাৎ তারা কারুর নজরে না পড়ে। বলা বাহুল্য, দু'জনেই দু'টো লোডেড্ রিভলবার কোমরে গুঁজে নিয়েছিল। পকেটে ছিল হুইস্‌ল্।

সিনেমার সামনে এসে তারা রিক্সা দাঁড় করায়। তারপর রিক্সাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকে। এক মিনিট, দু'মিনিট করে মিনিট পনেরো কেটে যায়। এমনি সময় পুলিশ বোঝাই একখানা গাড়ি সেখানে এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা সুশান্তর সঙ্গে চোখাচোখি হয় তাদের।

অমিত অস্ফুটকণ্ঠে ধূর্জটিকে বললে, দেরি হয়ে গেল কিনা কে জানে? চলুন, এবার এগোনা যাক।

অমিত ও ধূর্জটি পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সেই মদের দোকানের দিকে।

শত চেষ্টা করেও আসন্ন বিপদের চিন্তাকে মন থেকে তাড়াতে পারছিল না অমিত। কি জানি, কি হয়। টের পেলে লোকটা কি আর ছেড়ে কথা কইবে? হয়ত গোলাগুলি চালাবে। তেমন অবস্থায় তাদেরও হয়ত গুলি না চালিয়ে উপায় থাকবে না। একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে হয়ত। কিন্তু এছাড়া আর উপায় কি? এত অল্প সময়ের নোটিশে এর চাইতে আর ভাল ব্যবস্থা কি হতে পারতো? ভবদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকলেও বোধহয় এমনিই একটা ব্যবস্থা হত।

উত্তেজনায় বুকটা টিপ্ টিপ্ করছিল অমিতের। যে ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক ঐ সুন্দরলাল, তাতে আগে থেকেই টের পেয়ে সরে পেড়েছে কিনা, কে জানে! তা'হলে তো এত আয়োজন সমস্তই পণ্ড।

অনেকে অনেক সময় হাসে, ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। একটা লোককে ধরতে পুলিশের এত আয়োজন? হ্যাঁ, তাই। যাকে ধরবার চেষ্টা হচ্ছে সে একা হলেও বেপরোয়া। এলোপাথাড়ি গোলাগুলি চালিয়ে সে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। গ্রেপ্তার এড়াতে গিয়ে তার পক্ষে মরিয়া হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু পুলিশের দায়িত্ব সেখানে অনেক। দূর থেকে গুলি করে

তাকে খতম্ করে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। গ্রেপ্তার করতে হবে। অক্ষত শরীরে গ্রেপ্তার করাই কাম্য। সেই সঙ্গে নিজেরাও যাতে অক্ষত থাকতে পারে সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি থাকা চাই। কাজেই, একটি মাত্র সশস্ত্র ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে একটু বেশি আয়োজনই করতে হয় পুলিশকে।

দিশি মদের দোকান। প্রচুর ভীড় দোকানে। নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশি। ওরই মধ্যে দু'একজন ভদ্রচেহারার ব্যক্তিও নজরে পড়ে। এককালে হয়ত তারা বিলিতি বারেই যাতায়াত করতো, এখন হাতের পয়সা ফুরিয়েছে, কিন্তু নেশাটি আছে। তাই এখন এখানেই যাতায়াত শুরু করেছে।

মদের দোকানের সামনেই একটা চায়ের দোকান। বেগুনি, ফুলুরি, ছোলাভাজা প্রভৃতি নানা ধরনের ভাজাভুজি সাজানো রয়েছে দোকানের সামনে। সেখানেও খদ্দেরের ভিড়। ঢাকের সঙ্গে যেমন কাঁসি, তেমনি দিশি মদের সঙ্গে এই চাট্। এ না হলে নাকি ঠিক জমে না।

অমিত ও ধূর্জটি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় চাটের দোকানের সামনে। তারা ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে চেষ্টা করলেও দু'একজন খদ্দের একটু তির্যক চোখে তাকায় তাদের দিকে। হয়ত ভাবে নতুন খদ্দের। তাই মাথা ঘামায় না বিশেষ কেউ। যে যার নিজেকে নিয়েই অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ধূর্জটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় ঘরের মধ্যে। মদের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। ভেতরে হল্লা চলছে, তবে তেমন কিছু বেশি নয়। মদ খাওয়া বে-আইনী না হলেও মাতলামি করা বে-আইনী। ঠিক যেন সেই শিবঠাকুরের আপন দেশের মত ব্যাপার—নস্যি নেওয়া অপরাধ নয়, কিন্তু নস্যি নিয়ে হাঁচি দেওয়া অপরাধ ; ঘুমোনো অপরাধ নয়, কিন্তু ঘুমের ঘোরে নাক ডাকা নাকি সাংঘাতিক অপরাধ।

ঘরের মধ্যে লম্বা বেঞ্চির ওপর বসে থাকা একটি লোকের ওপর দৃষ্টি পড়তেই কিন্তু ধূর্জটির চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফিস্ ফিস্ করে বললে অমিতকে, চিনতে পেরেছেন মেজবাবু, ঐ যে বসে আছে, মোটা ভারি গোঁফ, মেটে রঙের হাফ সার্ট গায়ে!

উত্তেজিত চাপাকণ্ঠে জবাব দেয় অমিত, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি ভেতরে যাচ্ছি, আপনি এখানেই থাকুন। আমি ওকে চার্জ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি ঘরে ঢুকবেন।

অমিত যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ধূর্জটি আবার সাবধান করে দেয় তাকে। বললে, পেছনের ঐ দরজাটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন মেজবাবু, ব্যাটা ঐ পথে যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অমিত ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই একটা মাতাল এসে হঠাৎ তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। তারপর স্খলিতকণ্ঠে বলে ওঠে, কে বাবা তোমরা ইঁদুরের বাচ্চা? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন থেকে গুজ-গুজ্ ফুস্-ফুস্ করছো কেন বাবা? কি মতলব তোমাদের?

সর্বনাশ, এখনই বুঝি ভেস্তে যায় সব! ঘরের মধ্যে উপস্থিত লোকগুলোর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলেই আর রক্ষা নেই! সন্দিগ্ধ সুন্দরলাল সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের ঐ দরজা দিয়ে সরে পড়বে।

বিরক্ত ভঙ্গিতে অমিত সেই মাতালটাকে কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই ধূর্জটি চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে, চলে যান—ওকে নিয়েই ভেতরে চলে যান মেজবাবু, নিয়ে গিয়ে একগ্লাস মাল খাইয়ে দিন। শিগ্‌গির।

অমিত ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বিব্রত দৃষ্টিতে কেবল তাকায় ধূর্জটির মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জটি সেই মাতালটার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে ওঠে, কিছু না দাদা। ঘরের মধ্যে একটা গুঁফো বেড়াল ঢুকেছে। সেটাকে কি করে বাইরে আনব তাই ভাবছি, দাদা।

ধূর্জটির কথায় মাতালটার ভুরু দুটো হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তেমনি জড়িতকণ্ঠে সে বলে ওঠে, বেড়াল, বেড়াল ঢুকেছে? তারপর নিজের গোঁফের ওপর একবার শিথিল আঙুল বুলিয়ে হি—হি শব্দে হেসে উঠে বলতে থাকে, চমৎকার, বেড়ে বলেছ দাদা। শুধু বেড়াল নয়, গুঁফো বেড়াল—হি—হি—হি, বেড়ে বলেছ—গুঁফো বেড়াল! আরে দাদা, মাল টেনে একেবারে চুর হয়ে রয়েছো দেখছি। এঘরে বেড়াল আসবে কোত্থেকে? এখানে তো সবাই তোমার আমার মত মানুষ। মাল টেনে কি এমনি মাতাল হতে হয়? এই দেখ না দাদা, আমাকেই দেখ। বলেই লোকটা নিজের বুকের ওপর হাত চাপড়ে বীরত্ব প্রকাশ করে আবার বলে ওঠে, পুরো দু'বোতল টেনেছি, কিন্তু একটুও মাতাল হইনি। তুমিই বল, দাদা—

ধূর্জটি সেই মুহূর্তেই অমিতকে ইঙ্গিত করতেই অমিত ভেতরে চলে যায়। আর, দরজার সামনে মাতালটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ধূর্জটি তার সঙ্গে রঙ্গরস করতে থাকে। চোখ দু'টো কিন্তু থাকে ঘরের মধ্যে।

অমিত পায়ে পায়ে কাউণ্টারের সামনে এসে দাঁড়াতেই দোকানের মালিক তার দিকে তাকিয়েই ত্রস্তকণ্ঠে বলে ওঠে, মেজবাবু, আপনি এখানে।

সর্বনাশ! আর ভাববার মত সময় নেই অমিতের। এখনই সব ফাঁস হয়ে যাবে। অমিত বিদ্যুৎ গতিতে কোমর থেকে রিভলবারটা টেনে তুলেই চোখের নিমেষে সুন্দরলালের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর, উদ্যত রিভলবারটা তার কপালে ঠেকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, ভাগ্‌নেকো কোসিস মৎ করো, সুন্দরলাল।

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হয়। এক নিমেষেই সেখানে নেমে আসে শ্মশানের নীরবতা। একটিমাত্রমুহূর্ত, পরক্ষণেই কিন্তু খদ্দেরদের মধ্যে হুটোপুটি পড়ে যায় পালাবার জন্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার সামনে থেকে ছুটে ভেতরে ঢোকে ধূর্জটি। হাতে তার উদ্যত রিভলবার।

কিন্তু সুন্দরলালও কম ক্ষিপ্র নয়। অমিতের রিভলবারের নলটা তার কপাল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে-ও টেনে তুলেছিল তার পিস্তল। আর অমিতও সেই মুহূর্তে বাঁ-হাতে চেপে ধরেছিল সুন্দরলালের পিস্তলটা। কিন্তু তার আগেই সুন্দরলাল টিপে দিয়েছে ট্রিগার। প্রচণ্ড শব্দে পিস্তল থেকে গুলি ছুটে গিয়ে আঘাত করে দোকানের শো-কেশের উপর। ঝন্ ঝন্ শব্দে গোটাকয়েক মদের বোতল মেঝেয় আছড়ে পড়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়।

সুন্দরলালের দৈহিক শক্তি অমিতের চাইতে অনেক বেশি। এক ঝট্‌কায় পিস্তল সমেত নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে সুন্দরলাল, কিন্তু তার আগেই ধূর্জটি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর।

ঘর তখন প্রায় ফাঁকা। বাইরে জনতার ভিড়। এই সময় ঘরের মধ্যে ভেসে ওঠে অমিতের হুইসিলের আওয়াজ। একবার নয়, একাধিকবার।

গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সুশান্ত ফোর্স নিয়ে রেডি হয়েই ছিল। বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই লাঠি ও বন্দুকধারী কনস্টেবলরা হুড়মুড় করে এসে পড়ে সেখানে।

গ্রেপ্তার করা হয় সুন্দরলালকে। অনেকগুলো ডাকাতি মামলার প্রধান আসামী সুন্দরলাল। সাধারণ ডাকাতি নয়—ডেকয়েটি উইথ্ মার্ডার। ডাকাতি করতে গিয়ে একাধিক ক্ষেত্রে সে

নরহত্যা করেছে। তার ওপর, আর একটা নতুন অপরাধ—তার কাছে পাওয়া গেছে একটা আন-লাইসেনস্‌ড্‌ পিস্তল। আর্মস্‌ এ্যাক্টের ধারায়ও এবার অভিযুক্ত করা হবে তাকে।

কিন্তু অভিযুক্ত করাটাই তো বড় কথা নয়। আদালতে সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে। আর তা' প্রমাণের ভার সাক্ষী-সাবুদের হাতে। সেখানে পুলিশের কোন হাতই নেই। পুলিশ কেবল মামলার মালমশলা আর উপযুক্ত সাক্ষী সাবুদ নিয়ে গিয়ে হাজির করতে পারে বিচারকের সামনে। তার বেশি কিছু নয়। আইনের চুলচেরা বিচারে তাদের সাক্ষ্য ধোপে টিকবে কিনা তা' বিচারের ভার বিচারকের হাতে। সেখানে বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধির খেলায় যে কোন মুহূর্তে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। আর বিচারকের মনে যদি একবার সন্দেহের ছোঁয়া লাগে তো তার সবটুকু সুযোগ পাবে ঐ সুন্দরলালের মত লোকেরা—বেনিফিট্‌ অব্‌ ডাউট্‌। পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ঐ সুন্দরলালই হয়ত হাসতে হাসতে বেরিয়ে গিয়ে আর একটা ডাকাতের দল গড়বে। নইলে, নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে আদালতে উকিল-মোক্তারের পেছনে যে টাকা খরচ করতে হয়েছে, সেই টাকাটা উসুল হবে কোত্থেকে?

খবরটা ভবদেবকে জানানো হয় পরের দিন সকালে। শুনে একটু তৃপ্তির হাসি হাসে ভবদেব। অমিতকে ডেকে বললে, খুব সতর্ক হয়ে মামলার ডাইরী লিখবে। এতটুকু লুপহোল্‌ যেন থাকে না কোথাও। তা'হলে কিন্তু শত চেষ্টা করেও আটকাতে পারবে না ঐ সুন্দরলালকে। প্রচুর পয়সাকড়ি আছে ওর। বাঘা বাঘা উকিল-ব্যারিস্টার কিন্তু ওর হয়ে মামলা লড়বে।

খবরটা শুনে আমিও খুব খুশি হই। এটা কেবল আমার বন্ধু অমিতের কৃতিত্বের জন্যেই নয়, সেই সঙ্গে পরের দিন সংবাদপত্রে দেবার মত একটা খবরের জন্যেও বটে। ভয়ঙ্কর ডাকাত সুন্দরলাল ধরা পড়েছে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে—খবর হিসেবে এর কিছু দাম আছে বৈকি!

অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে ভবদেব। কিন্তু ডাক্তারের কড়া নির্দেশ, আরও কিছুদিন তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। তাই, ইচ্ছে থাকলেও কাজে যোগ দেবার উপায় নেই তার।

ভবদেব একদিন হেসে আমাকে বললে, অমিতের জন্যে সত্যিই আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। বিয়ের তো মাত্র আর দিন দশেক বাকি। এখন কোথায় বেচারা একটু হাল্‌কা মেজাজে কাজকর্ম করে বেড়াবে, তা' নয়, এতবড় থানার পুরো ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে ওকে। আর ঐ দিদিমণিও বোধহয় মনে মনে কষে গালাগাল দিচ্ছে আমাকে। হয়ত বলছে, লোকটা আর অসুখে পড়বার সময় পেল না?

আমি হেসে বললাম, না বড়বাবু, স্মৃতিকণা তেমন মেয়ে-ই নয়।

—না হোক, আমি নিজেই যে অস্বস্তিতে মরছি।

একটু সময় চুপ করে থেকে ভবদেব আবার হাল্‌কাসুরে, বললে, ডাক্তারই বলুক আর যে-ই বলুক, অমিতের বিয়েতে আমি যে অনুপস্থিত থাকব, সেটি কিন্তু মোটেই হচ্ছে না। প্রয়োজন হলে স্ট্রেচারে শুয়েই আমি গিয়ে হাজির হব বিয়ের আসরে, কি বল সংবাদ-প্রভাকর? বলেই সে হেসে ওঠে।

আমি বললাম, আপনি যাবেন না, তা' কি হয়? শিব ছাড়া যজ্ঞই যে অসম্পূর্ণ।

—ভুল করলে সংবাদপ্রভাকর, হাসতে হাসতে বলতে থাকে ভবদেব, অমিতের বিবাহ-যজ্ঞে অমিত নিজেই হচ্ছে শিব। আমরা তো কেবল নন্দীভৃঙ্গী মাত্র।

একটু থেমে ভবদেব আবার বললে, হ্যাঁ, অমিত শিব-ই বটে। শিব শব্দের অর্থ—মঙ্গল, শুভ। ওর মনটা সত্যিই শুচিশুভ্র। একেবারে খাঁটি সোনা।

৷৷ তিরিশ ৷৷

সন্ধ্যার অন্ধকার তার কালো পাখনা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ধূসর বর্ণের আকাশের গায়ে সবে ফুটে উঠছে একটি দু'টি তারা। দক্ষিণের মৃদু হাওয়ায় যেন জড়িয়ে রয়েছে স্নেহময়ী জননীর শীতল স্পর্শ।

সেই আধো আলো অন্ধকারের মধ্যে অজিতেশ দত্তর বাড়ির ছাদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি পুরুষ ও একটি নারী—অমিত ও স্মৃতিকণা। দু'জনের মুখ চোখেই খুশির দীপ্তি।

আবেগময় কণ্ঠে অমিত বললে, প্রাক্-বিবাহ জীবনে এই আমাদের শেষ দেখা, স্মৃতি।

—কেন? আর এখানে আসবে না? প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা।

হেসে জবাব দেয় অমিত, না, আর বোধহয় আসতে পারব না। এরপর দেখা হবে শুক্রবার গোধূলি লগ্নে একেবারে বর বেশে।

স্মৃতিকণাও একটু সলজ্জ হাসি হাসে। তারপর, একটু সময় চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বললে, চলো না আজ একবার সেই জোড়পুকুর মাঠে যাই।

—কেন?

—এমনিই। ভারি যেতে ইচ্ছে করছে। আমাদের দু'জনের অনেক কথাবার্তার সাক্ষী সেই দেবদারু গাছটার নিচে গিয়ে একটু বসতে ইচ্ছে করছে।

একটু সময় চিন্তা করে অমিত জবাব দেয়, আজ তো যাওয়া হবে না, স্মৃতি।

—কেন? আশাহত কণ্ঠে প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা।

—আমাকে যে এখনই থানায় ফিরতে হবে। বড়বাবু নেই। সমস্ত দায়িত্ব এখন আমার ওপর। এই যে তোমাদের এখানে এসেছি তাও ধূর্জটিবাবুকে বলে আসতে হয়েছে। বলেছি, বেশি দেরি হবে না আমার। তোমার বাবা খবর পাঠিয়েছেন। তাই একবার ঘুরে আসি।

—বাবা তোমাকে ডেকেছেন কেন? প্রশ্ন করে স্মৃতিকণা।

—শিলিগুড়ির কোন খবর আছে কিনা তাই জানতে। আমি বললাম, কাল বাবার টেলিগ্রাম পেয়েছি। আগামী বুধবার তাঁরা সবাই এসে পৌঁছবেন।

স্মৃতিকণা আবার অনুরোধ করে, বেশ তো, আজ না হয়, কাল এইসময় বরঞ্চ একবার এসো, ওখানে যাব।

একটু ম্লান হেসে অমিত জবাব দেয়, কাল কিংবা পরশুও হবে না। পরশু অর্থাৎ মঙ্গলবার দেশজুড়ে জেনারেল স্ট্রাইক্। ঐ জন্যেই কাল সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। স্ট্রাইক্ যদি সত্যি সত্যিই বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে, আর আমাদের থানা এলাকায় কোথাও যদি কোন গণ্ডগোল না হয় তা'হলে হয়ত কাজকর্ম সেরে মঙ্গলবার এইসময় একবার আসতে পারি। নইলে সেই বুধবারের আগে আর নয়! ঐ দিন থেকেই আমার ছুটির শুরু।

স্মৃতিকণা মাথা নেড়ে বললে, না—না, বুধবার কিছুতেই হবে না। ঐ দিনই আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা আসতে শুরু করবে। বাড়ি থেকে বেরোনো কিছুতেই চলবে না। যদি পার তো মঙ্গলবারই এসো।

—বেশ, তাই হবে। যদি একটু রাতও হয় তবুও মঙ্গলবার একবার আসতে চেষ্টা করব। আর, তা' যদি সম্ভব নাই হয় তো একেবারে শুক্রবারে। পরে যে কোন একদিন গিয়ে আমরা সারাটা বিকেল ঐ দেবদারু গাছটার নিচে বসে কাটাব, কেমন?

মাথা নেড়ে সায় দেয় স্মৃতিকণা। কিন্তু অমিতের মনে হয় স্মৃতিকণা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই সে আবার বললে, তোমার ইচ্ছেমত আজই একবার যেতে পারলে আমিও খুশি হতাম, স্মৃতি। কিন্তু মনে উদ্বেগ নিয়ে ওখানে গিয়ে কি ভাল লাগবে?

—না—না, থাক। এমন তাড়াতাড়ির কি আছে? না হয়, শুক্রবারের পরেই একদিন যাওয়া যাবে। বলেই একটু সলজ্জ হাসি হাসে স্মৃতিকণা।

স্মৃতিকণার মুখের ঐ হাসিটুকু কিন্তু অমিতকেও অনেকটা সহজ করে তোলে। তার এই সামান্য ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে না পেরে এতক্ষণে সে নিজেও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে স্মৃতিকণা আবার বললে, মঙ্গলবার জেনারেল স্ট্রাইক্। আমার কিন্তু খুব চিন্তা হচ্ছে।

—কিসের চিন্তা? হাল্কা সুরে প্রশ্ন করে অমিত।

জবাবে স্মৃতিকণা বললে, চিন্তা তোমাদের নিয়ে। ওদিন তোমরা আবার একটা কি কাণ্ড করে বসবে, তার ঠিক কি? ঝঞ্ঝাট দেখলেই তো তোমরা লাঠি চালাবে, গুলি ছুঁড়বে—

ধীরে ধীরে অমিতের মুখের ওপর একটা দৃঢ়তার ছাপ ফুটে ওঠে। শান্ত অথচ গম্ভীরকণ্ঠে সে জবাব দেয়, না স্মৃতি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি অন্তত তেমন কিছু করব না। ধৈর্যের একেবারে শেষ সীমায় না পৌঁছান পর্যন্ত গুলি ছুঁড়বার আদেশ অন্তত আমার মুখ থেকে বের হবে না। কারণ, আমি ভালমতই জানি জনসাধারণ ও দেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় প্রধানত এই স্ট্রাইক, হরতাল প্রভৃতি ঘটনাগুলো থেকেই। রাজনৈতিক নেতারা তো জনতাকে সামনে এগিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। দেশের সরকারও নিশ্চিন্ত থাকে পুলিশের প্রতি যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়েই। এদিকে মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় নিরীহ জনসাধারণ ও পুলিশ বাহিনী। জনসাধারণের সমস্ত অভিসম্পাত সেই মুহূর্তে এসে পড়ে তাদের ওপর। রোখ চেপে যায় পুলিশেরও। তারপর সামান্য একটু বোঝার ভুল কিংবা সামান্যতম একটু ইন্‌স্টিগেশান্-ই সৃষ্টি করে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড। জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সৌহার্দ্যটুকু এক মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তারপর ব্যাপারটা একটু থিতিয়ে এলেই দিকে দিকে আবার শোনা যায় জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে তোলবার আহ্বান। কেঁচে-গণ্ডুষ শুরু করতে হয় তখন। তারপর আবার একদিন সেই ভাঙার পালা। এমনিভাবেই ঢেউয়ের মত একটার পর একটা এগিয়ে এসে ভেঙে পড়ে কূলে। স্থায়ী হয় না কোনটাই।

কথার শেষে অমিত স্মৃতিকণার মুখের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে আবার বললে, আজকে এই মুহূর্তে এ'সব কথা শুনতে তোমার হয়ত ভাল লাগবে না। কিন্তু কথাটা তুমি তুলেছ বলেই বলছি। এ জিনিস কখনই চলতে পারে না। পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে এই বিদ্বেষের দেয়াল একদিন ভেঙে পড়বেই। আর সেইদিনই দেশের পুলিশ সত্যিকারের বন্ধু হয়ে উঠবে জনসাধারণের।

একমুহূর্ত থেমে অমিত আবার বললে, জানো স্মৃতি, কিছুদিন আগেও সবকিছু দেখেশুনে মাঝে মাঝে কেমন যেন নিরাশ হয়ে পড়তাম আমি। মনে হত, এসব কেবল কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে হত, দি ইস্ট ইজ ইস্ট্, দি ওয়েস্ট্ ইজ ওয়েস্ট, দি টুইন্ শ্যাল্ নেভার মিট্। কিন্তু সেদিন পরাশর সেনের স্ত্রী বস্তিবাসিনী মিনতি যখন বললে—গরীব হলেও আমরা যেমন মানুষ, পুলিশ হলেও আপনারাও ঠিক তেমনি মানুষ, সেদিন থেকেই যেন একটা আশার আলো জ্বলে উঠল আমার চোখের সামনে। মনে হতে লাগল, দেশে তা'হলে এমন মানুষও আছে যারা পুলিশকে শুধু পুলিশ হিসেবেই দেখে না, মানুষ হিসেবেও দেখতে পায়। কথা বলতে বলতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অমিতের।

স্মৃতিকণা পূর্ণ দৃষ্টিতে অমিতের উজ্জ্বল মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, চলো, এবার নিচে চল। চা খেয়ে তারপর যাবে।

অমিত নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ত্রস্তকণ্ঠে বলে ওঠে, দেখেছ, এর মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে একটি ঘণ্টা কেটে গেল। এখন আবার চা খেতে বসলে দেরী হয়ে যাবে।

যেতে যেতে স্মৃতিকণা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, দেরি হবে তো হোক, চা না খেয়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

স্মৃতিকণার মুখের দিকে তাকিয়ে সম্মতির হাসি হেসে অমিত বললে, বেশ, তাই হবে।

* * *

পরদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজের মধ্যে কেটে গেল অমিতের। রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ হরতালের ডাক দিয়েছেন। রাস্তাঘাটে হরতালের সমর্থনে পোস্টার। মাইকে পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা—হরতাল সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতেই হবে। সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে। দেশের সরকারকে দেখিয়ে দিতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ জনসাধারণের শক্তি। একটি দোকানও যেন খোলা না থাকে সেদিন, একটি অফিসের দরজাও যেন না খোলে, একটি গাড়ির চাকাও যেন না ঘোরে। সব—সব বন্ধ করে দিতে হবে। সরকারি জুলুমবাজি কিছুতেই চলবে না।

সরকারও প্রস্তুত। এ অন্যায় কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। গুণ্ডামির ভয় দেখিয়ে অনিচ্ছুক জনসাধারণকে যেন হরতালে যোগ দিতে বাধ্য করা না হয়। পুলিশের প্রতি কড়া নির্দেশ—শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল হয় তো হোক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যেন গুণ্ডামি বরদাস্ত করা না হয়। কঠোর হস্তে তা দমন করতে হবে।

যুদ্ধং দেহি। রাজনৈতিক লড়াই। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা আসল যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে-কাছেও থাকবে না। সেখানে মুখোমুখি দাঁড়াবে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ আর পুলিশ বাহিনী।

অমিতকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে শহরের বিভিন্ন অংশে পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে। মুহুর্মুহুঃ উর্ধ্বতন অফিসারদের টেলিফোন। ঘনঘন নির্দেশ। শহরের কোন্ কোন্ অংশে পুলিশ বাহিনী ডিউটি করবে, কোথায় কত সংখ্যক পুলিশ নিয়োগ করা হবে, কোন্ কোন্ অফিসারকে কোথায় ডিউটি দিতে হবে—ইত্যাদি ব্যাপারেই সমস্ত দিনটা কেটে গেল অমিতের। জেলার পুলিশ কর্তা অমিতের ব্যবস্থাপনায় খুব খুশি। ইয়ং হলেও বেশ এবল্ অফিসার এই অমিত রায়।

আমি নিজেও কিন্তু মোটেই বসে নেই। সংবাদপত্রের স্থানীয় রিপোর্টার আমি। আসল ও সত্যিকারের খবর জোগাড় করাই আমার কাজ। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আসল খবরটি

জোগাড় করতে হবে। এতটুকু অবহেলা করা চলবে না কাজে। আমিও তাই সংবাদপত্রের রিপোর্টারের মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করে পরের দিনের জন্যে প্রস্তুত হই।

সকাল হতে না হতেই শহরের রাস্তাঘাট পুলিশে ছেয়ে গেল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ পিকেট্। শহরের বড় বড় সরকারী সম্পত্তির দিকে পুলিশের বিশেষ নজর। সেখানে শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশ ওয়্যারলেস্ ভ্যান। জেলার ছোট-বড় পুলিশ কর্তারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন পুলিশ জীপের আরোহী হয়ে।

জেলার পুলিশ কর্তা স্বয়ং এসে বসে রয়েছেন থানায়। বিশেষ রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী থানাতেই উপস্থিত। তাঁর নির্দেশে অমিতকেও থানায় থাকতে হয়েছে। যদি কোথাও গণ্ডগোল শুরু হয় তো সেই বাহিনী নিয়ে তাকে ছুটতে হবে সেখানে।

শহরের দোকানপাট সবই বন্ধ। রাস্তার মোড়ে কিছু কৌতূহলী জনতার ভিড় ছাড়া রাস্তাঘাটও প্রায় ফাঁকা। পুলিশ জনতাকে কোথাও ভিড় করতে দিচ্ছে না।

বেলা দশটা পর্যন্ত শহর সম্পূর্ণ শান্ত। কোথাও কোন গোলমালের খবর নেই। শান্তিপূর্ণ হরতাল।

আমাকেও তেমন ছুটোছুটি করতে হচ্ছে না। খবর যখন নেই তখন সাংবাদিকের আর কাজ কি? চায়ের দোকানে বসে বসে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করাই তখন একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে, আজ চায়ের দোকানও বন্ধ। কাজেই বাধ্য হয়ে একটা পরিচিত ওষুধের দোকানে বসে দোকানের মালিকের সঙ্গে হরতাল নিয়েই আলোচনা করতে লাগলাম। ওষুধের দোকান হরতালের আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছিল।

থানার প্রশস্ত চত্বরে আর্মড্ ফোর্স সিপাইদের ভিড়। লম্বা বেঞ্চিতে বসে কেউ খইনি টিপছে, কেউ কেউ গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা করছে, আবার কেউ বা পকেট থেকে তুলসীদাসের গীত-এর ফুটপাথ মার্কা চটি-সংস্করণ বের করে অস্ফুট কণ্ঠে সুর করে পড়ছে আর দু'চারজন ভক্তিভরে তাই শুনছে। তাদের চালচলন কিংবা কথাবার্তায় ভাবনা-চিন্তার লেশমাত্রও নেই। যেন, দল বেঁধে অবসর বিনোদন করছে তারা। মুহূর্তের নোটিশেই যে তাদের ট্রাক-বোঝাই হয়ে কঠিন হাঙ্গামার সম্মুখীন হবার জন্যে ছুটে যেতে হবে, সে বিষয় কোন ভ্রুক্ষেপই নেই তাদের।

থানার ও. সি.'র ঘরে বসে আছেন জেলার পুলিশ কর্তা। মাঝে মাঝে শহরের পরিস্থিতির খবর আসছে কণ্ট্রোলরুম থেকে। টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে অমিত।

অকস্মাৎ টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রেখে অমিত উত্তেজিতকণ্ঠে পুলিশ কর্তাকে বললে, স্যার, পোস্ট-অফিসের সামনে হাজারখানেক জনতার ভিড় হয়েছে। তারা জোর করে পোস্ট-অফিস্ বন্ধ করে দিতে চায়। সিচুয়েশান্ নাকি গ্রেভ।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কর্তা জবাব দেন, ফোর্স রেডি করুন। আমি নিজেই যাব।

—আমিও কি আপনার সঙ্গে থাকব? জিজ্ঞেস করে অমিত।

এক মুহূর্ত ভেবে পুলিশ কর্তা বললেন, না, প্রয়োজন নেই। ফোর্স নিয়ে আমি একাই যাচ্ছি। আপনি বাকি ফোর্স নিয়ে এখানেই থাকুন। বলা তো যায় না, অন্য কোথাও হাঙ্গামা সুরু হতে পারে।

ট্রাক্ বোঝাই ফোর্স নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যান পুলিশ কর্তা। জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর।

মিনিটখানেক পরেই থানার টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করে আবার বেজে ওঠে। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে কালাপাহাড়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, কে, মেজবাবু বলছেন? আমি রেল স্টেশন থেকে কথা বলছি। সিচুয়েশান্ খুবই খারাপ। পাবলিক্ একখানা লোক্যাল্ ট্রেন আটকে দিয়েছে। শিগ্‌গির ফোর্স নিয়ে চলে আসুন। আমার এখানে যে ফোর্স আছে তাতে কুলোবে না।

—কত লোক জমা হয়েছে? প্রশ্ন করে অমিত।

—তা' প্রায় পাঁচ-ছ'শ।

—বেশ, আমি এখনই রওনা হচ্ছি। বলেই টেলিফোন রেখে দেয় অমিত। তারপর দ্রুতহাতে একটা লোহার হেল্‌মেট্ মাথায় চাপিয়ে, কোমরে রিভলবার গুঁজে ট্রাক্ বোঝাই পুলিশ ফোর্স নিয়ে রওনা হয় রেল স্টেশনের উদ্দেশে।

আমি কিন্তু আগেই খবর পেয়েছিলাম। তাই স্টেশনে গণ্ডগোল সুরু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হয়েছিলাম সেখানে।

স্টেশনে ডিউটি করছিল কালাপাহাড়বাবু। একখানা লোক্যাল্ ট্রেন স্টেশনে এসে দাঁড়াতেই শ'খানেক লোকের একটা জনতা এসে রেললাইনের ওপর বসে পড়ে তার গতিরোধ করেছিল। কালাপাহাড়বাবু তাদের লাইন ছেড়ে চলে যেতে বলা সত্ত্বেও তারা তার কথায় কান দেয়নি। অবশেষে কালাপাহাড় তাদের ওপর লাঠি চালাবার হুকুম দিয়েছিল।

প্রথমটায় একটু ভয় পেয়ে জনতা পিছিয়ে গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু তারপরই তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। রেললাইনের পাথর তুলে নিয়ে তারা ছুঁড়তে শুরু করেছিল পুলিশের দিকে।

ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝতে পেরে জনতার হাতে লাঞ্ছনার ভয়ে ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ড ট্রেন ছেড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল স্টেশনের বাড়ির মধ্যে। ফাঁকা ট্রেন। যে দু'চারজন যাত্রী ছিল তারাও ততক্ষণে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।

মুষল ধারায় পাথর বৃষ্টি হচ্ছিল পুলিশের ওপর। সেই পাথর বৃষ্টির মধ্যে জনতাকে তাড়া করে বেশিদূর নিয়ে যেতে সাহসী হয়নি কালাপাহাড়। তাই বাধ্য হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পুলিশ বাহিনী নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল স্টেশনের বাড়ির মধ্যে। আর, পুলিশ বাহিনীকে হটে যেতে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল সেই মারমুখী জনতা। মুহুর্মুহুঃ সরকার বিরোধী শ্লোগান তুলছিল তারা। ইতিমধ্যে জনতার ভিড়ও বেড়ে উঠেছিল পাঁচ-ছ' গুণ।

প্লাটফর্মের একপাশে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিলাম আমি। আর, প্রতিটি ঘটনা নোট করছিলাম আমার নোটবুকে। এগুলোই আজ রাতে পাঠাতে হবে সংবাদপত্রের অফিসে।

একটু পরেই স্টেশনের সামনে গাড়ির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ট্রাক্ বোঝাই একদল পুলিশ এসে হাজির হয়েছে। তাদের মধ্যে একদলের হাতে টিয়ার গ্যাস আর অন্যদের কারুর হাতে লাঠি, কারুর বা বন্দুক। মনে মনে প্রমাদ গনি আমি। এবার হয়ত আরও বড় রকমের কোন হাঙ্গামা শুরু হবে। স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে চারিদিকে লক্ষ্য রাখি। কোন কিছুই যেন আমার চোখ এড়িয়ে যেতে না পারে। আমি সাংবাদিক। ঘটনা যখন ঘটে তখন চোখ-কান খোলা রেখে সজাগ থাকাই আমার কাজ।

হঠাৎ পুলিশ বাহিনীর মধ্যে একটি লোকের দিকে নজর পড়তেই চম্‌কে উঠি। হ্যাঁ, তাই তো। মাথার সাধারণ টুপির বদলে হেল্‌মেট্ থাকা সত্ত্বেও অমিতকে চিনতে মোটেই অসুবিধা হয় না। একটু চিন্তিত হয়ে উঠি আমি। অমিতের পক্ষে বোধহয় এখানে না এলেই ভাল হত। কি জানি, অবস্থার চাপে পড়ে ওকেও যদি সেই ধূর্জটি গাঙ্গুলীর মত কোন কাজ বসতে হয়?

কিন্তু কোন উপায় নেই। আমি সাংবাদিক তরুণ ঘোষ। অমিত আমার প্রিয়তম বন্ধু। কিন্তু তাই বলে তার কাজে মাথা গলাবার এক্তিয়ার আমার নেই, আর থাকাও সমীচীনও নয়। তাই কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নজর রাখি অমিতের ওপর।

অমিত কালাপাহাড়ের কাছে প্রকৃত অবস্থাটা বুঝে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চিন্তা করতে থাকে।

কালাপাহাড় বলে ওঠে, আর কোন উপায় নেই, মেজবাবু। ওদের রেললাইন থেকে হটিয়ে দিতে হলে লাঠি চার্জ করতেই হবে। কোন কথাই ওরা শুনবে না।

দ্রুত চিন্তা করতে থাকে অমিত। বেশিক্ষণ চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। একটা কিছু এ্যাক্শান্ নিতেই হবে, আর তা' এখনই।

অমিত একবার মুখ তুলে জনতার দিকে তাকায়। ঐ সেই জনসাধারণ যাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি। আবার, যাদের শাসন করবার অধিকারও পুলিশের রয়েছে। অমিতের শান্ত মুখখানার ওপর একটা গাম্ভীর্যের আবরণ নেমে আসে। সরকারি নির্দেশ মনে পড়ে তার—শান্তিপূর্ণ হরতাল হয় তো হোক, কিন্তু জনতার জোর-জবরদস্তি কিছুতেই সহ্য করা হবে না।

অমিত কালাপাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললে, একবার তো লাঠি চালিয়ে দেখেছেন কালাপাহাড়বাবু। তাতে কি ফল হয়েছে তাও জানেন। আবার লাঠি চার্জ করতে গেলে ওরা আবার মুষলধারে পাথর ছুঁড়বে। তখন?

—তখন আর কি, মেজবাবু? এবার আমাদের সঙ্গে গ্যাস ও আর্মস্ রয়েছে। তেমন অবস্থা হলে প্রথমে আমরা টিয়ার গ্যাস চালাবো। তাতেও কিছু না হলে শেষে গুলি। এসব ব্যাপার অনেক দেখেছি। দু'একটা জখম হয়ে লাইনের ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলেই দেখবেন রেললাইন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

একটু সময় চুপ করে থেকে অমিত দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, না, তা' কিছুতেই হবে না।

—তবে আপনি কি করতে চান? বিরক্তকণ্ঠে বলে ওঠে কালাপাহাড়, জনতা জোর করে ট্রেন আটকে রাখবে, আর আমরা গুলি বন্দুক এমনকি টিয়ার গ্যাস না চালিয়েও কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা' দেখব?

—না, তাও নয়। তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় অমিত। তারপর ফোর্সের মধ্য থেকে কয়েকজন লাঠিধারী কনস্টেবল্ বেছে নিয়ে কালাপাহাড়কে বললে দমকা হাওয়া উল্টোদিকে বইছে। এখানে টিয়ার গ্যাস কোন কাজ হবে না। আপনি বাকি ফোর্স নিয়ে এখানেই থাকুন, আমি যাচ্ছি।

—কোথায়? বিস্মিত কণ্ঠস্বর কালাপাহাড়ের।

—ওখানে, ঐ জনতার সামনে।

উত্তেজিত কণ্ঠে কালাপাহাড় বলে ওঠে, আপনি পাগল হলেন নাকি, মেজবাবু? ঐ জনতার সামনে এই সামান্য ফোর্স নিয়ে গেলে কি আপনার রক্ষা আছে? একবার আমাদের তাড়া খেয়ে ওরা তেতে আছে। আপনাদের হাতের কাছে পেলে যে ছাতু করে ফেলবে।

ম্লান হেসে অমিত বললে, না, তা' করবে না। আমি কিছু না বললে ওরাও কিছু বলবে না। আর তেমন কিছু যদি সত্যিই ঘটে তা'হলে আপনি তো রইলেনই এখানে। ফোর্স নিয়ে ছুটে যাবেন।

—কিন্তু তার চাইতে সমস্ত ফোর্স নিয়ে গেলেই তো ভাল হত।

অমিত আবার দৃঢ়কণ্ঠে বললে, না, তা' হবে না। তাতে জনতাকে অহেতুক উত্তেজিত করে তোলা হবে। আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই। বলেই অমিত আর কথা না বাড়িয়ে সেই বাছাই কনস্টেবলদের নিয়ে জনতার দিকে এগিয়ে যায়।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। অমিতকে এগিয়ে যেতে দেখেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। ঐ সামান্য কয়েকজন কনস্টেবল্ নিয়ে ঐ উত্তেজিত জনতার দিকে সে এগিয়ে চলেছে কি উদ্দেশ্যে?

পুলিশ ফোর্সকে এগিয়ে আসতে দেখে জনতা আবার হৈ-হুল্লোড় করে। আকাশের দিকে বদ্ধমুষ্টি তুলে তারা মুহুর্মুহুঃ শ্লোগান দিতে থাকে।

অমিত কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে জনতার মুখোমুখি দাঁড়ায়? জনতার মধ্য থেকে এবার জেগে ওঠে নানা কটূক্তি,—আর এক শালা এসেছে রে! শালা লাঠি চালাবে নাকি? এবার তা' হলে মেরে একেবারে মাথার চাঁদি ফাটিয়ে দেব—

অমিত কিন্তু উত্তেজনাহীন অচঞ্চলকণ্ঠে বলতে থাকে, আপনাদের রেললাইন ছেড়ে দিতেই হবে। সরকারী হুকুম।

—রেখে দিন আপনার সরকারি হুকুম, মশাই। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন চিৎকার করে জবাব দেয়, কিছুতেই আজ ট্রেন চালাতে আমরা দেব না!

তারা থামতেই ভিড়ের মধ্য থেকে জেগে ওঠে আর একটা বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর,—শালা আমাদের সরকারি হুকুম শোনাতে এসেছে!

দৃঢ় অথচ শান্তকণ্ঠে অমিত আবার বললে, কিন্তু আমাকে যে সরকারি হুকুম মেনে চলতেই হবে। কিছুতেই আপনাদের ট্রেন আটকে রাখতে দিতে পারি না। এটা আমার কোন হুকুম নয়, অনুরোধ। আপনারা দয়া করে রেললাইন ছেড়ে সরে দাঁড়ান।

অমিতের কথায় আবার হৈ হৈ করে ওঠে জনতা। নেতৃস্থানীয় একজন আবার চিৎকার করে বললে, কি করবেন আপনি? লাঠি চালাবেন? গুলি ছুঁড়বেন? তাই করুন। দেখুন, তাতে কি ফল দাঁড়ায়!

জনতার মধ্যে এই সময় একাধিক কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে,—এবার আমরাও প্রস্তুত। আসুন, আপনাদের কত লাঠি, কত গুলি আছে তাই একবার দেখব।

অমিতের মুখে ভেসে ওঠে একটু বিষণ্ণ হাসি। সে আবার বললে, না, আমি লাঠিও চালাব না, গুলিও ছুঁড়ব না।

এবার যেন একটু থতমত খেয়ে যায় জনতা। এমনি একটা জবাব তারা মোটেই আশা করেনি একজন পুলিশ অফিসারের মুখে। তাই তারা কেবল একযোগে তাকিয়ে থাকে অমিতের দিকে।

ঠিক এই সময় ভিড়ের মধ্য থেকে একজন আবার বিদ্রূপ করে ওঠে, তবে কি আপনি কেবল মিঠে বুলি দিয়ে আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে চান?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় অমিত, হ্যাঁ, পারলে তাই সবচাইতে ভাল হত। কিন্তু আপনাদের এ্যাটিচুড্ দেখে বুঝতে পারছি আপনারা সে পথে যেতে চান না। কাজেই আমি ঐ পথও ধরব না।

একটু থেমে অমিত আবার বলতে থাকে, আপনারা যা-ই বলুন, যা-ই ভাবুন না কেন, আমি জানি সরকারী নীতি এই নয় যে, আপনাদের পয়সাতেই কেনা লাঠি, গুলি সরকার অহেতুক আপনাদের ওপর প্রয়োগ করবে। আমিও তা' করব না। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই

জানেন, আন্দোলনে যখন নেমেছেন তখন আপনারা গ্রেপ্তার হতে পারেন। আমিও তাই করতে চাই। কোন হুড় হাঙ্গামা নয়, কোন লাঠি গুলি নয়, আমি আপনাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করব। সেকালে রাজনৈতিক নেতারা যেমনিভাবে গ্রেপ্তার বরণ করতেন, আপনারাও তেমনি নির্ভীকভাবে গ্রেপ্তার বরণ করুন।

অমিত বোধহয় ভুলে গিয়েছিল, একাল সেকাল নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের সংজ্ঞায় সেকালে একালে অনেক তফাৎ। সেকালের মত একালে আর কেউ গ্রেপ্তার বরণ করতে গর্ববোধ করে না। তাই অমিত কনস্টেবলদের ইঙ্গিত দিয়ে জনতার দিকে এগিয়ে যেতেই, জনতা একটু পিছে হটে যায়।

ইতিমধ্যে একজন কনস্টেবল্ একটি লোককে ধরে ফেলেছে। লোকটি কনস্টেবলের হাত ছাড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করতেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়। অসমতল রেললাইনের ওপর সামলাতে না পেরে লোকটি পড়ে গিয়েই চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্য থেকে একঝাঁক পাথর এসে পড়ে পুলিশের ওপর।

থম্‌কে দাঁড়ায় অমিত। এটা কেবল সংকেত। ভবিষ্যতের সংকেত। এর পরেই আবার প্রচণ্ড বেগে পাথর-বৃষ্টি আরম্ভ হবে তাদের ওপর। তখন এই মুষ্টিমেয় পুলিশ বাহিনী নিয়ে বিপদে পড়বে সে।

প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হল অমিতের। না, কোন উপায় নেই। লাঠি চার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সরকারী আদেশ তাকে মানতেই হবে। জনতার জবরদস্তির কাছে মাথা নত করা চলবে না। এখনই বাঁশি বাজিয়ে গোটা পুলিশ ফোর্স ডেকে আনতে হবে।

মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বইতে শুরু করে অমিতের। একটা ভীষণ মানসিক দ্বন্দ্ব মুহূর্তের মধ্যে তার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। চীৎকার করে তার বলতে ইচ্ছে হয়—না না আমি এসব চাই না—আমি এসব ঘটতে দেব না। তোমাদের দেহের রক্ত ঝরিয়ে আমাদের আনন্দ হয় না। বিশ্বাস করো—বিশ্বাস করো, তোমাদের অসুখী দেখে আমরা সুখ পাই না। আমরা তোমাদেরই লোক—তোমাদেরই একান্ত আপন।

কিন্তু উপায় কি? আইনের অনুশাসনমত কাজ করতেই হবে। মেনে চলতেই হবে সরকারী হুকুম। কিন্তু—কিন্তু—

না, কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। পুলিশ অফিসারের এত সেন্টিমেণ্ট থাকা উচিত নয়। জনতা জোর করে ট্রেন আটকে রাখবে, তা' কিছুতেই হতে দিতে পারে না। অমিত যে পুলিশ অফিসার। কর্তব্যই তার কাছে সব চাইতে বড়। বুক পকেটে লিনিয়ার্ডের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে বাঁশিটা। অমিত মুহূর্তের মধ্যে বাঁশিটা টেনে তোলে।

প্ল্যাটফর্মের একপাশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে নোট বইটা রেখে ডান হাতে লিখে যাচ্ছি আমি। চোখে দেখছি, আর হাতে লিখছি। এর মধ্যে ভাবনা চিন্তার অবসর নেই আমার। আমি সাংবাদিক। প্রতিটি ঘটনা যথাযথ লিখে যাওয়াই আমার কাজ।

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজ রঙের ইলেকট্রিক ট্রেনটা। তারই সামনে উত্তেজিত জনতা। জনতার একমাত্র অস্ত্র রেললাইনের পাথর। এদিকে কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীও ছুটে এসেছে। লাঠি উঁচিয়ে তারা তেড়ে যাচ্ছে জনতার দিকে। জনতার দিক থেকেও ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর।

হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনটার একখানা কামরা থেকে বেরিয়ে এল সামান্য কিছু ধোঁয়া। তারপরই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কামরাটা। জনতা আগুন দিয়েছে একখানা কামরায়। পেট্রোলের আগুন। মুহূর্তে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল সমস্ত বগিটাকে।

সেই মুহূর্তে আমি যেন সহস্র লোচন হয়ে উঠেছি। এক সঙ্গেই যেন সব কিছু দেখতে পাচ্ছি—দামী ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের জ্বলন্ত বগি, পুলিশ বাহিনীর লাঠি চার্জ, বিক্ষুব্ধ জনতার পাথর ছোঁড়া, এমনকি জ্বলন্ত বগিটার দিকে তাকিয়ে অমিতের সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটুকুও আমার নজর এড়াল না।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছি আমি। ট্রেনের বগি জ্বালিয়ে দেবার পরিণাম কি হতে পারে তা' আমার অজানা নয়। এখনই অমিত বন্দুকধারী সেপাইদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দেবে—লোড্। অমনি সেপাইরা বন্দুকের মধ্যে গুলি ভরে নিয়ে ট্রিগারের ওপর আঙ্গুল রেখে পরের হুকুমের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকবে। তারপরই অমিত বলবে—ফায়ার! আর সঙ্গে সঙ্গে কর্ণবিদারী শব্দে জ্বলন্ত সীসার পিণ্ডগুলো ছুটে গিয়ে আঘাত করবে কয়েকটি হতভাগ্যের বুকে। অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলবার পূর্বমুহূর্তে সেই হতভাগ্যরা বুকফাটা আর্তনাদ করে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে যাবে। রক্তের প্রস্রবণ বইবে তাদের দেহে। তারপর সব শেষ।

সবদিকে নজর থাকলেও আমার বিশেষ দৃষ্টি কিন্তু রয়েছে অমিতের ওপর। তার প্রতিটি কার্যকলাপ, এমন কি তার অঙ্গভঙ্গিটুকু পর্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি আমি।

কিন্তু কই, অমিত তো গুলি ছুঁড়বার হুকুম দিল না! তার পরিবর্তে একদল লাঠিধারী কনস্টেবল্ নিয়ে সে ছুটে চলল সেই জ্বলন্ত বগিটার কাছে অপেক্ষমান জনতার দিকে। ওদের গ্রেপ্তার কারই বোধহয় তার উদ্দেশ্য।

ওরা ছুটছে—রেললাইনের পাথরের ওপর ভারি জুতোর শব্দ তুলে ছুটছে সেই পুলিশ বাহিনী। সবার আগে অমিত—কোতোয়ালী থানার মেজবাবু অমিত রায়। আমি এখান থেকেও তার চোখে-মুখে কেমন যেন এক বিষাদ জড়ান অথচ বিক্ষুব্ধ ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কেমন যেন এক ক্রোধ ও বিষণ্ণতা অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

নোট বুকের ওপর পেন্সিলটা কিন্তু থেমে নেই আমার। সে চলেছে তার নিজের গতিতে।

অকস্মাৎ, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে একটা প্রচণ্ড শব্দ। পরমুহূর্তেই ঘন ধোঁয়ার আড়ালে ঢেকে গেল সবকিছু। জনতা কিংবা পুলিশ বাহিনী কিছুই আর দেখতে পেলাম না আমি।

স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি তাকিয়ে রইলাম সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে। জনতার মধ্য থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়েছে।

কয়েকটি অসহনীয় উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত আবার। একটু একটু করে সরে গেল সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী। জনতা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে পুলিশ বাহিনী।

কিন্তু অমিত কোথায়? তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

হঠাৎ আমার সর্বাঙ্গে যেন এক বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল। অসাড় হয়ে উঠল আঙুলগুলো। হাত থেকে নোট বুক ও পেন্সিলটা খসে পড়ে গেল। আমি কেবল পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম অমিতের নিথর নিস্পন্দ ভূলুণ্ঠিত দেহটার দিকে। রক্তে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে তার খাকী পোশাক।

না, অমিত শহীদ হয়নি। কেউ তার নামের আগে ঐ পদটি ব্যবহার করেনি। কোন রাজনৈতিক ঘটনায় পুলিশের গুলির মুখে প্রাণ দিলে এদেশের মানুষ শহীদ হয়। কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে পুলিশ বাহিনীর কেউ যখন জনগণের রোষে প্রাণ হারায় তখন সে শহীদ হয় না। বড়জোর, সংবাদপত্রের এককোণে ঐ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কোন সাংবাদিক তার নামটা উল্লেখ করে—এই পর্যন্ত। মাত্র এইটুকুই তার প্রাপ্য। এর বেশি কিচ্ছু নয়।

অমিতের বিয়েতে আমাকে আর নিতবর সাজতে হয়নি। তার আগেই সে চলে গেছে। কেবল আমার মনের মধ্যে রেখে গেছে তার সেই স্মৃতি যা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। একটা চাকরি নিয়ে আজ আমি চলে এসেছি অনেক দূরে। এখনও কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে অমিতের সেই সুন্দর মুখখানা — সেই স্বপ্নময় একজোড়া চোখ, সেই মিষ্টি হাসি। এখনও যেন মাঝে মাঝে আমি স্পষ্ট শুনতে পাই অমিতের সেই সুললিত কণ্ঠস্বর —'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক। আর কিছু নয়, এই মোর শেষ পরিচয়।

অমিত সত্যিই আমাদেরই একজন হতে চেয়েছিল। ভালবাসতে চেয়েছিল আমাদের। পেতে চেয়েছিল আমাদের ভালবাসা।

প্রায় দু বছর পরে মাত্র দিন কয়েকের জন্যে একবার আমাকে আসতে হয়েছিল আমাদের সেই ছোট সহরে। এসে শুনলাম, বৃদ্ধ অজিতেশ দত্ত নাকি মারা গেছেন। আর, তাঁর একমাত্র কন্যা স্মৃতিকণা—অমিতের সেই বাকদত্তা বধূ স্মৃতিকণা নাকি কোথায় একটা মাস্টারি নিয়ে চলে গেছে। তাই আজ তাদের বাড়িতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবারও কেউ নেই।

হ্যাঁ, সত্যিই কেউ নেই—সবাই চলে গেছে। চলে গেছে শঙ্কর, চলে গেছে অমিত, চলে গেছেন অজিতেশবাবু। স্মৃতিকণাও আর এখানে নেই। আমি নিজেও আজ প্রবাসী। একমাত্র চলে যায়নি জোড়াপুকুর মাঠের সেই দেবদারু গাছটা, যার ছায়ায় বসে একজোড়া যুবক যুবতি একদা এক রঙিন আশার স্বপ্ন দেখতো। আজও বোধহয় যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, যখন দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে, যখন সাদা বকের দল আকাশে লম্বা পাখা মেলে নিজেদের আস্তানায় উড়ে যেতে থাকে, ঠিক তখনই হয়ত সেই দেবদারু গাছটি দক্ষিণের মৃদু হাওয়ায় ডালপালা আন্দোলিত করে হাতছানি দিয়ে ডাকে তার সেই হারিয়ে যাওয়া সাথী দু'টিকে।